নদীয়া-কাহিনী।

নদীয়া-কাহিনী।

নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন-ইতিকথা, বিদ্যাচর্চ্চা,
ধর্ম্মালোচনা, বংশ-পরম্পরাগত-কাহিনী, বিশিষ্ট-জীবনী,
এবং সাহিত্য, শিল্প, লোকাচার সম্বন্ধীয় বিবিধ
জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত
মুখবন্ধ সংবলিত।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

রাণাঘাট
সন ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

প্রকাশক
গ্রন্থকার
সাহিত্য-সভা।
১০৬।১, গ্রে_ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মুদ্রিত
ওলিম্পিয়ান প্রেস
৫৬, বেচু চাটুর্জ্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আর, আর, সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ২৸৹ আনা।

উৎসর্গ।



কর্ম্মমাত্রেই ফলপ্রসূ

অতএব

এই ক্ষুদ্র কর্ম্মের

যদি

কিছু ফল থাকে

তবে

সেই ফল

শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মে

ভক্তিপূর্ব্বক

অর্পণ করিয়া

ক্ষুদ্র

গ্রন্থকার

ধন্য

এবং

কৃতার্থ হইল।

আমার প্রিয় সুহৃদ্ অশেষ গুণালঙ্কৃত বঙ্গ-সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আন্তরিক যত্নে সাহিত্য-সভা আজ ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। আমার নদীয়া-কাহিনী সাহিত্য-সভার নামে প্রকাশিত হওয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আমি শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ মহোদয় প্রমুখ সাহিত্য সভার সুধী সভ্যগণের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম।

গ্রন্থকার।

মঙ্গলাচরণ

১। কেচিদ্বিষ্ণুং যমাহু স্ত্রিভুবন শরণং পূর্ণতাং যস্তমন্যা
কেচিচ্চাংশাবতারং বিবিধগুননিধিং নিত্যমাহুঃ প্রগল্ভাঃ।
কেচিৎভক্তং বদন্তি প্রতিহতমতয়োভাব গাম্ভীর্য্য পূর্ণং
সশ্রীকং তং নদীয়াজনচিতিতমসাং জ্ঞানদীপ স্বরূপং॥

২। নদীয়াভূষণং বন্দে বিষ্ণুং গৌরাঙ্গ রূপিণং।
পিত্রোশ্চচরণদ্বন্দ্বং সর্ব্বকামপ্রদং দ্বিজান্॥

সাহিত্যসভা-গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ২।

নিবেদন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে বংশবাটীর কৃতবিদ্য বিদ্যোৎসাহী কুমারগণের যত্নে পরিচালিত পূর্ণিমা নাম্নী মাসিক পত্রিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য-মহারথী প্রথিত-নামা যশস্বীলেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে "নদীয়া কাহিনী" নামে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার লিখিত সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে নদীয়াসম্বন্ধে আরও অধিক কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি নদীয়ার সমাজ, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় ইতিহাস সংগ্রহে যত্নবান হই ও বহু পরিশ্রমে এতদিনে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সম্প্রতি পুস্তকাকারে "নদীয়া-কাহিনী" নামে প্রকাশ করিলাম।

নদীয়া-কাহিনীকে নদীয়ার ইতিহাস বলা যায় না। তবে যে সকল উপাদানে ইতিহাস বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদের দেশে অন্যান্য বিষয়ের যতই কেন উন্নতি হউক না, ইতিহাসের চর্চ্চা যে কখনও বহুল পরিমাণে হইয়াছে, বলিয়া অনুমিত হয় না। যাহা কিছু ইতিহাস বলিয়া সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহা এতই অদ্ভুত ও অলৌকিক কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন যে, তাহার মধ্য হইতে খাঁটি সত্যটুকু বাছিয়া লওয়া সুকঠিন। আর তাহা বাছিয়া লইতে গেলেও ইতিহাসের অঙ্গে অনেক ক্ষত হইয়া পড়ে; তাই এই পুস্তক রচনায় বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছে, আর সেই জন্যই ইহার নাম নদীয়ার ইতিহাস না দিয়া "নদীয়া-কাহিনী" দিয়াছি। নদীয়া-কাহিনী কেবলমাত্র নবদ্বীপের কাহিনীতে পূর্ণ নহে, ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সমগ্র নদীয়া জেলার জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে।

সাধারণতঃ ইতিহাস বলিলে মনে যে একটা স্থান-বিশেষের রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির চিত্র মনে আসে, নদীয়ার ঠিক্ সেরূপ বিবিধ ঘটনা-রাগ-রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিবার উপায় নাই। কারণ, শেষ বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের পর, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসরের ব্যবধান। এই সুদীর্ঘকাল নদীয়া হইতে রাজধানী অপসারিত হওয়ায়, নদীয়ার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এইরূপ আরও অনেক সময়ের তথ্য সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। সুতরাং নদীয়ার ইতিহাস বর্ণন করিতে যাইয়া আমাকে অনেক সময় বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস বর্ণন করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গেতিহাসে নদীয়ার সংস্রব কতটুকু এবং বাঙ্গালার সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-বিপ্লবে নদীয়ার প্রভাব কতখানি, এইগুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রথম কয়েক অধ্যায়ে বঙ্গেতিহাসের সহিত নদীয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিয়াছি। পরে, পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে খাঁটি নদীয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এমন কি পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত গ্রাম মাত্রেরই স্থানীয় ইতিহাস পৃথক্‌ভাবে বিস্তীর্ণ-রূপে লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। একদিকে যেমন নদীয়া-রাজবংশের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি, তেমনি আবার বহুতর প্রাচীন বংশের ইতিহাস স্থানীয় বিবরণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

মুখ্যতঃ বিদ্যাচর্চ্চা লইয়াই নদীয়ার যশঃ পৃথিবী-ব্যাপ্ত! তাই, ন্যায়দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, বঙ্গভাষা ও পারস্য ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার চর্চ্চা, নদীয়ায় কোন্ সময় হইতে আরম্ভ ও উহাদের ক্রম-বিকাশ কিরূপে হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিয়াছি। এ সকল বিষয়ে লিখিবার এতই সামগ্রী আছে যে, উহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিলে তবে উহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু প্রত্যেকের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ লিখিত হইলেও, উহাদের কেবল স্থূল ঘটনা-গুলি মাত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর কয়েকজনের জীবনী মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

ধর্ম্মচর্চ্চাই নদীয়ার যশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়াছে; আর নবদ্বীপচন্দ্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবই নদীয়ায় প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের প্রাণ-স্বরূপ; তাই, তাঁহার পূতচরিত নদীয়ার ধর্ম্মচর্চ্চা অধ্যায়ে পৃথক্‌রূপে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি এবং মহাজন-বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের লিখিত বিবরণ হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির বিবরণ যতদূর প্রকাশ করিলে সাম্প্রদায়িক আপত্তির কারণ না হইতে পারে, ততদূরই প্রকাশ করিয়াছি। মুসলমান ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞান অতি সামান্য সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আমি লিখিয়াছি তাহাতে ভুল প্রমাদ থাকা সম্ভব। যদি কোনও সহৃদয় পাঠক কৃপা করিয়া ঐ সকল ভ্রম, বা অন্য কোন ভ্রম বা ত্রুটী প্রদর্শন করাইয়া দেন তাহা হইলে আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঐ সকল ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইব। সাম্প্রদায়িক মেলাগুলির বিবরণ স্বচক্ষে দেখিয়া বা স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

সমগ্র বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস যাহা, নদীয়ার সামাজিক ইতিহাসও তাহাই। তবে, বিশেষভাবে নদীয়ার সামাজিক পরিবর্ত্তন কিরূপে সাধিত হইয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য নদীয়ার গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতেই তত্তৎ সময়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

নদীয়ার যে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান সমূহের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ স্থানীয় জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ও প্রাচীন দলীলাদি দৃষ্টে লিখিত। তবে এ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট হইতে যতদূর সহানুভূতির আশা করিয়াছিলাম, তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায়, নদীয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সমস্ত স্থানগুলির ইতিহাস দিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে সাধারণের সহানুভূতি পাইলে, সমস্ত স্থানের সম্পূর্ণ ইতিহাস দিবার ইচ্ছা থাকিল। নদীয়া সম্বন্ধে "বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়" বলিয়া যে অধ্যায়টী লিখিয়াছি, তাহাতে বর্ত্তমান নদীয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ের statistical account যথাযথভাবে দেখান

হইয়াছে, যথা—জেলার ক্রমবিস্তৃতি ও তাহার হ্রাস, নদীয়ার নদী, রাজবর্ত্ম, আদমসুমারী, নদীয়ার কৃষী ও বাণিজ্য ইত্যাদি।

পুস্তকের মূলভাগে যে সকল বিষয় স্থান পায় নাই, তাহাই পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নদীয়া-কাহিনী মুদ্রাঙ্কণ করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে,নদীয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথাই একরূপ সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত হইলে দেখিলাম যে, অনেক কথাই লেখা হয় নাই। ভগবান দিন দিলে, সে সকল কথাই পুনরায় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এ পুস্তকে যে সমস্ত ছবি দিয়াছি, তাহার অধিকাংশই আমি নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে Photographer পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছি, আর কতকগুলি আমি মাননীয় বিচারপতি সাহিত্য-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরঋণী রহিলাম।

এই পুস্তক রচনায় আমি আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকের নিকটেই নানারূপে উৎসাহ লাভ করিয়াছি, সেজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তবে যাঁহাদের সহানুভূতি ও উৎসাহ না পাইলে আমি এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না, তাঁহাদের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যগুরু পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়,যিনি আমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করেন এবং কৃপা করিয়া আমার প্রায় সমগ্র পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিয়া নিরাভরণা নদীয়া-কাহিনীকে সালঙ্কারা করিয়া সাধারণের সম্মুখে প্রকাশযোগ্য করিয়া দিয়াছেন এবং পূজনীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযদুনাথ সার্ব্বভৌম, কবিভূষণ শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন. শ্রীহরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, শ্রীঅহিভূষণ কাব্যতীর্থ প্রমুখ নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহর-প্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ,শঙ্করাচার্য্য-

চরিত, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-রচয়িতা পণ্ডিত শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীরামময় বেদান্ত-রত্ন, উড়িষ্যার চিত্র প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গগত মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, শোভাবাজারের সাহিত্যানুরাগী রাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সুকবি শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী এবং আমার সোদর-কল্প বংশবাটীর স্বনামখ্যাত উদার-চরিত সাহিত্যসেবী সুধী রাজকুমারগণ প্রমুখ অনেকের নিকট আমি তাঁহাদের কৃত উপকারের জন্য চিরঋণী রহিলাম।

আমার অক্ষমতা বশতঃ এই গ্রন্থে নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও, ইহাতে আমার যত্নের ত্রুটি হয় নাই, তবে বিষয়টী যেরূপ দুরূহ এবং দেশের লোকের এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকেরও এবিষয়ে যেরূপ ঔদাসীন্য, তাহাতে গ্রন্থ সকলনে ও তথ্যসংগ্রহে সাধারণের নিকট আশানুরূপ সহানুভূতি না পাওয়ায় ইহাতে বহু ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া অবধি আমি দারুণ বাতরোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় এবং বহুদিন রোগভোগ করায়, সেই পীড়িত অবস্থায় প্রুফ সংশোধনে যথোচিত মনোযোগী হইতে না পারায়, মুদ্রাঙ্কণে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে সে ত্রুটি সংশোধনে যথোচিত যত্ন করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক রচনায় আমি কোনও বিষয়ের মৌলিকত্বের দাবী করিতেছি না বা সে স্পর্দ্ধাও রাখিনা। আমি নদীয়া সম্বন্ধে যেখানে যেটুকু বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি মাত্র। পরন্তু কোনও বিষয়ে মতান্তর প্রাপ্ত হইলেও সে সম্বন্ধে নিজের কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া তাহার সকলগুলিই পুস্তকে স্থান দিয়াছি। ফলতঃ বিশাল সাহিত্যক্ষেত্রে নদীয়ার ন্যায় কমনীয় ফলফুলে সুসজ্জিত কাননের যেখানে যে ভাল ফুলটী পাইয়াছি, তাহাই চয়ন করিয়া নদীয়া-কাহিনী রূপ মালা গাথিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই মালা যদি কাহারও মনোরঞ্জনে অপারক হয়, তবে সে দোষ পুষ্পের নয়—সে দোষ মালাকরের। এই ক্ষীণ-শক্তি মালাকরের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং যোগ্যতা কিছুই নাই, তবে সুরভি কুসুমের

প্রাণোন্মাদী গন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাহা নিজে উপভোগ করিয়া আর দশজন বন্ধু বান্ধবকে আনন্দ দিতে তাহার এই বিফল প্রয়াস। যদি কোন দক্ষতর শিল্পী এমন সুরভিকুসুমের অযোগ্য হস্তে এরূপ লাঞ্ছনা দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং এই সকল পুষ্পে সুন্দরমালা গ্রন্থন করেন, তবেই এই পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। সেদিন কি হইবেনা?

রাণাঘাট, নদীয়া।
১৪ই ভাদ্র সন ১৩১৭।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

মুখবন্ধ।

আপনাদের কথা, আপনাদের ঘরের কথা, আর একটু অধিকতররূপে ভাবিতে যদি আমরা অভ্যাস করি, তাহা হইলে, আমাদের অধিকতর মঙ্গল হয়। এমনই একটা ধারণা হইয়াছে যে, যে যত আপনার ঘরের কথা না জানে, তাহার তত 'কুপমণ্ডূকত্ব' অপবাদ ঘুচিয়া গেল। এই ধারণার বশে যুবকগণ আপনার দেশের, আপনার জাতির কিছুই না জানিয়া, না বুঝিয়া বিলাতে, বা অন্য কোন বিদেশে আপনার জ্ঞান বিস্তার করিতে যান;সেখানকার সমাজ-শৈবালের শোভা মাথায় পূরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন—একটি কিম্ভূত-কিমাকার জীব। দেশে আসিয়া হন—সমাজ-সংস্কারক। এই বিষমবিড়ম্বনা হইতে শীঘ্র বঙ্গীয় যুবকগণকে রক্ষা করিতে না পারিলে, আমরা তথা কথিত কুপমণ্ডূকমণ্ডলীর পরিবর্ত্তে পাইব—কেবল কতকগুলি উড়ন্ত ঘুঘু—সেই ঘুঘুগুলি আমাদের কোটা-ভিটায় প্রবেশলাভ করিয়া, আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

বাঙ্গালী যুবককে বাঙ্গালার কথা ঔষধ-গিলান মত করিয়া শিখাইতে হইবে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি সুধিগণ বাঙ্গালিকে বাঙ্গালার কথা শিখাইতে অগ্রসর হইয়া আপনারা ধন্য হইয়াছেন ও আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। খ্যাতনামা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় কৃষ্ণনগরের রাজবংশের এবং রাজাদিগের কৃতিত্বের বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করিয়া, যে পথ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই পথে আমাদের নবীন যুবক গ্রন্থকার রাণাঘাটের শ্রীমান্ কুমুদনাথ মল্লিক অগ্রসর হইয়া, এই যে নদীয়া-কাহিনী প্রচারিত করিলেন, ইহাতে সাধারণতঃ বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ নদীয়া জেলার অধিবাসীদের বিশেষ উপকার হইবে।

প্রাচীন য়ুনানী মণ্ডলে যেমন আথিনী নগরী, ভারতে যেমন বারাণসী,

বঙ্গে তেমনই নবদ্বীপ, ভারতীয় রাজধানী—কিতির প্রদীপ। নবদ্বীপ, সরস্বতীর সিংহাসন—এইখানে দীপ জ্বলে, চারিদিকে আলো হয়। স্মৃতি, তন্ত্র, ন্যায়, জ্যোতিষ—এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কলি-পাবন পতিত-তারণ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই খানেই অবতীর্ণ হইয়া, অপূর্ব্ব হরিনাম প্রচারে কলি-কলুষিত জীবের সদ্গতিসাধন করিয়াছেন। এই নদীয়ার এবং সমগ্র নদীয়া জেলার বিবরণ, ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আমাদের লিখিবার সামগ্রী। আবার নদীয়া জেলার পলাশী-ক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্যপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সুতরাং নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসও আমাদের অনুশীলনের উপযোগী।

নদীয়া-কাহিনীতে এসকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে, আরও অনেক প্রয়োজনীয় কথাও বিস্তর আছে। ফলকথা, নদীয়া-কাহিনীতে ভবিষ্যৎ বঙ্গেতিহাসের একটি প্রধান অংশ সঙ্কলিত হইল।

আমার ধাত্রীমাতা বৃদ্ধা এবং এক চক্ষুহীনা ছিলেন—সেই বিড়ম্বনায় আমার মাথার উপরিভাগ দগ্ধ হয়, এখনও কেশহীন। আমি নদীয়া-কাহিনীর সূতিকা হইতে পরিচর্য্যা করিয়াছি, আমিও এখন বয়োবৈগুণ্যে শক্তিহীন, দৃষ্টিক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছি—সুতরাং নদীয়া-কাহিনীর যে অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই—তবে ধাইগিরীতে যে নবগর্ভিণী সুপ্রসবা হইলেন, নবীন যুবক যে এরূপ সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইলেন, তাহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

নবপ্রসূতকে সূতিকায় সকলেই সোণারচাঁদ দেখে—আমাদের এই সোণার চাঁদকে, তোমাদের কোলে দিলাম, তোমরা বুকে করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে তোলো—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। ছেলে ভাল মন্দ—তোমরা যেমন লালনপালন করিবে, তেমনই হইবে। আমরা তার কি জানি?

কদমতলা, চুঁচুড়া
৫ই আষাঢ়, ১৩১৭।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।



সূচিপত্র।

চিত্রাবলী।

নদীয়ার মানচিত্র।
নবাব মুরশীদকুলী খাঁ।
নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ।
নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা।
নবাব মীরজাফর ও মীরণ।
ইংরাজের বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্তি।
লর্ড ক্লাইব।
ওয়ারেণ হেষ্টিংস্।
বঙ্গেশ্বর পিটারগ্রাণ্ট।
ডব্লিউ, এস্, সিটন্‌কর।
রেভাঃ জেমস্ লঙ্।
দীনবন্ধু মিত্র।
রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।
সার উইলিয়ম জোন্স্।
লর্ড কর্ণওয়ালিস।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
নবদ্বীপস্থ বর্ত্তমান পণ্ডিতমণ্ডলী।
সপরিষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাগবত শ্রবণ।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির।
লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমত্যানুসারে
নদীয়ায় ঢালাই কামান।
নবদ্বীপাধিপতি ৺ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর।
নবীন নবদ্বীপাধিপতি ক্ষৌনীষ চন্দ্র রায় বাহাদুর।
শিবনিবাসের শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির।
শিবনিবাসের ১ম শিবমন্দির।
শিবনিবাসের ২য় শিবমন্দির।
কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন চক্।
কবি কৃত্তিবাসের ফুলিয়ার দোলমঞ্চের ধ্বংশাবশেষ।
রাণাঘাটের জমীদার ৺ শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী।
রাণাঘাটের জমিদার ৺রামলাল দে চৌধুরী।
শান্তিপুর শ্যামচাঁদের শ্রীমন্দির।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্থাপিত উলার দীর্ঘিকা।
বাগের মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ।
মহামহিমান্বিত রাজরাজেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ড।
মহামহিমান্বিত রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ।





নদীয়া-কাহিনী।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আজ যে জনসঙ্কুল বিপুলা নগরী অগণিত পণ্য-বিথীকা, অসংখ্য সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি, শত শত অশ্ব গজাদিতে পরিপূর্ণ, কালে তাহাই বিজন অরণ্যে পরিণত। আজ যে স্থানে সমুন্নত গিরিশ্রেণী সগৌরবে নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাত অবহেলা করিতেছে, সময়ে হয়ত সেই স্থানেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল নীলাম্বুরাশির লহরীলীলা পরিদৃষ্ট হইবে। যে উত্তর কোশল একদিন প্রাতঃস্মরণীয়, বরেণ্য, সূর্য্যবংশীয় রাজগণের সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ছিল, যে স্থানে অন্য কথা কি, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং রঘুপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত শাসন ও স্বীয় মহতী সুপবিত্র লীলার দ্বারা মানবকে তাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, জগতের সেই শ্রেষ্ঠ পুরীর আজ কি দশা! যে ইন্দ্রপ্রস্থ একদিন মহারাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার মহা প্রতাপান্বিত আদর্শচরিত্র ভ্রাতৃগণের প্রিয় রাজধানী ছিল, যে স্থানে শত সহস্র নরপতি পাণ্ডবের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া তাঁহাদের সেবায় নিরবধি রত রহিতেন, সুবর্ণধাম সৌন্দর্য্যভূষিত সেই বিশালপুরী আজ কোথায়! যে মহতী দ্বারকানগরী শ্রীশ্রীনারায়ণের মর্ত্তলীলার ঐশ্বর্য্যবিকাশ, সেই ভূস্বর্গ দ্বারাবতী আজ কোথায়! আবার সেদিন যে সুপ্রশস্ত দিল্লীনগরী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মোগল বাদশাহগণের রাজধানীরূপে শোভা ও সমৃদ্ধির আধার ছিল, এবং যে বাদশাহগণ 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া খ্যাত হইতেন, আজ সেই দিল্লী এবং দিল্লীশ্বরগণের কি দশা! কালে সকলই লয় হয়, আবার পুরাতনের স্থানে নূতনের উদ্ভব হয়।

যে নবদ্বীপ একদিন স্বাধীন বাঙ্গালী সম্রাটের রাজধানী ছিল, যে স্থানের জ্ঞানগরিমা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত, যে পবিত্রধামে শ্রীমদ্ কৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং

নবদ্বীপচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল মহিমা আত্মচরিত্রে প্রদর্শন করিয়া লোক শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে স্থানের পণ্ডিত-মণ্ডলী সমগ্র দেশের বরেণ্য, সেই মহিমান্বিত নবদ্বীপ আজ গৌরবের স্মৃতি ও সমাধি মাত্রে পর্য্যবসিত। কালের গতি অতি কুটীল ও দুর্ব্বোধ্য। যে স্থান একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, আজ সে স্থান ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আশার ক্ষীণ রশ্মি মাত্রেরও বিকাশ নাই।

নদীয়ার সমগ্র ইতিহাস ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, স্বতই মনে হইবে যে নদীয়া যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত অথবা রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের জন্য উদ্ভূত হয় নাই। উহার প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যা ও জ্ঞান, এবং ধর্ম্ম। জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনাই নদীয়ার বিশেষত্ব। জ্ঞান নদীয়ার রক্ত, মাংস, অস্থি ও মজ্জা এবং ধর্ম্মই নদীয়ার প্রাণ।

নদীয়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে সমস্তই অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়। পুরাকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারী-গণের লিখিত বিবরণে কুত্রাপি নদীয়ার নাম দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীক বা রোমিয়গণের বৃত্তান্তেও ইহার কোন উল্লেখ নাই কিম্বা সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান বর্ণিত তৎকালীন বঙ্গের ইতিহাসে নবদ্বীপের উল্লেখ নাই। আবার যখন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অন্যতম চীন পরিব্রাজক হুয়েন্থসাং বঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিয়াছিলেন, তখনও তিনি নবদ্বীপের নামোল্লেখ করেন নাই। অতএব এ সময়ে হয় নবদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল না, অথবা উহা সামান্য নগণ্য অবস্থায় থাকায় কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তবে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের সংগৃহীত গ্রন্থ সমুদায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে পৌরাণিক যুগেও নদীয়ার নাম পরিচিত ছিল। শ্রীমৎ পূর্ণব্রহ্ম, শ্রীধাম নবদ্বীপে, শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন, এই মতের পোষকে যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করা হয়, সেই পৌরাণিক শ্লোকা-বলীই এ বিষয়ের উত্তম প্রমাণ।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে সমগ্র নদীয়া এবং বর্ত্তমান যশোহরের উত্তরাংশ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বহু পুরাতন সুবিস্তীর্ণ ও সমুন্নত চরভূমি এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে অধ্যুষিত।

কলকল নাদিনী স্বচ্ছ সলিলা ভাগীরথী, প্রাতঃস্মরণীয় ভগীরথের ঐকান্তিক ভক্তি ও কাতর প্রার্থনায় যখন সগরবংশের উদ্ধার কল্পে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াও সগর সন্তানগণের উদ্দেশ পান নাই, তখন কৃপাময়ী জননী ভক্তের কারণে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং এক শরীর হইতে শত মুখী হইয়া সগর সন্তানোদ্দেশে দক্ষিণমুখে প্রবাহিতা হন। সেই শত মুখ মধ্যবর্ত্তি জাহ্নবী বিধোত পূত বায়ু সম্পৃক্ত ভূখণ্ডই বঙ্গনামে অভিহিত। বাঙ্গলা যেন মায়ের কমনীয় কণ্ঠে মনোহর কণ্ঠভূষণ আর নবদ্বীপ—পুণ্যধাম নবদ্বীপ—যে স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বন্যায় সমগ্র ভারত প্লাবিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীধাম যেন সেই মনোরম ভূষণের দ্যুতীমান মধ্যমণি। চৈতন্য ভাগবতকার প্রণম্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় প্রকৃতই লিখিয়াছেন—

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যথা অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোসাঞি।"

নবদ্বীপের অপর নাম নদীয়া। প্রথমে কোন্ নামটীর দ্বারা ইহার নামকরণ সমাধা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। এই দুইটী নামের আবার বহু লোকে বহুবিধ অর্থ করিয়া থাকেন। যাঁহারা নবদ্বীপকে "নয়টি দ্বীপের সমষ্টি" বলিয়া উল্লেখ করেন তাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি একজন। ইঁহার প্রণীত "নবদ্বীপপরিক্রমাপদ্ধতি" * নামক গ্রন্থে নবদ্বীপকে নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বলিয়া এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

"নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে, নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥"
"নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
যৈছে রাজধানী কোন স্থান।
যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম॥"

---

* নরহরি দাস বিরচিত "নবদ্বীপ পরিক্রমাপদ্ধতি"—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

তিনি উক্ত গ্রন্থে যে নয়টি দ্বীপের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে পাঁচটি গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ও চারিটি পশ্চিম পারে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে যথা:—

গঙ্গার পূর্ব্ব পারের ৪টী দ্বীপ :—

(১) অন্তর্দ্বীপ——মায়াপুর বা মেয়াপুর, ভারুইডাঙ্গা ইহার অন্তর্গত। এই স্থানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।

(২) সীমন্তদ্বীপ—সরডাঙ্গা, সিমলাদি ইহার অন্তর্গত।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার আদি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৪) মধ্যদ্বীপ——মাজীদা, ভালুকা আদি ইহার অন্তর্গত।

গঙ্গার পশ্চিম পারে ৫টী দ্বীপ :—

(১) কোল দ্বীপ——কুলিয়া তেঘরির দক্ষিণ ও সমুদ্রগড় ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) ঋতু দ্বীপ———রাতুপুর, রাহুতপুর ও বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত।

(৩) মোদদ্রুম দ্বীপ—মাউগাছি, মামগাছি ও মহৎপুর ইহার অন্তর্গত।

(৪) জহ্নু দ্বীপ———জাননগর বা জান্নুনগর।

(৫) রুদ্রদ্বীপ———রাহুপুর বা রুদ্রডাঙ্গা, সঙ্কাপুর ও পূর্ব্বস্থলী আদি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

যাঁহারা নবদ্বীপের নূতন দ্বীপ অর্থ করেন, তাঁহারা বলেন যে পূর্ব্বকালে এই স্থান গঙ্গামধ্যবর্ত্তী চর ভূমি ছিল এবং উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া গঙ্গা ও জালাঙ্গী প্রবাহিত ছিলেন; কালে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ চরভূমি ক্রমশ: বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠে। ক্রমশ: জনসমাগমে ক্ষুদ্র পল্লী হইতে উহা একদিন সমগ্র বঙ্গের রাজধানীতে পরিগণিত হয়। দ্বীপের উপর নূতন গ্রাম সংস্থাপিত হয় বলিয়া উহা নব-দ্বীপ নামে খ্যাত হয়।

নদীয়া নামের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে পূর্ব্বকালে প্রদীপকে "দীয়া" বলিত এবং ন অর্থাৎ নয়টি দীয়া হইতে নবদীপ বা নদীয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতের পোষকে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, যখন গঙ্গামধ্যস্থিত সুবিস্তীর্ণ চরে প্রথম মনুষ্য সমাগম হইতে থাকে, তখন উক্ত চরে একজন সন্ন্যাসী প্রতি নিশায় নয়টী দীপ জালিয়া

কোনও তান্ত্রিক সাধনায় রত রহিতেন। লোকে দূর হইতে ঐ নয়টী দীপ দেখাইয়া উক্ত চরকে ন-দীয়ার চর বলিয়া অভিহিত করিত। ক্রমে যখন উক্ত চরে গ্রাম বসিল, তখন উহা নদীয়া নামে খ্যাত হয়; পরে কালের ক্রিয়ায় যখন এই ক্ষুদ্র চর বিশাল বঙ্গভূমির ঐশ্বর্য্যশালিনী রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইল, তখন তদধীন সুপ্রশস্ত রাজ্য সাধারণত নদীয়া নামে অভিহিত হয়।

নদীয়া রাজ্য বলিতে বল্লাল সেনের সময় সমগ্র বাঙ্গালা রাজ্য বুঝাইত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় উত্তরে পলাশী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে ধুলিয়াপুর ও পশ্চিমে ভাগীরথী এই চতুঃসীমান্তর্গত সুবৃহৎ চৌরাশী পরগণা বুঝাইত এবং ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগকে বুঝাইত। বর্ত্তমানকালে উত্তরে রাজসাহী, পূর্ব্বে পাবনা ও যশোহর, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা ও পশ্চিমে বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর-পশ্চিমে মুরসিদাবাদ এই চতুঃসীমান্তর্গত ভূখণ্ডই নদীয়া নামে খ্যাত। *

---

* Padma separating Nadia from Pabna and R jshahi; Jalangi from Murshidabad, Bhagirathi forming the Western boundary, but for the change of its curre t Navadip now lies on the farther bank of the river. Kaliaduk forms the South-eastern boundary separating from Jessore.

W. W. Hunter's Imp. Gazetteer of India Vol.X.



নদীয়ায় হিন্দুরাজত্ব।

বর্ত্তমান যুগে নদীয়া বলিয়া যে নদী বহুল প্রশস্ত ভূখণ্ড আখ্যাত, তাহা পুরাকালে গৌড়েশ্বরগণের রাজ্যান্তর্গত ছিল। এই গৌড় রাজ্য খৃষ্ট জন্মের ৭৩০ বৎসর পূর্ব্বেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিল, এবং গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল। এই খণ্ড পঞ্চ, পাঁচজন পৃথক নরপতির শাসনাধীন ছিল; এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি পঞ্চ গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। গৌড়ের অপর নাম লক্ষ্মণাবতী; সম্ভবতঃ টলেমি তাঁহার বর্ণনায় "গ্যানজিয়া রিজিয়া" বলিয়া যে ভূভাগের উল্লেখ করিয়াছেন উহাই এই গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী *। হিন্দুকুলচূড়ামণি মহারাজ আদিশূর ৯৯৯ শকে বা ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধাধিকার হইতে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করণান্তর স্বয়ং গৌড় রাজ্য অধিকার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্ত পুনরুড্ডীয়মান করেন †। কথিত আছে একদিন রাজা আদিশূর শ্রান্তি বিনোদনার্থ যখন প্রাসাদোপরি পাদচারণা করিতেছিলেন, সেই সময় একটী শকুনী অস্বাভাবিক শব্দ সহকারে তাঁহার প্রাসাদের শিখরদেশে সবেগে অবতরণ করে। শাস্ত্রজ্ঞানী রাজা, স্থান, কাল বিবেচনা করিয়া এই শকুনী অবতরণকে বিশেষ অশুভ জ্ঞাপক অবধারণ করেন এবং এ সম্বন্ধে স্বীয় সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মত জিজ্ঞাসু

---

* Gour called also Luknowti the ancient Capital of Bengal and supposed to be the Gangia regia of Ptolemy, stood on the left bank of the Ganges about 25 miles below Rajmahal. It was the Capital of Bengal 730 years before Christ.

Major Rennells' map of Hindustan.

† জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যাধিরাজ্যান।

শব্দকল্পদ্রুম।

হইলে, তাঁহার সভাস্থ একজন ব্রাহ্মণ বলেন যে সম্প্রতি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি কান্যকুব্জাধিপতির প্রাসাদে অবিকল এবম্বিধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এক মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা এতদ্বিষয়ের দোষশান্তি করিয়াছেন। ধর্ম্মগত প্রাণ নরপতি ব্রাহ্মণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কান্যকুব্জাধিপতির ন্যায় নিজেও যজ্ঞ দ্বারা এই অশুভ ঘটনার স্বস্ত্যয়ন করিতে বাসনা করেন। কিন্তু সে সময়ে বৌদ্ধ প্রভাবে তাঁহার রাজ্যমধ্যে তদ্রূপ ক্রিয়াশীল বেদজ্ঞ সুব্রাহ্মণের অভাব থাকায়, কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামধেয় আচারবান পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং ভক্তি ও যত্নসহকারে ধন রত্ন ও গ্রামাদি দান করিয়া তাঁহাদের এতদ্দেশে স্থাপনা করেন *। ইঁহারাই বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। মহারাজ আদিশূর এইরূপে বঙ্গদেশের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার বংশ কিছুদিন গৌড়সিংহাসনে রাজত্ব করিবার পর তদ্বংশীয়গণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয়েরা গৌড় অধিকার করেন। পরে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে সেন নরপতিগণ এদেশে রাজা হন এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান নবদ্বীপের ৪ মাইল পূর্ব্বে সুবর্ণবিহার নামে যে ক্ষুদ্র পল্লী বর্ত্তমান, উহাই পাল রাজাগণের অন্যতম বাসস্থান; এবং উক্ত পল্লীতে অদ্যাপি যে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহাই তাঁহারা পালরাজন্যবর্গের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পরন্তু বৌদ্ধগণের মঠের অপর নাম "বিহার"; এই গ্রামটীর নামের সহিত বিহার শব্দ যোগ থাকায় ইঁহাদের মতের পোষকতা করিতেছে। ইঁহাদের মতে নবদ্বীপ উক্ত রাজাগণের রাজত্বকালে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

মতান্তরে সেনবংশীয় হিন্দু নরপতিগণের রাজত্বকালে সামন্ত সেন নামে ঐ বংশীয় এক বৃদ্ধ নরপতি শেষ দশায় গঙ্গাতীরে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া গঙ্গা জালাঙ্গী সঙ্গমে এক উপনিবেশ স্থাপনা করেন। এই উপ-

* ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্।

ত্রিবেণীর অনতিদূরে বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত। এই সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন আপনার বাহুবলে বহু দেশ জয় করিয়া প্রবল প্রতাপশালী হয়েন। সুবিখ্যাত বল্লাল সেন এই বিজয় সেনের পুত্র। ইনি পিতার ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর এবং শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। সুবিখ্যাত গ্রন্থ দানসাগর তৎকর্ত্তৃক রচিত হয়। তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রধান প্রধান নদীর গতি অনুসারে পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত করেন। যথা—বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও মিথিলা *। এবং উক্ত প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে তত্তৎ নামে অভিহিত করেন, যথা—রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, মৈথিলী ইত্যাদি। এই সময়ে বল্লাল সেন সমাজে কৌলিন্যমর্য্যাদার সৃষ্টি দ্বারা জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সম্মান বাড়াইয়া যান। তিনি গৌড়-ব্যতিরেকে নবদ্বীপ ও সুবর্ণগ্রামে আর দুইটী রাজধানী স্থাপনা করেন, এবং জীবনের অধিকাংশ সময় পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তীরস্থ নবদ্বীপে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতেন, এক্ষণে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছেন †। বল্লালের সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ও বল্লাল দীঘি ইত্যাদি এখনও নবদ্বীপে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রাসাদের এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে কতিপয় কাষ্ঠের বারকোশ ও একটী বল্মীকদষ্ট ভগ্নসিন্দুক আবিষ্কৃত হয়। এই কাষ্ঠসিন্দুকের মধ্য হইতে কয়েকখানি কীটদষ্ট জীর্ণ শাল ও পশমী পোষাকের জীর্ণাতিজীর্ণ ছিন্নাংশ ও কতিপয় রৌপ্য মুদ্রা বহির্গত হয় ‡।

---

* বঙ্গ—গঙ্গাসঙ্গম স্থানের পূর্ব্ব, প্রধানতঃ বর্ত্তমান ঢাকা বিভাগ। রাঢ়—ভাগীরথীর পশ্চিমে এবং গঙ্গার দক্ষিণে, প্রধানতঃ বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ। বরেন্দ্র—পদ্মার উত্তরে এবং বারতোয়া ও কুশী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ, বর্ত্তমান রাজসাহী। বাগড়ী—গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থল, বর্ত্তমান প্রেসি-ডেন্সি বিভাগ। মিথিলা—মহানন্দার পশ্চিম প্রদেশে, বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্গত। প্রধানতঃ দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর ও পূর্ণিয়া।

† কথিত আছে ১২০৬ সনে ভাগীরথী এইরূপ গতি পরিবর্ত্তন করেন।

‡ On the other side of the river, there is a large mount still called after Ballal Sen. It was recently dug by one Mullah Shahib

বল্লালের শেষ জীবনে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন * পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া নবদ্বীপের বিশ্বপুষ্করিণীর দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।

---

who discovered some *Barkoshes* or wooden trays and a box containing remnants of shawls and silken dresses and also some small silver coins.

Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. II. p. 142.

* মতান্তরে লক্ষ্মণ সেন দেব ১১০৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার প্রথম পুত্র মাধব এক বৎসরের নিমিত্ত, পরে তাঁহার মধ্যম কেশব ১১০৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনিও অল্প বয়সে ১১১৮ খৃষ্টাব্দে এক গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী ও জনসাধারণ এই গর্ভস্থ সন্তানকেই রাজ্যেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। দশম মাসে সভাস্থ জ্যোতির্ব্বিদগণ গর্ভস্থ সন্তানের শুভাশুভ গণনা করিয়া আসন্নপ্রসবা রাণীকে বলেন, "যদি গর্ভস্থ শিশু এখনই জন্ম গ্রহণ করেন তবে দুর্ভাগা ও অল্পায়ু হইবেন, কিন্তু আর দণ্ড চারি পরে ভূমিষ্ট হইলে শিশু ভাগ্যবান হইবেন।" স্নেহশীলা মাতা পুত্রের ভাবী কল্যাণ কামনায় প্রসব বেদনা উপস্থিত হইবা মাত্র স্বীয় পরিচারিকাগণকে ও রাজবৈদ্যগণকে আহ্বান করিয়া কোন উপায় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক প্রসবে বিলম্ব ঘটাইতে বলেন; কিন্তু ঔষধাদিতে স্বভাবের গতি রোধের উপায় না দেখিয়া রাণী স্বীয় পদদ্বয়ে রজ্জু বন্ধন করিয়া উর্দ্ধ পদে অবস্থান করেন। এই অস্বাভাবিক উপায়ে স্বাভাবিক নিয়মের যদিও একটু ব্যতিক্রম হইল এবং পুত্রও কিঞ্চিৎ বিলম্বে ভূমিষ্ট হইল কিন্তু স্নেহশীলা মাতা পুত্রমুখ দর্শনের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিলেন। ট্যালবয় হুইলার সাহেব, ইলিয়ট সাহেব প্রভৃতির মতে এই পিতৃমাতৃহীন দুর্ভাগ্য সন্তানই পরে লক্ষ্মণের নামে অভিহিত হয়েন এবং ইহারই রাজত্বকালে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার বঙ্গদেশ জয় করেন। এ সম্বন্ধে হুইলার সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"The Raja of Nadia was named Rai Laksmaniya. His timidity may be in part ascribed to a belief in astrology. His mother is said

সর্ব্বধ্বংসী কালের হস্তে ইহাও এখন সুবিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এই অন্ধ বিশ্বাসই তাঁহার এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বনাশের মূল। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের সমস্ত ভারই ব্রাহ্মণগণের উপর ন্যস্ত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হলায়ুধ ও তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; বটুদাস নামে একব্যক্তি সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু তিনি যে কখনও সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বেই ত্রিপুরা, কামরূপ, পঞ্চকোট প্রভৃতি রাজ্যগুলি গৌড় রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। গৌড় রাজ্য যখন এইরূপে ক্রমে ক্রমে হীনবল হইতেছিল সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া সুচতুর মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজি বেহার জয় করিয়া ধীরে ধীরে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়েন *। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন এই সময়ে অশীতিপর বৃদ্ধ, মুসলমানগণ রাজধানী আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া তিনি কর্ত্তব্যাবধারণের নিমিত্ত সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত জিজ্ঞাসা করেন। শুভাশুভ অবধারণের নিমিত্ত দৈবজ্ঞগণের মত গ্রহণ করা হইল। দৈবজ্ঞগণ গণনাদ্বারা স্থির করিলেন যে রাজা লক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যচ্যুত হইবেন ও তাঁহার রাজ্য ম্লেচ্ছ জাতির হস্তগত হইবে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবে তাহার আকার ধর্ম্ম,

---

to have been put to horrible torment in order to delay his birth a couple of hours. The astrologers had assured him that he would be deprived of his kingdom by a man with long arms.

Wheeler's History of India. Vol. IV. Part I. p. 45.

* বেহার হইতে যে পথে বক্তিয়ার নবদ্বীপ জয় করিতে অগ্রসর হয়েন চেষ্টা করিলে তাহা বাহির হইতে পারে। নদীয়া জেলার যে যে স্থান দিয়া তিনি গমন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম বহন করিতেছে। শান্তিপুর ও বয়রার মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিনি গঙ্গা পার হইয়াছিলেন এখনও ঐ স্থানটী বক্তারের ঘাট নামে খ্যাত। এইরূপ অনেক স্থানে তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও মুখ মর্কটাকৃতি হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন দৈবজ্ঞগণ ও রাজ্যের কোনও কোনও কৃতঘ্ন কর্ম্মচারী মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার কর্ত্তৃক সবিশেষ প্রলুব্ধ হইয়া স্বীয় প্রভুকে প্রতারণা পূর্ব্বক নিজ মাতৃভূমি বিজাতীয় হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের কোনও উপায় নাই, তবে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া প্রতীতি হয়। বক্তিয়ার নবদ্বীপের উপকণ্ঠস্থ বনাভ্যন্তরে তাঁহার বিপুলবাহিনী লুকায়িত রাখিয়া, মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে অশ্ব বিক্রয়চ্ছলে দিবা দ্বিপ্রহরে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন *। সে সময়ে প্রাসাদস্থ রক্ষীবৃন্দ মাধ্যাহ্নিক পাককার্য্যাদিতে রত ছিল। বক্তিয়ার পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক রক্ষীবৃন্দ ও কর্ম্মচারীগণকে হত্যা করিতে লাগিলেন।

---

* বক্তিয়ারের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে অধুনা নানারূপ তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস বিদ্যমান না থাকায় অতীতের অন্ধকারময় গর্ভে শেষ বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী কি ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা তাঁহার পক্ষে কলঙ্কের কি গৌরবের সে বিষয়ে কিছু বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে সপ্তদশ অশ্বারোহীর নবদ্বীপ অধিকার কাহিনী "তবকাৎ-ই-নাসেরী" লেখক মিনহাজউদ্দীনের কল্পনা প্রসূত মাত্র; তাহা তাঁহার স্বাভাবিক হিন্দু বিদ্বেষের পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। মিনহাজউদ্দীন বঙ্গবিজয়ের কয়িৎকাল পরেই বক্তিয়ারের পার্শ্বচর অনেক মুসলমানের নিকট শুনিয়াই সর্ব্বপ্রথম এই কলঙ্ককাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। এবম্বিধ বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা লক্ষ্মণ সেনের ললাট হইতে ভীরুতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক চিহ্ন মুছিয়া লইতে চাহেন, এবং তৎস্থলে "অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি" "অরিরাজ মদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব" নামে তাঁহাকে মহিমান্বিত করিতে চাহেন। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ মতের একজন পরিপোষক, তিনি নবপর্য্যায় ৩য় বর্ষের বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

এই সময় দলে দলে মুসলমান সেনা বনপ্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়া নগর আক্রমণ করিল *। রাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ব হইতেই অবশ্যম্ভাবী পরাজয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সহসা এইরূপে আক্রান্ত হওয়ায় নবদ্বীপ ত্যাগ করত সপরিবারে বিক্রমপুরে প্রস্থান করেন এবং বঙ্গেতিহাসের অকলঙ্কিত পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য কলঙ্ককালিমা লেপন করেন।

রাজপুরী হস্তগত করিয়া বক্তিয়ার আপন সৈন্যদিগকে নদীয়া লুণ্ঠন করিতে আদেশ দেন। এইরূপে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় † করিলেও সমগ্র বঙ্গভূমি অধিকার করিতে মুসলমানগণের শতাধিক বৎসর লাগিয়াছিল। বক্তিয়ার এইরূপে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপ ধ্বংস করিয়া বঙ্গের পুরাতন রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে পুনরায় রাজধানী স্থাপন করেন। এই দিন নবদ্বীপের এবং সমগ্র বাঙ্গালার পক্ষে একটী স্মরণীয় দিন।

* Vide Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. II. p. 143.

† তবকাৎ-ই-নাসিরী নামক প্রাচীন মুসলমান ইতিহাসে বঙ্গবিজয়ের সময় ৫৯০ হিজরী বা ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত আছে। Blochman's Contribution to the Geography and History of Bengal in J. A. S. B. 1873 Pt. I p. 211 মতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে, Asiatic Researches, Vol. IV. p. 203তে উইলসন সাহেবের মতে ১২০৭ খৃষ্টাব্দে, এবং Thomas' Initial Coinage of Bengalএ ১২০৫ খৃষ্টাব্দে, উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেব প্রাগুক্ত সমস্ত পুস্তকগুলি বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়া "১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় হইয়াছিল" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরও এই মত।



নদীয়ায় যবনাধিকার।



বক্তিয়ার খিলিজি, অধিকৃত প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন, এবং গৌড়ের ন্যায় দিনাজপুরের সন্নিহিত দেবকোটে আর একটী রাজধানী স্থাপন করেন। এই দেবকোটেই বক্তিয়ার কালগ্রাসে পতিত হন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দিল্লীশ্বরের অধীন হয়, বাদশাহ গায়সুদ্দিন বলবন্ শাসন সৌকার্য্যার্থ বঙ্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গৌড়নগরীকে উত্তর ভাগের, সুবর্ণগ্রামকে পূর্ব্ব ভাগের এবং নবদ্বীপের পরিবর্ত্তে সরস্বতী-তীরস্থ সপ্তগ্রামকে পশ্চিম ভাগের রাজধানী মনোনীত করেন *। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যাদির কেন্দ্রস্থলরূপে গণ্য হয় এবং বহুসংখ্যক ধনবান্ বণিক এখানে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কালে এই সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ধনীর অভ্রভেদী প্রাসাদ ও দরিদ্রের পর্ণকুটীর একই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে দিন বিশাল-কায়া বেগবতী পুণ্যসলিলা সরস্বতীর স্রোত মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইয়া-ছিল সেই দিন হইতে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়।

১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়স্ সমগ্র বঙ্গদেশের একছত্র রাজা হন এবং দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন। সামসুদ্দিন গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুবিখ্যাত সেরসাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তিনি

* In the early period of the Mahometan rule Satgaon was the seat of the Governors of Lower Bengal and a mint town. It was also a place of great commercial importance.

Encyclopedia Brittanica. 9th Edition Vol. XII Page 148.

তাঁহার কৃতঘ্ন পুত্র গীয়াসুদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত হইলে, ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ বাইজিদ্‌সাহ নামে একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দশ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করেন। গণেশের পুত্র জাঠমল বা যদু জালালুদ্দিন নাম ধারণ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ১৪১৪ হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনন্তর জালালুদ্দিনের পুত্র আহমদ্‌সাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তিনি অচিরে তাঁহার ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক নিহত হইলে নসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার পুত্র বারবাক্ সাহ নিজ সেনাদলে আট হাজার হাব্‌সী ক্রীতদাসকে স্থান দান করেন। তাহারা ক্রমশঃ প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং অন্তঃপুর রক্ষী খোজা ও পাইক সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ফতে সাহকে হত্যাপূর্ব্বক বারীক নামক খোজাকে সুলতান সাজাদা নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার সিংহাসনে এইরূপে এক নপুংসক সমারূঢ় হইল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে হয় নাই। হাব্‌সী সেনাপতি মালিকিদ্দিন ইহাকে নিহত করিয়া ফিরোজ সাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার পর নসিরুদ্দিন মহম্মদসাহ রাজা হন। তিনিও আবার সিদ্দিবদর দেওয়ানে নামক এক ব্যক্তির দ্বারা নিহত হন। এই সিদ্দিবদর মজাফর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার ন্যায় নৃশংস ও যথেচ্ছাচারী রাজা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। তিনি নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে প্রথমে তুর্কী জাতীয় ওমরাহগণের নিধন সাধন করেন, পশ্চাৎ হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদারগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করেন। এই নির্ম্মম নরপতির অত্যাচার হইতে কাহারও নিস্তার ছিল না। তিনি ভয়ঙ্কর হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এই সময়ে কতকগুলি মুসলমান তাঁহার নিকট নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের নামে নানারূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার হয়। তাহাদের অত্যাচার নবদ্বীপের সন্নিহিত পিরল্যা গ্রামেই অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করে। তাহারা পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণগণকে বলপূর্ব্বক তাহাদের উচ্ছিষ্ট

অভক্ষ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করাইয়া জাতি ধর্ম্ম নাশ করিয়াছিল। এইরূপে নষ্টধর্ম্ম পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ উত্তরকালে পিরালী নামে অভিহিত হন *।

---

* "আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘর দ্বার লোটে তার নাগপাশে বাঁধে॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যা বাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকিও প্রমাদ হবে পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা॥
এই মিথ্যাকথা রাজার মনেতে থাকিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল"॥

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটী শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয় ভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের ভাগ্যবান পুত্র শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাত্র জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে বিবৃত করিয়াছেন। জয়ানন্দ এই ঘটনার প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি, সুতরাং তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার কথায় অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। এই উৎপীড়িত পিরল্যাগ্রামবাসীগণের "পিরালী" নামকরণ সম্বন্ধে দুই মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই পিরল্যাবাসী নষ্টধর্ম্মী ব্যক্তিগণই পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা ব্যক্তির নাম হইতে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন থাকের উৎপত্তি তেমনি পিরল্যা হইতে "পিরালী" থাকের উৎপত্তি হয়। আবার কেহ বলেন, বাগের হাটের পীর আলি সাহেব হইতে পিরালীর উৎপত্তি, এবং বাগের হাটে পীরআলি সাহেবের যে কবর

অনিচ্ছায় বল প্রয়োগে জাতিচ্যুত হইলে অনেকে যবনাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার অনেকে করেন নাই *।

পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে † খাঁ জাহান আলি বা খাঞ্জেআলি নামে কোন এক ধনশালী মুসলমান দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সুন্দরবন আবাদের সনন্দ লইয়া যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সুজলা সুফলা উর্ব্বরা ভূমিতে বিস্তীর্ণভাবে আবাদ করিয়া খাঞ্জেআলি অল্পকালের মধ্যে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া উঠেন এবং নবাব খাঞ্জেআলি নামে খ্যাত হন। নবাব খাঞ্জেআলির সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার যশোহরের বেঙ্টিয়া পরগণার জমিদার কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর অর্পিত ছিল। এই দুই ভ্রাতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে এবং নবাব খাঞ্জেআলির অর্থে খুলনা বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত ও পুষ্করিণী খনন করা হয় ‡।

এই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ তাহের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নবাব খাঞ্জে আলির সহিত মিলিত হন। মহম্মদ তাহের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একজন গোঁড়া মুসলমান হইয়া উঠেন এবং নবাব খাঞ্জে আলির সাহায্যে তৎপ্রদেশস্থ হিন্দুগণকে মুসলমান করিতে প্রবৃত্ত হন ও তিন শত ষাটটী মস্জিদ্ স্থাপন করেন, এ কারণে

অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে উহাতে পীর-আলির মৃত্যু তারিখ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে, অতএব পীরালীর সৃষ্টি জয়ানন্দ বর্ণিত ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ ঐ নষ্টধর্ম্মী পিরালীগণের মধ্যে বহু লোক আসিয়া নবদ্বীপের পল্লীবিশেষে বাস করায় উহাই পীরল্যা গ্রাম নামে অভিহিত হয় এবং উক্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া গৌড়েশ্বর নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি প্রদান করেন।

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ আইনের ৭ ধারা দৃষ্টে জানা যায় ম্লেচ্ছাচারী পিরালীগণের শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নিষিদ্ধ জাতির তালিকা হইতে পিরালী নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

† জয়ানন্দ বর্ণিত পিরালী বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক।

‡ Vide Hunter's Statistical Account of Jessore.

তৎপ্রদেশস্থ মুসলমানগণ তাঁহাকে "পির আলি" নামে অভিহিত করিয়া সম্মানিত করেন। পিরআলি আপনার বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ক্রমে নবাব খাঞ্জে আলির অতিশয় প্রিয়পাত্র হন এবং পরিশেষে তাঁহার উজিরী পদ লাভ করেন। দরিদ্র তাহের উজিরী পদ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না, তিনি দেখিলেন তদঞ্চলে কামদেব ও জয়দেব রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তি অসাধারণ; একে তাঁহারা স্বয়ং বহু অর্থের অধীশ্বর তাহাতে আবার নবাব খাঞ্জে আলির সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার হস্তে থাকায়, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের রাজা; সুতরাং উজিরী পাইলেও তাঁহাকে এই দুই ভ্রাতাকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে; বিশেষতঃ তাঁহারা নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ, আর তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বধর্ম্মত্যাগী মুসলমান বলিয়া অনেকের চক্ষে অতি হীন। এই সকল কারণে পিরআলি, চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং কিসে তাঁহাদের অনিষ্ট করিবেন তাহার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কোন একটী ঘটনা উপলক্ষে পিরআলি তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। নবাব খাঞ্জে আলি সকল সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন না। এক্ষণে উজির হওয়ায় পিরআলিই অধিকাংশ সময় দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরীও কার্য্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে দরবারে আসিতেন। এক দিন রোজার উপবাসকালের মধ্যে দরবার হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক কর্ম্মচারী একটী ঘৃতকলম্বা লেবু আনিয়া উজিরকে উপহার দিলেন। পিরআলি লেবুটীর আঘ্রাণ লইয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সেই দরবার গৃহে নিষ্ঠাবান হিন্দু চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় উপস্থিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ কামদেব রায়চৌধুরী উপবাসকাল মধ্যে উজির সাহেবকে লেবুর আঘ্রাণ লইতে দেখিয়া বলিলেন—"হুজুর করিলেন কি, রোজার দিন লেবুর আঘ্রাণ লইলেন?"। উজির জিজ্ঞাসা করিলেন—"দোষ কি?" তাহাতে কামদেব উত্তর করিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে উপবাসের দিন কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ পর্য্যন্ত লইতে নাই, কারণ ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন হয়।" পির-আলি একথা শুনিয়া মনে করিলেন তিনি যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাই লক্ষ্য

করিয়া কামদেব তাঁহাকে এবম্বিধ বিদ্রূপ করিতে সাহসী হইয়াছেন। তিনি মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

প্রতিহিংসা-পরায়ণ উজির এক দিন প্রজাসাধারণ ও কর্ম্মচারী-বৃন্দের এক দরবার আহ্বান করিলেন এবং চৌধুরীবংশের সকলকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে ঐ দরবার প্রাঙ্গণের সন্নিকটে এক সুপ্রশস্ত গৃহে মুসলমান বাবুর্চ্চিগণ নানাবিধ সুগন্ধি মসলা পলাণ্ডু ও লশুনাদি সংযোগে গোমাংস রন্ধন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সভাগৃহ গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল। সভাস্থ হিন্দুগণ নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বসিলেন; পিরআলি মনে মনে সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়া মৌখিক সৌজন্য সহকারে বলিলেন, "চৌধুরী মহাশয়গণ ওরূপ নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন কেন? ব্যাপার কি?" কামদেব উত্তর করিলেন "মাংসের গন্ধ"। তখন নষ্টবুদ্ধি পিরআলি বলিলেন "অগ্রে গোমাংসের গন্ধ পাইয়া পরে নাসিকা আচ্ছাদন করিয়াছেন, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্র মতে আপনাদের সকলেরই ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনাদের সকলেরই জাতিচ্যুতি ঘটিয়াছে, এক্ষণে আর নাসিকা-চ্ছাদনে ফল কি?" পিরআলির এবম্বিধ বাক্যে কামদেব প্রমাদ গণিলেন। ও দিকে উজিরের আদেশে কয়েকজন সিপাহী আসিয়া বল-পূর্ব্বক কামদেব ও জয়দেবের মুখে গোমাংস প্রদান করিল। গ্রামস্থ হিন্দুগণ সকলে মিলিয়া রায়চৌধুরী বংশীয়গণকে ও অন্যান্য দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পতিত সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার রহিত করিলেন। এ দিকে কামদেব ও জয়দেবের মুখে প্রত্যক্ষ-ভাবে গোমাংস পতিত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ ও নিকট কুটুম্বগণও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন সেই দুই দুর্ভাগা ব্রাহ্মণ সন্তান মুসল-মান হওয়া ব্যতিত গত্যন্তর নাই দেখিয়া নবাব খাঞ্জেআলি খাঁর শরণাপন্ন হইলেন ও যথাক্রমে কামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী ও জামালুদ্দীন খাঁ চৌধুরী নাম লইয়া যশোহরের পাঁচ ক্রোশ দূরে সিংহিয়া গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিলেন; ইহাদের বংশাবলী বৃদ্ধি পাইয়া এখন

সাতক্ষীরা, হুসেনপুর, মাগুরা, বসুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

পীরআলির দৌরাত্ম্যে এই সকল ব্যক্তির জাতিচ্যুতি ঘটায় তাঁহাদের পতিত বংশাবলী সাধারণতঃ পিরালী নামে খ্যাত হন। রায় চৌধুরী বংশীয়গণ এইরূপে শুড়গ্রামী সাধ্য শ্রোত্রীয় হইতে পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে বিশেষ দায়ে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধনের অপ্রতুল ছিল না, সুতরাং ধনবলে কুলীন ও শ্রোত্রীয় পাত্র সংগ্রহ করিয়া বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই সকল কুটুম্বগণও পতিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে পিরালীগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এতদ্ব্যতীত পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এ সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, যাহা ইতিহাসবহুল প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সাহিত্যে আদৃত তথা কথিত বিবরণটী, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

নবদ্বীপবাসীগণের উপর অত্যাচার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পিশাচ প্রকৃতি মজাফরের প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন সাহ মুসলমান ও হিন্দু জমিদারগণের সহিত মিলিত হইয়া ১৪৯৬ অব্দে মজাফরের কলুষময় জীবনের অবসান করত স্বয়ং বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। হুসেন সাহ নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির ও ভগ্ন দেউল প্রভৃতির পুনঃসংস্কারের অনুমতি প্রদান করেন। এই হুসেন সাহ পূর্ব্বে সুবুদ্ধি খাঁ নামক এক জন ধনাঢ্য কায়স্থের বাটীতে ভৃত্যের কার্য্য করিতেন। কোন সময়ে সুবুদ্ধি খাঁ তাঁহাকে পুষ্করিণী খনন কার্য্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। কিন্তু হুসেন তাঁহার প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে সবিশেষ মনোযোগী না হওয়ায়, সুবুদ্ধি বেত্রাঘাতে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করেন। হুসেন নীরবে বেত্রাঘাত সহ্য করেন এবং পূর্ব্ববৎ প্রভুর কার্য্য করিতে থাকেন, এ কারণ সুবুদ্ধির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সুবুদ্ধির চেষ্টায় হুসেন রাজসরকারে প্রথমে একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন, উত্তরকালে স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত লাভ করেন।

হুসেন সাহের সময়ে কামরূপ বিজিত হয় এবং চট্টগ্রামে মগগণ পরাজিত হয়। ইনিই মেদিনীপুর অঞ্চলে হাব্সীদিগকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া উড়িষ্যার রাজাদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থা অতি সচ্ছল ছিল। ধনীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন। নিমন্ত্রণ সভায় যিনি যত সুবর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি তত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি একদিকে যেমন সুশাসক বলিয়া পরিচিত, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা বলিয়াও সুবিখ্যাত। ইঁহারই আদেশে সুপ্রসিদ্ধ কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন, ইহা পারগলী ভারত বলিয়াও খ্যাত। বঙ্গকবি গুণরাজ খাঁ, ছুটী খাঁ, গোপীনাথ বসু প্রভৃতি ইঁহার সভার উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

হুসেনের সময় অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় দবীর খাস ও সাকর মল্লিক নামে তাঁহার সভায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সপ্তগ্রামের রাজপ্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি দান করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন *। চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে ও বহু সমসাময়িক সাহিত্যে দেখা যায় যে সে সময়ে কয়েকজন কাজী বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নদীয়া শাসন করিতেন। চাঁদ খাঁ নামক একজন কাজী নবদ্বীপের একাংশে বেলপুখুরিয়ায় বাস করিতেন। আর একজন শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে থাকিতেন; তাঁহার নাম ছিল মুলুক; ইঁহার গোরাই নামে এক জন হিন্দুবিদ্বেষী পরম অত্যাচারী অমাত্য ছিল। কাজীগণ বিদ্বেষ বশতঃ সর্ব্বদাই হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ভক্ত-

---

* হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ, ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

শিরোমণি যবন হরিদাস * ইসলাম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করায় শান্তিপুর নিবাসী কাজীর প্ররোচনায় ও বাদসাহের বিচারে বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে হরিদাস ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর অপার কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপস্থ চাঁদ কাজী মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়াও পরিশেষে তাঁহার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন।

হুসেন সাহের পরবর্ত্তীকালে সের সাহ নামক একজন দুর্দ্ধর্ষ আফগান প্রথমে বঙ্গদেশ পরে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সের সাহ রাজকার্য্যে সুদক্ষ হইলেও অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এমন কি তাহাদের জাতি ধর্ম্ম হানিকর আইনাদি প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সকল আইনের মধ্যে "হিন্দু প্রজা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে অশক্ত হইলে মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে তাহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, এবং ইসলাম ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত হিন্দু প্রজা ঘৃণা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য," †

* ভক্ত শিরোমণি হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বূঢ়ণ গ্রামে মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, প্রথমে তিনি বনগ্রামের অন্তর্গত বেনাপোলের বনাভ্যন্তরে নিভৃত কুটীরে নাম যজ্ঞ আরম্ভ করেন। কিন্তু ঐ স্থানের জমীদার রামচন্দ্র খানের পীড়নে তিনি উক্ত আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রথমে শান্তিপুরে, পরে সপ্তগ্রামের সন্নিকটস্থ চাঁদপুর গ্রামে আসিয়া কিছু দিন বাস করেন, পরে তথা হইতে আসিয়া শান্তিপুরের সন্নিকটে ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে এক গুহা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার প্রতি শান্তিপুরের কাজীর বিদ্বেষ জন্মে। ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের গুহার কোনও চিহ্ন ছিল না। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যশোহর জেলার চাঁচুড়ি পুড়ুরী গ্রামের জগদানন্দ গোস্বামী বহু কষ্টে ও অনুসন্ধানে হরিদাসের আশ্রম ও ভজন গুহাটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও গুহাটীকে কূপাকারে সংরক্ষণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে আশ্রমের তলে গঙ্গা না থাকিলেও গঙ্গার গভীর খাত বিদ্যমান আছে। ইহার উপর কবি কৃত্তিবাসের বাস্তুভিটা।

† When the collector of the Dewan asks them (the Hindus) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission. If the collector wishes to spit into their mouth, they should open

ইত্যাদি আইন প্রচলন দ্বারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র হিন্দুর ধর্ম্মনাশ করিয়া মুসলমান করিয়া যান। ইহাই এতদঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয় †।

সের সাহের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় কয়েক জন গৌড়ে শাসনকর্ত্তা হন। রাজনীতিবেত্তা মোগল-কুল-রবি সুচতুর আকবর সাহ সমগ্র হিন্দুস্থান করতলগত করিয়া সেনাপতি মুনিম খাঁকে এবং তোডরমল্লকে বাঙ্গালায়, পাঠান শাসনের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রেরণ করেন। এই সময়ে গৌড়ে অত্যন্ত মারিভয় উপস্থিত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক এই লোকক্ষয়কর ব্যাধির দারুণ কবলে কবলিত হওয়ায় প্রাচীন গৌড় একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁও এখানে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং আকবর সাহ তাঁহার স্থানে হুসেনকুলী খাঁ নামক একজন দক্ষ সেনাপতিকে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তোডরমল্লের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। সুচতুর তোডরমল্ল দিল্লী হইতে সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ জমিদারবর্গের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে তদানীন্তন নদীয়ার অন্তর্গত চতুর্বেষ্টিত দুর্গস্বামী কায়স্থকুলভূষণ রাজা কাশীনাথ রায় তোডরমল্লের সহিত মিলিত হন এবং মোগলের পক্ষ হইয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গ এক্ষণে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং সাধারণতঃ চৌবেড়িয়া নামে খ্যাত। ইহা বর্ত্তমান বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেল-

---

their mouths without the slightest fear of contamination so that the collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam—the true religion and to show contempt to false religions.

Von. Noha's Akbar.

এই বর্ব্বরোচিত আইন মহামতি আকবরের সময় রহিত হয়।

† The existence of a large Musalman population in the district (Nadiya) is accounted for by wholesale forcible conversions at a period anterior to the Moghul Emperors during the Afghan supremacy.

Hunter's. S. Account Vol. II p. 51.

ওয়ের গোপালনগর ষ্টেশন হইতে ৭ সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। * চতুর্বেষ্টিত দুর্গ যখন প্রাসাদ, পরিখা ও অগণিত জনপূর্ণ ছিল, তখন সন্নিহিত বনগ্রামও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। পূর্ব্বে চতুর্বেষ্টিতদুর্গ ও রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া পুণ্যসলিলা যমুনা প্রবল বেগে প্রবাহিতা ছিলেন; সেই দুর্গপাদচারিণী বিশালকায়া যমুনাও এক্ষণে ক্ষীণ রজত রেখার ন্যায় অতি মৃদু গতিতে প্রবাহিতা। কোথাও আবার সেই সূক্ষ্ম প্রবাহেরও অভাব দাঁড়াইয়াছে। গুণগ্রাহী বাদসাহ আকবর সেনাপতি তোডরমল্লের নিকট বঙ্গবীর রাজা কাশীনাথের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং পাটনা অবরোধের সময় স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া পাটনা অধিকারের পর প্রকাশ্য দরবারে রাজা কাশীনাথকে সমর-সিংহ এই গৌরব জনক উপাধি ও বাদসাহী ঝাণ্ডা, নাগরা, পাল্কী ও অশ্ব গজাদি প্রদান পূর্ব্বক নানারূপে সম্মানিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই যখন কুলী খাঁ ও তোডরমল্লের সম্মিলিত বিপুল মোগলবাহিনী পলায়নপর শেষ পাঠান নরপতি দায়ুদ খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল তখনও রাজা সমরসিংহ সানন্দচিত্তে সর্ব্ব প্রথমে তোডরমল্লের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং নিজের স্বাভাবিক বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালা হইতে পাঠান রাজ্য উচ্ছেদের ও মোগল রাজত্ব সংস্থাপনের বিশেষ সহায়তা

* পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুলেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস্, মহোদয় যখন বনগ্রামের সব ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন বহু অনুসন্ধানে এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গস্বামীর বীরত্বকাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস "বঙ্গবিজেতা" প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালে চৌবেড়িয়াতে পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কোনরূপ চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। চতুর্বেষ্টিত স্থানটীর মধ্যে এক্ষণে রাজার বাগান, ফুলবাড়ী ও সেহালাপাড়া নামে তিনটী ম্যালেরিয়া পীড়িত ক্ষুদ্র পল্লী বিদ্যমান আছে। তাহারা তাহাদের নামের সহিত যেন একটা পূর্ব্বস্মৃতির আভাসমাত্র বহন করিতেছে। এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গ এখানে সাধারণতঃ রাজা সতীশের দুর্গ বলিয়া খ্যাত। সতীশ ইছাপুরের জমিদার ও সমরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বংশ অদ্যাপি ইছাপুরে বিদ্যমান। ইছাপুর চৌবেড়িয়া হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী। এই চৌবেড়িয়া সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ প্রণেতা ৺দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের জন্মস্থান।

করেন। মহাবীর্য্যশালী রাজা সমরসিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবহ। বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইলে কুলী খাঁর উপর কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত বঙ্গের শাসন ভার অর্পণ করিয়া রাজা তোডরমল্ল সম্রাট আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী গমন করেন। এই সুযোগে সমরসিংহের কতিপয় কৃতঘ্ন কর্ম্মচারী সমরসিংহের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করে। রাজবিদ্রোহ-অপবাদে তদানীন্তন বঙ্গের সুবেদারের অদ্ভুত বিচারে সমরসিংহের শিরশ্ছেদন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তোডরমল্ল বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলে সমরসিংহের মহিষী তাঁহার নিকট বিচারপ্রার্থিনী হন। রাজা তোডরমল্ল, চতুর্বেষ্টিত দুর্গে বঙ্গবিজয়ের ঘোষণাস্বরূপ এক বিরাট দরবার আহ্বান করেন এবং সমর-সিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই দরবারে সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। এত দিনে বাঙ্গালায় স্বাধীন পাঠান রাজত্ব শেষ হইয়া বাঙ্গালা প্রত্যক্ষভাবে মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। রাজা তোডরমল্লই বাঙ্গালার মোগল সম্রাটের প্রথম প্রতিনিধি। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ জমাবন্দী করিয়া রাজস্বের সু-বন্দোবস্ত করেন ও আশ্‌লী জমানুসারে বঙ্গদেশকে ১৯টী সরকারে ও ৬৮৯টী মহলে বিভক্ত করেন। তোডরমল্লের আশ্‌লী জমায় ১০,৬৯৩,০৬৭৲ আকবরসাহী টাকা রাজস্ব আদায় হইত। পূর্ব্বোক্ত ১৯টী সরকারের মধ্যে ১১টী গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব্বে ৮টী গঙ্গার পশ্চিম এবং ভাগীরথীর সঙ্গমস্থানের নিকট অবস্থিত, তন্মধ্যে সরকার সপ্তগ্রাম ১টী। জেলা নদীয়া তখন সরকার সপ্তগ্রামের অধীন ছিল। এই সপ্তগ্রাম সরকার তখন বহুদূর বিস্তৃত ছিল; ইহার উত্তর সীমা পলাশী, দক্ষিণ সীমা হাতিয়াগড় এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম কপাতক (কপোতাক্ষ নদী ?) হইতে ভাগীরথীর উত্তর তীর লইয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার অধিকাংশ মহল বর্ত্তমান নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই সুবিস্তীর্ণ সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৪১৮,১১৮৲ আকবরী টাকা, বন্দর ও হাটের আয় ছিল ৩০,৩০০৲ টাকা, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে আয় ২৯৭,৭৪১৲ টাকা বলিয়া উল্লিখিত আছে *।

* Grant's Analysis of the Bengal Finances.

পাঠানগণ বিজিত হইলেও তাহাদিগকে মোগলগণের করতলগত রাখা দুঃসাধ্য হইল। সুযোগ পাইলেই বাঙ্গালার ভূস্বামীগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা নামে দিল্লীশ্বরের অধীন হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহারাই দেশের প্রকৃত রাজা ছিলেন। এইরূপে স্বাধীন ভূস্বামীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ জন প্রধান ছিলেন, তাঁহারা সাধারণতঃ দ্বাদশ ভৌমিক নামে খ্যাত। এই সকল স্বাধীন ভূস্বামী-গণের মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। মোগলগণ কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইলে পাঠান রাজের একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বহু পাঠান সর্দ্দারের ও স্বীয় ধন রত্নাদি সহ সুন্দরবনের মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন; তাঁহার নাম বিক্রমাদিত্য। তিনি এই জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশে ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া তদানীন্তন ভূস্বামীগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা বসন্ত রায় ইঁহার খুল্লতাতপুত্র এবং বঙ্গের শেষ বীর—বীরচূড়ামণি প্রতাপাদিত্য ইঁহার পুত্র। এই প্রতাপাদিত্য আকবরের শেষ জীবনে তাঁহার অতি দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়া উঠেন। তিনি চট্টগ্রামের ও আরাকানের রডা-প্রমুখ পর্ত্তুগীজদিগকে আপনার গোলন্দাজ সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিয়া পুরী হইতে নোয়াখালি পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ অধি-কার করেন। নদীয়ার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চননগর বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়া এবং জগদ্দল প্রভৃতি স্থানও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এখনও জগদ্দলে তাঁহার গড় ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে ও রাজার পুকুর নামে পুষ্করিণী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তাৎ-কালিক নদীয়ার অপরাপর স্থানেও তাঁহার অধিকারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে প্রতাপের রাজ্যলাভের পূর্ব্ব হইতেই কুশদহের অন্তর্গত জলেশ্বর ও ইছাপুরে কাশীনাথ রায় নামে একজন ধনশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। নদীয়া প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণা ইহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ ও খড়দহ মেলের সিদ্ধান্তী থাকের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিদারীর অধিকাংশ ভোগ করিতেছিলেন। প্রতাপ তাঁহাদের নিকট কর প্রার্থনা করিলে সিদ্ধান্ত-বাগীশ দিতে অস্বীকার করায় প্রতাপ তাঁহাকে শাসন করিবার

মানসে সসৈন্যে গোবরডাঙ্গার নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। এক্ষণে সিদ্ধান্তবাগীশ সবিশেষ ভীত হইয়া প্রতাপের শরণাপন্ন হন। দয়ালু প্রতাপ ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিতে তাঁহার জমিদারী গ্রহণ করিলেন না তবে যে স্থানে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল সেই স্থানটুকু গ্রহণ করিয়া আপনার নামে উহার প্রতাপপুর নাম রাখিলেন। এই স্থানটুকু গ্রহণের কারণ এই শুনা যায় যে প্রতাপ নিজ অধিকার ব্যতিত অন্যত্র আহার করিতেন না। এই গ্রামখানি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এখান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি হালিসহর, কুমারহট্ট, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। প্রতাপকে দমন করিবার জন্য দিল্লীশ্বর আকবর সাহ পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই সময় সম্রাট আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হন। জাহাঙ্গীরও প্রতাপের বিরুদ্ধে তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। মানসিংহ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে বাঙ্গালায় আগমন করতঃ নদীয়া রাজ-বংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় এবং প্রতাপের কতিপয় কৃতঘ্ন আত্মীয় ও কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় বহু কষ্টে প্রতাপকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান। দিল্লীর পথে পবিত্র কাশীধামে বীর প্রতাপের জীবলীলার অবসান হয়।

এই সময়ে অন্যান্য যে সমস্ত বঙ্গীয় ভূস্বামী অত্যাচারী মুসলমান শাসন-কর্ত্তার বিপক্ষে মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন, নদীয়ায় অন্যতম বিখ্যাত ভূস্বামী দেবগ্রামস্থ কুম্ভকার বংশীয় রাজা দেবপাল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কালের কঠোর নিষ্পেষণে এই কুবের সদৃশ ধনশালী, শক্তিমান ভূস্বামীর বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, বিপুলা পুরী ও সুগভীর পরিখাদি ধ্বংস হইয়া সাধারণতঃ "দে গাঁর ঢীবি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা এক্ষণে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের মাঝেরগ্রাম নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। দেবগ্রামস্থিত এই পর্ব্বতাকৃতি ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহৃদয় দর্শকমাত্রেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। এখনও ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত এনামেলের ইট কারুকার্য্যময় প্রস্তরাদি ও প্রাসাদের পরিখা প্রান্তে অবস্থিত চারিটী উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ (যাহার গঠন প্রণালী দেখিলে পূর্ব্বে শত্রু সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যালোচনার নিমিত্ত স্থাপিত বলিয়া অনুমিত হয়) এবং অসংখ্য পুষ্করিণী, বিশেষতঃ, শোকাবহ স্মৃতি বিজড়িত রাজান্তঃপুর সংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ সরোবর স্বতই প্রাণের অন্তস্তলে একটা বিষাদের চিত্র অঙ্কিত করে *।

রাজা দেবপাল সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে; তাহাদের মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। বহু অনুসন্ধানেও আমরা এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। সুকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মানসিংহের আখ্যায়িকার মধ্যে স্বর্গগমনোদ্যত ভবানন্দ মজুমদারের সহিত দেবী অন্নদার কথোপকথনচ্ছলে নবদ্বীপ রাজবংশের যে ভবিষ্যচিত্র অঙ্কিত

* "This is said to be the fort of a Mohjan Raja, who on going out to fight a battle, carried with him a pigeon giving his Ranis orders, that they should watch for the return of the pigeon. If he won the battle, he would return himself, if he lost he would loose the pigeon, whose return would intimate to the Ranis the loss of battle, and if they had any regard for the honor, they would destroy themselves. He won the battle but the pigeon got loose by accident and returned to the Raja's palace, whereupon the Ranis drowned themselves and their treasure in the "Khirki" tank behind the palace. The Raja hastened home but arrived too late to save the Ranis, whereupon in despair he drowned himself also in the tank. The tank has stone "ghats" all round and is covered on three sides with ruins of brick buildings, four high circular towers stood at the four corners of the oblong fort, which is of earth. Outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity, as evidenced by the size of the bricks. They are the only pre-Mahomedan ruins seen or heard of in the District."

"List of Ancient Monuments &c."
Published by the Government of India.

করিয়াছেন অর্থাৎ বাজপেয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে রাজসভায় বসিয়া ভারতচন্দ্র নদীয়া রাজবংশের যে অতীত কাহিনী দেবীর মুখ হইতে ভবিষ্যৎ বাণীরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেবগ্রামের রাজবংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি পরিদৃষ্ট হয়। ঐ ছত্র কয়েকটী হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে দেবপালবংশ ধ্বংস হইলে তাঁহাদের বিশাল সম্পত্তি, কি সূত্রে জানি না, ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘবের অধিকারভুক্ত হয়। যথা—

"গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর॥
দেগাঁর আছিল রাজা দেপাল কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন॥"

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্ব মুখে যাইলে কামালপুর নামে একখানি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রাম প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। বহু ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত এখানে বাস করিতেন; সেজন্য অনেকে এখনও ইহাকে ভট্টাচার্য্য কামালপুরও বলিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ বনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে স্বচ্ছসলিল থলসিয়ার বিল দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এই বিলের নিকট সরাবপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের মধ্যস্থিত ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের অভ্যন্তরে যে মৃত্তিকা প্রথিত হস্তপরিমিত লিঙ্গমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় উহাই সাধারণতঃ পোড়া মহেশ্বর নামে খ্যাত। ভগ্নাবশেষ মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকাস্তূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা যে পূর্ব্বে ইষ্টকনির্ম্মিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চত্বর বেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী দেবালয় ছিল তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সেই স্তূপ সকল এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদ সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে।

কথিত আছে এ স্থানের অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে একদা এক যোগী

সন্ন্যাসী এই পাষাণময় লিঙ্গমূর্ত্তির মস্তকদেশে একখানি স্পর্শমণি লুক্কায়িত আছে জানিতে পারিয়া এই শিবমন্দিরে আসিয়া বাস করিতে থাকে। এক দিন ঐ কপটাচারী ভাবিল যদি চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি উত্তপ্ত করা যায়, তবে ঐ মণি মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; কিন্তু পাছে দগ্ধ করিলে লিঙ্গমূর্ত্তি গ্রামবাসীগণকে মন্দির রক্ষার্থে আহ্বান করেন সেই আশঙ্কায় এক চাতুরী অবলম্বন করিল। সে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ঐ মন্দিরে সঞ্চয় করিল এবং উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং ঐ অগ্নিকুণ্ডমধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক "কে কোথায় আছ গ্রামবাসি! দেখ পামর সন্ন্যাসী আমায় দগ্ধ করিতেছে" ইত্যাদি আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। গ্রামবাসীগণ প্রথম প্রথম কয়েক রাত্রি ঐ ভয়ঙ্কর চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া মন্দিরে আগমন করিয়াছিল; কিন্তু প্রত্যহ সন্ন্যাসীকে এইরূপ চিৎকার করিতে শুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করিয়া আর কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ করিত না। এক দিন ঐ সন্ন্যাসী লিঙ্গমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিল তখন লিঙ্গমূর্ত্তি হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রামবাসীগণ উহা উন্মাদগ্রস্ত সন্ন্যাসীরই কার্য্য বিবেচনায় সে কথা কেহ শুনিয়াও শুনিল না, সন্ন্যাসীর এই পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দিতে কেহই অগ্রসর হইল না। দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বলমণি পাষাণ মূর্ত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে নিপতিত হইল। এতদিনে সন্ন্যাসীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সেই অমূল্য নিধি ঝুলির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দেবগ্রামে উপস্থিত হইল। তখন দেবগ্রামে বহু কুম্ভকারের বাস ছিল। সন্ন্যাসী ঐ গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেবপাল নামক একজন কুম্ভকারের গৃহে অতিথি হইল এবং ঝুলিটী ঐ কুম্ভকারের কুটীর প্রান্তে ঝুলাইয়া রাখিয়া স্নানার্থ গমন করিল। তখন বর্ষাকাল—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় কুম্ভকারের জীর্ণ চাল হইতে জল পড়িয়া ঐ ঝুলিটী সিক্ত হইতে লাগিল এবং স্পর্শমণি সংস্পর্শে ঐ জলধারা অপূর্ব্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থিত যে কোন ধাতবপদার্থের সংস্পর্শে আসিতে লাগিল তাহাই স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল। এই

অত্যদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কুম্ভকার যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং সাগ্রহে সন্ন্যাসীর অসাক্ষাতেই তাহার ঝুলিটী অনুসন্ধান করায় সেই অমূল্য-নিধি প্রাপ্ত হইল এবং এক নিভৃত স্থানে উহা লুক্কায়িত রাখিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সন্ন্যাসী স্নানান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে তাহার এত কষ্টের এত সাধনার ধন অপহৃত হইয়াছে। তখন সে আকুলপ্রাণে দেবপালের শরণাপন্ন হইয়া মণি প্রত্যর্পণের নিমিত্ত সকাতরে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া এক বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া এই বলিয়া পূর্ণাহুতি দিল, "যেন ঐ মহামণিই দেবপালের সর্ব্বনাশের মূল হয়—আর যেন অচিরাৎ সে নির্ব্বংশ হয়—ও সেই গ্রামে যেন কখন কোন কুম্ভকার আসিয়া বাস না করে—করিলে সেও যেন সবংশে নির্ব্বংশ হয়।" দেবপাল সেই স্পর্শমণির গুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশালী হইয়া উঠিলেন এবং নিজ বাসগ্রাম অধিকার করিয়া ইন্দ্রপুরী সদৃশ প্রাসাদ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ এবং সুবৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়া স্বীয় নামে ঐ গ্রামের "দেবগ্রাম" নাম করণ করিলেন। ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র গ্রাম নগরের আকার ধারণ করিল এবং দেবপাল একজন ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারী হইয়া উঠিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মুসলমানগণকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়—বঙ্গদেশ তখন মুসলমান অধিকৃত, মুসলমানগণের প্রতাপ তখন অপ্রতিহত। বহুদিন শান্তির ক্রোড়ে বিলাস স্রোতে ভাসমান থাকিয়া তাহারা অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি স্ত্রীলোকগণের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। রাজা দেবপাল এই সকল উচ্ছৃঙ্খলতা অমার্জ্জনীয় মনে করিতেন, তাই তিনি কঠোর হস্তে তাঁহার নিজ অধিকারভুক্ত মুসলমান-গণের এই সকল অত্যাচার দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তদানীন্তন বঙ্গেশ্বরের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং কয়েকবার কয়েকটী ক্ষুদ্র সংঘর্ষে তিনি মুসলমান সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ নবাব এই রূপে একজন ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার নিকট পরাস্ত হওয়ায় দারুণ হিংসানলে প্রজ্ব-লিত হইয়া দেবগ্রামের চতুষ্পার্শ্বে বহু সৈন্য সমাবেশ করিলেন। দিল্লীশ্বরের বিনানুমতিতে এক জন ভুঁইয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহার রাজ্য

বিধ্বস্ত করিলে পাছে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়, সেই ভয়ে বঙ্গেশ্বর দেবগ্রাম অবরোধ পূর্ব্বক রাজা দেবপালের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া দিল্লীদরবারে দূত প্রেরণ করিলেন এবং দিল্লীশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা দেবপালও বঙ্গেশ্বরের এই অযথা অত্যাচারের প্রতিবিধান মানসে দিল্লীর খাস দরবারে আরজ করিতে গমন করিলেন। গমনকালে তিনি জয় ও বিজয় নামে দুইটী বার্ত্তাবহ কপোতকে সঙ্গে লইয়া বলিয়া যান যে "যদি এই শ্বেতকায় জয় আমার আসিবার পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করে—তবে সকলে জানিও যে আমি দরবারে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্তু জয়ের পরিবর্ত্তে যদি কৃষ্ণকায় বিজয় প্রত্যাবর্ত্তন করে তবে জানিও আমার নিধন হইয়াছে। তখন সকলে দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্তে আত্মরক্ষার উপায় করিও।" নবাব প্রেরিত দূত ও দেবপাল উভয়ে একই সময়ে দিল্লীশ্বরের সমীপে উপস্থিত হন। দিল্লীশ্বর দেবপালের তেজগর্ব্বব্যঞ্জক বপু, অসীম সাহস, নির্ভীক ভাব ও উদার চরিত্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন ও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বঙ্গেশ্বরকেই মুসলমানগণ কৃত অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে পরামর্শ দিয়া দেবপালকে এক ফরমান দ্বারা মহারাজ উপাধি ভূষিত করিয়া কয়েকখানি পরগণার স্বামীত্ব প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দেন। মহারাজা দেবপাল এইরূপে দিল্লীর দরবারে অপ্রত্যাশিতরূপে সাফল্য ও সম্মান লাভ করিয়া বঙ্গাভিমুখে রওনা হন এবং কপোতবাহী দাসকে শ্বেতকায় জয়কে মুক্ত করিয়া দেবগ্রাম অভিমুখে প্রেরণ করিতে আদেশ করেন। ঐ কপোতবাহী দাস বঙ্গেশ্বরের দূতের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ লইয়া জয়ের স্থলে বিজয়কে মুক্তি প্রদান করে। দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত কপোত শনৈঃ শনৈঃ দেবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা দেবপালের পৌরজনবর্গ সেই অশুভ দর্শন কৃষ্ণকায় কপোতকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং রাজা দেবপালের নিধন নিশ্চয় বুঝিয়া মহিলাগণ দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্ত হইতে আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সকলে অপূর্ব্ব বেশভূষা ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রাসাদ প্রাঙ্গণস্থিত স্বচ্ছসলিলা খিড়কী

পুষ্করিণীতে ও সাগর দিঘীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তখন পুরুষগণ কৃপাণ হস্তে গড়ের দ্বার মোচন করিয়া প্রচণ্ড বেগে সেই মুসলমান সৈন্য ব্যূহের মধ্যে পতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্টিমেয় হিন্দু-সেনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন মুসলমানগণ বিনা ক্লেশে সেই অরক্ষিত পুরী প্রবেশ করিয়া যেখানে যাহা পাইল অপহরণ ও ধ্বংস করিল। এ দিকে মহারাজা দেবপাল মহোল্লাসে শূন্যে কত অট্টালিকা রচনা করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে মুসলমানগণের বিজয় নিনাদ শুনিয়া ও স্বীয় পুরী তাহাদের অধিকৃত দেখিয়া বজ্রাহতবৎ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছান্তে দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন এবং আপনার শরীর রক্ষক সেনা কয়জন ও স্বয়ং কিয়ৎকাল অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শত শত মুসলমান সেনা ধ্বংস পূর্ব্বক আপনিও নিহত হইলেন। এইরূপে বঙ্গের আর একটী রত্ন আপনার পূর্ণজ্যোতি বিকীরণ না করিতেই অকালে কালের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন এবং এইরূপে সেই দুর্ম্মুখ সন্ন্যাসীর দারুণ অভিসম্পাত কার্য্যে পরিণত হইল।

এইরূপে বাঙ্গালার ভুঁইয়া রাজাগণ একে একে মোগল শাসনাধীনে আসিলেন বটে কিন্তু রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মুসলমানগণের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক রহিল না। তদানীন্তন ভূস্বামীগণ রাজ্যের সর্ব্ব প্রকার শাসন কার্য্য স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ কেবল নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন ও সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতেন।

এইরূপে নদীয়া সে সময়ে আদৌ মুসলমান শাসনাধীন থাকিলেও উহা প্রত্যক্ষত কৃষ্ণনগরাধিপতিগণের শাসনাধীন হইল। মানসিংহকে বাঙ্গালা বিজয়ে সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বহু সম্মান ও এক ফরমান দ্বারা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া, মহৎপুর, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, কয়েশা, মসুণ্ডা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার স্বামীত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় হইতে নদীয়া, তদ্বংশীয়গণের দ্বারা স্বাধীনভাবে শাসিত হইতে থাকে। ভবানন্দ বাগোয়ান হইতে মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপনা করেন।

তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে মধ্যম পুত্র গোপালকে তাঁহার বিষয়ের অধিকারী করিয়া যান। গোপাল, বাদসাহের নিকট হইতে শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে স্বতন্ত্রভাবে কুশদহ ও উখুড়া পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করায় তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা গোপাল অধিকার করেন। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাঘব মাটিয়ারি হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে এই রেউই ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ খড়িয়া নদীর উপরে শ্যামল বৃক্ষাদি শোভিত মনোরম স্থান ছিল এবং সেই সময়ে এখানে দলে দলে মৃগ ও ময়ূর বিচরণ করিত। অদ্যাপি এই সকল মৃগের দু চারিটী বংশধর কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী আড়বন্দি প্রভৃতি গ্রামের প্রান্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন এই স্থানে বহুসংখ্যক গোপ বাস করিত এবং তাহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিল। রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্ররায় এই রেউইয়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণনগর নাম করণ করেন। তাঁহার সময়ে নদীয়া রাজ্য অতি বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করে। তিনি এই সুবিস্তীর্ণ ভূমির রাজস্ব হিসাবে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা মোগল সরকারে কর প্রেরণ করিতেন। কথিত আছে এই সময়ে তদানীন্তন বাদসাহ রেউইতে মৃগাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় শুনিয়া এখানে মৃগয়ায় আসিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজা সসৈন্য বাদসাহের আগমনে দরিদ্র প্রজাগণের উপর অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া বহু মুদ্রা অঙ্গীকার পূর্ব্বক বাদসাহকে নিরস্ত করেন *।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত টাবরনিয়ার সাহেব ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আগমন করিয়া উক্ত বৎসর ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নদীয়ায় উপস্থিত হন। তিনি তদানীন্তন নদীয়াকে জনসঙ্কুল বৃহৎ নগর বলিয়া

---

* Early in ye morning we passed by a village called Sreenagar and by 5 o'clock this afternoon (October, 1682) we got as far as Rewee—a small village belonging to Woodoy Roy, a Jamindar that owns all the country on that side of the water almost as far as over against Hughly. It is reported by ye country people that he pays

উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায় গঙ্গার জোয়ার এ সময়ে নদীয়া পর্য্যন্ত আসিত। কিন্তু এখন উহা কালনা পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে *।

---

more than twenty lacks of Rupees per annum to ye king, rent for what he possesses and that about two years since he presented above a lack of rupees to ye Mogoul and his favourite, to divert his intention of hunting and hawking in his country, for fear of his tenants being ruined and plundered by the Emperor's lawless and unruly followers. This is a fine pleasant situation, full of great shady trees, most of them tamrins, well stored with peacocks and spotted deer like our fallow deer. We saw two of them near the river side on our first landing.

Hedge's Diary Vol. I, p. 39.

তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Agent and Governor of their affairs in Bay of Bengal and of the British Factories (November 25, 1681) Mr. Hedges এর দৈনিক রোজনামচা হইতে আমরা পূর্ব্বোক্ত অংশটী গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত বিবরণীতে আমরা তদানীন্তন নদীয়াধিপতির নাম পাইতেছি "উদয় রায়" কিন্তু আমরা "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্" সংস্কৃত এবং Translation by W. Pertsch, Published at Berlin in 1852, W. W. Hunter's Statistical Account of Nadya, স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় রায় প্রণীত ক্ষিতীশ গ্রন্থাবলী এবং কৃষ্ণনগরের বর্ত্তমান মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের ইংরাজীতে লিখিত যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন, তৎসমুদায় প্রামাণিক বিবরণে তদানীন্তন কৃষ্ণনগরাধিপতির নাম পাইয়াছি "রুদ্র রায়"। এখন কোন্ নামটী বাস্তবিক তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। মতান্তরে এই রেউই গ্রাম এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমূহ তখন পাটুলীর ভূস্বামী উদয় রায়ের জমিদারী-ভুক্ত ছিল। নদীয়ার রাজাগণ, কি সূত্রে জানি না, ঐ গ্রাম খানি প্রাপ্ত হন এবং তথায় রাজধানী স্থাপনা করেন। বংশবাটীর স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজাগণই পূর্ব্বে পাটুলীর রাজা নামে খ্যাত ছিলেন। পাটুলী অগ্রদ্বীপের সন্নিহিত একখানি গ্রাম এবং পূর্ব্বে নদীয়ার এলেকাধীনই ছিল। নদীয়ার বহু গ্রামই তখন পাটুলীর রাজ্যান্তর্গত ছিল। পরে তাঁহারা পাটুলী হইতে তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করিলে নদীয়াবাসীর স্মৃতি হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িয়াছেন।

* On the 19th February 1666, I passed a large town called Nadiya, and it is the furthest point to which the tide reaches.

Tavernier's Travels in India. vol. I, p. 133.

এই সময়ে সুবিখ্যাত সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নবাব পদে অধিষ্ঠিত। ইঁহার রাজত্বকালে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে জবচর্ণক নামক সাহেব সুতানুটি নামক স্থানে ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুরের একটী কুঠী স্থাপন করেন; সুতানুটী কলিকাতার একটি অংশ, সুতরাং এই সময় হইতে কলিকাতার প্রথম সূত্রপাত বলিতে হইবে। কথিত আছে এই সায়েস্তা খাঁর শাসনকালেই টাকায় আট মন চাউল বিক্রয় হইত।

সায়েস্তা খাঁর পরে বঙ্গ মসনদে ইব্রাহিম্ খাঁ উপবিষ্ট হয়েন। ইঁহার সময়ে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভা সিংহ নামে বর্দ্ধমানের এক জন জমিদার, বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং রোহিম খাঁ নামক আফগান সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া রাজা কৃষ্ণরামের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তদীয় প্রাসাদ অধিকার করে। * বর্দ্ধমান রাজকুমার জগৎ রায় পলায়ন পূর্ব্বক নদীয়া রাজ রামকৃষ্ণের শরণ লয়েন। শোভা সিংহ ও রোহিম খাঁর সম্মিলিতশক্তি এই সময়ে হুগলি অধিকার করে, কিন্তু তাহারা ওলন্দাজগণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া সপ্তগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই স্থান হইতে শোভাসিংহ তাহার সৈন্যের অধিকাংশ রোহিম খাঁর অধীনে নদীয়া ও মুরশিদাবাদ অধিকার নিমিত্ত প্রেরণ করে †। এবং স্বয়ং বর্দ্ধমানাধিপতির কুমারী কন্যার রূপে আকৃষ্ট হইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করে এবং সুরাপানে মত্ত হইয়া রাজকুমারীর ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইলে তেজস্বিনী বর্দ্ধমান রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে কামোন্মত্ত পশুর প্রাণ হনন করেন। তাহার নিধনের পর তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিং তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অধিকার

---

* "अथ ससैन्यपठानरहीमशोभासिंहः समागत्य हतपरिवारं कृष्णरामरायं निहत्य वर्द्धमानमुपद्रावयामास। पलायनपरायणस्य जगत्रामं रामकृष्णरायो माटियारि मध्ये निभृतं स्थापयामास। शोभासिंहस्य हतशेषे कृष्णरामपरिवारे पलायमाने वर्द्धमाने स्वाधिपत्यं विस्तारयामास।"

क्षितीश वंशावली—चरितम्।

† Vide Memoirs of the Mogoul Empire by Eradut Khan p. 330.

পূর্ব্বক দেশে অরাজকতা আনয়ন করে। এই সময়ে ইংরেজগণ কলিকাতার মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে "ফোর্টউইলিয়ম্" নামকরণ করিয়া তাঁহাদের দুর্গ দৃঢ়তর রূপে স্থাপনা করেন এবং ওলন্দাজেরা চুচুড়ায় ও ফরাসীরা চন্দননগরে আত্মরক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদানীন্তন বাদসাহ ঔরঙ্গজেব বাঙ্গালায় শান্তিস্থাপনার্থ তাঁহার প্রিয় পৌত্র সাজাদা আজিম ওসানকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এদেশে প্রেরণ করেন। ইনি আসিয়া দেখিলেন যে শোভাসিংহ নিহত হইয়াছে এবং নব নিযুক্ত বঙ্গেশ্বর জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহ অনেক দমন করিয়াছেন সুতরাং নিজে বর্দ্ধমানে থাকিয়া দেশস্থ সমস্ত ভূম্যাধিকারীর সহিত প্রীতি বিনিময় ও আনন্দোৎসব করিতে থাকেন। এই সময় তদানীন্তন নদীয়াধিপতি রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। বাদসাহজাদা যখন বর্দ্ধমানে থাকিয়া এইরূপে উৎসবাদিতে মগ্ন, সেই সময়ে বিদ্রোহীরা আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া নদীয়া লুণ্ঠন করে *।

এই সময়ে নদীয়া রাজবংশ কি মুসলমান শাসনকর্ত্তা কি য়ুরোপীয় শাসনকর্ত্তা সকলের নিকটে বিশিষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাৎকালিক কলিকাতায় ইংরেজ প্রতিনিধি সাহেবের সহিত নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণের বিশেষ প্রণয় স্থাপিত হয়, এমন কি তিনি নদীয়ারাজের শাসন সৌকার্য্যার্থ সার্দ্ধ বিসহস্র অস্ত্রনিপুণ সৈন্য কৃষ্ণনগরে থাকিতে অনুজ্ঞা করেন †।

---

* Thus while the prince was amusing himself at Burdwan, receiving the congratulation of the Zemindars and principal men of the province, the rebels again collected in greater force and had the audacity, not only to Plunder the districts of Nuddeah and Hooghly, but to encamp within a few miles of Burdwan.

Memoirs of Mogoul Empire, Eradut Khan.

p. 341.

† Ram Krisna lived happily at Krisnagar for a long time. and any matter of interest of which he gave notice to the grandson of

বাদসাহজাদা আজিম ওসান নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, দেওয়ান জাফর খাঁর তাহা ভাল লাগিত না। রামকৃষ্ণের উপর তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ভাব ছিল কিন্তু তখন তিনি দেওয়ান মাত্র, কাজেই রামকৃষ্ণের কোনও অনিষ্ট করিতে সাহসী হন নাই। জাফর খাঁ, মুরসিদ কুলী খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঙ্গালার শাসন কার্য্য গ্রহণ করিলেন তখন রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব বিদ্বেষ জাগরিত হইয়া উঠিল এবং রাজস্ব অনাদায় ব্যপদেশে কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজধানীস্থ 'বৈকুণ্ঠে' (কারাগারে) প্রেরণ করিলেন। বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় এ কথা শুনিতে পাইয়া আপনি তাঁহার সমুদায় দেনা শোধ করিয়া তাঁহাকে নরক মুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্যতায় মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে "শূদ্রমণি" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তাহাতেও রামকৃষ্ণের পাপগ্রহ কাটিল না। অল্প দিন পরে পুনরায় রাজস্ব বাকী পড়ায় নবাব তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া রাজস্ব পরিশোধের নিমিত্ত একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনের ভিতর টাকা না আসিলে তাঁহার জাতি নাশের ভয় প্রদর্শন করেন। একদিন দুইদিন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল কিন্তু এবারেও রামকৃষ্ণের টাকা আসিয়া পৌছিল না। ওদিকে অন্যতম কারারুদ্ধ সমুদ্রগড়ের রাজার টাকা আসিল। সমুদ্রগড়ের উদারহৃদয় রাজা, রঘুদেবের মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার সমস্ত অর্থ রাজা রামকৃষ্ণের নামে জমা দিলেন। রঘুদেব যে কার্য্যের জন্য "শূদ্রমণি" উপাধিতে ভূষিত হইলেন সেই কার্য্যের জন্যই সমুদ্রগড়ের রাজার ভাগ্যে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইল। তিনি স্বীয় রাজস্ব দিতে না পারায় নবাবের আদেশে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন *। যদিও সদাশয় সমুদ্রগড়াধিপতির

the Sultan of Delhi, who resided at Janhagira was executed without fail by the latter who scarcely having got notice of it gave his instructions in a letter of answer.—Kshitish Vansabali Charitam.

* ইহাদের বাটীতে অদ্যাপি মহাসমারোহে দুর্গোৎসব ও মহরম দুইই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণনগরের রাজবংশীয়গণের সহিত ইহাদের বেশ সৌহৃদ্য বিদ্যমান আছে।

অহত্বে সে যাত্রায়ও রাজা রামকৃষ্ণের নিষ্কৃতিলাভ সুলভ হইয়াছিল কিন্তু 'বৈকুণ্ঠের' দারুণ কষ্টে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন।

মুরসিদকুলীর রাজত্বকালে আর একটী ঘটনার সহিত নদীয়ার সম্পর্ক দেখা যায়। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে মহাপ্রভু প্রদর্শিত বৈষ্ণবধর্ম্মই দেশ বিদেশে চর্চ্চিত ও বহুলরূপে আচরিত হইতেছিল। জয়পুর রাজের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য নামীয় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আপনার অসাধারণ বিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্তগণের আচরিত পরকীয়া মতে দোষারোপ করিয়া স্বকীয়াভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকল্পে জয়পুর ও বৃন্দাবনবাসী বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের সহিত বিচারার্থী হন। বিচারে পরাস্ত হইয়া পণ্ডিতগণ স্বকীয়ামতের আনুকুল্যে দিগ্বিজয়ীর জয়পত্র স্বাক্ষরিত করেন কিন্তু তৎকালিন জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দিগ্বিজয়ীকে বঙ্গের পরকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণব কুলের সহিত বিচার করিয়া স্বকীয়া বা পরকীয়াভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবকুলও স্বকীয়ার দস্তখত করিতে বাধ্য হন এবং বঙ্গের বহুস্থানেও দিগ্বিজয়ীর জয় হয়; কিন্তু পরিশেষে শ্রীধাম নবদ্বীপে এবং শ্রীখণ্ড ও কাজিগ্রাম প্রভৃতি বৈষ্ণবপ্রধান স্থানে আসিয়া ঐরূপ দাবী করিলে উক্ত স্থানসমূহের, বিশেষতঃ নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া দিগ্বিজয়ীর প্রাধান্য স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায়, তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর নবাব জাফর খাঁর আনুকুল্যে এক বিরাট বিচার সভা আহুত হইয়া এ সম্বন্ধে বিচার হয়। এই সভায় নদীয়ান্তর্গত চাকড়ী (চাখন্দী) গ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের বংশধর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুরের সহিত বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইয়া স্বকীয়া ভাবাপেক্ষা পরকীয়ার প্রাধান্য স্বীকার ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে দলিলের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষরকারী গোস্বামীগণের মধ্যে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্দ্ধমান, কাটোয়া, কানাইডাঙ্গা প্রভৃতির গোস্বামীগণের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন আমরা "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী; অতএব বিচারে যে ধর্ম্ম স্থায়ী হয়

তাহাই লইব। এই মত কড়ার হইল, বিচার মানিলাম—তাহাতে পাত-সাহী সুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল—তিঁহো কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজ্ হয় না—অতএব বিচার কবুল করিলেন। সেই মত সভাসদ্ হইল—শ্রীপাট নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার, সোনারগ্রামের শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য—সাং মহুলা *।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা রামকৃষ্ণ মুসলমানের অকথ্য পীড়নে কারা-গারে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় নদীয়া সিংহাসন কাহাকে বর্ত্তিবে এই লইয়া সে সময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং রাজা রামকৃষ্ণের পরম সুহৃদ সাজাদা আজিম ওসান তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে আন্তরিক ব্যথিত হইয়া জাফর খাঁর প্রতি এক পরোয়ানা জারি করেন এবং রামকৃষ্ণের যাবতীয় সম্পত্তি ও নদীয়ার রাজ্য তাঁহার পুত্র বা পৌত্র অভাবে দত্তক পুত্র বা তদ্বৎ-সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে দান করিতে অনুজ্ঞা করেন। জাফর রামকৃষ্ণের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিলেও এক্ষণে সাজাদা আজিম ওসানের আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে সাহসী না হইয়া লিখিলেন যে রামকৃষ্ণের পুত্রাদি বা উত্তরাধিকারী কেহই বিদ্যমান নাই, তাহাতে সাজাদা নদীয়া রাজ্য, রামকৃষ্ণের স্ত্রী ও আত্মীয়গণের সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম এরূপ কোন বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারীকে দান করিতে বলেন। এতদুত্তরে জাফর খাঁ পুনরায় লিখিলেন যে রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন যিনি বহুদিন যাবৎ ঢাকায় বন্দী অবস্থায় আছেন—অনুমতি হইলে তাঁহাকে নদীয়া রাজ্য প্রদান করা যায়। সাজাদা আজিম ওসান জাফরের এই প্রস্তাবে সম্মত হন। এইরূপে রামজীবন তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত জাফর খাঁকে বহু অর্থ অঙ্গীকার করিয়া নদীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু যথাসময়ে তাঁহার মুক্তির মূল্য পরিশোধ করিতে না পারায় পুনরায় জাফর খাঁ কর্ত্তৃক নবরাজধানী মুরসিদাবাদে কারারুদ্ধ হন।

---

* শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রকাশিত প্রতিলিপি (সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩০৬)।

এই সময়ে আলি মহম্মদ ও কালু জমাদার নামক দুইজন মুসলমান সেনানীর সহায়তায় রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ, বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গেশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং বীরকাটি *, নারায়ণগড়, দেবীনগর প্রভৃতি স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। মুরসিদকুলী খাঁ তাঁহার দমনের নিমিত্ত লহুরীমল্ল প্রমুখ সেনাপতিগণকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি রামজীবনের পুত্র অসীম বলশালী যুবরাজ রঘুরাম স্বইচ্ছায় লহুরী মল্লের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় স্বীয় বাহুবল ও বুদ্ধিবল প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন। কথিত আছে তাঁহারই অমোঘ সন্ধানে আলি মহম্মদ নিহত হইলে পরিণাম চিন্তা করিয়া বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণ সপরিবারে দেবীনগরের নিকটবর্ত্তী হ্রদে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এইরূপে বিদ্রোহ দমিত হইলে নবাব মুরসিদকুলী বিস্তীর্ণ রাজসাহী জমিদারী তাঁহার প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে প্রদান করেন। রঘুনন্দন তদানীন্তন বঙ্গের সদর কাননগু দর্পনারায়ণের কর্ম্মচারী ছিলেন †। এই রঘুনন্দনই নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুরসিদ নদীয়া রাজকুমার রঘুরামের কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার পিতা রামজীবনের কারামোচন করেন। পরে পিতার মৃত্যু হইলে রঘুরাম ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১৬৫০ শকে বা ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী-তীরে প্রাণত্যাগ করেন এবং

---

* লুপ লাইনে মুরারই রেল ষ্টেসনের পশ্চিমে মহেশপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণে বীরকিটী গ্রাম। ক্ষিতীশ বংশাবলীতে ইহাই বীরকাটী নামে অভিহিত। দেবীনগর অদ্যাপি বর্ত্তমান—এই সকল স্থানে ভগ্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়।

† কথিত আছে নবাব মুরসিদকুলী (তৎকালিন দেওয়ান জাফর খাঁ) এক সময়ে বাদসাহী দরবারে পেশ করিবার নিমিত্ত নিকাশী কাগজে প্রথামত সদর কাননগু দর্পনারায়ণের মোহর ছাপ করাইতে চাহিলে দর্পনারায়ণ তাঁহার প্রাপ্য রসুম বাবদ তিন লক্ষ মুদ্রা দাবী করেন এবং উক্ত মুদ্রা না পাইলে কোন মতেই মোহর ছাপ করিবেন না প্রকাশ করেন; কিন্তু দেওয়ানের তখন অত মুদ্রা সংগ্রহ না হওয়ায় দর্পনারায়ণের কর্ম্মচারী উদয়নারায়ণকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাঁহার দ্বারা নিকাশী কাগজে কাননগুর মোহর ছাপ করিয়া লন। এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ ভবিষ্যতে মুরসিদকুলী উদয়নারায়ণকে রাজসাহী জমিদারী প্রদান করেন।

তৎপুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই রাজার অধিকারকালে নদীয়া সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে নদীয়া রাজ্যের বিস্তৃতি উত্তরে মুরসিদাবাদ হইতে দক্ষিণে সুদূর বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ব্বে ধুলিয়াপুর হইতে পশ্চিমে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় *। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিতে ন্যূনাধিক দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত হইত এবং ইহার আয় পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রারও উপর ছিল †। সমগ্র অধিকার মোট ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল; এই সকল পরগণা বিভিন্ন জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল এবং দেশের সর্ব্ববিধ বিচার কার্য্যই এই সকল জমিদারগণ কর্ত্তৃক সমাহিত হইত। মহারাজা স্বয়ং হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান কাজীর সাহায্যে ন্যায়ানুমোদিত বিচার সাধন করিতেন। মহারাজের অধীনে বদীরুদ্দীন নামক জনৈক কাজী ছিলেন। কথিত আছে এই কাজীর মাতৃবিয়োগ হইলে মাতার প্রেতকার্য্য সমাধানার্থ তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত অবকাশ প্রার্থনা করিলে মহারাজ তাঁহাকে বিদায় দিয়া তাঁহার মাতৃকার্য্যে গোহত্যা করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহার স্থলে ছাগ ও মহিষ বধে অনুজ্ঞা দেন। কাজী স্বীকৃত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করত মহিষান্বেষণে বহু লোক নিযুক্ত করেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে মহিষ আসিয়া না পৌঁছানয় তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় গোহত্যা করিতে বাধ্য হন। মহারাজ, স্বীয় অধিকার মধ্যে আপনার ভৃত্য কর্ত্তৃক এরূপে গোহত্যা কাহিনী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ কাজীর মুখদর্শন

---

* রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগিরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গাপার॥ অন্নদামঙ্গল।

† Holwell, in his work, quoted under Jafar Khan I p. 202, says that he (Krisna Chandra) possessed a tract of country of about twelve days' journey and that he was taxed at 9 lacs per annum, though his revenue exceeded twenty-five lacs of rupees.—Kshitish Bangsabali Charitam—Translation by W. Pertsch p. 60. (Index).

করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ও তাহার আবাস লুণ্ঠনে আদেশ দেন। রাজসভায় রাজার জমাদার জাফর খাঁ—কাজীর বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজার আদেশ শ্রবণমাত্র গোপনে কাজীকে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগে পরামর্শ পাঠাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়ায়, রাজভৃত্যগণ যখন কাজীর আবাস লুণ্ঠন করিতে আসিল, তখন সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধানেও কাজীর সন্ধান না পাইয়া তাহার শূন্য আবাস দগ্ধ করিয়া তাহারা রাজসন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাজী ইতিমধ্যে বসিরহাটে কুটুম্বগৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে থাকেন এবং গোপনে জমাদার জাফর খাঁকে * রাজসন্নিধানে উপযুক্ত অবসরে তাঁহার পক্ষে ওকালতি করিয়া রাজার ক্রোধোপনোদনে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। মহারাজা সর্ব্বদা ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান কাজী বিহনে মুসলমানদের বিচারে সর্ব্বদাই মহারাজের সন্দেহ হইতে লাগিল। এক দিন এবম্বিধ সন্দেহাকুলিত চিত্তে যখন উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাঁহার প্রিয় জমাদার সুযোগ বুঝিয়া কাজীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তাহাতে মহারাজ সে যাত্রা কাজীকে ক্ষমা করেন বটে কিন্তু তাঁহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করায় কাজীর উপযুক্ত পুত্রকে ঐ কার্য্যে মনোনীত করিয়া তাহাদের সন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন। জমাদার পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের সন্ধান অবগত ছিলেন এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অবিলম্বে তাহাদের এই শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন ও তাহাদের দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ পাঠাইলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুরসিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী প্রাপ্ত হন। ইহার সময়ে চারি জন ব্যক্তি রাজ্যমধ্যে প্রধানরূপে গণ্য হন ও তাঁহাদের পরামর্শানুসারে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। প্রথম আলম চাঁদ—ইনি হিন্দু এবং

* এই জাফর খাঁ সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি নাকি একজন যথার্থ সাধক ছিলেন এবং কোনও সময়ে শিবনিবাসে থাকিয়াই যোগবলে শ্রীধাম পুরীর মন্দিরের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। শিবনিবাসে অদ্যাপি ইহার সমাধি বিদ্যমান আছে।

নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া পরে "রাইরাঁইয়া" অর্থাৎ রাজাদের মধ্যে রাজা—এই পদবী ভূষিত হন। দ্বিতীয় ফতেচাঁদ—যিনি বাদসাহ কর্ত্তৃক জগৎ শেঠ উপাধী-মণ্ডিত হন *। তৃতীয় হাজি-আহম্মদ—সুজার প্রধান মন্ত্রী ও চতুর্থ হাজি আহম্মদের সহোদর ভ্রাতা আলিবর্দ্দী যিনি আজিম-বাদের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সুজা এই সকল উপযুক্ত সহকারীর সাহায্যে সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে (১৩ই জেলহজ্জ ১১৫১ হিঃ) পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হন। সরফরাজ বাল্যকাল হইতে উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠেন এবং পিতৃবন্ধু রাইরাঁইয়ান আলমচাঁদ, মন্ত্রী হাজি আহম্মদ ও জগৎশেঠ, ফতেচাঁদকে সর্ব্বদা তাচ্ছিল্য করিতে থাকেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাদের অপমানিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। রাজ্যস্থ ক্ষমতাবান ব্যক্তি চতুষ্টয়ের সহিত সংঘর্ষ তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে এবং জগৎ শেঠের প্রতি নিদারুণ পাশব ব্যবহার তাঁহার উচ্ছেদের কাল অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেয়। কথিত আছে সরফরাজ এই সময় এতই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন যে জগৎ শেঠের ন্যায় একজন ক্ষমতাবান ধনীর অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই †। বৃদ্ধ জগৎ শেঠ তাঁহার পৌত্র মহাতাপ রায়ের সহিত একটী কিঞ্চিন্ন্যূন একাদশ বর্ষীয়া অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা প্রবাদের ন্যায় তৎকালে প্রচারিত হয়। নরপশু সরফরাজ এই লাবণ্যময়ী, সকল সৌন্দর্য্যের ললাম-ভূতা কন্যার রূপের কথা লোক-মুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একবার দর্শনের নিমিত্ত কামাকুল হৃদয়ে বৃদ্ধ জগৎ শেঠের শরণাপন্ন হন। এই নিদারুণ

---

* Riyaz-us-salatin—p. 274.

† He (Fattauah Chand) had about this time married his youngest grandson named Set-Mortab Roy to a young creature of exquisite beauty, aged about 11 years. The fame of her beauty coming to the ears of the Soubah, he burned with curiosity and lust for the possession of her and sending for Jagut Set demanded a sight of her.—Holwell's Interesting Historical Events. Part I. Ch. II. p. 70.

বাক্যে বৃদ্ধের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাঁহার বংশমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার পূর্ব্বেই পাপিষ্ঠ সরফরাজ জগৎ শেঠের বাটী অবরোধ পূর্ব্বক সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই কন্যাকে প্রাসাদে আনয়ন করেন এবং দর্শন-পিপাসা মিটাইয়া তাঁহাকে পুন প্রেরণ করেন *।

কেহ কেহ অনুমান করেন জগৎ শেঠের সহিত অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াই সরফরাজের মনান্তর হয়। যে কারণেই হউক রাজ্যপ্রাপ্তির ৫ বৎসরের মধ্যে সরফরাজ, আহম্মদ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের কোপনয়নে পতিত হন। হাজি আহম্মদ রাজমহলের ফৌজদার পরে পাটনার নবাব স্বীয় ভ্রাতা আলিবর্দ্দীকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজের প্রতি সরফরাজের তাচ্ছিল্য ভাবের প্রতিশোধ গ্রহণে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে জগৎ শেঠের সাহায্য পাইয়া কৌশলে দিল্লী হইতে আলিবর্দ্দীর নামে বাঙ্গালার সুবেদারের সনন্দ বাহির করয়া লন, এবং গোপনে আলিবর্দ্দীকে সসৈন্যে মুরসিদাবাদ আক্রমণে উপদেশ প্রেরণ করেন। পথে গিরিয়া নামক স্থানে নবাব সৈন্যের সহিত আলিবর্দ্দীর বল পরীক্ষা হয় এবং এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে আলিবর্দ্দী আপনাকে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজধানী অধিকৃত হইলেও সমগ্র দেশ তাঁহাকে প্রথমে সুবেদার বলিয়া স্বীকার করে নাই এ কারণে তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের পর দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে না হইতেই নাগপুর হইতে মারহাট্টারা আসিয়া বার বার পশ্চিমবঙ্গ লুটপাট করিতে থাকে। এই ঘটনার নাম বর্গীর হাঙ্গামা *। এই হাঙ্গামা দেশে দশ বৎসর ছিল। এই সময়ে বর্দ্ধমানের

---

* The young woman was sent to the Palace in the evening, and after staying there a short space, returned unviolated indeed, but dishonoured to her husband.—Orme Vol. II p. 30.

সম্ভবতঃ এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বঙ্গ কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধে" সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক জগৎ শেঠের নির্ম্মল কুলে কালি দিয়াছেন। হতভাগ্য সিরাজ! মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের যাবতীয় সত্য ও মিথ্যা দোষ ভাগ্যক্রমে তোমার স্কন্ধে আরোপিত—জানি না তোমার প্রেতাত্মা কিরূপে এই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতেছে।

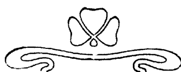


মুরসিদ কুলিখাঁ





নবাব আলিবর্দ্দী





নবাব মীরজাফর ও মীরণ



নবাব সিরাজদ্দৌলা

রাজা সপরিবারে পলায়ন করিয়া তদানীন্তন নদীয়ান্তর্গত বূলাজোড়ের সন্নিহিত কাউগাছি গ্রাম গড়খাই করিয়া তন্মধ্যে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। কিন্তু নদীয়াও এ সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচার * হইতে অব্যাহতি পায় নাই। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে নির্ব্বিঘ্ন হইবার মানসে শিব-নিবাসকে কঙ্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া সুদৃঢ় দুর্গ ও বাসস্থানাদি নির্ম্মাণ করেন, এবং সন্নিহিত কৃষ্ণপুরে অসংখ্য লাঠি সড়কী ক্রীড়া পারদর্শী গোপ-গণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন †। বর্গীর বিভ্রাটে নদীয়ার ভাগীরথীকুল যেমন ধ্বংস হইয়াছিল তেমনি নবাবের রাজস্ব আদায়ের অযথা অত্যাচারে সমগ্র নদীয়ার প্রজাকুল উদ্বাস্ত হইতে বসিয়াছিল। বর্গীর বিভ্রাটে পশ্চিম বঙ্গের জমিদারকুল, বর্গীর আক্রমণে অত্যধিক পীড়িত হওয়ায় পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জমিদারগণের নিকট হইতে অসম্ভব রাজস্ব আদায় হইতেছিল এবং নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতির রাজাগণের নিকট যুদ্ধের ও রাজ্য-রক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত সবিশেষ উৎপীড়ন চলিতেছিল। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র পৈত্রিক ঋণ দশ লক্ষ ও দুই লক্ষ মুদ্রা নিজ নজরানা না দিতে পারায় তৎকাল প্রচলিত নিয়মে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন ‡। এখান হইতে তিনি সে সময়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ

* আজিও অশান্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে, বঙ্গজননী

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥"

বলিয়া তাহার চঞ্চল মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করেন।

† শিবনিবাস এক্ষণে লুপ্ত-শ্রী। কৃষ্ণপুরের গোয়ালাদের বংশাবলী অদ্যাপি আছে ও লাঠী ধরিতে আজিও মজবুত।

‡ শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে। (১৬৬৪ শকে)
বর্গীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥
আলিবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রে ধরে লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বদ্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে।
মোর স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥ অন্নদামঙ্গল।

করিতেন কিন্তু শীঘ্রই স্বীয় দক্ষ দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের কর্ম্মকুশলতায় নজরানার টাকা পরিশোধ করিয়া মুক্ত হন। মারহাট্টা বিভ্রাট শেষ হইলে পুনরায় রাজস্ব বাকী দায়ে কারারুদ্ধ হন। এবার নবাব আলিবর্দ্দী স্বচক্ষে তাঁহার জমিদারীর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন। কথিত আছে চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে জলবিহারী নবাবকে নদীয়ার জলমগ্ন ভূভাগ সকল বিশেষতঃ নবদ্বীপের বংশাচ্ছাদিত জলাভূমির ও কলিকাতা সন্নিহিত বাদার জলময় স্থান সকলের দুরবস্থা দেখাইয়া সে-যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত দেওয়ান রঘুনন্দন সম্বন্ধেও বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে কোন সময়ে নদীয়ারাজের দেওয়ান মুরসিদাবাদ দরবার গৃহে প্রবেশকালে সভাপ্রবেশের পথ অতি সঙ্কীর্ণ বিধায় তাঁহার পরিচ্ছদের প্রান্তদেশ বর্দ্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাণিকচাঁদের অঙ্গস্পর্শ করায় ক্রুদ্ধ হইয়া মানিকচাঁদ, রঘুনন্দনকে হিন্দি ভাষায় "দেখ্‌তে নেহি পাজী" বলায় তেজস্বী রঘুনন্দন "হাঁ, নওকর সব্‌হি পাজী হৈ—কোই ছোটা কোই বড়া"—এই সমুচিত উত্তর প্রদান করেন। সেই অবধি মাণিকচাঁদ রঘুনন্দনের ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া দাঁড়ান এবং পরে বুদ্ধিবলে বর্দ্ধমান রাজ-সংসার হইতে মুরসিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া রঘুনন্দনের সর্ব্বনাশ করিবার পন্থা খুঁজিতে থাকেন। এই সময়ে হুগলী হইতে কয়েক লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব হিসাবে মুরসিদাবাদ সরকারে প্রেরিত হয়, কিন্তু পথে নদীয়ান্তর্গত পলাশীতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক উহা অপহৃত হইলে বহু অনুসন্ধানেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মচারীগণ উহার উদ্ধার সাধন করিতে না পারায় রঘুনন্দনের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া মাণিকচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে রঘুনন্দনকে প্রথমে গর্দ্দভ পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করাইয়া পরে তোপমুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসী দেওয়ানের এই বীভৎস পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়া রঘুনন্দনের বংশাবলীকে পলাশী পরগণায় চৌদ্দ শত বিঘা মহোত্রাণ জমি প্রদান করেন। অদ্যাপি তাঁহারা উহা ভোগ করিতেছেন।

বর্গীদিগের দ্বারা ক্রমাগত দশ বৎসর কাল যাবৎ দেশ এইরূপ পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইতে থাকে, এবং অমিততেজা বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী বার বার তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেও প্রায়শঃ প্রতিবৎসর বর্ষাগমে সুযোগ

পাইলে তাহারা দর্শন দিতে থাকে। ইদানীং তাহারা আর সমবেত হইয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিত না; সুতরাং তাহাদিগকে আশু দমন করার কোন আশা না দেখিয়া রাজনীতিজ্ঞ বৃদ্ধ নবাব ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনা করেন। এই সন্ধির ফলে বর্গীয়া উড়িষ্যার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও বাঙ্গলার চৌথ অর্থাৎ বার্ষিক রাজস্বের এক চতুর্থাংশ বাবদ দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে চিরদিনের জন্য বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই দীর্ঘ কালব্যাপী বর্গীর হাঙ্গামার ফলে দেশে দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছিল—শস্যাদির অবস্থা শোচনীয় দাঁড়াইয়াছিল এবং বস্ত্র বয়নাদি সূক্ষ্ম শিল্পেরও সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল; তন্তুবায়গণ যুদ্ধের অবকাশ কালে যে কিছু বস্ত্রাদি বয়ন করিত তাহাও আশঙ্কা ও ব্যগ্রতা প্রযুক্ত তত উৎকৃষ্ট হইত না *। এইরূপে এই সময় হইতেই শান্তিপুর প্রভৃতির বস্ত্রাদি বয়ন ব্যবসায়ে দুরবস্থার সূত্রপাত হয়।

ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ নবাবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি তখন তাঁহার আদরের দুলাল, স্নেহের পুতুল দৌহিত্র সিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দূরদর্শী বৃদ্ধ নবাব ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, নবীন নবাব নানাকারণে তৎকালিন রাজ্যস্থ বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত ও তাঁহার কতিপয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সদ্ভাব রাখিতে সক্ষম হয়েন নাই; সুতরাং তাঁহাদের সকলেরই তাঁহার প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল, এবং কিসে তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় সকলেই তাহার পন্থা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইঁহাদের দুই চারিজন একত্র হইলেই এ বিষয়ের গোপন পরামর্শ চলিতেছিল; এক্ষণে দৈবক্রমে তাঁহাদের মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়ার এক সুযোগ উপস্থিত হইল। ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দেওয়া উপলক্ষে ও অন্যান্য নানাকারণে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত নবীন নবাবের বিবাদ বাধিয়া উঠিল। † এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীগণ ইংরাজগণের সহায়তায় নবাবকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে

* Holwells—Interesting Historical Events p. 151.

† Vide Life of Lord Clive (1836) vol. I, p. 147, and Orme's History of the Military Transactions of the British Nation, vol. II, p. 49.

সিংহাসন দেওয়াইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে জগৎশেঠের মুরশিদাবাদ ভবনে এই গোপন সভার অধিবেশন হয়। প্রবাদ এই সময়ে নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরিজন ও ভৃত্যবর্গ লইয়া শিবনিবাসে বাস করিতেছিলেন। নবাব সিরাজের পক্ষে ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্র (দুর্লভ রাম) রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নদীয়াধিপতিকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া সৎপরামর্শ দিবার জন্য এক পত্রিকা প্রেরণ করিয়া মুরশিদাবাদে আহ্বান করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পত্রিকার্থ অবগত হইয়া এককালে হর্ষ ও বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। এই পত্রে নবাবকে পদচ্যুত করিবার কথা লেখা ছিল। রাজা সেইদিন নিশীথসময়ে এক নিভৃত স্থানে স্বীয় মন্ত্রী কালীপ্রসাদ সিংহ ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া পত্রপাঠ পূর্ব্বক তাঁহাদের পরামর্শ চাহিলেন। পত্রার্থ এইরূপ ;—

"নবাবের অত্যাচারে মুরশিদাবাদের লোক সকল স্ব স্ব ঘরবার ত্যাগ করিয়া পলাইতে উদ্যত। নবাব কাহারও কোন কথা শুনেন না। এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আপনি শীঘ্র আসিবেন।" সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের আহ্বানে প্রথমে স্বয়ং না যাইয়া নিজ বিশ্বস্ত দেওয়ান কালীপ্রসাদকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইবার জন্য মুরশিদাবাদে প্রেরণ করেন। পরে, তাঁহার বাচনিক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং মুরসিদাবাদ যাত্রা করেন। পুনর্ব্বার জগৎশেঠের বাটীতে মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কেহ কেহ মুসলমানের পরিবর্ত্তে হিন্দু শাসকের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাতে দূরদর্শী বিচক্ষণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর করেন, "আমার মতে সেনাপতিকে সহায় করিয়া নববলদৃপ্ত ইংরাজগণের সহিত যোগ দিয়া বর্ত্তমান নবাবকে পদচ্যুত করা সহজসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ ইংরাজগণের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব আছে, সুতরাং এ বিষয়ে আমি বিশেষ চেষ্টা করিতে পারিব।" পরিশেষে কথঞ্চিৎ বাকবিতণ্ডার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কোন কাগজপত্রে প্রকাশ না থাকিলেও ইহা বাঙ্গলার জনসাধারণের বিশ্বাস যে স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীঘাটে মায়ের পূজা দিবার ছলে কলিকাতায় গমনপূর্ব্বক ইংরাজদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এ

বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। এইরূপে নবাবের নৃশংস হস্ত হইতে অসহায় প্রজাবর্গের নিষ্কৃতি লাভ ও বাঙ্গালায় ইংরাজাধিকার বিস্তার এই উভয় ঘটনাই নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরিণামদর্শীতার ফল বলিতে হইবে।

এইরূপে উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ হইলে ইংরাজগণ সেনাপতি মীরজাফরের আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া প্রায় ৩সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পলাশীস্থ সিরাজের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ২২শে জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সমগ্র বৃটিশবাহিনী পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইল, এবং গভীর নিশীথে ভাগীরথী তীরস্থ বিশাল আম্রকুঞ্জে আশ্রয় করিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। * এই আম্রকানন তখন "লকাবাগ"নামে অভিহিত হইত, কথিত আছে এই বাগানে লক্ষ আম্রবৃক্ষ থাকাতেই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল—কেহ কেহ বলেন ঐ স্থানে বহু শত পলাশ বৃক্ষথাকায় ঐ স্থানের নাম পলাশী হইয়াছিল। নবাব চালিত নবাব সৈন্যগণ মুর্শিদাবাদ হইতে মানকরা তৎপরে দাদপুর পরিশেষে পলাশী ক্ষেত্রে ইংরাজেরা আসিবার দ্বাদশ ঘণ্টা অগ্রে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। নবাব পক্ষে ৩৫ হাজার পদাতিক পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী ও ৪০টী কামান ছিল। কিন্তু হইলে কি হয় এই, বিপুলবাহিনীর অধিকাংশই ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফর ইয়ারলুৎফ ও দুর্লভরামের অধীনে চালিত হইতেছিল। ২৩শে জুন বৃহস্পতি বার প্রাতঃকালে এই অগণিত নবাব বাহিনী ইংরাজের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। বিপর্য্যয় চক্রব্যূহ বিশাল কায় বিচিত্র গতি রণহস্তী, রণকুশল সুসজ্জিত বিপুল অশ্বসেনা, ভীমকায় সুদক্ষ পদাতিক ও তাহাদের হস্তস্থিত বালার্ক কিরণ প্রতিভাত করাল করবাল, কঠিন গিরিভেদী দুর্জ্জয় কামান ও প্রভাত সমীরে উড্ডীয়মান অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত যবনের জয়পতাকা ও রথধ্বজ সমূহ মুষ্টিমেয় ইংরাজ দলের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করিল। অমিততেজা অসমসাহসী দলপতি মনেও ত্রাসের সঞ্চার হইল। মনে হইল যদি মীরজাফর প্রমুখ নবাবের সেনাপতিবর্গ দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতই যুদ্ধে অগ্রসর হয়—যদি তাহাদের আশ্বাসবাক্য যবনের

* পলাশী যুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ তথ্য জানিতে হইলে Bolt's consideration on Indian-affairs. Malleson's Decisive Battles of India. Orme. Firminger অক্ষয় বাবুর "সিরাজদ্দৌলা" নিখিলবাবুর "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী" কালীপ্রসন্ন বাবুর "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

চক্রান্তমাত্রই হয়, তবেত একটী প্রাণীও সংবাদ দিতে ফিরিবে না। তাহাদের আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইংরাজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে; এখন হয় যুদ্ধ নয় কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন ব্যতীত উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্লাইব সৈন্যসমাবেশে মন দিলেন এবং আক্রমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় ফরাসীগণই প্রথম কামান দাগিল। অতঃপর নবাবসৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বর্ষার বারি বরিষণের ন্যায় অজস্র গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী সেদিন ইংরাজের প্রতি অনুকূল, সুতরাং অধিকাংশ গোলাই হয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ইংরাজের পশ্চাতে পড়িতে লাগিল বা আম্রবৃক্ষে লাগিয়া বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। কচিৎ ২।৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল; কিন্তু এই স্বল্প মৃত্যু সংখ্যাই ইংরাজের সংখ্যা হিসাবে অতি ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদনের পদদ্বয় গোলা লাগিয়া উড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে নবাব শিবিরে আনয়ন করা হইল; তথায় প্রভুর সাক্ষাতে অন্যান্য সেনাপতির দুরভিসন্ধির কথা বলিতে না বলিতে তিনি স্বর্গগত হইলেন। এতদিনে নবাবও তাঁহার সেনাপতিগণের দুরভিসন্ধি বেশ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদের হস্তেই আত্মসমর্পণ করিলেন এবং মীরজাফরকে স্বীয় পটাবাসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর এতক্ষণ স্থিরভাবে সসৈন্যে যুদ্ধক্রীড়া পরিদর্শন করিতেছিলেন; এক্ষণে মীরমদনের মৃত্যুর পর বাঙ্গালী বীর মোহনলালকে অমিত বিক্রমে শত্রুসৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইংরাজের প্রমাদ গণিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। নবাবের আহ্বানে স্বীয় প্রাণের আশঙ্কায় মীরজাফর, পুত্র মীরণ ও হোসেন খাঁ প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সসজ্জ নবাব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কথিত আছে সিরাজ তখন আপনার ও প্রিয় জনের প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্বর্গগত নবাব আলীবর্দ্দির পুণ্য নাম স্মরণ করতঃ মীরজাফরের সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া স্বীয় সম্মান ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মূঢ়ের মন তখন রাজ্যলাভেচ্ছায় মত্ত—সে বধির কর্ণে সিরাজের কাতরোক্তি নিবেদন আদৌ প্রবেশ লাভ করিল না। বরং এতাবৎ যে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল তাহা সুসাধনের উপায় দেখিয়া, মীর জাফর নবাবকে সে দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার এই কপট বিজ্ঞতায়

সরল প্রকৃতি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নবাব প্রতারিত হইলেন এবং মোহনলালকে ও ফরাসী গোলন্দাজগণকে সে দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুমতি পাঠাইলেন। মোহনলাল প্রতিমুহূর্ত্তেই বিজয়ের আশা করিতেছিলেন সুতরাং সে সময়ে প্রত্যাগমনের সময় নহে বলিয়া নবাবের নিকট যুদ্ধ চালাইবার অনুমতি চাহিয়া পাঠান কিন্তু মীর জাফরের চক্রান্তে পুনরায় যুদ্ধ করিতে নিষেধাজ্ঞা পাইয়া অগত্যা অনিচ্ছাসত্বে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সেনাপতির প্রত্যাবর্ত্তনে সৈন্যগণ ভয়াকুল হইল। ওদিকে চক্রান্তকারীগণের সৈন্যদের পলায়নপর দেখিয়া তাহারা আরও নিরুৎসাহ হইয়া রণে ভঙ্গ দিল।

নবাব সৈন্যগণকে এইরূপ পলায়নপর দেখিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবার মানসে ইংরাজদলের মেজর কীলপ্যাটরিক আম্রকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা

অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাসীক্ষেত্রের একণে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পলাসী যুদ্ধে ইংরাজসৈন্যের আশ্রয়ক্ষেত্র সেই আম্রকুঞ্জ এবং এই কুঞ্জের উত্তর দিকে স্থাপিত নবাবের সেই শিকার মঞ্চ, যেখানে ভাগীরথী অত্যন্ত বক্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই বেগবতী স্রোতস্বতী ভাগিরথী, সেই ভাগিরথী তীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামাদি সকলেরই পরিবর্ত্তন অথবা ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। সেই বিশাল আম্র কুঞ্জের সমস্ত বৃক্ষ ধ্বংস হইলেও একটী বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল এবং অঙ্গে গোলার চিহ্ন ধারণ করিয়া বহুদিন একাকী পলাশী যুদ্ধের শেষ সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল। ১৮৭৯ অব্দে উহা শুষ্কাবস্থায় পরিণত হওয়ায় তাহার মূলদেশ পর্য্যন্ত খনন করিয়া পলাশী বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। পলাশী প্রবাহিত ভাগীরথীও স্বাভাবিক চঞ্চলতা হেতু বহুল পরিমাণে গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এবং ১৮০১ সালে উহা পলাসী উদরস্থ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় বহু গ্রামাদির স্থান পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিধুপাড়া গ্রামখানী যাহা পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে স্থাপিত ছিল তাহা একণে বাঁকের মধ্যস্থ সংকীর্ণ ভূমি ধ্বংস হওয়ায় নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী হইয়াছে। একণে একটী বিস্তীর্ণ বাঁধ ভাগীরথীর প্লাবন নিবারণার্থ পূর্ব্বদিক দিয়া বরাবর মুর্শিদাবাদ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধকালে যে দুইটী বৃহৎ বাঁক বিদ্যমান ছিল একণে তাহাদের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এবং প্রশস্ত বাঁকটী একেবারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। এবং অর্দ্ধ চন্দ্রাকার বাঁকটী বেষ্টনকারী ভাগীরথীর দুই মুখ এক হইয়া বাঁকটি একণে একপ্রকার বিলে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম বিদ্যমান আছে তাহা যুদ্ধকালীন আম্রকুঞ্জের অতি সন্নিহিত ছিল। একণে উক্ত স্থান হইতে অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে লোকনাথপুর গ্রামের পাদদেশ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের

করিয়া সেনাপতির আজ্ঞা চাহিয়া পাঠান। ক্লাইব এই সময়ে নবাবের মৃগয়াকুঞ্জে ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া সোৎসাহে সানন্দে তিনি বাহিরে আসিলেন। এদিকে নবাব-শিবির হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই মীর জাফর ক্লাইবকে তৎক্ষণাৎ নবাব-শিবির আক্রমণের পরামর্শ দিলেন, এবং অন্যতম বিশ্বাসঘাতক রাজা দুর্লভরাম সিরাজকে রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনের পরামর্শ প্রদান করিলেন এইরূপে সেই দিন পলাশী ক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত হইল। এদিন নদীয়ার আর একটী স্মরণীয় দিন।

বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকমাত্রেই হতভাগ্য সিরাজের পরিণাম অবগত আছেন—পলায়নপর সিরাজ কিরূপে মীরজাফর পুত্র মীরণ কর্ত্তৃক ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই জাফরগঞ্জের প্রাসাদে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এইরূপে এই নিদারুণ বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতিত হইলে, ক্লাইব মীরজাফরকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন।

এই সময়ের ইংরাজ কোম্পানীর দপ্তর অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—যে তদানীন্তন নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক ইংরাজগণ কর্ত্তৃক অতীব সম্মানিত হইতেন কিন্তু সেই সময়ে যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের নিকট বিশেষ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কোন কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহার জাতি নাশের ব্যবস্থা, ও তদীয় পুত্র শিবচন্দ্রকে জামিন স্বরূপ কয়েদ রাখিবার এবং তাঁহার হস্ত

স্থানে স্থানে অনেক সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে করীমতলার ফকীর করীম সাহেবের সমাধির পশ্চাতে সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের সমাধি উল্লেখযোগ্য। ইংরাজের এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মহা বিজয়ের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ পলাশীক্ষেত্রে প্রথমে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একটী ক্ষুদ্রকায় বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, পরে বড় লাট লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালে তিনি পলাশীক্ষেত্র দেখিতে আসিয়া এই ক্ষুদ্র স্তম্ভটীকে পলাশির অনুপযুক্ত স্তম্ভ মনে করিয়া একটী বৃহদাকার প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহারই সন্নিকটে পলাশী দর্শনেচ্ছু জনসাধারণের থাকিবার জন্য একটী ডাক বাঙ্গলা স্থাপিত হইয়াছে। পলাশী এক্ষণে রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেলওয়ের উপর একটী রেল ষ্টেসন।

হইতে নদীয়া শাসনের ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাব করেন *। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট তারিখের গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে দেখা যায় যে তদানীন্তন নদীয়ার রাজস্ব ৯ লক্ষ মুদ্রা ধার্য্য ছিল। এই ৯ লক্ষ মুদ্রার মধ্যে ৬৪৩৩৮ টাকা কোম্পানীর রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ৮৩৫,৯৫২ টাকা নদীয়া রাজকে মুসলমান সরকারে রাজস্ব দিতে হইত। নদীয়া পূর্ব্ব হইতেই মীরজাফরের অঙ্গীকৃত তন্‌খার নিমিত্ত ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুরের নিকট বন্ধক থাকায় শেষোক্ত খাজানাও ইংরাজ কোম্পানীকে দিতে হইত। সে সময়ে রাজ্যের আভ্যন্তরিক গোলযোগের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে যথা সময়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। সেকারণ তিনি ক্রমাগত নানা ওজর করিয়া মালগুজারি দিতে বিলম্ব করিতে থাকেন। সুতরাং কোম্পানীর প্রাপ্য আদায় করিবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রাহকগণ নদীয়া রাজ্য নদীয়াধিপতির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া শোভাবাজারের স্বনামখ্যাত রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ রাজা নবকিশন বাহাদুর প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির সহিত তিনবৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দবস্ত করেন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং রিচার্ড বিচিসাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী † সদাশয় কোম্পানী বাহাদুর বাঙ্গালার এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশের

---

* Mr. Luke Scrafton writes from Maradabad to Government complaining of the arrears of revenue due in Nadia—'It is possible that by threatening the Raja with loss of his caste and such corporal punishments as are in practice among those people, something more may be extorted from him. However, I suppose Raydullub will either pay the balance out of the treasury or pay the 9 lacks for the ensuing year, therefore, it is requisite some methods must be taken to make the best of the ensuing year. As the chief cause of balance is Raja's extravagance, it, therefore, appears to me to send a trusty person into his country to collect his revenue for him, only to deprive the Raja of all power in his country allowing him only Rs. 10,000 per annum or whatever your honour &c. may think proper for his expenses and keep the son in Calcutta as security for the father's good behaviour; if this method is persued, it is probable the Hon'ble Company, may within two years receive the full of Toncaws on him.

Vide Long's Selections from Unpublished Records No. 337.

† Fort William 28th April 1770.

To

The Honble John Cartier Esqr. President & Governor and The gentlemen of the select committee.

"In Mr. Verelst and my joint addresses which accompanied the statement at the commencement of this season we informed you that the Rajah of Nuddea had behaved so ill and owed so considerable a sum

মর্য্যাদা হানি না করিয়া পুনরায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত নদীয়ার মালগুজারি বন্দবস্ত করেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও বাকী রাজস্ব কিস্তীবন্দী অনুযায়ী বিনা ওজরে কোম্পানীর কুঠীতে চালান দিবেন অঙ্গীকারে এক চুক্তি পত্র লিখিয়া দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন। *

---

account his Mulguzary that the ministers recommended his not being confided in and we thought it prudent to endeavour to let the country to farm for three years on terms that would have proved very advantageous term to Employers and reserved to the Rajah his rights and a stipulated annual salary of one lac of rupees. Nobkissen & several other principal Calcutta Merchants offering themselves to become farmers on terms which appeared advantageous to the company, just to the Rajah and equitable to the ryots—their terms were accepted and they sent people to begin the collections but it was soon found that the farmers required being invested with powers that would deprive the Rajah of his just right and that they acted oppressively in the distress and did not pay the revenues according to their agreement. The Rajah at the same time jealous of their authority and earnest to be again reinstated offered to comply with the terms agreed on by the farmers to pay his former balance and to give security for the due completion of his agreement. The ministers were very urgent for closeing with the Rajah's people and I was induced to acquiesce in the measure from the following consideration. The farmers absolutely demanded to be invested with the Rajah's rights of Zamindary which could not be granted without deposing the oldest Zemindar in the country of his hereditary right in which neither equity nor our Honble Master's orders would have justified us. The farmers have behaved ill and seemed either aiming at getting power and wealth than benefiting and improving the country committed to their charge. An English gentleman being appointed to supervise the Nuddea Province and superintend the collections. I thought he would be such a check on the Rajah as to prevent his being able to demand the Sircars of its just reveunes or to distress his own Ryots. The security offered by the Rajah being indubitable was another motive with me for assisting to the measure which I still hope will prove to have been rightly judged, the only difficulty which seems to present itself is as to the sum of Rs 225000 said by the Rajah to have been received by the farmers does not prove this sum against the farmers he and his securities are to make it good if he does I hope there will be no difficulty in obtaining payment of Nob kisen and the other farmers. Mr. Ryder is now employed in setting this account. &. &. &.

Moidepore
30th March. 1770.

With respect &c.

Richard Bechee.

Long's Selection of U. P. R. No. 5 & 10.

* "I promise to pay the above sum of Rs. 835, 952 agreeable to the kist-bandi without delay or faliure. I will pay the same into the Company's Factory. I have made this that it may remain in full force and virtue. Dated the 23rd of Julhaid (Sic) and the 4th August of Bengal year 1166."

Vide Hunter's Statistical Account Vol. II page 159.

এইকালে যখন লর্ড ক্লাইব বাহাদুর দিল্লীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন তখন মিঃ সামনার বৰ্দ্ধমানাধিপতির জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ও ঝালরদার পালকী শিরোপা প্রার্থনা করিলে, রাজা নবকিশন বাহাদুর * আপনার নিজ তহবিল হইতে দশ সহস্র মুদ্রা নজরানা দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিমিত্তও ঐরূপ শিরোপা ও রাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি প্রার্থনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর এই উপকারের বিনিময়ে রাজা নবকিশনকে ১১৭৩ বঙ্গাব্দে শ্রীরামপুর বনাম মূলাযোড় গ্রামখানি মহোত্রাণ স্বরূপ প্রদান করেন। কিন্তু তদানীন্তন রেভিনিউ বোর্ডের নির্দ্দেশমতে নদীয়ার কালেক্টর মিঃ রেডফারনের আদেশে নদীয়াধিপতির এরূপ দানের ক্ষমতা না থাকা অজুহাতে উক্ত মূলাযোড় গ্রাম গবর্ণমেণ্টের খাস দখল ভুক্ত হয়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করায় ভান্সিটার্ট সাহেব বাঙ্গালায় কোম্পানীর কুঠির গভর্ণর ও অধ্যক্ষ হয়েন। এই ভান্সিটার্ট বাহাদুর কিছুকাল নদীয়ায় কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরাজদিগকে, অঙ্গীকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে না পারায় সকৌন্সিল ভান্সিটার্ট সাহেব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার সুচতুর জামাতা মীরকাশিমকে নবাব মনোনীত করেন। মীরকাশিম সন্দিগ্ধমনা, কোপন স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ও স্বাধীনচেতা. কর্ম্মদক্ষ শাসন কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত। তিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে কোম্পানীর সহিত তাঁহার সদ্ভাব যে স্থায়ী হইবে না তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। তিনি মসনদে উপবিষ্ট হইয়া কোম্পানীর দাবী পরিশোধের নিমিত্ত বাঙ্গলা বিহারের ভূস্বামীগণকে বন্দী করিয়া তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার একশেষ করিয়াছিলেন। সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রও বন্দীগণের মধ্যে ছিলেন। এবারও রাজস্ব বাকীর দায়ে তাঁহার এই দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছিল। ইংরাজের অঙ্গীকৃত তন্খা পরিশোধ হওয়ায় নদীয়া রাজ্য পুনরায় নবাবের এলেকাধীন আসিয়াছিল। এক্ষণে নব

---

* নবকিশন বাহাদুর বঙ্গে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পক্ষে যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা তাৎকালীন গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র দৃষ্টে বেশ বুঝা যায়। এ সম্বন্ধের বহু প্রমাণ নবকিশন বাহাদুরের উপযুক্ত বংশধর রাজা বিজয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট বিদ্যমান আছে।

নবাব মীরকাশিম রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বহু অর্থ বাকী দেখিয়া বারম্বার তাঁহাকে রাজধানী মুরশিদাবাদে আহ্বান করেন; কিন্তু রাজা, আজ কালহরা—কাল দেওয়ালী—তৎপর স্ত্রীর অসুখ ইত্যাদি নানা অছিলায় রাজস্ব প্রদানে বিলম্ব করিলে, নবাব, ইংরাজ গভর্ণর ভান্সিটার্ট বাহাদুরকে রায় রায়ানের দ্বারা রাজাকে মুরশিদাবাদে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এক লিপি প্রেরণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সদাশয় ইংরাজ পক্ষের শরণ লইয়া নজর ও রাজস্বের কিয়দংশ প্রদান করিয়া এবং নিজ মালগুজারী ১২৮,৭৫৫৲ টাকা বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া লইলে কিছুদিনের জন্ত পরিত্রাণ লাভ করেন। কিন্তু আবার অল্পদিনের মধ্যেই বন্দী হয়েন। নবাব, বাঙ্গালার প্রধান প্রধান ভূস্বামী ও ধনবান ব্যক্তিদিগকে বিশেষতঃ যাহাদিগকে তিনি ইংরাজবাহাদুরের পক্ষভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিলেন—তাঁহাদিগকে মুঙ্গের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া পরিশেষে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। এইকালে নবাবের আদেশে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি অন্যান্ত বন্দীর সহিত সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" মনে করিয়া নবাবের কর্ম্মচারীগণকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তৎকালোচিত এক যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং পূর্ণাহুতে তাঁহাদের প্রাণ গ্রহণের নিমিত্ত সকাতরে প্রার্থনা করেন। সেজন্য তাঁহাদের প্রাণদণ্ডে বিলম্ব ঘটে। এদিকে ইংরাজের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজ বাহাদুরের সহায় হওয়ায় নবাব পরাজিত হইয়া মুঙ্গের ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন; সুতরাং সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সে যাত্রা রক্ষা পান। মীরকাশিম গুরগণ খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিবর্গের অকর্ম্মণ্যতায় পলাশী, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বার বার পরাজিত হইয়া পরিশেষে অযোধ্যায় পলায়ন করেন; পরে অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীশ্বর সাহ আলমের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বকসারের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অল্পদিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এইরূপে দেশব্যাপী রাষ্ট্র বিপ্লবের উপসংহার হইলেও দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। এ সময়ে নদীয়া রাজ্যে একরূপ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। দেশ মধ্যে দস্যু ও তস্কর ভীতি অসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহাদের দারুণ অত্যাচারে কত সোণার সংসার শ্মশানে

পরিণত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সামান্য ধনশালী বা গৃহস্থ লোকের কথা দূরে থাকুক, এই সকল অসমসাহসিক দস্যুনিচয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কোম্পানীর কুঠীও লুণ্ঠন করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। এই সকল লুণ্ঠন কাহিনীর দুইটী ঘটনা অনন্ত অক্ষরে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। একটী তদানীন্তন কোম্পানীর শান্তিপুরের কাপড়ের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া কোম্পানীর গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্য্যকে লইয়া যাওয়া এবং অপরটী সায়েস্তা খাঁ নামক মুরসিদাবাদের জনৈক মুসলমান সওদাগরের কর্ম্মচারী মহম্মদ মোবারিক ও মুশা বদলু প্রভৃতির নিকট হইতে নদীয়ার সীমানায় ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা লুণ্ঠন করা; শেষোক্ত ব্যাপারটী লইয়া দেশ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। সায়েস্তা খাঁ বাদসাহ সরকারে যাইয়া এ বিষয়ে জানাইলে তথা হইতে তাদানীন্তন কোম্পানীবাহাদুরের গভর্ণরের উপর এ বিষয়ের বিচারের নিমিত্ত এক পরোয়ানা জারি হয় এবং গভর্ণর সাহেব তাৎকালিক নদীয়ার মুসলমান কালেক্টরকে এ বিষয়ে সম্যক তদন্ত করিয়া দোষীর শাস্তি বিধান ও নদীয়া রাজের গোমস্তা প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তির অমনোযোগিতায় এ কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের সকলের শাস্তি বিধান ও অপহৃত অর্থ আদায় পূর্ব্বক অভিযোগকারী সায়েস্তা খাঁকে পুনপ্রদানের অনুমতি প্রদান করেন।

তাৎকালিক নদীয়ার দস্যু দলপতিদিগের মধ্যে একজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে ব্যক্তি বিশ্বনাথ বাবু। বাড়ী গাড়রা, ভাতছালা থানা চাপড়ার ৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে। বিশ্বনাথ জাতিতে বাগদী এবং ব্যবসায় ততোধিক হীন হইলেও তাহার উদার চরিত্র ও বীরোচিত সুন্দর গঠন, ভদ্রোচিত দানশৌণ্ডতা তাহাকে "বাবু" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—দরিদ্র অসহায় প্রজাকুলকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করা। বিশ্বনাথ কৃপণ ধনীর যম ছিল। ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণের ধনে দরিদ্র পোষণ তাহার বড় আনন্দের কার্য্য ছিল। বিশ্বনাথ কত কন্যাদায়গ্রস্থ দরিদ্রের বিবাহের ব্যয় কুলান করিয়াছে, কত অসহায় পরিবারের সংসার প্রতিপালন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশ্বনাথের পুত্রাদি না হওয়ায় বৈদ্যনাথ নামক

এক গোপ বালককে সে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল; এই বৈদ্যনাথ হইতে শেষ জীবনে বিশ্বনাথকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বিশ্বনাথের যে সকল সহযোগী ছিল তাহাদের মধ্যে মেঘা, কৃষ্ণসর্দ্দার, নলদা এবং সন্ন্যাসী, প্রধান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক একটী বিশেষত্ব বিদ্যমান ছিল। নলদা ডুব দিয়া জলের ভিতর বহুক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া থাকিতে পারিত। বিশ্বনাথ স্বয়ং দস্যুচিত বহুগুণে শোভিত ছিল। রণ্পা নামক দীর্ঘ বংশ যষ্টি অবলম্বনে সে এক রাত্রে বিংশতি ক্রোশ পথ গমন করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম ছিল। বিশ্বনাথের সুবৃহৎ দলে সহস্রাধিক বলবান ব্যক্তি সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রস্তুত থাকিত। এই সুবৃহৎ দলের প্রত্যেকের উপর তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বর্ত্তমান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের উপর বিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল যেন কেহ কদাচ স্ত্রীলোক, শিশু ও গোজাতির উপর কোন অত্যাচার না করে। বিশ্বনাথ বাবু এই সুবিপুল দস্যুদলের সহিত প্রকাশ্য ভাবে পালকী চড়িয়া দস্যুতা করিতে গমন করিত। বিশ্বনাথের আর একটী নিয়ম ছিল পূর্ব্বে গৃহস্থকে পত্র দ্বারা সতর্ক করা। উক্ত পত্র এই মর্ম্মে লিখিত হইত "সদাশয় মহাশয়! যদি পত্র বাহক মারফৎ প্রার্থিত অর্থ প্রদান করেন বিশেষ বাধিত হইব, অন্যথা প্রস্তুত থাকিবেন শীঘ্রই আপনার শ্রীচরণ দর্শনে গমন করিব।"

একবার বিশ্বনাথ কালী পূজার দিন অর্থ সঙ্কুলান করিতে না পারায় সমৃদ্ধি সহকারে মায়ের পূজা হয় না দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে উপবিষ্ট আছে এমন সময়ে তাহার গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে কালনার গদীতে বৈদ্যপুরের নন্দীরা এইমাত্র নগদ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে সবিশেষ পুলকিত হইয়া বিশ্বনাথ তৎক্ষণাৎ মাত্র তিন জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে নৌকা যোগে কালনায় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ দারোগার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বাধ্য করিয়া এক একরার লিখাইয়া লইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই গদীতে উপস্থিত হইল। ঐ একরার এই মর্ম্মে লিখিত হইল যে দারোগার বিশেষ যোগ সাজসে এ

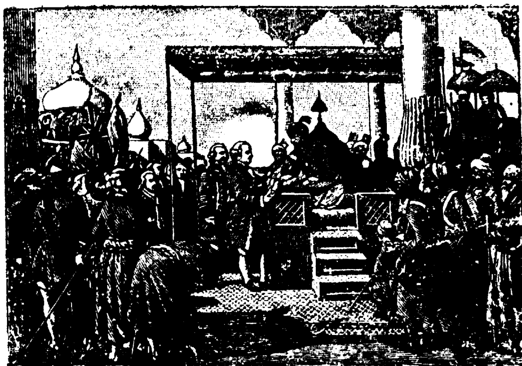
কার্য্য সমাহিত হইল। এইরূপে সেই কার্য্যের যথাযথ অনুসন্ধানের মূলোচ্ছেদ করিয়া বিশ্বনাথ স্বীয় বিক্রমে পল্লী লুণ্ঠন পূর্ব্বক সেই রাত্রেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

আর একবার বিশ্বনাথের দল সংবাদ পায় যে নদীয়ার ইনডিগো কনসার্নের ফ্যাডি সাহেবের বাঙ্গালায় সেই দিন কলিকাতা হইতে বহু সহস্র মুদ্রা রায়তদিগকে দাদন দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া বিশ্বনাথের দল রাত্রে ফ্যাডির বাঙ্গালা আক্রমণ করে। মিসেস ফ্যাডি রাত্রির অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে কোনরূপে নিকটস্থ পুষ্করিণীতে কাল হাঁড়ি মাথায় দিয়া দস্যুদলের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু ফ্যাডি সাহেব শীঘ্রই ধৃত হইয়া দলপতির সম্মুখে নীত হইলে দূরদর্শী বিশ্বনাথ একজন সাহেবের প্রাণ নাশ করিলে সমগ্র সাহেব লোক তাহার কিরূপ ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে স্মরণ করিয়া সাহেবকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু দলস্থ সকলেই এক বাক্যে ফ্যাডি সাহেবকে বিনাশ করিতে মত প্রকাশ করে এমন কি দলস্থ এক জন সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া ফ্যাডিকে সংহার মানসে তরবারি উত্তোলন করিলে বিশ্বনাথ ক্ষিপ্র হস্তে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সাহেবের প্রাণ রক্ষা করেন। পরিশেষে বহু বাকবিতণ্ডার পর সাহেবকে মুক্তি দেওয়াই স্থির হইলে বিশ্বনাথ সাহেবকে তাঁহার ভগবানের নামে শপথ করাইয়া অঙ্গীকার করাইয়া লন যেন মুক্ত হইয়া কিছুতেই তাহাদের বিপক্ষতাচরণ না করেন। ফ্যাডি সাহেব এইরূপে মুক্ত হইয়া দস্যুর নিকট প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নহে মনে করিয়া বরাবর তাৎকালিক নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেবের নিকট গমনপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করেন। ইলিয়ট সাহেব কলিকাতা হইতে ব্যালকুয়ার সাহেবের অধীনে কতকগুলি বলিষ্ঠ ইউরোপীয় গোরা আনাইয়া ও শান্তিপুর হইতে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ গোড়ো উপর গোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া বিশ্বনাথের পালিত পুত্র বৈদ্য নাথের সাহায্যে শীঘ্রই বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন। বিচারে বিশ্বনাথ ও তাহার দ্বাদশ জন সঙ্গীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং নদীয়া ঠগবগের খালের মাঠে বাঁশবেড়িয়া কুঠীর দক্ষিণে নদীতীরস্থ বটবৃক্ষে তাহাদের

ফাঁসি হয়। * বিশ্বনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে মাত্র দুই জনের উপর বিশেষ কোপ প্রকাশ করে। প্রথম তাহার বিশ্বাসঘাতক পালিত পুত্র বৈদ্যনাথ, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ফ্যাডি সাহেব।

রাজ্যের যখন এরূপ অরাজক অবস্থা তখন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ক্লাইব ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে লর্ড উপাধি ভূষিত হইয়া মুসলমানের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কর্ত্তৃক এদেশে পুনঃ প্রেরিত হন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে চতুর্দ্দিক হইতে নবাব ও জমিদারগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে নজর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রও পঞ্চ ঘোটক ও তৎকালোচিত সৌজন্যপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিয়া ভাগ্যবান ক্লাইবের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ক্লাইবের আগমনের পূর্ব্বেই মীরকাসিমের মৃত্যু হয় এবং মীরজাফর দ্বিতীয় বার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারও মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র নাজিমদ্দৌলা ইংরাজগণ কর্ত্তৃক নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্লাইব মুরশিদাবাদে যাইয়া নূতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্দোবস্ত করিলেন যে সৈন্য সংক্রান্ত ও রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় অন্যান্য ভার ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের হস্তে থাকিবে; কর সংগ্রহ, শাসন ও বিচার প্রভৃতি কার্য্য নবাবের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং ঐ সকল কার্য্য ও সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন। অনন্তর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখের প্রদত্ত বাদসাহী সনন্দ বলে প্রজাপালক ইংরাজ বাহাদুর বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন।

* নদীয়ার প্রায় প্রতি গ্রামেই ৫, চারিজন চৌর বা ডাকাতের বাস ছিল, তন্মধ্যে হুতীমারা জাগুলী, ডাকাতের কুলবেড়ে প্রভৃতির ডাকাতগণের নাম শুনিলে লোকের হৃৎকম্প হইত। এই কুলবেড়েকে লোকে বিষম কুলবেড়ে বলিত। মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাইতে তখন এই গ্রামের উপর দিয়া যাইতে হইত। ইহারই নিকট গোঁজা সন্ন্যাসীর মঠ; শুনা যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা মঠের সন্ন্যাসীর উপর সন্তুষ্ট হইয়া এই মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের সমসাময়িক দস্যুগণের মধ্যে কড়ুর সর্দ্দার ও বলরাম সর্দ্দারের অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। অমানুষিক অত্যাচার ও নৃশংসতার তাহারা বিশ্বনাথকেও পরাস্ত করিয়াছিল তাহারাও কয়েক মাস মধ্যে সদলে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।—Fifth Report of the Select Commitee p. p. 817-20.



সম্রাট্ সাহ আলমের হস্ত হইতে ক্লাইবের বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ।





লর্ড ক্লাইব।





ওয়ারেণ হেষ্টিংস্।

নদীয়ায় ইংরাজাধিকার।



মহামান্য ইংরাজ কোম্পানী সম্রাট সাহ-আলম দত্ত বঙ্গের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলে,তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড ক্লাইব বাহাদুর মুরসিদাবাদ-সন্নিকটস্থ মতিঝীল প্রাসাদে ১৭৬৬ অব্দে পুণ্যাহ দিনে কার্য্যতঃ বঙ্গের শাসনভার হস্তে লইয়া এতদ্দেশের রাজস্বের উন্নতি বিধানে মনঃসংযোগ করিলেন; কিন্তু এ সকল বিষয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের সম্যক অভিজ্ঞতা না থাকায় সমস্ত বিষয়ে প্রথম প্রথম বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া কোম্পানী বাহাদুর কঠোর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং তৎকাল প্রচলিত প্রথানুযায়ী সিপাহী দ্বারা কর আদায় করাইতে লাগিলেন। * বিশেষতঃ এই সময় লর্ড ক্লাইব পুনরায় বিলাত যাওয়ায় কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের এবং রাজকার্য্যে নানারূপ গোলযোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাৎকালিক জমিদারগণও কি জানি কিরূপ দাড়ায় মনে করিয়া নিরীহ প্রজাকুলের নিকট স্বীয় স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। রাজপরিবর্ত্তনের অনিবার্য্য

---

* The Musalmans when they came into Bengal and acting on Fudal principles were opposed to that beautiful System of village Self-Goverment which had so long been tower of strength to the rayats, instead of it a military tenure was adopted and the revenues are collected by sepoys, the Zemindars were a semi-millitery cellector of revenue, which was realized at the point of the Sword, a practice adopted even by the English when they first took possesion of Burdwan Birbhum & Nadyia.

Introduction to Long's Unpublished Records page LIV.

ফলে কিছুদিন দেশের এইরূপ অবস্থা হইল, ইহার উপর আবার ১৭৬৮—৬৯খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের সমূহ অনিষ্ট হওয়ায় দেশে করালমূর্ত্তি দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী ভয়ঙ্কর বেশে দর্শন দিল। এই দুর্ভিক্ষে দেশের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। * শুনা যায় অট্টালিকায়, পর্ণকুটীরে, পথে, প্রান্তরে ঘাটে, হাটে, মাঠে, লোকালয়ে, যেখানে সেখানে দলে দলে মানুষ ও গৃহপালিত পশ্বাদি মরিয়া পড়িয়া থাকিত, কেহ কাহাকেও দেখিবার বা কেহ কাহাকে ফেলিবার ছিল না। এই নিদারুণ ঘটনা বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে সংঘটিত হওয়ায় ইহা "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর" নামে খ্যাত।

ইংরাজরাজ নবলব্ধরাজ্যের রাজস্ব ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে মনোযোগী হইয়া পড়িলেন ও বঙ্গদেশকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া জমিদার গণের সহিত নুতন মেয়াদী বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুযোগ পাইয়া নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সমগ্র বিষয় স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে নুতন প্রথানুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এক "অভিলষিত ব্যবস্থাপত্র" দ্বারা শিবচন্দ্রকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মানানীত করেন। ইংরাজের সুশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফল স্বরূপ আমরা এতদ্দেশে মৃত্যুর পূর্ব্বে বিষয়াদির বিধিবন্ধের জন্য এই প্রথম "উইল" পত্রের সৃষ্টি দেখিতে পাই। মহারাজা রাজেন্দ্র অগ্নিহোত্রীবাজপেয়ী কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ এই সময়ে অতি বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যাপী ধারাবাহিক কর্ম্ম নিচয় তাঁহার স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি করিয়াছিল। এক্ষণে কর্ম্মবীর মহারাজা নিজের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণনগর হইতে ক্রোশৈক পূর্ব্বে স্থিত অলকনন্দা তীরে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তনুত্যাগ করেন। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত অলকনন্দার ন্যায় তাঁহার বংশের অবস্থারও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এইকাল হইতেই

* Vide Lord Macaulay's Graphic Description of the great Famine in his essay on Lord Clive.

† Vide Hunter's Unpublished Bengal Mss. Records No. 211.

ভারতবর্ষের সহিত সদাশয় ইংরাজের স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা শিবচন্দ্র ১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নদীয়ার রাজত্ব করেন। রাজা শিবচন্দ্র পিতৃ-গদীতে অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার নিজাধিকারে তাঁহার ক্ষমতায় কোম্পানী কর্ত্তৃক হ্রাস করা হয়। এমন কি কোম্পানীর তদানীন্তন কর্ম্মচারী জন্ শোর সাহেব নদীয়া রাজের শিথিল হস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার পর্য্যন্ত অপহৃত করিয়াছিলেন। * কিন্তু নদীয়া-রাজ এ বিষয়ে তদানীন্তন সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংশ সাহেব বরাবর এ বিষয়ে আবেদন করেন, তাহাতে প্রার্থনা থাকে যে, বর্ত্তমান সন তাঁহার সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত স্থির হইলে তিনি প্রথানুযায়ী কিস্তীবন্দী হিসাবে কোম্পানীর সরকারে বর্ত্তমান সনের রাজস্ব দাখিল করিবেন এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর বাকী বকেয়াও পরিশোধ করিবেন। যদি এ বিষয়ে সক্ষম না হয়েন, তাহা হইলে তখন যেন তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করা হয়। † ইহার উপর কি আদেশ প্রদত্ত হয়, তাহা পাওয়া যায় নাই কিন্তু ১৭৮২ খৃঃ ২৪ জুন তারিখের মিঃ ম্যাক্‌ডাইয়েল সাহেবের রিপোর্টানুযায়ী দেখা যায় যে সেই বৎসর নদীয়া-রাজের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃকই রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। ‡

* Vide Letter from Mr. John Shore reporting that he has dispossessed the Zemindar of Nadiya from charge of collections (March 25. 1782).

Letter No. 100 Hunter's Unpub. Bengal Mss. Records.

† Vide petetion from the Raja of Nadiya binding himself on the settlement of current year being made with him to pay up the revenue list together with balance of last year on pain of his forfeiture of Zemindary in case of faliure.

Letter No. 147 Hunters Bengal Mss. Records.

‡ Vid Letter from Mr. Mc. Dowel reporting that Zemindary officers have begun to collect revenue of Nadiya for current year (June 24. 1782).

Letter No. 166. H. U. P. Mss. Records.

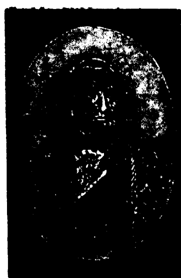
মহামান্ত হেষ্টিংস বাহাদুর ১৭৭২ অব্দে রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্ত কালেক্টর-পদ সৃষ্টি করিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন এবং নদীয়াতেই সর্ব্ব প্রথমে জেলা স্থাপিত করিয়া ইংরাজ কালেক্টরের অধীন করিলেন। বর্ত্তমান কালে প্রেসিডেন্সী বিভাগ বলিয়া যে ভূভাগ আখ্যাত, মুরসিদাবাদ বাদে তাহাই এই সময়ে নদীয়া বিভাগ বলিয়া খ্যাত হয়। হেষ্টিংস সাহেব কলিকাতা কাউন্সিলের চারিজন সদস্যকে জমিদারগণের সহিত পাঁচ বৎসরের জন্ত খাজনার বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলেন, ও মুরসিদাবাদ হইতে খাজনা-দপ্তর নদীয়াস্তর্গত "সুখসাগরে" * এবং অন্তান্ত যাবতীয় সরকারী কার্য্যালয় মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন। বিচার কার্য্যের সুবিধার্থ প্রতি জেলায় এক একটী দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত গোবিন্দসড়কে (গোয়াড়ীতে) নদীয়ার এই সকল আদালত স্থাপিত হইল। কালেক্টররাই দেওয়ানী বিচারালয়ে বিচারপতি হইলেন, কিন্তু ফৌজদারী বিচার মুসলমান কাজী ও মুফ্‌তির হস্তেই রহিল। আপিল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামে দুইটী আদালত স্থাপিত হইল। পরিশেষে ইংরাজদিগের অপরাধের এবং রাজধানীর মকর্দ্দমা বিচারের নিমিত্ত কলিকাতায় মহামান্ত ইংলণ্ডেশ্বরের ব্যবস্থানুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট নামে এক নূতন আদালত সংস্থাপিত হইল এবং ভারতবন্ধু সংস্কৃতানুরাগী পণ্ডিত সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম্ জোন্স সাহেব উক্ত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হইয়া অসিলেন। সংস্কৃতানুরাগী জোন্স সংস্কৃত ভাষাধ্যয়নের নিমিত্ত ১৭৮৪ অব্দে গোয়াড়ীতে কয়েক মাস অবস্থান করেন এবং তাৎকালিক নদীয়ারাজ শিবচন্দ্রের নিকট এক জন উপযুক্ত অধ্যাপকের প্রার্থনা করেন। তখন দেশমধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করে নাই সুতরাং ম্লেচ্ছকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ঐ কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে মহারাজের ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায় বৈদ্য-কুলোদ্ভব রামলোচন কবিভূষণ সাহেবকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হয়েন। এই রামলোচন সংস্কৃতে এবং চিকিৎসা

* Calcutta review. Vol. VI. 1846. page 410



নদীয়ায় সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রাপ্ত সার উয়িলিয়ম্ জোন্স।





লর্ড কর্ণওয়ালিস্।





ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শাস্ত্রে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে একবার কোন ব্রাহ্মণ-কুমারের ব্যাধি ও ঔষধ নির্ণয়ে তাঁহার ভ্রম হয় এবং ঐ ভ্রম হেতু ব্রাহ্মণ-পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত অধ্যাপনায় ব্রতী হয়েন।

রাজা শিবচন্দ্র পূর্ব্বের অঙ্গীকারানুযায়ী নদীয়ার রাজস্ব যথা সময়ে ইংরাজ সরকারে দাখিল করিতে না পারায় ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞাপন দ্বারা নদীয়া-রাজ কর্ত্তৃক নদীয়ার রাজস্ব আদায় পুনর্ব্বার সর্ব্বতোভাবে রহিত করা হয়। * কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মহামান্য সকৌনশিল গবর্ণর জেনারল বাহাদুর পুনরায় নদীয়া রাজকে তাঁহার অধিকারে রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য ক্ষমতা প্রদান করেন। ‡

১৭৮৫ অব্দের প্রারম্ভে লর্ড হেষ্টিংস স্বদেশ যাত্রা করেন। এবং পর বৎসর লর্ড কর্ণওয়ালিশ গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ১৭৮৮ অব্দে রাজা শিবচন্দ্র পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়া-রাজ্যের অধিকারী হয়েন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত বিলাসী এবং অমিত-ব্যয়ী ছিলেন। ইনি কৃষ্ণনগর হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে অঞ্জনা নামক অধুনা বদ্ধ-সলীলা নদী-তীরে শ্রীবন নামে এক প্রমোদ-উদ্যান স্থাপন করিয়া নদীতটে একটী সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এই অট্টালিকার দক্ষিণ দিকে যে কানন অধুনা বন্য বনস্পতির গাঢ় ছায়ায় আবৃত থাকিয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু বা ততোধিক হিংস্র দস্যু তস্করের আশ্রয়-স্থল হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বিবিধ সুগন্ধী পুষ্পের ও সুস্বাদু ফলের বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং ইহার আবরের নাম ছিল মধুপোল। এই

---

* Advertisement forbiding any collection being made in Nadiya by the Raja or his Amla 17th. April, 1783.
No. 397, Hunter's U. P. Bengal Mss Records,

‡ Vide Letter from Governor-General in council respect ing the repeeling the reestablishment of the Raja of Nadia in managemennt of his zemindarv,
No. 995, Hunter's, U. P. B. Mss. Records.

অপূর্ব্ব আনন্দ কাননে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তাঁহার রাজকার্য্যে অমনোযোগ বশতঃ রাজকার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইতে থাকে।

এই সময়ে প্রজাহিতৈষী লর্ড কর্ণওয়ালিশ বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায়ের সুবাবস্থ বিধান, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন প্রভৃতি দেশের হিত কামনায় নির্দ্দিষ্ট রাজস্বে জমিদারগণের সহিত "দশশালা" বন্দোবস্ত করেন। এবং পরে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয় এবং এতদ্দ্বারা অবধারিত হয় যে জমিদারেরা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া অধিকৃত ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবেন। কিন্তু বৎসরের মধ্যে কতিপয় নিরূপিত দিনে রাজস্ব দিতে না পারিলে তাঁহাদের জমিদারী নিলাম হইবে।

যথাকালে কর দিতে না পারিলে জমিদারী নিলাম হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার বহু অক্ষম জমিদারের জমিদারী হস্তান্তর হইতে আরম্ভ হইল বটে কিন্তু মুসলমান অধিকারে ভূম্যধিকারীগণ বাকী খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ হইয়া যেরূপ বর্ব্বরোচিত অকথ্য শাস্তি প্রাপ্ত হইতেন, তাহা এই সুসভ্য বিধানে এই সময়ে রহিত হইয়া গেল। নদীয়া রাজ ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয়কার্য্যে অমনোযোগিতা নিবন্ধন রাজকার্য্যে খুবই বিশৃঙ্খলা ঘটিতে ছিল; এক্ষণে আবার ১৭৯৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভাগিরথী ও অন্যান্য নদীর জল অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে, নদীয়ায় এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়। * এই প্লাবনে লোকের কষ্টের অবধি ছিল না, দেশে ডাঙ্গা ছিল না, ডাঙ্গায় ঘর ছিল না, ঘরে লোক ছিল না; কাজেই রাজস্ব আদায় কষ্টকর হইয়া পড়িল।

* Vide Letter from Collector of Nadiya forwarding a Petition from the Zemindar and rayats of Nadiya Complaining of the distressed State of Country from innundation.

No. 6188 Hunters U. P. B. Mss. Records

Collector ordered to enquire October 7th. No. 281796.

নদীয়া রাজ গবর্ণমেণ্টকে দেশের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া রাজস্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন।* কিন্তু তখন পূর্ব্বোক্ত নিলামী আইন সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় এ আবেদনে কোনই সুফল হয় নাই এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত যে নদীয়া রাজ্যের ক্রমিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এই সময় হইতেই নিলামে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করিল। বিধির নিয়ম এক ভাঙ্গে, আর গড়ে। এদিকে নদীয়া রাজের যেমন অবস্থা হানি হইতে লাগিল, ওদিকে তাৎকালিক উদীয়মান সুবিখ্যাত ধনপতি রাণাঘাটের কৃষ্ণপান্তি নদীয়া রাজের নিলামী জমিদারি সকল ক্রয় করিয়া ধনে ও মানে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন।

নদীয়াধিপতির এইরূপে দিন দিন আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িলেও তাঁহার অধিকারস্থ নবদ্বীপে তখনও জ্ঞান-চর্চ্চা একেবারে লোপ পায় নাই। দুই একটী ক্ষীণ জ্যোতি, তখনও পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছিল। রাজ কার্য্যে তখনও দেশীয় তারিখের সমধিক প্রচলন ছিল অথচ বিশুদ্ধ পঞ্জিকা সাধারণভাবে দেশ মধ্যে প্রচলিত না থাকায় জন সাধারণের বিশেষতঃ রাজকার্য্যের অনেক সময়ে গোলযোগ সংঘটিত হইত। এই অভাব দূরীকরণ মানসে গবর্ণমেণ্টের যত্নে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক দেশীয় প্রচলিত জ্যোতিষের মতে সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুমোদিত এক বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রণীত হয়।§ ইহাই বর্ত্তমানকাল প্রচলিত "নব পঞ্জিকার" মূল ভিত্তি।

---

* Vide Letter from Collector of Nadiya enclosing representation from the Zemindar on the calamity of the season and his inablity to discharge revenue. November 30th. 1791. No. 2199 Hunter's U P. B. Mss. Records.

§ Letter from Secretary to Board stating that he has repeatedly found difficulty in procuring an accurate Bengal Almanac and suggesting that Collector, Nadiya be directed to transmit one properly authenticated by Brahmanical Astronomy for the use of Office. July 5th 1799.

এই ১৭৯৯ অব্দে নদীয়ার নদী সকল অসম্ভব স্ফীত হইয়া আবার দেশে বন্যা আনয়ন করে। তদানীন্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রজার দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া সে বৎসর রাজস্ব আদায়ে শিথিলতা প্রকাশের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। *

এই দারুণ দুরবস্থা হইতে দেশ উদ্ধার হইতে না হইতে ১৮০২ অব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র প্রাণ ত্যাগ করেন এবং গিরিশচন্দ্র নদীয়ার রাজগী প্রাপ্ত হন। এই সময় মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেসলী গবর্ণর জেনারল্ পদে অধিষ্ঠিত। পূর্ব্বে লর্ড কর্ণওয়ালীশ রাজস্ব বিভাগের ন্যায় শাসন ও বিচার বিভাগেও বহু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। প্রতি জেলায় এক জন জজ্ ও তাঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে একজন রেজিষ্ট্রার ও কয়েক জন মুন্সেফ ও তাঁহাদের সকলের বিচারিত মকর্দ্দমা আপিল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুরসিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় চারিটী প্রভিনসিয়াল কোর্ট স্থাপন করেন এবং দেশের শান্তি রক্ষার জন্য কয়েক ক্রোশ অন্তর এক একটী থানা স্থাপন করিয়া প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া দারোগা নিযুক্ত করিয়া যান। যদিও নদীয়া বিভাগেই সর্ব্ব প্রথমে এই সকল বৃটীশ নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এতাবৎ এ সকল রাজ-ব্যবস্থা জন সাধারণের বিশেষ অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং কি ফৌজদারী কি দেওয়ানী, কি সামাজিক সকল বিষয়ের মীমাংসাই নবদ্বীপাধিপতি অথবা জমিদারবর্গ কিম্বা গ্রামস্থ প্রধানগণ কর্ত্তৃক সমাহিত

No. 8217 U. P. B. Mss. Records.

Collector transmit the same, August 9th.

No. 8305. Hunter's B. Mss. Records.

পত্রিকা প্রণয়নে কালেক্টরের প্রতি উপদেশ ও কালেক্টরের কর্ত্তৃক পত্রিকা প্রেরণ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কাল অতি সংক্ষেপ, সে কারণে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, এইরূপ পত্রিকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ও প্রচলিত ছিল, কালেক্টর কেবল তাহা প্রেরণ করিয়াছিলেন মাত্র।

* No. 8385 Bengal Mss. Records.

হইতেছিল। § অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১২২০—২৫ সাল) নদীয়ায় "দশ ঠাকুরী" প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যায়। গ্রামস্থ দশজন নিরপেক্ষ প্রধান ব্যক্তি এক যোগে সর্ব্ববিধ মকদ্দমাই নিষ্পত্তি করিতেন। সুতরাং এখনকার ন্যায় বিচার-কার্য্য তখন এত ব্যয়-সাপেক্ষ ছিল না। কিন্তু ইংরাজী ভাব দেশে তখন শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ করিতেছিল এবং যাহা কিছু প্রতীচ্য, তাহাই আদরের সহিত গৃহীত ও যাহা প্রাচ্য তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং এ সকল সনাতন প্রথা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই সময়ে নদীয়া-সিংহাসনে রাজা গিরীশচন্দ্র অধিষ্ঠিত। ইঁহার জীবদ্দশায় নদীয়া রাজ্য, যাহা কৃষ্ণচন্দ্রর সময়ে সুবিস্তীর্ণ চৌরাশী পরগণায় বিস্তৃত ছিল, তাহা মাত্র ৫। ৭ খানি পরগণা ও কয়েকখানি নিষ্কর গ্রামে দাঁড়াইয়াছিল। ইঁহারই সময়ে নদীয়া-রাজের সর্ব্বপ্রধান সুবিস্তীর্ণ ও সুবিখ্যাত "উখুড়া" পরগণা নিলাম হইয়া যায় এবং পরে ১৮০৬ অব্দে ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার সমস্ত জমিদারী বাকী খাজনার দায়ে নিলামে উঠিয়াছিল। ‡

এই সময়ে কোম্পানীর সুবিখ্যাত শান্তিপুরের কাপড়ের আড়ং এর শ্রী পূর্ব্বের ন্যায় না থাকিলেও বহু পরিমাণে বজায় ছিল। † তখনও বিলাতি

---

§ At the commencement of the period dealt with (1782—1807) the military and Political ascendency of the East India Company had been firmly established in Bengal. The Company was the undisputed central Governing power but it had not yet been able to construct an orderly or efficient administration for the districts which had passed under its rule. * * * Each land-holder held his own Civil Court and kept up a private defencive Police.

Introduction, Bengal Mss. Records page 14—15.

‡ Vide Letter No. 13440 Hunter's Bengal Mss. Records.

† এই শান্তিপুরের আড়ং হইতে বাৎসরিক ১৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মসলিন কোম্পানির কমারসিয়াল এজেণ্ট কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হইত।

Vide Imp. Gazetteer of India Vol. X.

কাপড়ের আমদানী আরম্ভ হয় নাই ; তবে এ বিষয় তখন ইংলণ্ডীয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং কিসে ভারতের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল। তখন শান্তিপুরে কোম্পানীর একজন কমারসিয়াল রেসিডেণ্ট বাস করিতেন। ১৮০৬ অব্দে কমারসিয়াল এজেণ্ট শান্তিপুরে দেশী মদ প্রস্তুত করিয়া রপ্তানীর জন্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এক সুবৃহৎ মদের ভাঁটী স্থাপন করেন। *

১৮০৭ অব্দে লর্ড মিণ্টো বাহাদুর গবর্ণর জেনারল হইয়া এদেশে আগমন করেন। তিনি নদীয়ায় সংস্কৃত-চর্চ্চার সমূহ অবনতি দেখিয়া গভীর চিন্তাপূর্ণ এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং সংস্কৃত-চর্চ্চার দুরবস্থাদির কারণ নির্ণয় করিয়া পরিশেষে বাণীর প্রিয়-নিকেতন নবদ্বীপে ও ত্রিহুটের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে দুইটী সংস্কৃত কলেজ ও তৎসংলগ্ন পাঠাগারাদি স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন এবং তদনুসারে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময় কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভ্যগণ ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিত-গণের উৎসাহদান-কল্পে অন্যূন এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক ব্যয় করিতে আদেশ দেন। † এই টাকায় নদীয়ায় কোন সংস্কৃত কলেজাদি স্থাপিত হয় নাই বটে, কিন্তু ১৮২৩ সালের ১৭ জুলাই "কমিটী-অব পাবলিক ইন-

---

* Vide Letter from Secretary to Government authorizing an assignment in favour of the commercial resident at Santipur for providing Rum. August 19th. 1806.

No. 13414 Hunter's Bengal Mss. Records

† That a sum of not less than a lac of rupees in each year shall be set apart, and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of the Sciences among the British Territories of India.

ট্রাষ্টশন" নামে একটী সভা গঠিত হয়। ঐ সভা উক্ত অর্থ প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ও পণ্ডিতদিগের বৃত্তি আদিতে ব্যয় করিতে থাকেন

মুসলমানদিগের হস্ত হইতে দেশ সর্ব্বতোভাবে ইংরাজদিগের হস্তে আসিয়া নিরুপদ্রব হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু নদীয়ার ভাগ্যে বহু দিন ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখ বিধাতা লেখেন নাই। এই সময়ে— এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নদীয়ার রাজনৈতিক গগনে একটী অশুভকর জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়; সেটী তিতুমীর নামে খ্যাত জনৈক ধর্ম্মোন্মত্ত বলদৃপ্ত মুসলমান। কিছু দিন তিতুর দৌরাত্ম্যে নদীয়ার শান্তি বিদূরিত হইয়াছিল। বলদৃপ্ত তিতু তাহার মূর্খ অনুচরগণের সাহায্যে কেবল যে নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণার জমিদারগণ ও নিঃসহায় প্রজা-কুলের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা নহে; সে তাহার প্রায় নিরস্ত্র, নিরক্ষর সঙ্গীগণের সাহসের ও আপনার অদ্ভুত শক্তির উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরাক্রান্ত বৃটীশ-রাজের বিপক্ষেও দণ্ডায়মান হইতে পশ্চাদ্-পদ হয় নাই। ¶ তিতু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের গোবরডাঙ্গা ষ্টেসান হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে হায়দারপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান তখন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। এই হায়দারপুর গ্রাম খানি জেলা নদীয়া ও ২৪ পরগণার সন্ধি-স্থলে ইচ্ছামতী নদী, যাহা নদীয়া ও ২৪ পরগণার সীমা নির্দ্দেশ, করিতেছে তাহারই দক্ষিণ কূলে কিয়দ্দূরে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ইহা জেলা ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া নামক থানার অন্তর্গত। শিশু-কাল হইতেই তিতুর মুসলমান ধর্ম্মের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত

¶ Fortytwo years ago the case was very different and the fanatic leader Titu-Miyan found in Nadiya a sufficient body of disaffected Faraizi husbandmen, as to lead him to set up the Standard of revolt, for a short time to defy the British Government.

Hunter's Statistical Account Vol. II page 51

হইত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই ধর্ম্মভাব ধর্ম্মোন্মাদে দাঁড়াইয়াছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিতু মক্কা যাত্রা করে। তথায় ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়। মতান্তরে করাজী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ফরিদপুরের অন্তর্গত দৌলতপুর নিবাসী হাজি সরিতুল্যার ধর্ম্ম-মত গ্রহণ পূর্ব্বক তিতু দেশে প্রত্যাগমন করে এবং স্বদেশীয় হীন জাতি মুসলমানগণের ভ্রষ্টাচার ও স্থানে স্থানে হিন্দুবৎ আচার করিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে নবমত প্রচার করিতে আরম্ভ করে। তিতুর নূতন মত সর্ব্বতোভাবে কোরাণের সহিত ঐক্য না হওয়ায়, কোন সম্রান্ত মুসলমান তাঁহার ধর্ম্ম মতাবলম্বী হয়েন নাই। কেবল কতকগুলি মুসলমান জোলা প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় লোক তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির বাস নদীয়া জেলায়। তিতু ইহাদের স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ লইতে, আনন্দোৎসবে বাজোদ্যম করিতে, ও কাছা দিয়া কাপড় পরিতে নিষেধ করিল এবং সকলকেই দাড়ী রাখিতে অনুমতি করিল। মক্কা হইতে আসিবার কালীন একজন ফকীর তিতুর সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিল। সে এই সময়ে নানারূপ বুজরুগ দেখাইয়া তিতুর মূর্খ শিষ্যগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিতুর দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং এই অজ্ঞ, ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ হিন্দুগণের প্রতি, এবং যে সকল মুসলমান তাহাদের মতাবলম্বন করে নাই, তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। বিশেষতঃ এই সময়ে তিতুর দল পুষ্ট হওয়ায় তাহার এখন দল বজায় রাখিতে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু আয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা না থাকায় সে দুই এক সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাটী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল।

তিতুর এই সকল অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া পুঁড়া গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার জমিদারীর মধ্যে তিতুর দলের প্রতাপ হ্রাস করিবার মানসে উক্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের দাড়ীর প্রতি ১৷॰ পাঁচ সিকা কর ধার্য্য করিলেন। জমিদারের এইরূপ অনধিকার চর্চ্চায় তিতু যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইল; তখন তাহার দলে সহস্রাধিক লোক যোগ দিয়াছিল সুতরাং এই অপমান নীরবে সহ্য না করিয়া পুঁড়া আক্রমণপূর্ব্বক

উক্ত রায় মহাশয়কে লাঞ্ছিত করিয়া মুসলমান করিবার মানসে তিতু সদলে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক দিন যাত্রা করিল। পথে খাসপুরে যে সম্ভ্রান্ত মুসলমান রায় মহাশয়কে তিতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বাটী লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাঁহার কুমারী কন্যার ধর্ম্ম নাশ করিয়া তিতু পর দিন প্রভাতে ইচ্ছামতী উত্তীর্ণ হইয়া পুঁড়া আক্রমণ করিল। সে দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উপলক্ষে সেখানে বারোইয়ারি পূজা হইতেছিল ও তদুপলক্ষে প্রাতেই যাত্রা বসিয়াছিল। সদলবলে তিতুমীর পুঁড়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া বারোইয়ারি-তলা জনশূন্য হইয়া পড়িল। পুরোহিত তখন পূজায় বসিয়াছিলেন, সুতরাং পূজা ছাড়িয়া উঠিতে না পারিয়া তিনিই কেবল বারোইয়ারী মণ্ডপে উপস্থিত রহিলেন। এদিকে তিতু আসিয়া প্রথমে বারোইয়ারি তলায় একটী গোহত্যা করিল। পূজারত ধর্ম্মপ্রাণ পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় এই নিদারুণ ব্যাপার ও বীভৎস দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া মায়ের সম্মুখস্থিত দীর্ঘ কৃপাণ গ্রহণ করিয়া সেই নিষ্ঠুর ঘাতকগণের মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তখনই অগণিত পাষণ্ড কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নিজেও হত হইলেন। এদিকে জমিদারের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে লাঠী লইয়া বাহির হইলে তিতু. গতিক মন্দ দেখিয়া, সে যাত্রা পলায়ন করিল।

বারাসাতে তৎকালে জেলা ছিল ও একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে থাকিতেন। বসিরহাটে তখন মহকুমা বা বাদুড়িয়াতে থানা হয় নাই। এক কদম্বগাছিতেই থানা ছিল। বারাসাতের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ব্যাপার অবগত হইয়া বহুসংখ্যক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ও চৌকিদার লইয়া কদম্বগাছির ব্রাহ্মণ দারোগাকে তিতুকে গ্রেপ্তার করিতে পাঠান। কিন্তু তিনি কয়েক জন অনুচরসহ তিতুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তিতু এই দারোগা-জয়-ব্যাপারে সাতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়া আপনাকে অসীম বলশালী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল এবং বৃটিশ-শাসন উপেক্ষা করিয়া আপনাকে ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিল এবং টাকীর ও গোবরডাঙ্গার জমিদারগণের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইল। গোবরডাঙ্গায় এ সময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় জমিদার ছিলেন। তাঁহার

প্রতাপে তখন বাঘে বখরিতে এক ঘাটে জল খাইত। অন্যূন দুই শত লাঠিয়াল, তিন চারি শত পাইক ও নগদী ও কয়েকটা হস্তী তাঁহার সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তখনও দেশে চোর ডাকাতের ভয় সম্পূর্ণ দূরীভূত না হওয়ায়, সকল জমিদার ও ধনবান ব্যক্তিরই কিছু কিছু লোকজনের ছলতানা রাখিতে হইত। এই সময়ে তিতুর দৌরাত্ম্য কালীপ্রসন্ন বাবু দুই শত বেতন-ভোগী হাব্সী আনিয়া গোবরডাঙ্গার রাখায় তাঁহার নিকট কর গ্রহণ করিতে আসিতে বা কর না দিলে তাঁহার মস্তক লইতে আসিতে তিতুর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। যাহা হউক এ সময় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল তাহার দৌরাত্ম্যে একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

তিতু তাহার বাসের নিমিত্ত ও সঙ্গীগণের আশ্রয়ের জন্য নারিকেল বেড়িয়া নামক স্থানে একটী সুবৃহৎ আম্র-কাননের চতুর্দ্দিকে গড় কাটিয়া, বাঁশ পুঁতিয়া, কেহ কেহ বলেন মৃত্তিকাভ্যন্তরে তাহার কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এখনও কোন বিষয়ে ক্ষণ-ভঙ্গুরতা প্রকাশ করিতে হইলে লোকে "তিতুমিরের কেল্লা" উল্লেখ করিয়া থাকে। এই বংশ ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষণভঙ্গুর কেল্লায় বসিয়া ভারতের স্ব মনোনীত নব বাদসাহ কবে কোন্ গ্রাম ধ্বংস করিবেন, কাহার অর্থ লুণ্ঠন করিবেন এবং কখন্ কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যে ধর্ম্মপ্রাণতায় উত্তেজিত হইয়া তিতু প্রথমে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছিল, দুরাশার ছলনায়, অর্থের অবিতৃপ্ত পিপাসায় এক্ষণে তাহা পৈশাচিক ভাব ধারণ করিয়াছিল; তাই নিত্য নূতন অত্যাচার করিয়াও তিতুর তৃপ্তি হইতেছিল না।

মোল্লাহাটির কুঠীর ম্যানেজার ডেভিস সাহেব দুই শত লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা লইয়া তিতুকে আক্রমণ করেন; কিন্তু তিতু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কোনরূপে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সাহেবের সঙ্গীগণ কেহ কেহ ইচ্ছামতী তীরস্থ গোবরা গোবিন্দপুরে যাইয়া আশ্রয় লইলে, তাহাদের রক্ষা করিতে যাইয়া উক্ত স্থানের জমিদার রায় মহাশয়গণের সহিত তিতুর বিবাদ হয়।

বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দিন দিন তিতুর এই অপ্রতিহত প্রতাপ

বৰ্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন ; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মুষ্টিমেয় জনকতক উন্মত্ত মুসলমানের শাসনের জন্য প্রথমে সৈন্য না পাঠাইয়া বারাসাতের নাজিরের অধীনে কয়েক শত চৌকিদার, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল এবং কয়েকজন অনিয়মিত সৈন্য ও চারিজন গোরা অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহারাও যখন এই বলদৃপ্ত মুসলমানদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইল ও একটী ইংরাজ অশ্বারোহী ও কয়েকজন সিপাহী নিহত হইল, তখন গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দমনের নিমিত্ত ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টান্যাণ্ট ষ্টুয়ার্টের অধীনে একদল ইংরাজ সৈন্য, একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় কামান প্রেরণ করিলেন। লেফ্‌টান্যাণ্ট ষ্টুয়ার্ট তাঁহার দলবল লইয়া ১৯ নবেম্বর রাত্রি থাকিতে আসিয়া তিতুর কেল্লা ঘিরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিতু ও তাহার সঙ্গীগণ তখনও পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ভীত না হইয়া এই সুশিক্ষিত সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। তিতু তাহার ধর্ম্মোন্মত্ত সৈন্যগণকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিল যে, ধর্ম্মবলে সে ইংরাজের গোলাগুলী গিলিয়া ফেলিবে। লেফ্‌টান্যাণ্ট ষ্টুয়ার্ট এই বংশ-কেল্লাবাসী বীরগণকে ভয় দেখাইবার জন্য প্রথমে কতকগুলি ফাঁকা আওয়াজ করিতে আদেশ দিলেন ; কিন্তু মূর্খ মুসলমানগণ ইহাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইল না দেখিয়া "হজরত গুলি খা ডালা" বলিয়া কেল্লা হইতে বাহির হইয়া সবেগে ইংরাজ-সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। তখন বাধ্য হইয়া সেনাপতি গোলাগুলী ছাড়িতে আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল। তিতুমীর ও তাহার বহু শিষ্য কেল্লার মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল এবং তাহার ভাগিনেয় নসিরদ্দি তিন শত মুসলমানের সহিত বন্দী হইল। অবশিষ্ট যে যেমন পারিল, পলায়ন করিল। বারাসতে এই সকল বন্দীর বিচার হইয়া নসিরদ্দি ও অপর দেড় শত লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এইরূপে তিতুর দল বিধ্বস্ত হইলে দারুণ ভয়ে তাহার শিষ্য সেবকগণ দাড়ী ফেলিয়া হিন্দু সাজিতে আরম্ভ করিল। কথিত আছে তখন পরামাণিকগণ প্রতি দাড়ী ফেলিতে ১৷৹ পাঁচ সিকা হিসাবে মজুরি লইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তখন অনেক ব্যঙ্গ-কবিতা রচিত হইয়াছিল।

জোলানী উঠিয়া বলে উঠ্‌রে জোলা ঝাট।
হাজাম বাড়ী গিয়া ঝাট মোচ দাড়ী কাট॥
কোথায় হাজাম, কোথায় মোকাম কোথায় কার বাট্‌।
দাড়ী কেচ্চে দিয়ে কাট, দাড়ী কেচ্চে দিয়ে কাট॥
তিতুমীরের গলা ধরি মসরদ্দি কয়।
তোমার বুদ্ধিতে মামু ঠেকলাম এবার দায়॥
এসেছে রাঙ্গা গোরা, উর্দ্দি পরা ব্যাঙের টোপর মাথায়।
এরা ছাড়ছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরত গুলি মানলেনা।
সারলে ইংরাজে মামু! এবার আর জানে রাখলে না॥

এইরূপে তিতুর বিদ্রোহ দমন হইলে নদীয়ায় আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। ১৮৪১ অব্দে রাজা গিরীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইলে তাঁহার দত্তক পুত্র শ্রীশচন্দ্র জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট বিষয়ের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ইনি উদ্যোগী হইয়া নদীয়া জেলার অনেক ভদ্রলোককে সমবেত করিয়া নিজ প্রাসাদে এক সাধারণ হিতকরী সভা স্থাপন করেন। এই সভার উদ্যোগে নদীয়াবাসীগণের একটী মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তির নিষ্কর ভূমি গবর্ণমেণ্ট সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, এই সভা ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারা আবেদন করাইয়া গবর্ণমেণ্টকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

১৮৪৪ অব্দে সার হেনরি হার্ডিঞ্জ সাহেব গবর্ণর জেনারল মনোনীত হয়েন। ইনি সাতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং এদেশে হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয় নামে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে এক শত একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছিলেন। ইঁহারি রাজত্ব কালে ১৮৪৬ অব্দের ১লা জানুয়ারি মহাসমারোহে কৃষ্ণনগর কলেজ খোলা হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েন। এই সময় হইতে নদীয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে দেশময় "বিধবা বিবাহের" এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ে অগ্রণীরূপে দণ্ডায়মান হন। বিধবা-বিবাহের আন্দোলন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইলেও এই সময়ে ইহা দেশ মধ্যে

বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয় বিশেষতঃ এ বিষয় আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে রক্ষণশীল হিন্দুমাত্রেই মহা আপত্তি উত্থাপন করেন; এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে নদীয়া জেলায় "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি বহু কবিতা প্রকাশিত হয় * এবং শান্তিপুরের তাঁতিগণ কাপড়ের পাড়ে ঐ সকল গীত লিপিবদ্ধ করে। হিন্দু মাত্রেই তখন এ বিষয়ে কর্ত্তব্যাবধারণের নিমিত্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী হয়েন। কথিত আছে বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবার পুন সংস্কার শাস্ত্র সম্মত কিনা এ বিষয়ে বিচারার্থী হইয়া নবদ্বীপে আসিলে তত্রস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং পাকার্থ তণ্ডুল ও অন্যান্য দ্রব্য সজ্জিত করিয়া রন্ধনের নিমিত্ত গঙ্গাতীর হইতে এক উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্র আনিয়া প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঙ্গিতে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমতের আভাব পাইয়া সে যাত্রা বিনা বিচারেই প্রত্যাগমন করেন। যাহা হউক পরে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়। †

---

* "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হ'য়ে।
সদরে করেছ রিপোর্ট বিধবা রমণীর বিয়ে।
কবে হবে হেন দিন, প্রকাশ হবে এ আইন,
জেলায় জেলায় থানায় থানায় বেরবে হুকুম
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।
কে যাবে এদের সনে বরণ ডালা মাথায় হ'য়ে।
কবিবর হেসে কয়, ঘুচিল নারীর ভয়
সকলের হাতের খাড়ু হইল অক্ষয়।
সবে বল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়।
দেখে শুনে মদন রাজা পলাইল ভয়ে।"

এই গানের ব্যঙ্গ পাল্টা গানও হইয়াছিল;
"শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চির রোগী হয়ে।"

† The first clause of the Act was—"No marriage contracted between Hindus shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person who was dead at the time of such marriage, any custom and any interpretation of Hindu law to the contrary not withstanding."

১৮৪৮ অব্দে লর্ড ডালহৌসী গবর্ণর জেনারল হয়েন। তাঁহার শাসন-কালে কলিকাতায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের সূত্রপাৎ ও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গ্রাণ্ট-ইন এড্-সিষ্টেম্ প্রবর্ত্তিত হয় এবং নদীয়ার কলেজ ও দুই একটী স্কুলে উক্ত সাহায্য প্রদত্ত হয়। তাঁহার যত্নে এ দেশের যে সকল উন্নতি বিধান হইয়াছিল তাহার মধ্যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট এবং পূর্ত্ত বিভাগ সর্ব্ব প্রধান।

১৮৫৩ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী পর্লিয়ামেণ্ট হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হন তাহাতে বাঙ্গালার লেফ্টেন্সাণ্ট গবর্ণর নামে একজন স্বতন্ত্র শাসন কর্ত্তা নিয়োগের আদেশ থাকে এবং এতদ্দেশবাসীগণ বিলাত যাইয়া সিভিল সার্ব্বিস দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে সার্ ফ্রেডরিক হ্যালিডে বাহাদুর বাঙ্গালার প্রথম লেফ্টেন্সাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হয়েন * ইনি বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হইয়াই প্রজাকুলের অবস্থা পরিদর্শন মানসে ষ্টীমার আরোহণ করিয়া জলপথে তাঁহার এলেকাধীন প্রধান প্রধান স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং তদনুসারে মাথাভাঙ্গা নদী বাহিয়া নদীয়া জেলা পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। এ বৎসর নদীয়ায় দারুণ প্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল; † এবং সে কারণে প্রজা সাধারণের

* The extent of the provinces included within the Lientanant Governorship of Bengal was stated in the first Adminstration Report of the year 1855—56. The provinces were divided into seven portions, namely :—

Bihar, having an area of about	...	42.000 sq. miles
Bengal, ...	...	85.000 ... „
Orissa, ...	...	7000 ... „
Orissa Tributary mahals	...	15 5000 ... „
Chota Nagpur and the tributary-States on the S. W. Fronter	...	62,000 ... „
Assam ...	...	27,000 ... „
Arracan ...	...	14,000 ... „

Total arrea—2,53,000 sq. miles.

† Sir F. Haliday, subsequently proceeded to Calcutta by the unusual route of the Matabhanga, to observe the

বৎসরোনাত্তি কষ্ট হইয়াছিল। ডাকাডহর এক হইয়া যাওয়ায় বহু গবাদি গৃহপালিত পশু ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

এইকালে (১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে) হিন্দুগণের চড়কপূজা উপলক্ষে বাণফোঁড়া, জিবফোঁড়া, কাঁচি, ছুরী, ক্ষুর প্রভৃতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের উপর উচ্চ হইতে পতিত হওয়া প্রভৃতি নির্ম্মম অনুষ্ঠানের প্রতি কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন, কিন্তু তদানীন্তন উন্নতমনা বঙ্গেশ্বর হ্যালিডে বাহাদুর ইহা জন সাধারণ স্বইচ্ছায় করে বলিয়া আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত করিতে অস্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ বিশেষ মিসিনারী এবং গ্রাম্য পণ্ডিতগণের প্রতি সাধারণকে বুঝাইয়া এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পরামর্শ দেন। যাহা হউক এ বিষয়ে পুনরায় বঙ্গেশ্বর গ্রাণ্ট বাহাদুরের শাসনকালে আন্দোলন হয় এবং বঙ্গেশ্বর জমীদারগণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে জনসাধারণকে বুঝাইয়া কচিৎ পুলিশের সাহায্যে ইহা দমন করিতে প্রয়াস পান এবং তিনি এইরূপে কৃতকার্য্যও হন।

এই সময়েই নদীয়ায় তামাকের চাষ বিশেষভাবে জাঁকিয়া উঠে. এমন কি সুদূর বিদেশেও উহা জাহাজযোগে প্রেরিত হইতে থাকে। কথিত আছে এই নদীয়া জেলাতেই দিল্লীশ্বর সাহান সা আকবরের সময় ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক তামাকের আবাদ আরম্ভ হয়। * অদ্যাপি নদীয়ায় সর্ব্বত্র বিশেষ নদীয়া জেলায়

---

state of Nadia district. It was evidently a year of high floods, as the whole country was one sheet of water, so that it was difficult to distinguish even the course of river; and the villages, except those on the higher lands were nearly submerged.

Vide Buckland's Bengal Under Lieutenant Governors. Page 32.

*"Nuddea was one of the places at which the tobacoo plant was First introduced into India by Europeans during the reign of Acbar, and it is still extensively cultivated in this part of the country.

Vide "Travels in India a Hundred years ago" by Thomas Twining, P P 94.

রাণাঘাট মহকুমার অধীনস্থ চাকাদহ, মদনপুর, হরিণঘাটা, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি স্থানে হিংলী তামাকের চাষ বিশেষভাবে হইয়া থাকে।

১৮৫৬ অব্দে লর্ড কানিংবাহাদুর গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ১৮৫৭ অব্দে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক এক শত বৎসর পরে ভয়ানক সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহ বৃটীশ রাজত্বের মূল পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল কিন্তু সুকৌশলী সহৃদয় দয়াল ক্যানিংয়ের সদাশয়তায় শীঘ্রই বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই দুর্দ্দিনে নদীয়া যদিও প্রত্যক্ষভাবে কোন রূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই, তথাপি স্বাভাবিক উদ্বেগ আবেগ ও ভীতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। নদীয়া বলিলে সে সময়ে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগকে বুঝাইত। বারাকপুর, বহরমপুর ছাউনির সিপাহীদের কেহ কেহ বিদ্রোহী হইলে তাহাদের দমনের জন্ম সৈন্যাদি প্রেরণ করায়, শান্তিপ্রিয় অধিবাসীগণের মনে স্বতঃই একটা অশান্তি ও আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। এতাবৎ বাঙ্গালা ও অন্যান্য বৃটিশাধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন ছিল। বিদ্রোহ শান্তির পর ১৮৫৮ অব্দের ১লা নভেম্বর এলাহাবাদের দরবারে লর্ড ক্যানিং বাহাদুর এই মর্ম্মে দয়াময়ী ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে কোম্পানীর হস্ত হইতে এদেশের শাসনভার মহারাণী স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন ;* তিনি প্রজাসাধারণের জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুমোদিত বিচার দ্বারা তাঁহাদের স্বত্ব রক্ষা করিবেন এবং উপযুক্ত দেখিলেই রাজ্যের সর্ব্ববিধ উচ্চপদে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। গবর্ণর জেনারলগণ অতঃপর রাজপ্রতিনিধী "ভাইসরয়" নামে অভিহিত হইলেন। *

এই ১৮৫৮ অব্দে এক দিকে সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হইলে যেমন দেশে

* "Her Majesty the Queen, having declared that it is her gracious pleasure to take upon herself the Government of the British Terretories in India, the Viceroy and Governor General hereby notifies that from this day all acts of the Government of India will be done in the name of the Queen alone.

শান্তি পুনস্থাপিত হইতেছিল * তেমনি আবার নদীয়া, যশোহর, পাবনা প্রভৃতি নীল-প্রধান জেলাতে দেশীয় ও বিদেশীয় বহু নীলকরের সহিত চাষী রায়ত গণের বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছিল। একদিকে রায়তগণ যেমন কোন কোন নীলকরের অত্যাচারকাহিনী গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেছিলেন, তেমনি অপরদিকে নীলকরগণও স্থানবিশেষের রায়তগণের দাদন লইয়া কার্য্য না করা প্রভৃতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিতেছিলেন।

From this day all men of every race and class who under the administration of the Honble. East India Company have joined to uphold the Honor and Power of England will be the servants of the Queen alone.

The Governor-general summons thus one and all, each in his degree and according to opportunity and with his whole heart and strength to aid in fulfilling the gracious will and pleasure of the Queen as set forth in her royal proclaimnation from the many millions of her Majesty's native subjects in India, the governor general will now and at all times exact a loyal obedience to call which in words, ful of benevo- lance and mercy their severing has made upon their allegiance and faithfulness."

* দেশ তখনও সর্ব্বতোভাবে শাসিত হয় নাই সুতরাং দেশের শান্তি তখন প্রায়ই চোর ডাকাতের উপদ্রবে অব্যাহত থাকিত না। সুবিধা পাইলেই দেশের নিম্ন শ্রেণীস্থ বলিষ্ঠ দুই দশজনে একত্র হইয়া দল বাধিত ও দেশের সর্ব্বনাশসাধন করিয়া বেড়াইত। এইরূপ চোর ও ডাকাত সব গ্রামেই দু চারিজন দেখা যাইত, এমন কি, চোর তাড়াইতে জমীদারগণ কেহ কেহ ডাকাত পুষিতেন। এই সময়ে যাহাদের উপদ্রবে নদীয়াবাসীগণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত ছিল তাহাদের মধ্যে মনোহর দাস সর্ব্বপ্রধান ছিল। মনোহর জাতিতে গোয়ালা, নবদ্বীপের পশ্চিমদিকে একডালা পরাণপুরে তাহার বাসস্থান ছিল। মনোহর দস্যুপযোগী বহুগুণেই শোভিত ছিল। লাঠিখেলা, সিন্ধুচুরী, ডাকাতি রাহাজানি, নৌকামারা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহার শারিরীক শক্তি সম্বন্ধে বলেন যে "সে চিত হইয়া শুইয়া থাকিত এবং তাহার গলার উপরে একখণ্ড বাঁশ দিয়া বাঁশের দুই প্রান্তে দুইজন বলিষ্ঠ মনুষ্য চাপিয়া

১৮৫৯ অব্দে সদাশয় সারজন পীটার গ্র্যাণ্ট মহাশয় বঙ্গেশ্বররূপে এদেশের শাসনভার হস্তে লয়েন। এ সময়ে নদীয়া ও যশোহর জেলায় বহু প্রজা ও জমিদারবর্গের সহিত অনেক অত্যাচারী নীলকরের প্রকাশ্যভাবে বিবাদ বাধিয়া উঠে এবং লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় যে আর নীলের দাদন লইবে না বা নীলের চাষ করিবে না; সুতরাং ঐ বিষয়ে তখন মহামান্য গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হইয়া উঠে।

থাকিলেও মনোহর মৃত্তিকার উপরে হস্ত পদের ভর করিয়া বাঁশ সমেত সেই দুই জনকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিত" নয়না, মানিকা প্রভৃতি তাহার সময়ের নদীয়ার অন্যতম দস্যু নায়ক। সমগ্র নদীয়া জেলা এই দলপতিত্রয়ের কার্য্যক্ষেত্র ছিল। ইহারা তখন এতদূর অকুতোভয় হইয়া উঠিয়াছিল যে অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক ইহারা কয়েকবার কৃষ্ণনগরের সাহেবদিগের মেস কোর্টের ও জজ ব্রাউন সাহেবের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বোঝাই নৌকা লুট করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। মনোহর অন্যত্র যাহাই করুক নিজ গ্রামে কখন সে চুরী বা ডাকাতি করে নাই। মনোহর তাহার জীবনে যে কত ভীষণ ডাকাতি কার্য্য সমাধা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, যাহা হউক পরিশেষে সে শান্তিপুরের (বর্ত্তমান রাণাঘাট)সবডিভিসনের ডেপুটী বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এবং কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট মণ্টেশ্বর সাহেব বাহাদুরের যত্নে ও নদীয়ার কর্ম্মদক্ষ দারোগা বাবু গিরীশচন্দ্র বসুর চেষ্টা ও অসমসাহসিকতায় এবং তাহার নিজ মাতুলের বিশ্বাসঘাতকতায় ধৃত হইয়া তাহার আজন্ম-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে। সঙ্গে সঙ্গে মনোহরের সঙ্গীদেরও রাজদণ্ড হয়। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বস্থলীর গোপাল পোদ্দার বিশেষ প্রসিদ্ধ, সে মনোহরের "খাজিনার" অর্থাৎ মাল সামালদার ছিল। জজ ব্রাউনের বিচারে মনোহরের চিরনির্ব্বাসন দণ্ড হয় তদানীন্তন রীত্যানুসারে এই আদেশ সদর নিজামত হইতে কায়েম হইয়া আসিলে মনোহর আলিপুর জেলে প্রেরিত হয় তথা হইতে কয়েকমাস পরে ৫০।৬০ জন পঞ্জাবী ও পশ্চিমে দায়মালী আসামীর সহিত নির্ব্বাসনের জন্য ব্রহ্মদেশে থায়েটমিউ নগরে ক্লারিসা নামক জাহাজে চালান হয়। সমুদ্র মধ্যে মনোহর তাহার সঙ্গী কয়েদীদের সহিত এক যোগে মহাবিপ্লব বাধাইয়া জাহাজের কাপ্তেন ও অন্যান্য সাহেবকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া বধ করে। কেবল জাহাজ চালাইবার জন্য কয়েকজন দেশী খালাশীর প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাদের দ্বারায় ভিন্ন রাজার এলেকায় জাহাজ চালাইয়া পালাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ একখানা রণতরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই মানোয়ারের



রাজরাজেশ্বরী করুণাময়ী ভিক্টোরিয়া।

এই সময়ের অবস্থা এতই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে তদানীন্তন উদার-হৃদয় রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাদুর তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"বর্ত্তমান নীলকর ব্যাপারে প্রায় সপ্তাহব্যাপী আমার এতই উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে বুঝি দিল্লীর ব্যাপারেও তত হয় নাই। আমি ক্রমাগত ভাবিয়াছি কোন এক নির্ব্বোধ নীলকর যদি ভয় বা ক্রোধ পরবশ হইয়া একটিমাত্র প্রজাকেও গুলি করে তবে সেই মুহূর্ত্তেই নিম্ন বঙ্গের সকল কুঠীগুলিই প্রজ্ব লিত হইয়া উঠিবে।"*

দেশের যখন এইরূপ ভয়ানক অবস্থা তখন মহাশয় গবর্ণর গ্র্যান্ট মহোদয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কিসে অশান্তি ও বিপ্লবের হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভবানীপুর বাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান হরিশ্চন্দ্র প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইয়া "পেট্রিয়টে" লেখনী ধারণ করিলেন এবং প্রতিদিন স্বয়ং সহস্র সহস্র প্রজাকুলকে প্রজাপালক গবর্ণমেণ্টের নিকট বিচার প্রার্থী হইবার জন্য সৎপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন। † চতুর্দ্দিক হইতে নীলকরগণের মধ্যে যাঁহারা

কাপ্তেন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া অকায়েব বন্দরে লইয়া যান এবং তথায় বিচার হইয়া তাহাদের ফাঁসী হয়।

* "I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi, and from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames."

Lord Canning,

Buckland's Bengol Under Lt. Govers. page 192.

† নদীয়ার প্রজাকুল হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিত। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণনগরে নীল কমিসানের সমক্ষে সাক্ষী দিবার কালে তদানীন্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ, জে, হারসেল সাহেব ১৮৬০ সালে ৯ই জুলাই এইরূপ বলিয়াছেন :—

Commission—"Are you in a position to state, who in Calcutta or else where have furnished the rayats with advice?"

Mr. Harsehel—" * * * I have heard that they used to go to the Editor of the Hindu Patriot; and the rayats,

অত্যাচারী তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল কিন্তু ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে অকালে হরিশের মৃত্যু হইল। * যাহাই হউক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ঐকান্তিক সাধনায় সুফল ধরিয়াছিল। কারণ প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় সুশাসক গবর্ণমেন্ট ইণ্ডিগো কমিসন নামে নীলকর কৃত অত্যাচারের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত এক কমিসন নিযুক্ত করেন। †

এই কমিশনের সভ্যগণ ১৮ই মে কৃষ্ণনগরেই প্রথম অধিবেশন করিয়া প্রকাশ্যভাবে নীলকর ব্যাপারের তদন্ত আরম্ভ করেন। তিন মাস ব্যাপী কমিসন সর্ব্বসমেত ১৩৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ১৫ জন গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী, ২১জন নীলকর, ৮ জন মিসিনরী, ১৩ জন জমিদার এবং ৭৭ জন রায়ত বা প্রজা। এই কমিসনে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু জয়চাঁদ

---

in the case which I reffered to before, admitted the fact. But I have no reason to suppose that the advice was improper.

* হরিশের অকাল মৃত্যুতে নদীয়ার জন সাধারণ বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য ১৮৬২ খৃঃ অব্দের ২৭ জুলাই তারিখে "নীলদর্পণ" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্রের উদ্যোগে এবং নদীয়াধিপতি মহারাজা বাহাদুর সতীশচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে কৃষ্ণনগরে এক শোক-সভা আহ্বান করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতিরক্ষা কল্পে—বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় 'হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি রক্ষা ভাণ্ডারে' প্রেরণ করেন। এইরূপে আমরা "নীলদর্পণের" অমর গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্রকে (যিনি তখন নদীয়ার পোষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে বিরাজিত ছিলেন) নীলকর পীড়িত প্রজাকুলের অকৃত্রিম হিতৈষী হরিশের পূজায় প্রধান পুরোহিত রূপে দেখিতে পাই। এই সময়ে নদীয়ায় হরিশ সম্বন্ধে যে সকল গান উঠিয়াছিল তন্মধ্যে এইটি বিশেষ প্রসিদ্ধ—

'কাঁদছে যত মনের হরিষে।
(আগে) লুটে খেত এক হরিশে,
(এখন) বাঁচালে এক হরিশে।
যুগে যুগে নীল কত জমি খীল
(এখন) হতেছে তার অঙ্গুর ফলাই সরিষে॥'

প্রথম—(হরিশ নীল কুঠীর এক অত্যাচারী কর্ম্মচারী)
দ্বিতীয়—(সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়॥

† Indigo commission ;—W. S. Seaton—Karr, Esq. C. S.

পাল চৌধুরীর সাক্ষ্য মাননীয় বক্সেশ্বর বাহাদুর বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া প্রশংসা করেন। *

এদিকে যখন কমিসন প্রজাগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন মহাশয় বঙ্গেশ্বর গ্র্যান্ট মহোদয় কার্য্যান্তর ব্যাপদেশে নদীয়া ও যশোহর মধ্যে প্রবাহিনী "কুমার" ও "কালী গঙ্গা" দিয়া ষ্টীমার আরোহণে গমন করিতেছিলেন। তিনি বলেন "তখন নদীতীরে দলে দলে প্রজাগণ সমবেত

—President. R. Temple. Esq. C. S, Member. Rev. J. Sale, to represent the interests of the rayats in the committee, and the missionaries. W. F. Furgusson Esq. nominated by the Indigo Planters' Association to represent the interest of that body and Babu Chandra Mohan Chatterjee nominated by the British Indian Association to represent the Landholders, interest.

* "Babu Joychand Pal Choudhury—a great Zemindar, who is or was a great indigo planter (having had thirty two concerns in his Estate and shares in 9 other concerns) is asked "If the rayats have for the last twenty years been unwilling to sow indigo, how then have they gone on cuiti-vating the plant up to the present time"? To this he answers "by numerous acts of oppression and violence, by locking them up in godowns, burning their houses, beating them etc" The whole of this gentleman's evidence is very instructive as proceeding from a great Zemindar and practical native indigo planter. This diluted into becoming official language, I find to be the conclusion of the commission and it is certainly the inevetable deduction from the whole body of evidence."

Minute of the Ltnt. Governor on the Report of the Indigo Commission. Para 40.

হইয়া আর নীল বুনিব না আপনি অনুমতি করুন এই কাতর প্রার্থনা উপস্থাপিত করে।" *

এইকালে স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র কর্ত্তৃক "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হইল। নীলদর্পণ প্রকাশ হইবা মাত্র দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

এই নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ ব্যাপার লইয়াই সুবিখ্যাত জেমস্ লঙ সাহেব ও মাসুয়েল সাহেবের ঐ পুস্তকের অনুবাদক ও প্রকাশক বলিয়া কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয় ইহা লইয়া সে সময়ে দেশে হুলস্থুল পড়িয়া যায়।

এইরূপে নীলদর্পণের শেষ যবনিকা পতন হইল বটে. কিন্তু এ বিষয় লইয়া বহুদিন ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের বহু কাগজ, কলম, কালী ব্যয়িত হইয়াছিল। ‡

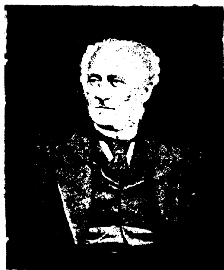
---

* "On my return a few days afterwards along the same two rivers, from dawn to dusk, as I steamed along these 2 rivers for some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with crowds of villagers, claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves ; the males who stood at and between the river-side villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants for justice ; all were most respectful and orderly, but also were plainly in earnest. It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women, and children has no deep meaning. The organisation and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration,"

Vide Sir J. P. Grants Minute of 17th Sept 1860.

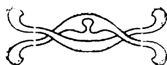
‡ Vide the different Minutes and the animated correspondence that ensued between the Government of India and Sir, J. P. Grant.





বঙ্গেশ্বর পিটার গ্র্যাণ্ট।

ডব্লু এস্, সিটন্‌কর।







রেভাঃ, জেম্‌স্ লং।

দীনবন্ধু মিত্র।

পরে বহু বাদানুবাদের পর মহামান্য সদাশয় প্রজাপালক গবর্ণমেণ্ট, যাহাতে অসহায় প্রজাগণের উপর অযথা অত্যাচার না হয় এবং তাহাদের নিজ নিজ সম্পত্তিতে নিজের স্বত্ব স্বামিত্ব সম্পূর্ণ বজায় থাকে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত ই, জ্যাকসন্ সাহেবকে নদীয়ার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। এ সময়ে সহৃদয় ডবলিউ, জে, হারসেল্ সাহেব নদীয়ার স্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। সদাশয় গ্র্যাণ্ট মহোদয় নদীয়ার কেবল অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; যাহাতে সুদূর মফঃস্বলেও অত্যাচারী নীলকর বা জমিদার অসহায় প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিতে না পারে এবং যাহাতে প্রত্যেক প্রজা সহজেই রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে সেই নিমিত্ত সমগ্র নদীয়া ডিভিসনকে—যাহা এক্ষণে প্রেসিডেন্সী ডিভিসন বলিয়া খ্যাত—কয়েকটী

মহামান্য বঙ্গেশ্বর সার জন্ পীটার গ্রাণ্ট মহোদয়ের ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের মন্তব্য (Minute) পাঠ করিলে নীল গোলোযোগের সকল কথাই জানা যায়; এই রিপোর্টে সবিস্তারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছিল:—

"The Report gave an account of the various systems of Indigo cultivation existing in Bengal and Bihar; and divided the subjects of inqniry into three heads; (1) the truth or falsehood of the charges made against the system and the planters.

(2) The charges required to be made in the system, as between manufacturer and cultivator, such as could be made by the heads of the concerns themselves.

(3) The changes required in the laws or administration, such as could only originate with, and be carried out by, the lagislative and executive authourities.

Vide Bengal under Ltnt Governors
By C. E. Buckland Esqr I, C, S CIE.

সবডিভিসনে বিভক্ত করিয়া* উহা এক এক জন ডেপুটীর অধীন করেন এবং প্রত্যেক সব ডিভিসনের হেড কোয়ার্টার, গমনাগমনের সুবিধার্থ রেল, নদী বা বৃহৎরাজবর্ত্ম সন্নিকটে স্থাপনা করেন। এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তীকালাপেক্ষা বিচারালয়ের সংখ্যা দিন দিনবৃদ্ধি পাইলেও দেশের লোকের প্রবৃত্তি অনুযায়ী প্রজাকুল অত্যাচারী

যাঁহারা নীলগোলোযোগ সম্বন্ধে সবিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাকল্যাণ্ড বাহাদুরের "বেঙ্গল আণ্ডার লেপ্টনান্ট গবর্ণরস" মিঃ, সিটনকার প্রমুখ নীল কমিসনরগণের সবিস্তারিত রিপোর্ট বঙ্গেশ্বর গ্রাণ্ট বাহাদুরের ঐ রিপোর্টের উপর মন্তব্য, ঐ ব্যাপার সংক্রান্ত মহামান্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের শত শত পত্রাদি এবং সুবিখ্যাত দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিত মোহন মিত্র প্রণীত "ইণ্ডিগো ডিসটারবেন্‌স ইন্ বেঙ্গল" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিবেন। এই নীল হাঙ্গামার কিছু কাল পরে নানা কারণে বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে দেশ হইতে নীলের আবাদ একরূপ উঠিয়াগিয়াছে, নীলকর সাহেবগণের কেহ কেহ একণে নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার, তাঁহাদের সদয় ব্যবহারে তাঁহাদের প্রজাগণ একণে সুখে আছে!

* In 1860, the Government of Bengal undertook the rearrangement of subdivisions in the districts throughout the Province, making a commencement with the Nadia (now the Presidency Division). No more important measure, with a view to bringing justice home to the doors of the people, was ever undertaken. The views of Government were contained in a resolution of the 7th November of the year. * * Subdivisions were placed (as was the case with Khulna) where perhaps some man of influence and power hapend to reside, who misused his position ; or in the centre of some distant part of an unusually extensive district ; * * On the otherhand, some of the older subdivisions had been constituted in large towns or marts, places of intrinsic and permanent importance ; and such positions were in their nature fixed.

Bengal under Ltnt Governors
pp 219—222.

জমীদারের হস্ত হইতে যেমন নিষ্কৃতি পাইতে লাগিল তেমনি জেদে পড়িয়া মকর্দ্দমা চালাইবার ঝোঁক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। *

পূর্ব্ব হইতেই নদীয়ার সবডিভিসনের ন্যায় ২। ১ টী ক্ষুদ্র বিভাগ ছিল বটে ‡ কিন্তু ১৮৬০ অব্দে মহামতি গ্রাণ্ট নদীয়া বিভাগকে রীতিমত চারিটী ডিষ্ট্রীক্ট ও ১৮টী প্রধান সবডিভিসনে বিভক্ত করেন এবং এই ১৮টী সবডিভিসনের ১৮টি মহকুমা নির্দ্দিষ্ট করেন;—১। কুষ্টিয়া, গঙ্গা ও ই, বি, এস, রেলওয়ের উপর অবস্থিত। ২। মেহেরপুর। ৩। ঝিনেদহ—নবগঙ্গার উপর। ৪। চুয়াডাঙ্গা—ই, বি, এস, রেলওয়ের উপর। ৫। কৃষ্ণনগর (সদর)। ৬। মাগুরা—নবগঙ্গার উপর। ৭। কোটচাঁদপুর—রেলওয়ে হইতে পাকা রাস্তার উপর। ৮। নড়াইল। ৯। যশোহর (সদর) ১০। বনগ্রাম—সরকারি বড় রাস্তার উপর। ১১। শান্তিপুর—(বর্ত্তমান রাণাঘাট)। ১২। খুলনা এখন খুলনা সদর। ১৩। সাতক্ষীরা। ১৪। বসিরহাট। ১৫। বারাশত। (এই নামের ডিষ্ট্রীক্ট এই সময়ে উঠাইয়া

---

* In 1796, there was only one Civil Court and one covenented English officer. In 1800, there were 39 courts and two covenented English officers in Nadiya. In 1883, there were 26 magistrial courts and of revenue and Civil 18, with four covenented English officers.

Vide Hunter's Imperial Gazetteer Vol X.

‡ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নীল কমিসনে সাক্ষ্য দিবার কালে নদীয়ার তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট হারসেল সাহেব এইরূপ বলেন :—

প্রশ্ন—"Previous to this year what number of Duputy and Asst. Magistrates were in this District, besides the Magistrate?

উত্তর—"There was one Subdivision in Kareempur and another at Santipur; and in the latter part of 1859 one was established at Damurhuda. and since then another at Bongong.

দিয়া উহাকে সবডিভিজন করা হয়)। ১৬। আলিপুর (সদর)। ১৭। পোর্ট মাত্‌লা (বর্ত্তমান বারুইপুর)—কলিকাতায় যাইবার রাস্তার উপর। ১৮। ডায়মণ্ডহারবার। এতদ্ব্যতীত বারাকপুর ও দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টকে ২টী ক্ষুদ্র সবডিভিজন করিয়া দুইজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের অধীন করা হয় ও শিয়ালদহে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রাখা হয়।

এতন্মধ্যে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর, চুয়াডাঙ্গা, শান্তিপুর ও বনগ্রাম লইয়া ক্ষুদ্রাকারে নদীয়া জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। নদীয়ার বিস্তৃতি পূর্ব্বে মুসলমান শাসনে যাহা ছিল এ সময়ে তাহাপেক্ষা বহু হ্রাস করা হয় এবং পরবর্ত্তী কালে বনগ্রামকে যশোহরের অন্তর্গত করায় ক্রমে উহা আরও ক্ষুদ্র কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নদীয়ার রাজস্বও এই কারণে কমিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ১৮৬২ অব্দে হিতকামী রাজার প্রজারক্ষার কল্যাণকর বিধানে নদীয়ার এবং অন্যান্য নীলকর প্রপীড়িত জেলায় আভ্যন্তরীন শান্তি পুনঃস্থাপিত হইলে, সার সিসল্ বিডন সাহেব বাহাদুর বঙ্গের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। ইঁহার ৫ বৎসর কাল ব্যাপী রাজত্ব কালের মধ্যে নদীয়ার এক হৃদয় বিদারক দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়। এই বৎসর নদীয়ার বিভিন্ন গ্রাম সমুদায়ে বিশেষতঃ নিম্ন ও আর্দ্র ভূমিতে এক প্রকার রোগের উৎপত্তি হয় যাহা ক্রমে মহামারী আকার ধারণ করিয়া গ্রামকে গ্রাম জনহীন করিয়া দিয়াছিল। যে পবিত্র ধাম পূর্ব্বে স্বাস্থ্য ও উৎকৃষ্ট জল বায়ুর জন্য সুবিখ্যাত ছিল—যে নদীয়ায় পূর্ব্বকালে ইউরোপীয়গণও স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত আগমন করিতেন—যে স্থানে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনর্গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বহুদর্শী চিকিৎসকগণের ব্যবস্থানুযায়ী তদানীন্তন ইংরাজ কোম্পানীর

Vide Minutes of evidence taken before the Indigo Commission at Krishnagar. Para 2867.

*The area of the district is at present smaller by third than it was in 1790. Land Tax was £ 13;993 in 1850, £ 117449 in 1870 and £ 91105 in 1883—84.

Hunter's Imperial Gazetteer. Vol X.

গবর্ণর বাহাদুর আসিয়া বহুদিন যাপন করিয়াছিলেন * এবং যে নদীয়ার উৎকৃষ্ট জল বায়ু হইতে তাঁহার বিনষ্ট স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া কিছুদিনে আবার তিনি রোগগ্রস্ত হইলে নদীয়ায় পুনরাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, † সেই স্বাস্থ্যময় ভূস্বর্গ নদীয়া এই সময় মহামারীর দারুণ কবলে এক মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। যে দিকে তাকাইবে সেই দিকেই কেবল বিষাদপূর্ণ শোকের দৃশ্য। রাস্তা ঘাট জনহীন—ক্বচিৎ দুই একজন বৈদ্য এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করি-

---

* January 3rd. 1713 A. D.

The Governor having for several months been very much indisposed and being adviced by the physicians to go up to Nadyia for change of air as the only means left for the recovery of health. Agreed that during his absense the worshipful Robert Hedges Esq. act as chief and transact all affairs with the rest of the Council and also take charge of the cash. —Ordered that the doctor go with the Governor and considering the troubles in this Country that Captain Woodvil with fifty soldiers go as guards

Wilson's Early Annals of the English Vol. II page 96.

† February 23rd. 1713 A. D.

The Governor not being perfectly recovered of his illness and begining to relapse which the doctors impute to the difference between the air of this place and Nadiya where he has lately been for the recovery of his health and therefore advice him to go up thither again.

Ordered that thirty soldiers go up with the Governor as a guard, also that several of the Company's servants who are now indisposed go up with the Governor for the recovery of their health. Mr Hedges act as chief.

Vide Abstract of Letters from Bengal to the Court of Directors also Wilson's Early Annals of the English. Vol II page 96.

তেছে অথবা শিবাকুল ও সারমেয় সম্প্রদায় শ্মশান হইতে বা গৃহ হইতে শব দেহ সংগ্রহ করিয়া ভীষণ কোলাহল করিতেছে। প্রথম প্রথম লোকে শবাদি শ্মশানে লইয়া দাহ করিতেছিল কিন্তু ক্রমে শব সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্মশানে আর স্থান না পাইয়া যেখানে সেখানে দাহ করিতে বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিতে থাকে। ক্রমে যখন সকলেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল তখন আর কে কাহাকে শ্মশানে লইয়া যায়—কাজেই লোক গৃহাভ্যন্তরে মরিয়া পচিতে আরম্ভ করিল। গ্রামস্থ ২।১ জন যাহারা কোনরূপে নিস্তার পাইতে লাগিল তাহারা ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন পর হইল। এইরূপে কত সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল—কত বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী, জনহীন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িল এবং কত শত শত গ্রাম, শিবাকুল ও শকুনী-গৃধিনী-পিশাচের ক্রীড়া ভূমিতে পরিণত হইল। এইরূপে যে সমস্ত গ্রাম শ্রীহীন হইয়া পড়িল নদীয়ার সমৃদ্ধ শোভাময় প্রাচীন গ্রাম বীরনগর তাহাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ যোগ্য * জন সাধারণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে এই বীরনগরেই প্রথম অশুভ তিথি নক্ষত্রাদি সময়কালে, একটী শব বাহকগণের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হওয়ায় নদীয়ায় এই দারুণ দুর্দ্দৈব সংঘটিত হয়। এখনও আমরা নদীয়াবাসী সন্ধ্যায় অন্ধকার গাঢ় হইলে প্রাচীনের নিকট একাগ্রমনে কত বিভীষিকা ময় ভূত পিশাচ ঘটিত এই জনহীন বীরনগরের অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠি। কতদিন গত হইয়াছে কিন্তু বীরনগরের স্বাস্থ্য বা পূর্ব্বশ্রী কিছুই প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই; এখনও বীরনগরের শ্রীহীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে সেই মহামারীর নিদারুণ মূর্ত্তির অস্পষ্ট ছায়া কিছু কিছু উপলব্ধি হয়।

১৮৬২ সালের শেষভাগে এবং পরবর্ত্তী কালে যখন এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি

---

* A fever of a mixed character made its appearance in a severely epidemic form at Birnagar in 1856, and at Hanskhali, Chakdah and Santipur, extending to Kanchrapara, Naihati and Tribeni.

Hunter's Statis. Account Vol. II. page 139.

নদীয়াকে কবলিত করিয়া যশোহর বারাসাত. বর্দ্ধমান, হুগলীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল; * এবং সেই সেই স্থানে ও অসম্ভবরূপ লোকক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল তখন গবর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ডাক্তার জে, ইলিয়ট নামে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসককে এই সর্ব্বনাশী ব্যাধির কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার ব্যাধিগ্রস্থ স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই তবে তাঁহার নিদেশানুযায়ী অনেক গ্রামে জঙ্গলাদি কর্ত্তন করিয়া বা দাহ করিয়া পুলিস সাহায্যে পুষ্করিণী প্রভৃতি কেবল পানীয়র নিমিত্ত নির্দ্ধারণ করিয়া ও ডোবা ও বৃহৎ গর্ত্তাদি পরিপূরিত করিয়া এবং গ্রামাদির জল নিকাশনের ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্তু রোগ দমনে এ সকল অতি সামান্যই কার্য্যকরী হইয়াছিল। কারণ পরবর্ত্তী কালে বিশেষতঃ ১৮৮১ অব্দে

---

* It began to rise about ten years ago (1862) in Jessore and Nadiya and caused much consternation and havoc in several parts of the 24 Parganas, and in 1864—65 crossed the Hugly district. In 1866 it appeared in the eastern and southern Parts of the Burdwan district. During 1867—68 it continued to prevail and spread in these districts along the course of the Damodar river and 1867 the town of Burdwan was attacked and many places in both districts suffered severely. In 1870 the type and mortality were not so severe, but in 1871 fever broke out with renewed violence, and was more wide-spread and fatal than ever. It also extended to the parts of Birbhum and Midnapur bordering on Burdwan and Hugly. The disease commenced in July and continued to cause more serious sickness and mortality throughout the whole of the cold season of 1871—72. The year 1871 closed with the epidemic in full away throughout large portions of Birbhum and Midnapur.

Bucklands' Bengal under the Lieut. Governor page 505.

নদীয়ায় ইহার প্রকোপ ও প্রতাপ অত্যাধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মৃত্যুসংখ্যা একেবারে চরমে উঠিয়াছিল। এক শত জনের মধ্যে ন্যূনাধিক ৬০। ৭০ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। দেশের বিভীষিকাময় হৃদয় বিদারক সেই শোকের ছবি বর্ণনা করিতে হস্ত হইতে লেখনী স্খলিত হইয়া পড়ে। এই সময় সদাশয় গবর্ণমেণ্ট অত্যাধিক প্রজাহানী দর্শন করিয়া সবিশেষ বিচলিত হইয়া উঠেন এবং বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও ঔষধ দাতব্য হিসাবে গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করেন, কিন্তু কোনরূপেই এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিতে না পারিয়া ইহার কারণ নির্দ্দেশার্থ ১৮৮১ অব্দে এক কমিসন নিযুক্ত করেন। কমিসন সমগ্র শীতকালে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া জমিদার ও জনসাধারণকে বিশুদ্ধ পানীয়ের উপকারিতা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহারা পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ব্যাধির কোন বিশিষ্ট কারণ নির্দ্দেশ হইতে পারে না—তবে সংক্ষেপতঃ বলা যায় যে, জনসাধারণ নিজে নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এবং লোকাল বোর্ড গ্রামাদি সংস্কারে মনোযোগী হইলে কালে এ ব্যাধি দেশ হইতে বিদূরিত হইতে পারে। এই সময়ে নদীয়ার মধ্যস্থল দিয়া ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল লাইনের নিমিত্ত মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় অনেকের মনেই এই ধারণা হয় যে রেলের উচ্চ ভূমির দ্বারা জল নিষ্ক্রামণের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হওয়ায় এই দারুণ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছে * কিন্তু কমিসন তদন্তে প্রকাশ করেন যে রেল ও রাস্তা প্রভৃতিতে জল নিষ্কাশনের যেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা অধিকাংশ স্থলে বিশিষ্টরূপ বর্ত্তমান থাকায় ইহা ব্যাধির কারণ হইতে পারে না। পরিশেষে সমগ্র বিষয় অনুধাবন করিয়া বঙ্গেশ্বর সার জি, ক্যাম্বেল বাহাদুর ১৮৭১ অব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে "উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিক উপায়ের সহায়তায় আমরা এই ব্যাধি প্রশমনে যতই কেন প্রয়াস পাই না এখনও চিকিৎসা শাস্ত্রে

* Raja Digamwar Mittra had strenuously ascribed it to obstructed drainage but his facts and deduction were called in question.

Bucklands' Bengal under Lt, Governors.

এমন কোন উপায় উদ্ভাবন হয় নাই এবং বহুদিনেও হইবে কিনা জানিনা যদ্দ্বারা দেশ হইতে এই ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিতে পারা যাইবে।"† এই রূপে বহু বর্ষ ধরিয়া এবং ক্রমান্বয়ে বঙ্গেশ্বর সার সিসিল বিডন, সার উইলিয়ম গ্রে, সার জর্জ কাম্বেল, সার রিচার্ড টেম্পেল এবং সার এস্লি ইডন বাহাদুরের শাসনকাল পর্য্যন্ত দেশ বিধ্বস্ত করিয়া এখন দারুণ ম্যালেরিয়া রূপে ইহা সমগ্র বঙ্গবাসীর অস্থি মজ্জায় প্রবেশ পূর্ব্বক জীবনের সারভূত শক্তি সামর্থ হরণ করিয়া দেশে সম্ভবাতীত অকাল মৃত্যুর আকর স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। জানিনা কত দিনে কিম্বা আদৌ কখনও বঙ্গবাসী ইহার করাল কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে কি না?

সার সিসিল বিডন মহোদয়ের আর এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি ১৮৬৪ অব্দে মফঃস্বলের মিউনিসিপালিটী ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। দেশের স্বাস্থ্য এই সময়ে একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি জেলাস্থ প্রধান প্রধান স্থানে মিউনিসিপালীটী স্থাপনে মনোযোগী হয়েন। তদনুসারে ঐ বৎসর ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে নদীয়া জেলায় সর্ব্ব প্রথম রাণাঘাটে এবং ১লা নবেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগরে দুইটী আদর্শ মিউনিসিপালীটী স্থাপিত হয়, পরে ঐ দুইটীর দ্বারা সন্তোষজনক ফল লাভ হইলে ১৮৬৫ সালের ১১ জানুয়ারী শান্তিপুরে ও ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল নদীয়া, কুষ্টিয়া, কুমারখালি, বীরনগর, মেহেরপুর এবং পরিশেষে ১৮৮৬ অব্দের ১লা মে তারিখে চাকদহে এক একটী মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। এবং ১৮৬০ অব্দে কৃষ্ণনগর দাতব্য

---

† The observation of the desease seem, however to show that it creeps over the country, taking hold in many cases of highlands and low lands alike and after a period of retaining its hold in a way, which seems to indicate, if not contagion or infection atleast of some kind of local progression which we do not understand. And however we may mitigate the desease by drainage or other engineering expediants there is still much for medical science to discover before we can understand it so as to cope with it effectually."

Sir G. Campbell.

চিকিৎসালয় ১৮৬৩ অব্দে কুষ্টিয়ায়, ১৮৬৪ অব্দে রাণাঘাটে ও চাকদহে চুয়াডাঙ্গায় ১৮৬৮ অব্দে মেহেরপুরে ১৮৬৯ অব্দে বীরনগরে ১৮৭০ অব্দে কুড়ুলগাছিতে ও শান্তিপুরে এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

সার সিসিল বিডন বাহাদুরের শাসনকাল নানারূপে নদীয়ায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইঁহারই সময় ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কলিকাতা হইতে নদীয়ার উত্তর সীমা কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেল খোলা হয়। কার্য্যতঃ এই রেল খুলিবার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫২। ৫৩ খৃঃ অব্দে ইহার নিমিত্ত প্রথম প্রস্তাব উত্থিত হয়, তদনুসারে ১৮৫৪ অব্দে লেফ্‌টেন্যাণ্ট গ্রেট হেড নামক একজন দক্ষ এনজিনিয়ার কলিকাতা হইতে ঢাকা, তথা হইতে চট্টগ্রাম ও তথা হইতে আকোয়াব পর্য্যন্ত জরীপ করিতে নিযুক্ত হয়েন। ইতি মধ্যে মিষ্টার পাউন নামে একজন এন্‌জিনিয়ার কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত পথের এক নক্সা ও পদ্মার উপর একটী ব্রীজের আদর্শ অঙ্কন করিয়া গবর্ণমেণ্টে পেশ করেন, তদনুসারে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ৩০ এ জুলাই ১৪৭৫৯৬৭২ পাউণ্ড মূলধনে লণ্ডনে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কম্পানী গঠিত হয়, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ঐ পথের কণ্ট্রাক্ট দিলি হয় পরে ১৮৬২ অব্দের ১৬ নভেম্বর তারিখে ঐ পথে প্রথম যাত্রী গাড়ী চলিয়াছিল। পরে পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা সার রিচার্ড টম্পসনের সময় ১৮৭৭ অব্দের ১ লা এপ্রিল এই রেল গবর্ণমেণ্টের খাস অধীনে আইসে এবং ইহার ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে নাম করণ হয়। যে দিন প্রথম এই রেলপথে লৌহ-শকট চলিয়াছিল সে দিন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। দলে দলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া লাইনের দুই ধার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গাড়ীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং অনেকেই কিরূপ লৌহ শকট অতলোক ও গাড়ী লইয়া অত দ্রুত আসিবে সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে ই, আই, আরের গাড়ী দেখিয়াছে তাহারা অনেক বুঝাইলেও অন্যান্য সকলে কিছুতেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না করিয়াছিল ততক্ষণ এই অপূর্ব্ব ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। পরে যখন বংশীধ্বনি করিয়া প্রথম গাড়ী দেখা দিল—ঐ সমবেত সোৎসুক জনসমুদ্র বিশেষ কৌতুহলী হইয়া

আনন্দ মিশ্রিত এক কোলাহল উত্থাপিত করিল এবং স্ত্রীলোকগণ কল্যাণ সূচক হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। এইরূপে ই, বি, লাইন প্রথম কৌতূহলী জনসমুদ্র কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেশ মধ্যে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া আসিতেছে। যখন প্রথম ই, বি, লাইন খোলা হয়, তখন গাড়ীতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারি শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। স্ত্রীলোকগণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গাড়ীর বন্দোবস্ত থাকিলেও সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোকগণ সাধারণের সহিত তখন গাড়ীতে উঠিতেন না তাঁহাদের পালকী, গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইত;—তখন নদীয়ার মধ্যে কাঁচড়াপাড়া, চাকদহ, রাণাঘাট, বগুলা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া এই কয়টী ষ্টেষনে প্রধানতঃ যাত্রী ও মাল গতায়াত করিত।

১৮৬৩ অব্দে ৫ই অক্টোবর এক দৈব দুর্ব্বিপাকে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জের নিকট হইতে এক আবর্ত্তনময় মহা ঝটিকা উত্থিত হইয়া বরাবর উত্তরমুখে ঘণ্টায় ২৬ মাইল বেগে ধাবিত হয়। উহা বাঙ্গালা ১২৭১ সালে আশ্বিন মাসে সংঘটিত হওয়ায় "একাত্তুরে ঝড়" বা "আশ্বিনে ঝড়" বলিয়া খ্যাত। অতি বৃদ্ধের মুখেও শুনা যায় এরূপ ভয়ঙ্কর ঝটিকা তাঁহারা কখন গল্পেও শুনেন নাই। যদিও ১৮৪২ অব্দে এবং ১৮৫২ অব্দের যে মাসে দুইটী প্রবল ঝটিকা সংঘটিত হইয়াছিল কিন্তু এরূপ সর্ব্বধ্বংশী, সর্ব্বনাশী ঝড়ের সহিত তুলনায় সে দুটী কিছুই নহে। তখন মাত্র রেল খুলিতেছে, লোকে তখনও নদী দিয়াই দেশ দেশান্তরে গমন করিতেন। বিশেষতঃ পূজার সময় যিনি যেখানে বিদেশে ছিলেন সকলেই নৌকাযোগে নিজ নিজ জন্ম ভূমিতে আগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূজার পঞ্চমী দিনে বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৪টা অবধি ভীষণরূপে ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া ও করকা বারিপাতে এক মহা প্রলয়ের সূচনা হইয়াছিল এবং নদী বক্ষঃস্থ সমস্ত নৌকা ও জাহাজ একেবারে চিহ্ন রহিত হইয়া ধ্বংস হইয়াছিল। প্রভঞ্জনের সেই ভৈরব ভীম মূর্ত্তি, স্বভাবের এই অস্বাভাবিক আক্রোশ, সেই সুতীক্ষ্ণ ভেরী নিনাদবৎ কর্ণভেদী হুহুকার যে কেহ দেখিয়াছে বা শ্রবণ করিয়াছে সে ইহজন্মে আর ভুলিবে না। এই ভয়ঙ্কর ঝটিকায় নদী সকল উদ্বেলিত হইয়া যে মহা-

প্লাবন আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে আজিও শরীর শিহরিয়া উঠে ও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ এই প্লাবনে ১৫০০ বর্গ মাইল প্লাবিত হইয়া ৪৭,৮০০ মনুষ্য ১৩৬,০০০ গবাদি পালিত পশু, ১,০০,০০,০০০, টাকা মূল্যের জলযানাদি ও ৪,৫০,০০০ টাকা মূল্যের গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি অনন্যমেয়রূপে নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই বিপদে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দুঃস্থ, নিরাশ্রয়, নিরন্ন ব্যক্তিবর্গকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভগবানের রাজ্যে কিছুই একেবারে ভাল বা একেবারে মন্দ হয় না। এই সর্ব্বনাশী বিপদেও নদীয়ার এক মহান উপকার সাধিত হইয়াছিল। যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি, মহামারী আকার ধারণ করিয়া নদীয়ার অগণিত লোকের কালস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কিছুদিনের নিমিত্ত দেশ হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছিল। * কিন্তু শীঘ্রই হতভাগ্য দেশ আবার উহার কবলে পতিত হয়।

১৮৬৪ অব্দের মহা ঝটিকায় নদীয়া জেলা একরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল বলা যায়। বিশেষতঃ পর পর দুই বৎসর পর্জ্জন্যদেব কালে বর্ষণ করিতে কৃপণতা প্রকাশ করায় শস্যাদির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।‡ যদিও সায়েস্তা খাঁ বা নবাব সুজার সময়ের ন্যায় টাকায় অষ্ট মণ চাউল আর

---

* It is on record that "the epidemic fever disappeared entirely after the cyclone of 1864 and there was no return of it in 1865 to attract attention. But it reappeared in 1866 and 1867."

Buckland's B. U. L. G. page 292

‡ The collector of Nadiya reported on the 31st. October that the outtern of rice crop was expected to be less than half that produced in ordinary years ; that in some parts of the district the plant was utterly desrtoyed, so as to be beyond the hope of saving, even in the event of a rain fall, and the cold weather crop was also threatened with comparative failure if the drought should continue.

কখনই বিক্রয় হয় নাই তথাপি লোকে তখনও টাকায় একমণ, ত্রিশ সের চাউল অনায়াসে ক্রয় করিত এবং এতদপেক্ষা মূল্যাধিক্য হইলেই বিশেষ কষ্টে পতিত হইত। ১৮৫৯ অব্দের প্লাবনের পর ১৮৬০ অব্দে ২৸০ টাকা মণ চাউল বিক্রয় হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। * এই কষ্ট সাধ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে না হইতে দেশে মহা ঝটিকা সংঘটিত হয় এবং ১৮৬৬ অব্দে দেশে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল বেশে দর্শন দেয়। প্রথমে দীন দুঃখী পরে কিছু দিনের মধ্যে অনেকেই ইহার দারুণ কবলে কবলিত হইতে থাকে। যে পরিমাণ চাউল পূর্ব্বে ৩ পয়সা ৪ পয়সা মূল্যে বিক্রিত হইত তাহাই এক্ষণে চারি আনা বা পাঁচ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল। কিছুদিন পরে মূল্য দিলেও আর মিলিতেছিল না সুতরাং অনেকের পক্ষে পরিত্যক্ত ভাতের ফ্যান বা আমানী কিম্বা গাছের ছাল, পাতা, মূল সার হইয়া উঠিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট যদিও পূর্ব্ব হইতেই বাজার দর প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন তথাপি কার্য্যতঃ প্রথমে কোনও সাহায্য প্রদান করেন নাই। পরে যখন চতুর্দ্দিক হইতে বিশেষতঃ নদীয়া কাপাস ডাঙ্গার মিশিনরীগণের পক্ষ হইতে সকরুণ আবেদন গবর্ণমেণ্টের গোচর হইল ‡ তখন নদীয়ার কালেক্টরের উপর এ বিষয়ের তদন্ত করিবার ভার পতিত হইল। কালেক্টর সবিশেষ তদন্ত করিয়া ১৮৬৬ অব্দে ৩০ এপ্রিল

* The highest price to which rice has risen in Nadiya district within the last 30 years, excepting in the famine year of 1866 was in 1860 when it rose as high as 7s. 6d. a hundredweight (Rs 2/12 a maund) or about 3 farthings a pound. The high rates of 1860 were caused by the floods of 1859.

Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. II. page 87.

‡ Rev. T. G. Lincke stated :—that "a certain measure of rice, which some years ago cost 3 or 4 pice, now sells at ten or fourteen pice, which alone is sufficient to account for the present distress of the poor. Were I to tell you of the

যে রিপোর্ট দেন তাহা পাঠ করিলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।† এই রিপোর্টের ফলে শীঘ্রই অনেক স্থানে সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপিত হইল এবং

---

instances of how long many must go without food and what sort of materials they contrive to convert into food, you could not believe it, for it is really incredible and yet it is true nevertheless."

Another missionary the Rev. F. Schuar of Kapasdanga stated that—"Respectable farmers are so much reduced in circumstances that they cannot employ so many day labourers as they used to do in former times and consequently the labouring classes are reduced to the point of starvation. They are now (March 1866) able to glean a little wheat, grain etc. but after a month all the crops will have been gathered in when nothing can be obtained by gleaning in the fields. They are now thrown upon roots, berries, etc for their chief support and when that supply is exhausted, they will be forced to eat the rind of trees, grass et. I never witnessed such misery in my life.

Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. II. page 89.

† The collector on the 30th April, 1866, reported that the suffering was much less in the neighbourhood of Kustia and Chooadanga and Meherpur than in other parts. Regarding the rest of the district the collector stated, all accounts agree, that there is great distress. There is no famine, for grain is to be had, but there is very little money to buy it at the prevailing prices. For some months the poor (and in this word I include all most all the working classes) have not had more than one meal a day and it is to be feared that many have not had even that. Nor can there be any doubt that there is a good deal of illness; and I am afraid, there have already been a few deaths owing to a want of sufficient food for so long.

Hunters' Statis. Acc. Vol. II. page 92.

দলে দলে দুঃস্থ পরিবার আসিয়া সাহায্য প্রার্থী হইল। কিন্তু পরবর্ত্তী জুন মাসে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সদাশয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার কষ্টে অস্থির হইলেন, তখন বহুস্থানে অন্নছত্রাদি স্থাপন করা হইল এবং কর্ম্ম-কুশল ব্যক্তিগণকে কাপড় বুনাইয়া লইয়া সাহায্য দান করা হইতে লাগিল।* এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের মোট ২৪৫০ পাউণ্ড (৩৬৭৫০) টাকা এবং সাধারণের চাঁদায় ১১০০ পাউণ্ড (১৬৫০০) টাকা অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। আগষ্ট মাস হইতে আরম্ভ করিয়া অক্টোবর মাসেই এই দুর্দ্দৈবের প্রকোপ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হয় ও ক্রমে ক্রমে আবার শস্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে। তদনুসারে চলিত চতুর্বিংশতি সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেসরকারি ভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে বন্ধ করা হয়। এইরূপে মহামান্য গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তায় ও যত্নে নদীয়ায় সে দুর্দ্দিন গত হয়। তদবধি এইরূপে দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ যখনই দেশে দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় তখনই শ্রমজীবি শ্রেণী অপেক্ষা অধিক কষ্ট হয় দরিদ্র গৃহস্থগণের যাঁহারা সমাজে ভদ্রনামে অভিহিত কারণ সামান্য শ্রমজিবীর ন্যায় কায়িক পরিশ্রমে তাঁহারা অনভ্যস্ত আবার অক্ষমতা বশতঃ তাঁহাদের পক্ষে উপার্জ্জনের অন্য পন্থাও বিরল, এক্ষেত্রে ৮।১০টি পোষ্য লইয়া, পুত্রাদির লেখাপড়া শিখাইয়া কন্যাদির সৎপাত্রে বিবাহ দিয়া "ভদ্রভাবে" সংসার চালান তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে। †

---

* East of the Hooghly the District most afflicted with famine was Nadia in which the official courage of Lord Ulick Browne, the colleotor, secured efficient relief. In June the distress became very severe and money was rapidly expended both in giving employment to those who could work and feeding those who could not. On 18th June about 2,500 persons were employed in the special relief works and 4,000 on public works of all kinds. At the worst time the number fed exceeded 10,000.

Bengal nnder L. G's. page 353.

† সুখের বিষয় সর্ব্বচক্ষুষ্মান, হিতকামী, প্রজাপালক সুসভ্য ইংরাজ রাজের প্রজার এই দুঃখ কষ্টের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রজারক্ষাকল্পে তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টা সমধিক এমন কি দৈব বিড়ম্বনার প্রতিবিধান মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইলেও উহার প্রতিকারকল্পেও তাঁহাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। কিসে প্রজাসাধারণ সুখে থাকে, কিসে দ্রব্যাদির মূল্য অত্যধিক না হয়, কিসে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, কিসে জল কষ্টাদি দূর হয় এই সমুদয় বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা

১৮৬৬ অব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষের কোপ প্রশমন হইতে না হইতেই নদীয়ায় আবার এক ভয়ঙ্কর দৈব বিপাক উপস্থিত হয় উহা সাধারণতঃ ৭৪ সালের বন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নদীয়ায় বার বার এতই জল প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে যে বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেকের উল্লেখ অসম্ভব। * নদীয়া জেলায় এতই নিম্নভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বর্ত্তমান যে যে বৎসর একটু অধিক পরিমাণে বারিপাত হয় সেই বৎসরেই নদীয়ায় বন্যা হয়। এ সম্বন্ধে চলিত পদ "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বাণ"—এটী সার্থক লেখা মনে হয়। কারণ টাপুর টুপুর অর্থাৎ সামান্য মাত্র বর্ষণ হইলেই নদীয়ায় যত বাণ আসে এত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিগত ১৮৭১ অব্দে নদীয়া ও যশোহরে যেরূপ বন্যা আসিয়াছিল এতদঞ্চলে বহুকাল সেরূপ সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ইহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেরূপ ক্ষতি হইবে অনুমান করা হইয়াছিল তাহা হয় নাই। বন্যার জল নাবিয়া যাইলে সাধারণতঃ যেরূপ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি উৎকট ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় সে বৎসর সেরূপ কিছুই হয় নাই।

অসাধারণ এবং এই চেষ্টার ফলেই আজি নদীয়ার বহুস্থানেই স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য Anti Malarial Measure এর কার্য্য, দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির কারণানুসন্ধানের জন্য Commission of Enquiry into High prices of Food stuff, সাধারণে যাহাতে অল্প হারে কর্জ্জ পায়, সেই জন্য গ্রামে গ্রামে Co-operative Credit Society, জলপ্লাবন নিবারণার্থ যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই বাঁধ ও জলকষ্ট নিবারণার্থ নদী প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিতে অজস্র অর্থব্যয় হইয়া থাকে, এই সব দেখিয়া স্বতই মনে ভরসা হয় যে, এই সুশিক্ষিত ভাগ্যবান রাজার অকপট যত্নে, উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়েই হউক বা অর্থ ও সামর্থ দিয়াই হউক দেশের প্রতি দৈবের প্রকোপও শীঘ্রই দূরীভূত হইবে।

* ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বের এতদ্দেশের শাসন বিভাগের বিশ্বাসযোগ্য যথাযথ ইতিহাস না থাকায়. তৎপূর্ব্বের দুর্ভিক্ষাদির ও তজ্জনিত অসংখ্য লোকক্ষয়ের,বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না, সুতরাং ইংরাজের সুরক্ষিত বিবরণী যাহাতে এতদ্দেশে যখন যে ব্যাপারটী ঘটিয়াছে তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক ,লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে যখন ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বের ইতিবৃত্তে দুর্ভিক্ষ বা জলপ্লাবনাদির বিষয় কিছুই লিখিত হয় নাই তখন ঐ সকল কালে কোনও রূপ দৈববিড়ম্বনা সংঘটিত হয় নাই। পরন্তু ঐ সব কালের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস থাকিলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে ঐ সব কালে দুর্ভিক্ষাদি আরও কঠোরতর মূর্ত্তিতে দেখা দিত, কেন না তখন এখানকার মতন সুশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় রাজার কর্ণে প্রজার কষ্টের কথা পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হইত এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে এত সহজে রেল বা জাহাজযোগে চাউলাদি সাহায্য পাঠান অসম্ভব ছিল, প্লাবনের সময় উপযুক্ত বাঁধ বাঁধিয়া প্লাবন নিবারণে এখন সব সুশিক্ষিত এঞ্জিনিয়ারের ঐকান্তিক অভাব ছিল। আর ঘন ঘন ঐ সকল দুর্দ্দৈব সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে বলা যায় যে এখনও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জল প্লাবন প্রভৃতি যে সব কারণে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হয় তখনও ঐ সকল কারণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল।

১৮৬৭ অব্দের বন্যার পর নদীয়ায় পর পর আরও কতকগুলি দৈব দুর্বিপাক সংঘটিত হইয়াছিল। ১৮৬৮ অব্দে বাঙ্গালা ১২৭৫ সনে, ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে শ্রাবণ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া সমগ্র নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। আবার এই মহাবৃষ্টির প্রকোপ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৯ অব্দে বা বাঙ্গালা ১২৭৬ সনের ২৮ আষাঢ় সমগ্র দিবাভাগ ব্যাপি প্রবল ঝটিকায় ও বৃষ্টিতে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট সংঘটিত হয় এবং পুনরায় পরবর্ত্তী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বা ১২৭৮ সালের দারুণ প্লাবনে কত শত শত গৃহস্থ নিঃসহায়-সম্পত্তি হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সে বৎসর ভাগিরথীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া মুরসিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহরে দারুণ প্লাবন আনয়ন করিয়াছিল। মুরসিদাবাদের পাদদেশে যে বাঁধ ভাগিরথীর প্লাবন নিবারণের নিমিত্ত বর্ত্তমান আছে তাহা জল বেগে ধ্বংশ হওয়ায় ভাগিরথীর জল ঘোর বেগে নদীয়া প্লাবিত করিয়া পরিশেষে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের কতিপয় স্থান ভঙ্গ করিয়া যশোহরের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এতদ্বারা নদীয়ায় যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল সেরূপ ক্ষতি আর কোন জেলায় হয় নাই। যদিও বহু নর নারী এই দারুণ দুর্দ্দৈব বশতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বটে কিন্তু গবাদি পালিত পশু এত অধিক সংখ্যক বিনষ্ট হইয়াছিল যে তাহা অপরিমেয়। গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে সাহায্য করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কোনরূপ সাহায্য গৃহিত হয় নাই। যদিও এই দুর্দ্দৈবে নদীয়ায় সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল বটে কিন্তু পর বৎসর বন্যাপ্লাবিত মাঠ সকলে অত্যাধিক ফসল উৎপন্ন হওয়ায় প্রজাকুলের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।

ইহার পর কিছুদিন নদীয়াবাসী হাঁপ ছাড়িতে সময় পাইয়াছিল। কিন্তু আবার ১৮৮৫ অব্দে বাঙ্গালা ১২৯২ সনে দারুণ বন্যায় সমগ্র নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। এই প্লাবনে ২,২০০ বর্গ মাইল জলাকীর্ণ হইয়া দেশে মহা দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছিল এবং তদুপলক্ষে দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগৃহিত হইয়া স্থানে স্থানে সাহায্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছিল। কমিটী মোট ৬৫,৬৯৫, টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে সমগ্র দুঃস্থ জেলায় সাহায্যার্থ মোট ৩৭,০০০, টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, বাকী অর্থ

ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা পীড়িত বঙ্গের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত আছে।

পরবর্ত্তী কালে ১৮৯৭ অব্দে ১২ই জুন বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ তারিখে সমগ্র ভারতব্যাপী যে মহা ভূমিকম্পন অনুভূত হইয়াছিল তদ্বারা নদীয়ারও বহু ক্ষতি হইয়াছিল। নদীয়াবাসী অতি প্রাচীনের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা কখন গল্পেও এরূপ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের বিষয় শ্রবণ করেন নাই। এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই এমন বাটীই ছিল না—এই মহা কম্পনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে যে রথচক্রধ্বনিবৎ গুরু গম্ভীর নিনাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে আজিও হৃদ্‌কম্পন উপস্থিত হয়। এই দেশ ব্যাপী ভূমিকম্পে কত নদী শুকাইয়া গিয়াছিল—এবং কত উচ্চ ভূমি ও পর্ব্বতাদি বসিয়া জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই মহান ভূমিকম্পের পরই নদীয়ার উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ১৯০২ অব্দের অক্টোবর মাসের মহাবৃষ্টি। সপ্ত দিবস ব্যাপী এই মহাবৃষ্টিতে সমগ্র নদীয়া জলপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অসংখ্য মৃণ্ময় ও ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ প্রাচিরাদি ভূমিসাৎ হইয়াছিল এবং ঘাট পথ বন্ধ হইয়া লোকে সশঙ্ক অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছিল।

সংক্ষেপতঃ আজ পর্য্যন্ত ইহাই নদীয়ার উল্লেখ যোগ্য ঘটনাবলী।



নদীয়ায় বিদ্যাচর্চ্চা।

নবদ্বীপ আবহমান কাল জ্ঞান-গৌরবে গৌরবান্বিত। বিদ্যাচর্চ্চার বিবরণ ও জ্ঞানী মহাত্মার জীবনী লইয়াই নবদ্বীপের ইতিহাস বিরচিত। সুবিখ্যাত হিন্দু-নরপতি বল্লালসেন যে অবধি নবদ্বীপে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চ্চার গৌরব বৃদ্ধি হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে। কথিত আছে, তাহার পূর্ব্বে একজন যোগী গঙ্গার চরে ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া কেবলমাত্র কতিপয় ছাত্রকে ন্যায়ের পাঠ দিতেন। ইহাঁর ছাত্রগণের মধ্যে শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং ব্যায়াপ্তি শিরোমণি প্রধান। ইঁহাদের উভয়েই ন্যায়ের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্কর তর্ককবাগীশের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও তৎকারণে জনসমাজে তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদিন তর্কবাগীশ কোনও ধনী-গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইবার সময় উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া তথায় ত্বরায় গমনমানসে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া সত্বরে তাঁহাকে পারে লইয়া যাইবার জন্য নাবিককে বারম্বার আদেশ করায়, নাবিক তাঁহার কথায় বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল "ঠাকুর যেন নদের শঙ্কর তর্ক-বাগীশ এলেন আর কি, তাই সব কাজ রেখে ওনাকে আগে পার করে দেও"। মূর্খ নাবিকের মুখে আপনার অসাধারণ প্রতিষ্ঠার এই রূপ অপূর্ব্ব প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার যে আনন্দ হইয়াছিল, শত সভা বিজয়েও বুঝি তত হয় নাই।

বল্লালসেন একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বঙ্গের আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-গণের বর্দ্ধমান বংশাবলীকে আচারভ্রষ্ট দেখিয়া শিথিলপ্রায় সমাজবন্ধন দৃঢ় করেন। ইঁহার সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বল্লালসেনের পরে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেন বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতৃতুল্য বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাসবান ছিলেন। এই অন্ধ বিশ্বাসই পরে তাঁহার ও সমগ্র বাঙ্গলার

সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। ইঁহার সময়ে হলায়ুধ, পশুপতি ও শূলপাণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হয়। সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব এবং উমাপতিধর ইঁহারই সভা-উজ্জ্বলকারী রাজকবি ছিলেন।

হলায়ুধ "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব", "স্মৃতি সর্ব্বস্ব" এবং "মীমাংসা সর্ব্বস্ব" ও "ন্যায় সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকার। ইনি আপনাকে বাৎস্য গোত্রীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র বলিয়া স্বীয় সংগৃহীত "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।

পশুপতি হলায়ুধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার কৃত "শ্রাদ্ধাদি কৃত্য" পশুপতি-পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধ।

শূলপাণি ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার কৃত গ্রন্থ সমূহ স্মৃতিবিবেক নামে খ্যাত। তৎসংগৃহীত "ব্রতমালাবিবেক", "প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক" প্রভৃতি অদ্যাপি বিদ্যজ্জনসমাজে সমাদৃত রহিয়াছে।

শ্রীধর দাস, লক্ষ্মণ সেনের সেনাপতি বটুদাসের পুত্র। ইনি "সদুক্তি কর্ণামৃত" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১১২৯ বা ১২০০ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত হয়।

জয়দেব গোস্বামী—ইঁহার নিবাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে। কিন্তু ইনি লক্ষ্মণসেনের সময়ে রাজসভাসদ্ ও রাজকবি-রূপে নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার অমৃতময়ী লেখনী বঙ্গে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও জননীর নাম বামা দেবী। জয়দেব অল্প বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণে বাঞ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। এক অপুত্রক ব্রাহ্মণের জগন্নাথদেবের নিকট মানসিক ছিল যে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র বা কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে প্রথমটীকে জগন্নাথের পদে অর্পণ করিবেন। উক্ত মানসে ব্রাহ্মণ আপন প্রথম তনয়াকে জগন্নাথসমীপে আনয়ন করিলে ব্রাহ্মণের প্রতি জগন্নাথদেব প্রত্যাদেশ করেন যে জয়দেবকে কন্যা দান করিলে সে তাঁহারই পাওয়া হইবে; এই কন্যার নাম পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশক্রমে সন্ন্যাসী জয়দেব পদ্মাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হন। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন; তিনি প্রেম-বিহ্বল হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে মধুর কান্ত পদাবলী রচনা করিতেন, তাহা

অতুলনীয়। কথিত আছে, স্বয়ং বৈকুণ্ঠনায়ক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমে মর্ত্ত্যে আসিয়া শ্রীহস্তে তাঁহার পুথির পৃষ্ঠায় "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিয়া অপূর্ণ পাদ পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্ত জয়দেব সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। জয়দেব প্রত্যহ কেন্দুবিল্ব হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ পদব্রজে চলিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন; বৃদ্ধ বয়সে তিনি চলচ্ছক্তিহীন হইলে, তাঁহার প্রার্থনামতে কেন্দুবিল্বে গঙ্গা প্রবাহের আবির্ভাব হইয়াছিল। একবার তদ্গতপ্রাণা দেবী পদ্মাবতী কোন সূত্রে অবগত হয়েন যে জয়দেবের মৃত্যু হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্রে পতিগতপ্রাণা সাধ্বী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে, জয়দেব মৃত পত্নীর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। এইরূপ শতশত অলৌকিক গল্প তৎসম্বন্ধে প্রচলিত আছে। তাঁহার মাধুর্য্যময় "গীত গোবিন্দ" আজিও সর্ব্বত্র সাতিশয় আদৃত। শ্রীক্ষেত্রে ইহা জগন্নাথদেবের পূজার অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে কেন্দুবিল্ব গ্রামে অপ্রকট হন। অদ্যাপি তথায় প্রতিবৎসর মাঘী সংক্রান্তিতে তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এবং "গীত গোবিন্দ" গীত হয়।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির পর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০ বৎসর ব্যবধান। এই সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশ প্রায়শঃ মুসলমানগণের শাসনাধীন ছিল। ইহাদের সকলেই গৌড়ে বাস করিতেন এবং গৌড়েশ্বর বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের শাসনাধীনতায় দেশে বিদ্যাচর্চ্চা সমভাবেই চলিতেছিল। দেশে ভূম্যধিকারী সকলেই প্রায় হিন্দু ছিলেন, সুতরাং বিচার ও শাসন প্রত্যক্ষতঃ হিন্দুগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যা-চর্চ্চা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বরগণও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং সংস্কৃত ও গৌড়ীয় ভাষায় বহুতর গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। * যে "কৃত্তিবাস-রামায়ণ" আজ হিন্দুর গৃহে গৃহে আদৃত ও পূজিত হইতেছে, তাহা গৌড়েশ্বরেরই আদেশক্রমে রচিত। এই সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সুললিত প্রেমময় পদাবলী রচনা দ্বারা

* গৌড়েশ্বর নসরত খাঁ মহাভারত অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

গৌড়ে ভাবী দেশোন্মাদকর বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া যান। চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খৃষ্টাব্দে) * বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা বলে সমগ্র দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন।

বিদ্যাপতি ঠাকুর চণ্ডীদাসের সমসাময়িক, তিনি মৈথিল। † মিথিলাই তৎকালে দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য সকল বিষয়েই অগ্রগামী। এইস্থানে মহামুনি গৌতম ‡ স্বীয় অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে যে ন্যায় শাস্ত্রের সূত্রপাত করিয়া যান, উদয়নাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশোপাধ্যায় ও তৎপুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় তাহাকে বহু টীকা ও ভাষ্য দ্বারা অলঙ্কৃত ও ভূষিত করেন।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁহার প্রকৃত নাম জয়ধর মিশ্র তর্কালঙ্কার। কথিত আছে যে, তিনি কোনও কথা একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া বিনা আলোচনাতেও এক পক্ষকাল স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন, ও যে কোনও শাস্ত্রীয় বিচার এক পক্ষ কাল ধরিয়া করিতেন এবং তিনি পূর্ব্ব বা উত্তর যে পক্ষেই থাকিতেন, তাহা কখন স্খলিত হইত না বলিয়া তাঁহার পক্ষধর উপাধি হইয়াছিল। ইনি আপনাকে যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের

---

*"বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চ বাণ।
নবহু নবহু রস ইহ পরিমাণ।"

†"জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর
মৈথিলি দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধীপ শিব সিংহ ভূপ
কৃপাকরি লেউ নিজ পাশ।

‡ ন্যায় শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক মহর্ষি গৌতম, উতথ্যের পুত্র ও অঙ্গিরার পৌত্র। ইঁহার নামান্তর—দীর্ঘতমাঃ এবং অক্ষপাদ। পিতৃব্য বৃহস্পতির সাপে ইনি জন্মান্ধ হন, তাই নাম হয় "দীর্ঘতমাঃ"। পরে যোগবলে স্বীয় পদে চক্ষুঃ উন্মীলিত করেন, তজ্জন্ত নাম হয় "অক্ষপাদ"। অনেকে এরূপও বলেন যে স্বীয় শিষ্য বেদব্যাস তদীয় বেদান্ত সূত্রে ন্যায়মত খণ্ডনের চেষ্টা করিলে, রুষ্ট মহর্ষি গৌতম এ চক্ষুতে আর ব্যাসের মুখাবলোকন করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পরে ব্যাস কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে সংপূজিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ স্বাভাবিক নয়নে তাঁহার মুখদর্শন না করিয়া স্বীয় পদে চক্ষুঃ সৃজন করেন।

ছাত্র এবং হরি মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। পক্ষধর মিশ্র তাৎকালিক পণ্ডিতগণের শীর্ষস্থানীয় এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বহুদূরদেশ হইতে তাঁহার নিকট বহু ছাত্র পাঠার্থ সমবেত হইত। অধিকাংশ ছাত্র ন্যায় পড়িবার জন্যই মিথিলায় আসিত, কারণ ন্যায়শাস্ত্র ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থাদি তখন অন্য কুত্রাপি পাওয়া যাইতনা। মিথিলার পণ্ডিতগণ সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদের বহু পরিশ্রমের গ্রন্থগুলি অতিসংগোপনে ও যত্নে রাখিয়াছিলেন। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিলনা, সকলকেই স্বীয় স্বীয় পাঠ্য পুথি স্বহস্তে লিখিয়া লইতে হইত। যখন কোন ছাত্র ন্যায়াধ্যয়নার্থ মিথিলায় আসিতেন, অধ্যাপকগণ তাঁহাদের অভ্যাসের নিমিত্ত পুথি সকল প্রদান করিতেন, আবার পাঠান্তে সে গুলি পুনর্গ্রহণ করিতেন, এবং পাছে কেহ কোন অংশ গোপনে লইয়া যান, এই জন্য সকল ছাত্রকেই বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া মিথিলার বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত; এইরূপ এতাবৎ মিথিলার অধ্যাপকগণ বহু যত্নে ন্যায়শাস্ত্রে আপনাদের প্রাধান্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং সে সময়ে ন্যায়পাঠার্থী ছাত্রগণের মিথিলায় গমন ব্যতীত গত্যন্তর ছিলনা। বিশেষতঃ মৈথিলী অধ্যাপক ব্যতীত অপর কাহারও উপাধিদানের ক্ষমতা ছিলনা।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

যে সকল ছাত্র মিথিলা হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা কোন না কোন ধনবানের আশ্রয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দেশে শিক্ষার বিস্তার করিতেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্র, উপযুক্ত গ্রন্থ ব্যতিরেকে তাহার সম্যক্ শিক্ষাদান অসম্ভব; সুতরাং উপযুক্ত গ্রন্থ অভাবে নবদ্বীপে তখন ন্যায়ের আশানুরূপ অনুশীলন ছিলনা, কিন্তু শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় শীঘ্রই এ অভাব মোচন হয়। মিথিলার বহুযত্নঅর্জ্জিত গৌরব খর্ব্ব করিতে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরম মেধাবী অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন শ্রুতিধর বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ ভট্টাচার্য্য। তিনি স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং আপনার পুত্রকে তৎকালপ্রচলিত রীত্যনুসারে ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠান্তে স্মৃতি

অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করান। বাসুদেব অল্পকালমধ্যেই পিতৃনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র সমুদয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন এবং ন্যায় শিক্ষার জন্য উৎসুক হইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে মিথিলায় গমন করেন। তৎকালে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার পণ্ডিতগণের মধ্যে একচ্ছত্রী সম্রাটরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। বাসুদেব মিথিলায় তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায় শিক্ষা করিতে থাকেন।* ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নে তিনি দিন দিন যতই উন্নতি করিতে লাগিলেন, ততই অসীম আনন্দে আপ্লুত হইতে লাগিলেন এবং কিরূপে এই অমূল্য রত্নে আপনার মাতৃভূমিকে অলঙ্কৃত করিবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মৈথিল অধ্যাপকগণের সম্ভবাধিক যত্নে ন্যায়শাস্ত্রকে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে স্বদেশে লইয়া আসা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র বিশেষতঃ গঙ্গেশ-উপাধ্যায় কৃত চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্র একেবারে কণ্ঠস্থ করিলেন, পরে যখন দেখিলেন, উক্ত শাস্ত্র সম্যক কণ্ঠস্থ হইয়াছে, তখন তিনি কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, কিন্তু অচিরে তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ হওয়ামাত্র শ্লোকভাগ ব্যতীত আর তাঁহার কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করা হইল না; তখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন, এবং পক্ষধর মিশ্র কর্তৃক "শলাকা পরীক্ষায়" সসম্ভ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া "সার্ব্বভৌম" এই সম্মানিত উপাধি-ভূষিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু পাছে তিনি কোন গ্রন্থ সঙ্গোপনে সঙ্গে লইয়া যান, এই আশঙ্কায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী প্রত্যেক বস্তু অতি সাবধানে পরীক্ষা করিলে বাসুদেব বলিলেন, "আমার স্মৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অঙ্কিত রহিয়াছে, আমার কোন গ্রন্থ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।" এই কথায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ ঈর্ষান্বিত হইলেন বুঝিতে পারিয়া বাসুদেব, পাছে নিজের জীবনের উপর কোন অত্যাচার হয়, এই আশঙ্কায় নবদ্বীপের পথে না আসিয়া নবদ্বীপযাত্রাচ্ছলে কাশী যাত্রা করেন এবং কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া তিনি বেদান্তে ব্যুৎপন্ন হয়েন; পরিশেষে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রথমে ন্যায় শাস্ত্র ও কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ

---

* কাহারও কাহারও মতে পক্ষধর মিশ্র বাসুদেবের সহাধ্যায়ী, কোনও সময়ে পক্ষধরের নিকট তর্কে পরাজিত হইলে বাসুদেব প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহার কোনও শিষ্য দ্বারা তিনি পক্ষধরের দর্প চূর্ণ করিবেন, পরে সেই জন্য রঘুনাথকে মিথিলায় প্রেরণ করেন।

লিপিবদ্ধ করিয়া পরে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। এই হইতেই নবদ্বীপে ন্যায়ের বিধিমত চর্চ্চা আরম্ভ হয়; এবং দলে দলে পাঠার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট ন্যায়ের পাঠগ্রহণ করিতে থাকে, কিন্তু ন্যায়ের কয়েক খানি মাত্র গ্রন্থে তিনি পাঠ দিতেন, সুতরাং তখনও অনেকে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য মিথিলায় গমন করিতেন। বাসুদেবের বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রধান মধ্যে গণ্য ছিলেন। এই রঘুনাথই স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে মিথিলা হইতে নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের উপাধি দানের ক্ষমতা আনয়ন করেন। শ্রীচৈতন্য যৌবনেই ধর্ম্মপথাবলম্বী হন এবং বাসুদেব জীবনের শেষ বয়সে (১৫২০ খৃষ্টাব্দে) যখন প্রবল প্রতাপান্বিত গঙ্গাবংশীয় রাজা গজপতি প্রতাপ রুদ্রের ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহার সভাসদরূপে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন *, তখন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার মতানুগামী হয়েন। কথিত আছে, বাসুদেবের শেষ বয়সে নবদ্বীপে মুসলমানগণ ঘোর অত্যাচার করিতে থাকে, তিনি তাহাতেই ঘোর উত্ত্যক্ত হইয়া সপরিবারে উৎকলে যাত্রা করেন এবং তথায় রহিয়া "সার্ব্বভৌম নিরুক্ত" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এক পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করেন। এই পুত্রের নাম দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ। ইনি বোপদেব কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও কবিকল্পদ্রুমের টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ টীকায় তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যথা :—

"শাকে সোমরসেষু ভূমি গণিতে শ্রীসার্ব্বভৌমাত্মজো
দুর্গাদাস ইমাঞ্চকার বিশদাং টীকাং স্ববোধাবধি।"

রঘুনাথ শিরোমণি।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম আপনার অনন্যসাধারণ মেধা ও স্মৃতি শক্তির সাহায্যে মিথিলার দারুণ কবল হইতে যে ন্যায়শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া আপনার মাতৃভূমি অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য রঘুনাথ স্বীয় অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে তাহার উন্নতি সাধন ও মিথিলা হইতে উপাধি দানের ক্ষমতা আনয়ন করিয়া নব-

* Vide L. 2854, Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanskrit Mss., vols. I—IX, Sastri X—XI.

দ্বীপকে তদানীন্তন দেবভাষায় "বিশ্ববিদ্যালয়ে" পরিণত করেন। রঘুনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপে এক দুঃখী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শিশুকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং তাঁহার কাঙ্গালিনী মাতা সার্ব্বভৌমের বাটীতে পরিচারিকার কার্য্য করিয়া দুঃখে দিনপাত করিতে থাকেন। মতান্তরে রঘুনাথ শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈদিক সংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থে প্রকাশ, সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই পঞ্চখণ্ডে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীধর আচার্য্য মিথিলা হইতে ৫৩ ত্রিপুরাব্দে বা ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। রঘুনাথের পিতা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি "দীপিকা প্রধান" নাম্নী একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার মাতার নাম সীতাদেবী। রঘুনাথের পিতার অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। তিনি অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলে রঘুনাথের দুঃখিনী মাতা অতিশয় কষ্টে শিশু রঘুনাথের ভরণ পোষণ করিতে থাকেন। এই সময়ে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তিনি স্বগ্রামবাসী নিজ জনের সঙ্গে সপুত্র নদীয়ায় যাত্রা করেন। এখানে আসিতে পথে তিনি কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহার সহযাত্রীগণ সপুত্র তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যান। কিছু দিন রোগ ভোগের পরে আরোগ্য লাভ করিলে স্বজাতীয় স্বগ্রামবাসীর এই নিষ্ঠুর আচরণে তাঁহাদের উপর তাঁহার বিশেষ বিরাগ উপস্থিত হয়, সে কারণে আর স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া তিনি কোন এক বণিককে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে সপুত্র নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাৎকালিক বিদ্যারাজ্যের অধিপতি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আশ্রয় লাভ করেন। জন্মাবধি রঘুনাথ একচক্ষুহীন ছিলেন; এই কারণে যখন তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েন, তখন কাণভট্ট শিরোমণি নামে খ্যাত হয়েন। *

---

* কেহ কেহ বলেন যে তিনি আজন্ম এক চক্ষু ছিলেন না, কোনও এক সপ্তমী নিশিতে আকাশের দিকে চাহিয়া যখন একাগ্রমনে শাস্ত্রচিন্তা করিতেছিলেন, তখন একটা পতঙ্গ তাঁহার একটী চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই তাঁহার সেই চক্ষুটী নষ্ট হইয়া যায়। সপ্তমী রাত্রিতে পাঠ একে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহাতে রঘুনাথের এই দৈব বিড়ম্বনায় নৈয়ায়িকগণ সপ্তমী রাত্রিতে একেবারেই শাস্ত্র-চর্চ্চা করেন না।

রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই অতি মেধাবী ছিলেন। কথিত আছে, একদা তিনি মাতার নিদেশানুসারে টোলের কোন ছাত্রের নিকট অগ্নি আনিতে যান। ঐ ছাত্র বার বার এইরূপ ত্যক্ত হইয়া রঘুনাথকে অপ্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক হাতা জলন্ত অঙ্গার লইয়া রঘুনাথের হস্তে দিতে যাইলে বালক রঘুনাথ পাত্রাভাবে স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে ঝটিতি এক অঞ্জলি ধূলি গ্রহণ করিয়া অগ্নি লইতে প্রস্তুত হয়েন। ঐ সময়ে বাসুদেব স্বীয় চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালকের এতাদৃশ বুদ্ধি দর্শন করিয়া রঘুনাথের মাতাকে বলিয়া স্বয়ং রঘুনাথের পঠনের ভার গ্রহণ করেন। কথিত আছে, রঘুনাথ "ক," "খ" শিখিতে আরম্ভ করিয়াই "ক" অগ্রে না বলিয়া "খ" অগ্রে বলিলে কি দোষ হয়"; ব্যঞ্জনবর্ণে দুইটী "জ" দুইটী "ন" দুইটী "ব" তিনটী "স" ইহারই বা প্রয়োজন কি ইত্যাদি প্রশ্নজিজ্ঞাসু হয়েন, সুতরাং রঘুনাথকে বর্ণমালা শিখাইতে গিয়াই সমস্ত ব্যাকরণ পড়াইতে হইয়াছিল। রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্য অভিধান শেষ করেন এবং কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াই বাসুদেবের নিকট ন্যায়ের পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতি মেধাবী রঘুনাথকে বাসুদেব সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না, পরন্তু রঘুনাথ ইতিমধ্যেই "সার্ব্বভৌম নিরুক্ত" নামক গ্রন্থের বহুদোষ বিচার করিয়া "কৃত বিদ্যো গুরুং দ্বেষ্টি" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন পুরঃসর নিজ গুরু সার্ব্বভৌমের উক্ত পুস্তকের অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। বাসুদেব রঘুনাথের এবম্বিধ অসাধারণ ক্ষমতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে মিথিলায় ন্যায় আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। রঘুনাথ মাত্র বিংশতি বৎসর বয়সে (খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) মিথিলায় উপস্থিত হয়েন। বাসুদেবের গুরু সুপ্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র তখনও জীবিত। রঘুনাথ তাঁহারই চতুঃষ্পাঠীতে নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিম্নশ্রেণীতে প্রবেশ করিলেও অধিক দিন তাঁহাকে নিম্ন শ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই, কারণ তিনি নবদ্বীপ হইতেই চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং শীঘ্রই সকল ছাত্রকে তর্কে পরাস্ত করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র 'সামান্য লক্ষণা' নামক পুথি প্রণয়ন করিতেছিলেন, রঘুনাথ এখন ন্যায়ে সম্যক ব্যুৎপন্ন হইয়া তাহারই দোষ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষধর মিশ্র তাঁহার এই

অসাধারণ তর্কশক্তি ও অসামান্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন এবং মনে মনে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেও এবং পুনঃ পুনঃ রঘুনাথের সহিত তর্কে পরাস্ত হইলেও লোকলজ্জায় ও বৃথা অভিমানে রঘুনাথকে প্রকাশ্যে কটুবাক্যে বিলক্ষণ অবমাননা ও বিদ্রূপ করিলেন। পক্ষধর কুপিত হইয়া তাঁহাকে শ্লেষাত্মক রূক্ষ বাক্যে কহিলেন :—

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটে।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥"

"রে স্তন্যপায়ী কাণা; যখন সুপরিব্যক্ত সংশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন কি করিয়া সহসা "সামান্য লক্ষণা" লোপ করিবে?"

রঘুনাথ এক চক্ষুহীন বিধায় তাঁহাকে কাণা বলাতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হওয়ায় তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন :—

"যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেকাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ॥"

তখন পক্ষধরের সহিত তাঁহার রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তিনি অসাধারণ বুদ্ধি ও অপূর্ব্ব তর্কশক্তি প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপকের কূট বাগ্‌জাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন; তখন পক্ষধর উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিলেন এবং তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছাত্রগণও তাঁহাকে অযথা মনঃকষ্ট দিবার নিমিত্ত তাঁহার এক চক্ষুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন :—

"আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥"

রঘুনাথও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও সগৌরবে উত্তর করিলেন—

"কুশদ্বীপনলদ্বীপনবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মনীষিণঃ॥"

আমাদের তিন জনের উপাধি যথাক্রমে তর্কসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত ও শিরোমণি এবং বাসভূমি কুশদ্বীপ, নলদ্বীপ ও নবদ্বীপ।

এইরূপ অযথা লাঞ্ছিত হইয়া রঘুনাথ ক্ষুণ্ণমনে নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং হর্ষ শীঘ্র মত স্থাপন নতুবা আচার্য্যের প্রাণ হনন এই স্থির করিয়া তীক্ষ্ণধার এক অস্ত্র গ্রহণ করিয়া নিশাযোগে গুরু-মন্দিরে

উপস্থিত হইলেন। সে দিন পূর্ণিমা রাত্রি, পূর্ণিমার শশধর বিমল জ্যোৎস্না বিকিরণ করিতেছিলেন। রঘুনাথ তখন ক্ষিপ্তপ্রায়; শোকে, ক্ষোভে ও অপমানে উত্তেজিত হইয়া দারুণ প্রতিহিংসাবশে পক্ষধরকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। দেখিলেন, পক্ষধর সস্ত্রীক অলিন্দায় উপবিষ্ট এবং উভয়ে কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন। পক্ষধরগৃহিণী বিমল জ্যোৎস্নায় প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"নাথ! জগতে এই জ্যোৎস্না অপেক্ষা বিমল প্রীতিপ্রদ বস্তু আর কিছু আছে কি?" পক্ষধর তখন উন্মনা, বুঝি রঘুনাথের অযথা অপমানে আত্মগ্লানি আসিয়াছে, স্ত্রীর বারংবার প্রশ্নে আকৃষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন "কি ছার এই কলঙ্কী চাঁদের জ্যোৎস্নার প্রশংসা করিতেছ, তোমার গৃহে নবদ্বীপের যে অকলঙ্ক চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার বুদ্ধির নিকট জগতে বিমলতর আর কিছুই হইতে পারে না।" রঘুনাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন এবং আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সহসা গুরুপদে একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন গুরু ও শিষ্য উভয়ে উভয়কে চিনিয়াছেন—উভয়ে বহুক্ষণ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিলেন এবং এই দুই মহাপ্রাণ এক হইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে পক্ষধর এক মহতী সভা আহ্বান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বীয় পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে রঘুনাথকে নবদ্বীপে থাকিয়া উপাধি-দানের ক্ষমতা প্রদান করিলেন। তদবধি মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল এবং মিথিলার যশঃশ্রী নবদ্বীপের অঙ্কশায়িনী হইলেন। এই দিন নবদ্বীপের একটী স্মরণীয় দিন।

এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে অভিলাষ করিলেন। রঘুনাথ অতি দরিদ্র ছিলেন, এমন কি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। এ সময়ে নবদ্বীপে হরিঘোষ নামে এক ধনাঢ্য গোপ বাস করিতেন; তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার সুবিস্তীর্ণ গোশালা চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য শিরোমণিকে দান করেন। এই গোশালাতেই রঘুনাথ তাঁহার বহুযত্নার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া অমর টোল স্থাপন করিলেন। একণে তিনি টোল স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া নানা দিগ্দেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাঁহার সুবিস্তীর্ণ চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ করিল। এই

সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর পাঠাভ্যাসকালীন কোলাহল বহুদূর হইতে শ্রবণগোচর হইত। এখনও লোকে কোনও স্থান জনাধিক্য বশতঃ কোলাহলপূর্ণ হইলে "হরিঘোষের গোয়াল" বলিয়া থাকে।

রঘুনাথকৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "চিন্তামণি-দীধিতি" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা "নবন্যায়" নামেও খ্যাত। এতদ্ব্যতীত তিনি "পদার্থ খণ্ডন" "আত্মতত্ত্ব-বিবেকের টীকা" এবং সুবিখ্যাত বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ও উদয়নাচার্য্য কৃত গ্রন্থ সমুদয়ের টীকা ও "নঞবাদ," "প্রামাণ্যবাদ," "নানার্থবাদ," "আখ্যাতবাদ," "ক্ষণভঙ্গুরবাদ" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল সদ্যুক্তিপূর্ণ ন্যায়ের গ্রন্থরাজি ব্যতিরেকে স্মৃতিশাস্ত্রীয় "মলিম্লুচ-বিবেক" (মলমাস) নামে একখানি গ্রন্থ দেখা যায়।

এই সময়ে শ্রীচৈতন্য দেবও নদীয়ার অধ্যাপকরূপে বিরাজমান। তাঁহার অলৌকিক দিগ্বিজয়ী মেধা, উজ্জ্বলতর রূপে পরিস্ফুট হইয়া অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষা সম্পাদন করিতেছিল; কিন্তু শীঘ্রই তিনি পার্থিব জ্ঞানকে জীর্ণবস্ত্রখণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া অপার্থিব সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য মনোনিবেশ করেন এবং ধর্ম্মপথের পথিক হয়েন। নবদ্বীপের ইহাই সুবর্ণযুগ! রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব হইতেই নবদ্বীপের মহিমা পূর্ণভাবে বিকশিত। তাঁহাদের উভয়ের জ্ঞানগরিমা ও অনন্যসাধারণ চরিত্রমহিমা জনসমাজে প্রচারিত হইবার পরেই সুদূর দ্রাবিড়, কাঞ্চী, মিথিলা কাশী, তৈলঙ্গ প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্র ও ভক্তগণ আসিয়া নবদ্বীপকে এক তীর্থে পরিণত করে। তদবধি নবদ্বীপ শ্রীধাম ও সরস্বতীর পীঠস্থানরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীচৈতন্য দেব ও রঘুনাথের সময়ে নবদ্বীপ সর্ব্বতোমুখী বিদ্যালোচনায় উন্নতির শিখরদেশে উন্নীত হইয়াছিল। এই সময়ে ও ইহার পরবর্ত্তী কালে বহু মেধাবী পণ্ডিত এই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কিংবা বাস করিয়া তাঁহাদের নিজরচিত মৌলিক পুস্তকাদির দ্বারা নবদ্বীপের জ্ঞানগরিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের বিবরণ পাওয়া দুর্লভ এবং পাইলেও এ স্থলে বিশদভাবে উহা দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইল। এই যুগে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ ও অসংখ্য ভক্তবৃন্দের দ্বারা বঙ্গভাষা বিশেষরূপে অলঙ্কৃত ও মার্জ্জিত হয়। যে সকল

মহাত্মা এই সুকোমল বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যধিক ; মধ্যে কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত চরিত স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হইল। নবদ্বীপের প্রতি এই সময়ে বাণীর অসীম কৃপা দেখা যায়। এই যুগে নবদ্বীপে যেরূপ ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, সেরূপ আবার নবদ্বীপবাসী স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও অন্যান্য বহু পণ্ডিত কর্ত্তৃক স্মৃতি, তন্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্র সবিশেষ উন্নতি লাভ করায় নবদ্বীপ সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইবে।

বহু পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপে ন্যায়ের চর্চ্চা থাকিলেও রঘুনাথই নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং তৎকালে তিনিই প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়েন। তদবধি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক সমাজে প্রধান নৈয়ায়িকের মৃত্যুর পর তদুপযুক্ত একজন ঐ পদে বৃত হইয়া আসিতেছেন। রঘুনাথের পর তাঁহারই বংশাবলীকে বহুদিন ন্যায়-রাজ্যে একাধিপত্য করিতে দেখা যায়। রঘুনাথের পুত্র রামভদ্র। ইঁহার উপাধি সার্ব্বভৌম। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। ইনি স্বরচিত পদার্থমণ্ডলের টীকায় নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন :—

"তাতস্য তর্ক-সরসী-রুহ-কাননেষু
চূড়ামণে র্দিনমণেশ্চরণং প্রণম্য।
শ্রীরামভদ্র সুকৃতিঃ কৃতিনাং হিতায়
লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি।"

ইনি "পদার্থ মণ্ডলের" টীকা, "পদার্থ-তত্ত্ব বিবেচনা প্রকাশ" ব্যতীত উদয়-নাচার্য্য কৃত সমগ্র "কুসুমাঞ্জলির" টীকা করিয়াছিলেন। "কুসুমাঞ্জলি কারিকা ব্যাখ্যা," "গুণকিরণাবলী-রহস্য," "সমাসবাদ," "ব্যুৎপত্তিবাদ" "প্রামাণ্যবাদ," "নঞার্থবাদ," "ক্ষণভঙ্গুরবাদ," আখ্যাতপদ," "আত্মবিবেক টীকা," "তর্ক দীপিকা প্রকাশ," গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত "চিন্তামণির ভাষ্য," "খণ্ডনখণ্ড খাদ্য টীকা," "গুণ কিরণাবলী," "প্রকাশদীধিতি," "ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ দীধিতি," "স্তায় লীলাবতি দীধিতি," "ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি," "নলিমূচ্ বিবেক," "অদ্বৈতেশ্বরবাদ," "অপূর্ব্ববাদ রহস্য," "আকাঙ্ক্ষাবাদ" প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইঁহারই সময় ইঁহারই সহাধ্যায়ী দুঢ়্যপ্রবৃত্তি শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যগুণে দেশমান্য হয়েন। তিনি পাঠদশাতেই দীধিতির টীকা লিখিয়া যশস্বী হয়েন, পরে পিতৃ-নির্দেশানুসারে গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত চিন্তামণি গ্রন্থের এক অতি প্রাঞ্জল ভাষ্য প্রণয়ন করেন। কথিত আছে—মথুরানাথ কণাদ নামে একটী উপযুক্ত শিষ্যের অনুরোধে "অবয়বের" টীকা লিখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। কণাদের ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে গুরুর গ্রন্থাবলীর সহিত তাঁহারও একখানি গ্রন্থ প্রচলিত হয়। মথুরানাথের টীকা গ্রন্থসমূহের মধ্যে কণাদকৃত অবয়ব টীকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মথুরানাথের তিরোভাবের পর তাঁহার পুত্র প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিখণ্ড চিন্তামণির পিতৃপ্রণীত টীকা পাঠ করিয়াই বিনা গুরূপদেশেই সুপণ্ডিত হয়েন। মথুরানাথের এই সকল টীকা ব্যতীত বল্লভাচার্য্যের "ন্যায়লীলাবতী প্রকাশের" ও গুণকিরণাবলীর ভাষ্য" নৈয়ায়িক সমাজে অতি আদরের বস্তু। তাঁহার কৃত অসংখ্য টীকা ও ভাষ্য "মাথুরী রহস্য" নামে খ্যাত। তাঁহার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রধানরূপে পূজিত হয়েন। ইঁহার কৃত টীকা "ভবানন্দী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার কৃত "মণি দীধিতি" "শুদ্ধার্থ প্রকাশিকা," "শব্দার্থ সার মঞ্জরী," "নটার্থবাদ" "কারণত্ববাদ বিচার," "কারকচক্র" প্রভৃতি পুস্তক অদ্যাপি সমাদরে পঠিত হইতেছে। বিখ্যাত "বৈশেষিক শাস্ত্রীয় পদার্থ নিরূপণ," "অধিকরণ" "চন্দ্রিকা "চিত্ররূপ," "বাদ পরিচ্ছেদ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা রুদ্ররাম এই ভবানন্দেরই পুত্র। পিতার ন্যায় ইঁহার টীকাও আদরের সহিত গৃহীত হয়; ইঁহার কৃত টীকা সাধারণতঃ রৌদ্রী নামে খ্যাত।

সুবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণির বংশে যে সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, হরিরাম তর্কবাগিশ, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান; ইনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার সময়ে দেশের কোন ক্রিয়া কাণ্ডে ইনি ন্যায়ের প্রধান বিদায় প্রাপ্ত হইতেন; ইঁহার কৃত বহু গ্রন্থের মধ্যে "নব্যমত রহস্য," "আচার্য্যমতরহস্য," "মঙ্গলবাদ," "প্রমাণপ্রমোদ" "অনুমিত পরামর্শ, "স্বরবৃত্তি," "বিষয়তা বাদ," "বিশিষ্ট বৈশিষ্ট বোধ বিচার," "প্রতিবন্ধকতা বিচার," "প্রত্যাসত্তি বিচার" ও সপ্তপদার্থ নিরূপণের ব্যাখ্যা"

"রত্ন কোষের ব্যাখ্যা" প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহার টোলে বহু দূরদেশ হইতে ছাত্রগণ পাঠার্থ আগমন করিত। এই সকল ছাত্রের মধ্যে রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, ও গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রধান ছিলেন।

রঘুদেব নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ অধস্তন বংশধর হইবেন। ইনি শিরোমণি-কৃত "নঞ বাদের" "নঞবাদ বিবেচন" নামক টীকা রচনাকালে গ্রন্থারম্ভে এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।—

"শিবং প্রণম্য তৎপশ্চাত্তর্কবাগীশরং গুরুম্।
ক্রিয়তে রঘুদেবেন নঞর্থস্য বিবেচনম্॥

এই শ্লোকে তিনি আপনার গুরু হরিরাম তর্কবাগীশকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন; আবার গ্রন্থের শেষে বলিতেছেন:—

"অত্র সূক্তং দুরুক্তং বা যৎ কিঞ্চিৎ জল্পিতং ময়া।
তৎ সর্ব্বং জগদীশস্য প্রীত্যর্থং লিখিতং হি তৎ।
রঘুদেবকৃতগ্রন্থালোকনেন মনীষিণঃ।
অধ্যাপয়ন্তু সন্তোষৈর্নঞ্‌বাদনবিবাদতঃ॥"

ইহাতে স্পষ্ট বলিতেছেন যে, তিনি জগদীশ তর্কলঙ্কারের প্রীত্যর্থে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে তিনি হরিরাম ও জগদীশ উভয়ের নিকটেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার "পদার্থখণ্ডন বিবরণ" ১৬৪১ শকে অর্থাৎ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি মহর্ষি কণাদের "বৈশেষিক সূত্রের" "কণাদ সূত্র ব্যাখান" নামে টীকা, গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত "তত্ত্ব চিন্তামণির" তত্ত্বার্থে, "তত্ত্বদীপিকা" নাম্নী ব্যাখ্যা পুস্তিকা, "পরামর্শ বিচার," "অবয়ব গ্রন্থ" রঘুনাথ কৃত "আখ্যাতবাদের" টীকা, "আকাঙ্ক্ষাবাদ," "কার্য্য কারণ ভাব বিচার," "চিত্ররূপবাদ," "জ্ঞানঘরবাদ," "জ্ঞানলক্ষণ বিচার," "তর্ক বিচার" "নঞবাদ টিপ্পনী," "নবীন নির্ম্মাণ," "নানার্থ বাদ," "নিরুক্তি প্রকাশ," "মনোবাদ," "লক্ষণাবাদ" "বিশিষ্ট বৈশিষ্টবোধ বিচার," "বিশিষ্ট বৈশিষ্ট বাদ" "বিষয়তাবাদ" "স্মৃতি সংস্কার বিচার" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ টীকাগুলি সাধারণতঃ "রঘুদেবী" নামে পরিচিত।

গদাধর ভট্টাচার্য্য পাবনা জেলার লক্ষ্মীচাপড় গ্রামের জীবাচার্য্য ভট্টাচার্য্যের

পুত্র। কিন্তু বাল্যকাল হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে নবদ্বীপের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইয়া যায় এবং কথিত আছে, গদাধর তাঁহার পৈতৃক জন্ম স্থান পাবনা হইতে ছাত্র সংগ্রহের নিমিত্ত বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করেন। এই কালে দেবভাষাধ্যয়নকারী ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইবার প্রথম কারণ—মুসলমান সভ্যতার বিস্তৃতি ও তদনুযায়ী ফারসী ভাষার উন্নতি ও প্রচার। এই সময়ে মুসলমানগণের দোর্দ্দণ্ড শাসনে এবং বিলাস আয়েস দর্শনে দেশ "মোছলমানী" ভাবে বিভোর। দ্বিতীয় কারণ—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্থাপিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসাদ ও তদঙ্গীভূত পদাবলীর রচনা ও প্রচার এবং বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি।

কিন্তু এই সকল বাধা সত্বেও সংস্কৃত ভাষা তখনও সমাজে সমাদৃত ছিল এবং তখনও মেধাবী অধ্যাপকগণের অভাব আদৌ অনুভূত হয় নাই। এই সময়ে "শব্দ শক্তি প্রকাশিকা," "তর্কামৃত" প্রভৃতির গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার বর্ত্তমান ছিলেন; জগদীশের জীবনী এক অদ্ভুত উপন্যাস। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ইঁহাদের আদি নিবাস মিথিলা, জগদীশ তাঁহার পিতার তৃতীয় পুত্র। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে জ্যেষ্ঠ ষষ্টীদাসের উপর তাঁহাদের পঞ্চ ভ্রাতার ভরণপোষণের ভার বর্ত্তে। ষষ্টীদাস চৈতন্যানুরক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি চৈতন্যের সেবার কোনও রূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং ভ্রাতৃগণের বিদ্যাচর্চ্চা ও নৈতিক উন্নতির দিকে আদৌ মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। জগদীশ স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন, এক্ষণে পিতৃবিয়োগ ও ভ্রাতার অমনোযোগিতায় উচ্ছৃঙ্খলতা ঘোর দুষ্টামীতে পরিণত হয়। তখন তাঁহার বর্ণ শিক্ষা হয় নাই বলিলেও হয়। ভাগ্যনেমির পরিবর্ত্তনে কাহার কিরূপ হয়, কে বলিতে পারে। কথিত আছে, একদিন জগদীশ পক্ষীশাবক অপহরণেচ্ছু হইয়া এক বৃহৎ তালবৃক্ষে আরোহণ করেন, দৈববশতঃ এক সুবৃহৎ বিষধর সর্প ঐ পক্ষিনীড়ে অবস্থান করিতেছিল। জগদীশ যেমন পক্ষিশাবক লইতে ঐ কুলায় হস্ত প্রবেশ করাইয়াছিলেন—ঐ সর্পও ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে দংশনোদ্যত হইল। জগদীশ তদ্দর্শনে কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চকিতে ঐ সর্পের ফণা ধরিয়া ফেলিলেন। সর্পও তাহার শরীরের দ্বারা তাঁহার হস্ত দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিল; কিন্তু জগদীশ তৎক্ষণাৎ উহার মুণ্ড তালের

সূচ্যগ্র বাকলে ঘর্ষণ করিয়া কর্ত্তনানন্তর দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে নাগপাশমুক্ত হইয়া তিনি সহর্ষে বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

এতক্ষণ এক সন্ন্যাসী ঐ বৃক্ষমূলে বসিয়া জগদীশের কার্য্য অবলোকন করিতেছিলেন। জগদীশ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার অসীম সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর ঐ সন্ন্যাসী জগদীশের সমস্ত তথ্য অবগত হইলেন ও কৃপাপরবশ হইয়া জগদীশকে পাঠে মনোযোগী করিতে যত্নবান হইলেন। এতদিনে জগদীশের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল; তিনি সন্ন্যাসীর আগ্রহে তাঁহার নিকট পাঠগ্রহণে সম্মত হইলেন। এই দুরন্ত অশিষ্ট জগদীশ পরে সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক হইয়া নবদ্বীপের মুখোজ্জ্বল করেন। জগদীশ পাঠে মনোযোগী ছিলেন বটে, কিন্তু অর্থাভাবে তৈল ক্রয় করিতে না পারায় তাঁহার রাত্রিতে পাঠাভ্যাসের সুবিধা হইত না, কিন্তু অসাধারণ উদ্যমশীল জগদীশ দিবাভাগে শুষ্ক বংশপত্র সংগ্রহ করিয়া রাত্রিতে তাহারই আলোকসাহায্যে অধ্যয়ন করিতেন। হায়! এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় অধুনা দেশ হইতে একেবারে বিদায় হইয়াছে।

জগদীশ ক্রমে কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের টোলে ন্যায়-শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন এবং শীঘ্র আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে ভবানন্দের প্রিয় হইয়া উঠেন এবং তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

উপাধি প্রাপ্তির পর গ্রাম্যসাহায্যে জগদীশ চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। এই সময়ে যদিও সংস্কৃত শিক্ষার আদর কিছু কমিতেছিল, তথাপি তাঁহার টোল্ শীঘ্রই ছাত্রপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু দরিদ্র জগদীশের অত ছাত্রের ভরণপোষণের ক্ষমতা কোথায়? অবশ্য অধ্যাপক বিদায়ে তখনও তাঁহাদের বিশেষ প্রাপ্য ছিল, কিন্তু অধ্যয়ননিরত জগদীশের সর্ব্বদা দূরদেশে গমনে নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল, অতএব তিনি গৃহে বসিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে মহাপ্রভুআচরিত ধর্ম্মে, জনসাধারণের মধ্যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। এতাবৎকাল মাত্র ব্রাহ্মণেই যথাবিহিত শাস্ত্র পাঠ ও অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু মহাপ্রভুর উদার ধর্ম্মে শূদ্রকেও শাস্ত্রে অধিকার দিয়াছিল এবং এখন শূদ্র কর্ত্তৃক শাস্ত্র অধীত ও রচিত হইতেছিল। তাঁহাদের মধ্যেও জ্ঞানী

লোকের অভাব ছিল না। সেজন্ত জগদীশ জ্ঞানী আচারবান দেখিয়া শূদ্র শিষ্য গ্রহণ করিলেন; সুপণ্ডিত জ্ঞানবান জগদীশের শিষ্য হইতে সকলেই আগ্রহান্বিত হইলেন এবং শীঘ্রই ৩৬০ ঘর শিষ্য-সংখ্যা পূর্ণ হইল। তিনি নিয়ম করিলেন যে প্রত্যেক শিষ্যকে বৎসরে একদিন তাঁহার যাবতীয় খরচের ভার লইতে হইবে; শিষ্যেরাও সাহলাদে এই ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থাতেও গ্রন্থ লিখিতে সর্ব্বদা রত রহিতেন। তাঁহার কৃত গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত "অনুমানময়ূখ" গ্রন্থের "ভাষ্য" ও "প্রশস্তবাদ", আচার্য্যকৃত "বৈশেষিক শাস্ত্রীয় দ্রব্য ভাষ্যের" টিপ্পনী ও রঘুনাথের "ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ" প্রভৃতি দীধিতি গ্রন্থের টীকা কি অদ্ভুত বিচার শক্তি ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তাহা আর্য্য ন্যায়পাঠক মাত্রেরই গোচর আছে। তাঁহার গ্রন্থসমূহ 'জগদীশী' বলিয়া খ্যাত।

জগদীশের দুই পুত্র—রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর। রঘুনাথ "সাংখ্য তত্ত্ব বিলাস" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রুদ্রের কোন গ্রন্থ বা টীকা প্রকাশ নাই। সুবোধিনী নাম্নী শব্দশক্তিপ্রকাশিকার টীকাকার রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ রুদ্রের পুত্র।

জগদীশের তিরোভাবে পূর্ব্বোক্ত গদাধর, প্রধান নৈয়ায়িকরূপে বৃত হয়েন। ইনি ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে দেশদেশান্তর হইতে ছাত্র আনাইয়া নবদ্বীপের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত চিন্তামণি আলোকের টীকা, "বৌদ্ধাধিকার" "নানার্থবাদ," "নব্য মতবাদার্থ," "রত্নকোষ পদার্থ", "উপসর্গবিচার," "সন্দিগ্ধার্থ বিচার," "সাদৃশ্যবাদ" "প্রথমা ব্যুৎপত্তি," "অনুকরণ বিচার," প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজী অদ্যাপি বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। এই সময় হইতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের নবদ্বীপের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং পরে মহারাজ রামকৃষ্ণ নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যকল্পে বহু মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "নবদ্বীপাধিপতি" এই মহা সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন।

সুবিখ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে নবদ্বীপের ম্রিয়মাণ বিদ্যাচর্চ্চা আবার নবশক্তি প্রাপ্ত হয়। ইঁহারই অধিকারকালে নবদ্বীপের হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ সুকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণের যশঃসৌরভে বঙ্গভূমি আমোদিত হইতেছিল।

হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত শুধু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাউজ্জ্বলকারী পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর নবদ্বীপে প্রধান নৈয়ায়িকরূপে বরিত হয়েন। ইঁহার মৃত্যুর পর শঙ্কর তর্কবাগীশ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্রের সভায় ও নবদ্বীপে প্রাধান্য লাভ করেন। ইঁহার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বুনো রামনাথ, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি উদ্ভূত হয়েন।

বুনো রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত।

কথিত আছে, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত তদানীন্তন নৈয়ায়িকপ্রধান রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের শিষ্য। তিনি পঠদ্দশায় বিবাহ করেন এবং অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন। সে সময়ে পাঠান্তে সকলেই নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণনগরের রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিতেন, কিন্তু দাম্ভিক রামনাথ তাহা না করিয়া নবদ্বীপের উপকণ্ঠে বনের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সমাগত ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যাদান করিতে থাকেন। বনে কুটীর মধ্যে বাস করায় লোকে তাঁহাকে বুনো রামনাথ বলিত। যদিও তাঁহার যশঃসৌরভে বিদ্যার্থীর অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু সনাতনপ্রথানুযায়ী তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার ঐকান্তিক অভাব ছিল। এ সময়ে দেশের অবস্থাও শোচনীয়—ইংরাজ তখন কেবল আধিপত্য গ্রহণ করিতেছেন; দেশ সুশাসিত হয় নাই—দস্যু ও চৌর্য্যভয়ে দেশ সশঙ্কিত—ধনী আর অর্থ ব্যয় করে না, পাছে ধনাপবাদে গৃহে ডাকাতি হয়, সুতরাং বহিঃসাহায্য তখন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে; এ অবস্থায় বিদ্যা ও পুঁথিমাত্রসম্বল দরিদ্র অধ্যাপকগণের আর পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্রপোষণে ক্ষমতা ছিল না, তাই রামনাথ তাঁহার ছাত্রগণকে কেবল বিদ্যাদান করিতেন, তাহারা নিজ ব্যয়ে আহারাদির ব্যবস্থা করিত। এই সময় হইতে "ছাত্র পোষণের" মনুপ্রচলিত সনাতন নিয়ম বিশিষ্টরূপে শিথিল হইয়া যায়।

রামনাথ দরিদ্র হইলেও সর্ব্বদা তাঁহার অবস্থায় সন্তুষ্ট রহিতেন। রামনাথের গৃহিণীও তাঁহার ন্যায় অল্পে সন্তুষ্টা ছিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে স্বামীর উপযুক্তা ছিলেন। কথিত আছে, একদিন ঘরে রন্ধনোপযোগী দ্রব্যসম্ভার কিছু না থাকায় রামনাথগেহিনী স্বামীকে কি ব্যঞ্জন হইবে জিজ্ঞাসা করায়, শাস্ত্রচিন্তায় তন্ময়

রামনাথ উদাস দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে নিকটস্থ এক তিন্তিড়ী বৃক্ষের দিকে কিয়ৎক্ষণ মাত্র তাকাইয়া চলিয়া যান। অবোধ গৃহিণী—বুঝি স্বামী তিন্তিড়ী পত্রের ব্যঞ্জন রাঁধিতে অনুমতি করিলেন ভাবিয়া, মধ্যাহ্নে স্বামীকে তিন্তিড়ী পত্রের ব্যঞ্জন ও অন্ন প্রদান করেন। পণ্ডিতও তখন সমস্ত বুঝিয়া সাহ্লাদে তাহাই অমৃত বোধে ভোজন করিলেন।

এইরূপে যখন তাঁহাদের আকাঙ্খারহিত পুণ্যময় জীবন অতিবাহিত হইতেছিল, তখন তদানীন্তন নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র তাঁহাদের এই দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া কিছু সাহায্য-মানসে এক দিন তাঁহাদের কুটীরে পদার্পণ করেন। রামনাথ তখন একাগ্রমনে পাঠ দেখিতে ছিলেন, সুতরাং প্রথমে রাজাকে দেখিতে পান নাই। পরে সবিশেষ আদর করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা উপবিষ্ট হইয়া কথান্তরে রামনাথকে তাঁহার কিছু অনুপপত্তি আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে রামনাথ উত্তর করেন, "মহারাজ! সম্প্রতি চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, আর এখন কিছুই ত অনুপপত্তি দেখিতেছিনা।" এই উত্তরে মহারাজ আশ্চর্য্য হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও সস্ত্রীক রামনাথ তাঁহার দান অস্বীকার করেন। এই সময়ে কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণের বাটী জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগমন করেন ও তদুপলক্ষে এক মহতী সভা আহূত হয়। সেই সভায় ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপের নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ শিবনাথ বাচস্পতিপ্রমুখ পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু দিগ্বিজয়ীর প্রশ্নের উত্তরদানে সকলে অক্ষম হইলে এই নির্লোভী মহাপণ্ডিত বুনো রামনাথই নদীয়ার চিররক্ষিত সম্মান রক্ষা করেন।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি তাঁহার পিতা শঙ্কর তর্কবাগীশের পরলোকের পর প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়েন। কথিত আছে, ইঁহার পিতার শ্রাদ্ধসভায় দেশমান্য যাবতীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর সমাবেশ হয় এবং সেই সভায় ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এক পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে ও নবদ্বীপের যশোহানি করিতে উদ্যত হয়েন। এই

সময়ে শিবনাথ দানোৎসর্গ করিতেছিলেন; তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহার প্রিয় ভূমি নবদ্বীপের যশোহানি হয় দেখিয়া দানোৎসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগন্নাথের সম্মুখীন হইয়া তর্ক দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করেন।

শিবনাথের পর কাশীনাথ চূড়ামণি প্রধানরূপে গণ্য হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর দণ্ডী নামে একজন কিয়দ্দিবসের জন্ত প্রধানরূপে গণ্য ছিলেন। তৎপরে শ্রীরাম শিরোমণি প্রাধান্ত লাভ করেন। ইঁহার সময়ে নলডাঙ্গায় মাধব তর্ক-সিদ্ধান্ত নামে একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, তিনি "সুবোধা" নামে শিরোমণি-কৃত পদার্থতত্বের এক টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীরাম শিরোমণির পরে তৎপুত্র হরমোহন চূড়ামণি প্রাধান্ত লাভ করেন। ইনি ১৭৮৫ শকে বা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে "সামান্ত লক্ষণা বাখ্যা" নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রাধান্ত সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও প্রসন্ন তর্করত্ন প্রধান পণ্ডিত। এই সময়ে ১৮৬৪ অব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ই বি কাউয়েল সাহেব গবর্ণমেণ্টনিয়োজিত হইয়া নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে আগমন করেন। তিনি যখন এখানে আসেন, তখন প্রধান পণ্ডিত সকলেই কুচবিহারের বৃদ্ধ রাজার শ্রাদ্ধে আহুত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে সমগ্র নদীয়ায় দ্বাদশটী টোল ও সেই সকলে সার্দ্ধ একশত মাত্র ছাত্র গণনা করিয়াছিলেন। এই সকল টোলের মধ্যে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রসন্ন তর্করত্ন মহাশয়ের টোলই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছিলেন।* এই

*এই চতুষ্পাঠী গৃহ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"It was built for him by a Hindu gentleman of Lucknow and is really an elegant building, occupying about half an acre of land. The quadr-angle inside, is about 30 yds square and contains 30 rooms for the students. The rooms are generally about 9 feet long and 8 wide, with a window and a door; The corner rooms are rather longer. More than half of one side is given up to lecture-hall. This stands on a platform raised some five feet from the ground, it has two apartments, each about 33 feet in length, the outer is ten and the inner 12 feet wide, and the front is supported by 6 pillars, which produce a very good effect." এই টোল নবদ্বীপে সাধারণতঃ পাকা টোল নামে খ্যাত এবং ইহাই বুনো রামনাথের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

টোলগৃহ বাবুলাল নামক জনৈক লক্ষ্ণৌবাসী বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দেন এবং তথাগত ছাত্রবৃন্দের অশনের ব্যয়ও স্বীয় স্কন্ধে বহন করেন।

হরমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রধান পদে বৃত হয়েন। ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রাধান্যকালমধ্যে মহামহোপাধ্যায় ৺মধুসূদন স্মৃতি-রত্ন, ৺প্রসনকুমার তর্করত্ন, ৺হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ৺মথুরানাথ পদরত্ন, ৺লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, ৺প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, ৺রাম নাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ৺শ্রীনাথ শিরোমণি প্রমুখ অধ্যাপক মহাশয়গণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরে ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রধান নৈয়ায়িক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে নবদ্বীপে তাঁহার চতুষ্পাঠী ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম, অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং আশুতোষ তর্কভূষণ এই তিন জন অধ্যাপকের ৩ খানি ন্যায়ের চতুষ্পাঠী আছে। এই চারিখানি ন্যায়ের চতুষ্পাঠীতে বৎসরে অন্যূন ৫০ জন ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্মৃতির দশখানি ও বেদান্ত পাঠের একখানি চতুষ্পাঠী সম্প্রতি নবদ্বীপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

স্মৃতি।

নবদ্বীপ বিগত কয়েক শতাব্দীতে ন্যায়শাস্ত্রে যেরূপ উন্নতি করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চ-দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রের আমূল সংস্কার ও আলোচনা করিয়া উক্ত শাস্ত্রেও আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। স্মৃতির অপর নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র সকল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুনিগণ কর্ত্তৃক তৎকালীন সমাজবন্ধনের জন্য সংগৃহীত। শাস্ত্রে মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি প্রধানতঃ ঊনবিংশ জন স্মৃতিকারের সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। * অনেক বিষয়ে এই সকল বিভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়,

* মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী॥

সুতরাং কোন্ মত গ্রাহ্য অথবা কোন্ মত প্রামাণিক, তাহা স্থির করা অতি দুরূহ—এই কারণে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদী মতের মধ্যে একটা সাম্যতা রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতগণ মীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল মীমাংসকগণের মধ্যে জৈমিনী, মনুটীকাকার মেধাতিথি, কুল্লুকভট্ট, "ধর্ম্মরত্ন"কার জীমূতবাহন, বিবাদচিন্তামণিকার মিশ্র বাচস্পতি, শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রধান মধ্যে পরিগণিত। ইঁহাদের মধ্যে কুল্লুকভট্ট ও শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালী। কুল্লুক ভট্ট তৎকৃত মনুসংহিতার টীকায় এইরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

"গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈ র্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্ট দিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টোঽভবৎ।

ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কাশীতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া "মন্বর্থমুক্তাবলী"নাম্নী মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষকালে নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ শ্রীবরাচার্য্য ইঁহার পিতা, ইঁহার কৃত কৃত্যতত্ত্বার্ণব, দায়তত্ত্বার্ণব, উদ্বাহতত্ত্বার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে আদৃত। ইঁহার সময় হইতেই নবদ্বীপে স্মৃতিশাস্ত্রচর্চ্চার বিকাশ হয় এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উহার প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্যাচার্য্য।

রঘুনন্দন খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।* ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তদানীন্তন স্মার্ত্ত পণ্ডিত "সময় প্রদীপ"-

---

পরাশর ব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

* "নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দকেন পূরিতা"
জ্যোতিষতত্ত্বে রবি-সংক্রান্তি গণনা।

অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাব্দে পূরণ করিবে। তাঁহার কৃত জ্যোতিষতত্ত্ব সঙ্কলনের কাল এইরূপ

রচয়িতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঔরসে রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি রঘুনন্দন যেমন মেধাবী, তেমনি শিষ্ট ও শান্ত স্বভাব ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্যাদিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং সুন্দর সুন্দর শ্লোকরচনায় পারদর্শী হয়েন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই সময় নবদ্বীপের নবযুগ। পরম ভাগবত শ্রীমন্ কৃষ্ণচৈতন্য, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি মনীষিগণ এই সময়ে বিদ্যমান। দেশ তখন সর্ব্ববিষয়ে নবহিল্লোলে টলটলায়মান।

মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বলে জাতিভেদপ্রথা শিথিল হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণের গুরুত্বের অনেক লাঘব হইয়াছিল। রঘুনাথের নব ন্যায় দেশে একপ্রকার নাস্তিকতা আনয়ন করিতেছিল, আগমবাগীশের তন্ত্রোক্ত মত বামাচারের কৃষ্ণ আবরণে ব্যভিচার ও সুরা স্রোতের প্রশ্রয় দিতেছিল; ওদিকে মুসলমানগণের সুদীর্ঘকালের শাসনে ও সংস্পর্শে সমাজের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার সর্ব্বপ্রকারে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। এই টলটলায়মান সমাজ দৃঢ়ীকরণেও তৎ-কালোচিত সমাজগঠনের ঐকান্তিক প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিতে বর্ত্তমান যুগের মনু, রঘুনন্দন অগ্রসর হইয়াছিলেন। রঘুনন্দন সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ঋষিগণপ্রবর্ত্তিত সমস্ত বিধি যথাযথ আচরিত হইতে পারে না; সুতরাং এই সকল কঠোর বিধি কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দেশকাল পাত্রোচিতরূপে সংস্কারে মনোনিবেশ করেন এবং স্বীয় মত দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থের তিনি এইরূপ তালিকা প্রদান করিয়াছেন :—

"মলিম্লুচে দায়ভাগে, সংস্কারে শুদ্ধিনির্ণয়ে।
প্রায়শ্চিত্তে বিবাহেচ তথৌ জন্মাষ্টমীব্রতে॥
দুর্গোৎসবে ব্যবহারতত্ত্বে কাদশ্যাদি নির্ণয়ে।
তড়াগভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গ ত্রয়ে ব্রতে॥

লিখিত হইল। উক্ত গ্রন্থখানি তাঁহার শেষ বয়সের রচনা বলিয়া গ্রাহ্য করিলে ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব কাল কল্পনা করিতে হয়। অতএব শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণ কালের প্রায় ১৫।২০ বৎসর পরে তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়।

প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুযজ্ঞকে।
দীক্ষায়ামাহ্নিকে কৃত্যে, ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্য-বিচারণে।
ইত্যষ্টাবিংশতিস্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥"

সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপে সংস্কৃত হইবার পর তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণানন্তর ও সর্ব্বস্থানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের সহিত বিচারে স্বীয় মত সংস্থাপন করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচারার্থী হয়েন এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে শীঘ্রই আত্মমত স্থাপনে সমর্থ হয়েন। এই সময়ে স্মার্ত্ত শব্দ যোগরূঢ় হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিত। তাঁহার মত তখন সকলে এতই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে থাকেন যে, কথিত আছে—একদিন প্রাতঃকালে নবদ্বীপের গঙ্গাতটে শিবপূজাকালীন রঘুনন্দনের বস্ত্রের কচ্ছদেশ তাঁহার অজ্ঞাতসারে মুক্ত হইয়া যায়। রঘুনন্দন তখন ধ্যানমগ্ন—বাহ্যবিষয়ে একেবারে অজ্ঞান, সুতরাং কাছা খুলিয়া গিয়াছে, ইহা আদৌ জানিতে পারেন নাই। এই কালে নবদ্বীপের ঘাট সমুদায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। * সহস্র সহস্র লোকে সকল সময়েই এই ঘাট পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর স্নান, পূজার্চ্চনা, পাদচারণ, এমন কি ছাত্রাধ্যয়ন ও তর্কযুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই এখানে সমাহিত হইত। সমবেত পূজানিরত পণ্ডিতমণ্ডলী স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকে ঐরূপে মুক্তকচ্ছ হইয়া পূজায় নিরত দেখিয়া উহাই শাস্ত্রোক্ত প্রথা মনে করিয়া সকলেই মুক্তকচ্ছ হইয়া পূজা করিতে থাকেন। পূজান্তে স্মার্ত্ত, সকলকে তদবস্থ দেখিয়া কারণানুসন্ধানে সমস্ত অবগত হইয়া মহাকৌতুক করিতে থাকেন।

কথিত আছে ঃ—রঘুনন্দন তাঁহার মত স্থাপনার্থ যখন দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া ৺গয়াক্ষেত্রে পিতৃ মাতৃ কার্য্যের জন্য উপস্থিত হয়েন, তখন গয়ালী পাণ্ডাগণ অনেক পণ গ্রহণ করিয়া তবে ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে যাত্রীদিগকে পিণ্ডদান করিতে দিতেন। লোকমুখে রঘুনন্দনের খ্যাতি ও যশ শ্রুত থাকিলেও পাণ্ডাগণ তখনও

* নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষলোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ॥

কেহ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, সুতরাং তদানীন্তন প্রথানুযায়ী গয়ালী পাণ্ডাগণ তাঁহার নিকটেও উচ্চপণ চাহিয়া বসেন এবং স্মার্ত্তের ঐকান্তিক কাতরতায় দয়ার্দ্র না হইয়া অর্থের জন্য জেদ করিতে থাকেন। উহাতে স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন শাস্ত্রানুযায়ী ক্রোশব্যাপী গয়াক্ষেত্র ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া মন্দির হইতে দূরে একপ্রান্তরে পিণ্ডদানের উদ্যোগ করেন। এখন পাণ্ডারা তাঁহাকে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য জানিতে পারিয়া নিজেদের ত্রুটী স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে সমাদরে মন্দিরে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। কারণ, তাঁহারা বেশ জানিতেন, সেই দিন স্মার্ত্ত যদি প্রান্তরে পিণ্ড দান করিতেন, তাহা হইলে আর কেহ পাণ্ডাদের অযথা অত্যাচারে পীড়িত হইতে মন্দিরে গমন করিত না। এই সকল কাহিনী হইতে রঘুনন্দন তদানীন্তন হিন্দুসমাজে কি উচ্চতম আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়।

এই সময়ে হিন্দুবিধবাগণের আচার-ব্যবহার ঠিক শাস্ত্রসম্মত না থাকায় এবং তৎসম্বন্ধে সমাজের শিথিলতা দেখিয়া স্মার্ত্ত একাদশীতে উপবাসাদির কঠোর নিয়ম প্রচলিত করেন। তিনি তিথিতত্ত্ব নামক গ্রন্থে প্রত্যেক তিথিতে আচরণীয় কার্য্যাদির ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন; এবং আহারাদির বিষয়েও সবিশেষ সংস্কার করিয়া যান। কথিত আছে, এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক গোপনে সিদ্ধ চাউল ও মসূর ডাউল ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। স্মার্ত্ত উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের প্রকাশ্য ব্যবহারবিধি দেন। এইরূপে সর্ব্ববিষয়েই তিনি সংস্কার সাধন করিয়া যান।

স্মৃতিরাজ্যে এইরূপে একাধিপত্য করিয়া স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন সপ্ততি বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম।

রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর অনেকেই তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া গ্রামে গ্রামে ব্যবস্থাদি দিবার নিমিত্ত টোল স্থাপন করেন। তিনি এইরূপে বহুশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতের আয়ের সংস্থান করিয়া যান। অদ্যাপি তাঁহার স্থাপিত নব্যস্মৃতি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে। ইহাঁর পরে সময়ে সময়ে এক এক জন পণ্ডিত তাঁহারই গ্রন্থ সমূহের টীকা ও ভাষ্য সঙ্কলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাজা রামজীবনের সভায় শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমকে প্রধান

স্মার্ত্তরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্মৃতি ব্যতীত কাব্য রচনাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার "পদাঙ্কদূত" একখানি কৃষ্ণলীলাময় সুখপাঠ্য কাব্য। তিনি উক্ত গ্রন্থে এই রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন:—

"শাকে নায়ক-বেদ-ষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা স্মরন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতরচনং বিদ্বন্-মনোরঞ্জনং
শ্রীল শ্রীযুত রামজীবন-মহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমের পর চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নবদ্বীপে স্মৃতির মান রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত স্মৃতিপ্রদীপ ও স্মৃতিসার-সংগ্রহ, সংকল্পদুর্গভঞ্জন ও ধর্ম্মবিবেক প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য দিতেছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল পণ্ডিত বর্ত্তমান থাকিয়া বিশেষ রূপে খ্যাত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, দৈত্য বীরেশ্বর ও রামানন্দবাচস্পতি শীর্ষস্থানীয়। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের টীকা ও "দায়ক্রমসংগ্রহ" নামক দায়ভাগ সংক্রান্ত এক গ্রন্থ রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক্ সাহেব এই "দায়ক্রমসংগ্রহ" ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্। ইনি উদ্বাহ, আচার, তিথি, দায়, সম্বন্ধ, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, দুর্গোৎসব প্রভৃতি কতকগুলি নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কথিত আছে;—ঐতিহাসিক রাজা রাজবল্লভের কন্যা বালিকা-বয়সে বিধবা হওয়ায়, যাহাতে বালবিধবার বিবাহ দেশে প্রচলিত হয়, তাহার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজবল্লভ কতিপয় পণ্ডিতকে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রেরণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র বহু বিষয়েই রাজা রাজবল্লভের নিকট ঋণী ছিলেন, সুতরাং এ বিষয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েন। কিন্তু এই গোপালন্যায়ালঙ্কারই অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ বলে বিধবা-বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় ও সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশ কাল পাত্রানুপযুক্ত, তাহা প্রতিপন্ন করেন। বিধবা-বিবাহরূপ ঘোর সমাজ-

বিপ্লব এইরূপ মুকুলেই শুষ্ক হইয়া যায়। এই সময়েই ইংরাজগণ বাঙ্গালার শাসন ও কিয়ৎ পরিমাণে বিচারভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিচার সম্বন্ধে হিন্দুর ব্যবস্থায় তাঁহারা একেবারে অজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন হয়। এই গোপাল ন্যায়ালঙ্কারই প্রথম মাসিক বৃত্তি অবধারণে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হন। ইঁহার পর বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন এই পদে নিযুক্ত হয়েন।

বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন ও "আহ্নিক-আচার" প্রণেতা রামানন্দ বাচস্পতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভার অলঙ্কার-স্বরূপ ছিলেন। উক্ত বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চাননই "দৈত্য বীরেশ্বর" নামে খ্যাত। কথিত আছে;—একদিবস বীরেশ্বর তাঁহার কোন এক ভৃত্যের উপর অতিশয় রোষপরায়ণ হইয়া তাহাকে একটী চড় মারেন। তাঁহার একমাত্র চপেটাঘাতেই ভৃত্যটী প্রাণ ত্যাগ করে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দয়ায় ব্রাহ্মণ সে যাত্রা অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু মহারাজ বলিলেন—"পণ্ডিত! আপনার কার্য্যটী দৈত্যের ন্যায় হইয়াছে," তদবধি তিনি ও তাঁহার বংশীয়েরা দৈত্য নামে খ্যাত হয়েন। সে কালে কোনও লঘু পাপের শাস্তি দিতে হইলে কুক্রিয়াশীল ব্যক্তির নামের সহিত উক্ত কার্য্যের যোগ করা হইত। এই রূপ শুনা যায় যে, একবার কোন এক ব্যক্তি প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন না করিয়াই বাসিমুখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়। রাজা তাহার শ্লেষ্মা ও লালা-সংলিপ্ত মুখ দর্শনে তাঁহাকে "বাসি মুখো" বলিয়া সম্বোধন করেন; তদবধি ঐ ব্যক্তি "বাসি মুখো" নামে খ্যাত হয়। ইহাদের বংশ শান্তিপুরে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সভায় কৃষ্ণকান্তবিদ্যাবাগীশ ও লক্ষ্মীকান্তন্যায়ভূষণ প্রধান স্মার্ত্তরূপে বিরাজিত ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত, ন্যায় ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ন্যায়ের গ্রন্থ "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" এবং জীমূতবাহন-কৃত দায়ভাগের টীকা লিখিয়া উভয় শাস্ত্রেই ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপস্থ উত্তর মাঠে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে এক গোপালমূর্ত্তি উত্থিত হয়েন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তিনি "গোপাললীলামৃত" রচনা করেন। এই গোপাল অদ্যাবধি রাজবাটীতে আছেন। কথিত আছে;—কৃষ্ণকান্ত অতিশয় দাম্ভিক ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সময়ে নবদ্বীপে

সংস্কৃত অতি হীন অবস্থায় পরিণত হইতেছিল এবং একমাত্র তিনিই নবদ্বীপের জ্ঞানগৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার আসন্নকালে যখন আত্মীয় স্বজনে তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করেন, তখন তাঁহার একজন আত্মীয় কহিলেন, "খুড়া মহাশয় গঙ্গায় আনা গেল প্রণাম করুন"। তাহাতে বিদ্যাবাগীশ বলেন "বাপু হে আনা গেল নহে, আনা রহিল; আমি গেলে নদের পনর আনা যাইবে, আনা রহিবে।" কেহ কেহ বলেন "তিনি মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করেন :—

"অধিগগনমনেকাস্তারকা দীপ্তিভাজঃ
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তু প্রভুত্বং।
দিশি দিশি বিলসন্তঃ সন্তু খদ্যোত-পোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিন্নলোকৈব্যলোকি॥"

অর্থাৎ সূর্য্যাস্তে তারাগণও দীপ্তিভাজন হয়, প্রতিগৃহে দীপ সকল প্রভুত্ব প্রদর্শন করে এবং চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোত সকলও দীপ্তি পায়, অতএব আমার ন্যায় সূর্য্য অস্ত গমন করিলে নদীয়ায় বিদ্যাকাশে এখন ক্ষুদ্র পণ্ডিতগণও প্রভুত্ব করিবে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন নবদ্বীপে প্রধান স্মার্ত্তরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। এই মহাপুরুষ পূর্ব্বে শাক্ত-মতাবলম্বী থাকিলেও শেষ জীবনে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হয়েন এবং "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং স্বীয় চতুষ্পাঠীতে একটী হরিসভা স্থাপন করেন। এই অবধি নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই মহাপ্রভুর মতানুবর্ত্তী বৈষ্ণবগণের উপর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন। কথিত আছে;—কৃষ্ণনগরের রাজগণেরও মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ভাল লাগিত না। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় একজন বৈষ্ণবের সহিত আলাপ-কালীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ ভাবের কোন বাক্য বলিয়াছিলেন; তাহাতে ঐ স্পষ্টবাদী বৈষ্ণবটী শ্লেষব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করেন, "মহারাজ আপনার এই চৈতন্যদ্বেষ স্বাভাবিক ও শাস্ত্রসম্মত; কারণ পুরাণাদি সমস্ত পাঠ করিয়া দেখুন, যে দেশে যখনই বিষ্ণু কলেবর গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই সেই দেশের পরপারবাসী রাজগণের (দৈত্যগণের) সঙ্গে তাঁহার বিবাদ ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অযোধ্যায় রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলে অপর পারস্থ রাবণের সহিত বিবাদ হয়। গোকুলে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে পরপারস্থ কংসের বিদ্বেষ জন্মে। এই রূপে প্রমাণিত হইতেছে আপনার এই বিদ্বেষ শাস্ত্রানু-

মোদিত ও স্বাভাবিক। ব্রজনাথের পুত্র মথুরানাথ পদরত্ন প্রধান পদে, পরে লালমোহন বিদ্যাবাগীশ তৎপরে শিবনাথ বাচস্পতি প্রধান পদে বৃত হয়েন।

বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বস্থলীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রধান স্মার্ত্তের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তত্রত্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিদ্যারত্নও একটি প্রবীণ স্মার্ত্ত। এখন নবদ্বীপে সর্ব্ব সমেত দশখানি স্মৃতির টোলে অন্যূন ১০০ শত জন ছাত্র প্রতিবৎসরে স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অধ্যাপকগণের মধ্যে বঙ্গবিবুধী-জননী সভার সম্পাদক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ, বর্দ্ধমানরাজের স্মার্ত্ত-পণ্ডিত শ্রীসিতিকণ্ঠ বাচস্পতি (ইনি এখন বর্দ্ধমানে থাকেন) শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন, চৈতন্যচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীতারাপ্রসন্ন চূড়ামণি, শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, নদীয়া রাজপুরোহিত শ্রীনিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ—প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। এই সকল অধ্যাপক মহাশয়গণের মধ্যে পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন কাব্য ও অলঙ্কারে অদ্বিতীয়। সুচারু দেবভাষায় সুললিত কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। উপস্থিত পাদপূরণে ও মুখে মুখে শ্লোক রচনাতেও তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব। এই সকল টোলধারী অধ্যাপক ব্যতীত নবদ্বীপে এক্ষণে শ্রীকেদারনাথস্মৃতিভূষণ, শ্রীহরিদাসন্যায়সিদ্ধান্ত, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি, শ্রীউমেশচন্দ্র তর্করত্ন, শ্রীদ্বারিকানাথ শিরোমণি—প্রমুখ বহুঅধ্যাপককল্প পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন।

বেদান্তশাস্ত্রে স্বামী শিবগোবিন্দ ভারতী ও শ্রীদামোদরশাস্ত্রী বিখ্যাত।

এতৎ প্রসঙ্গে নিকটবর্ত্তী বিল্বপুষ্করিণীর শ্রীসুরেন্দ্রনাথতর্করত্ন, শ্রীদেবীপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন, শ্রীমৃত্যুঞ্জয়স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযদুনাথ সর্ব্বভৌম; শান্তিপুরের শ্রীরামনাথ তর্করত্ন, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, উলার শ্রীগদাধর শিরোমণি, কাঞ্চননগরের শ্রীমৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, পূর্ব্বস্থলীর শ্রীগঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ন; চাকদহের শ্রীদুর্গাপতি শিরোমণি, খাঁইসমালীর শ্রীস্মৃতিকণ্ঠ শিরোরত্ন, মাঝিচারির শ্রীকুমারনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম নদীয়ার বর্ত্তমান চতুষ্পাঠীধারিগণের নামের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন পুরাণ বা ভক্তিশাস্ত্রে নদীয়ার মহাপ্রভুর সেবক শ্রীযুক্ত প্যারীলাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভাগবতভূষণ, শ্রীমাধবচন্দ্র গোস্বামী ভাগবতভূষণ প্রভৃতি পৌরাণিকগণ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।



১ মহামহোপাধ্যায়	যদুনাথ সার্ব্বভৌম ১
২ ন্যায়রত্ন কবিভূষণ	অজিত নাথ ২
৩ ন্যায়রত্ন	অবিনাশ চন্দ্র ৩
৪ স্মৃতিভূষণ	স্মৃতি কণ্ঠ ৪
৫ স্মাতভূষণ	নৃসিংহ প্রসাদ ৫
৬ ভাগবৎরত্ন	প্যারী লাল ৬
৭ ভাগবৎরত্ন	কুঞ্জ লাল ৭
৮ তর্কভূষণ	আশুতোষ ৮
৯ স্মৃতিতীর্থ	যোগেন্দ্র নাথ ৯
১০ বিদ্যাভূষণ	নিরঞ্জন ১০
১১ কাব্যতীর্থ	অহিভূষণ ১১
১২ পণ্ডিত	দ্বারকা নাথ ১২
১৩ ন্যায়চঞ্চু	সীতা নাথ ১৩
১৪ জ্যোতিষার্ণব	বিশ্বম্ভর ১৪
১৫ তর্করত্ন	হরিশ্চন্দ্র ১৫
১৬ ভাগবৎভূষণ	শশী মোহন ১৬

নবদ্বীপ বিদগ্ধ-জননী তলায় সমবেত বর্ত্তমান পণ্ডিত মণ্ডলী।

জ্যোতিষ।

ন্যায় এবং স্মৃতিশাস্ত্রের ন্যায় নবদ্বীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। কত কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে পৃথিবীর আদিম জ্ঞানভাণ্ডার বেদের মধ্যেও নাতি-বিস্তৃত ভাবে জ্যোতির্বিদ্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ যজ্ঞকর্ম্মাত্মক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞানের আবশ্যক। জ্যোতিঃশাস্ত্রই সেই কাল-জ্ঞানের একমাত্র উপায়। এই জন্যই জ্যোতিষ বেদের ছয়টি অঙ্গের অন্যতম অঙ্গ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে উল্লিখিত হইয়াছে,—ময়নামক অসুরের প্রার্থনায় স্বয়ং সূর্য্যদেব তাহার অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত স্বীয় দেহ হইতে এক ঋষিকে সৃষ্টি করেন; তিনি ময়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ বিরচিত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচিত হইবার পর আর্য্যভট্, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য, কেশব-দৈবজ্ঞ, গণেশ-দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অসংখ্য জ্যোতির্ব্বিৎ ভারতীয় জ্যোতিষ-বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভটই সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর গতি নির্ণয় করেন। বরাহমিহিরের গ্রন্থে জ্যোতির্ব্বিদ্যা-সংক্রান্ত নবাবিষ্কৃত অনেক তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভাস্করাচার্য্যই প্রথম মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কার করেন। কেশবদৈবজ্ঞ ও গণেশদৈবজ্ঞ প্রভৃতির গ্রন্থে তিথি নক্ষত্র ও গ্রহণ-গণনাদির সুন্দর নিয়ম দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন অনন্তদৈবজ্ঞ-প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার জাতক-সংক্রান্ত (জন্মপত্রিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে) বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গদেশে কতকাল পূর্ব্বে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন লিখিত বিবরণ না থাকিলেও বঙ্গীয় জ্যোতির্ব্বিৎ-সম্প্রদায়ের কুল গ্রন্থ হইতে এদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চ্চার একটা স্থূল সময় নির্ণয় করা যায়। এখন বঙ্গদেশ বলিলে যে সীমান্তর্গত জনপদ বুঝায়, পূর্ব্বে তাহা বুঝাইত না। পূর্ব্বে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ নদীয়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, দীনাজপুর, রাজ-সাহী পূর্ণিয়া মালদহ, মুর্সিদাবাদ, চব্বিশপরগণা প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত স্থানকে "গৌড়" ও যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, বরিশাল, মৈমনসিং কমিল্লা, শিলেট, নওয়াখালি প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত স্থানকে "বঙ্গ" বলিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে শশাঙ্ক নামে এক নরপতি মহাপ্রতাপের সহিত গৌড়রাজ্য শাসন

করিতেন। এক সময় উক্ত নরপতি কোন দারুণ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নানাবিধ চিকিৎসার দ্বারা রোগমুক্ত হইতে না পারিয়া অবশেষে দৈবকার্য্য সম্পাদনের জন্য অভিলাষী হইয়া শাস্ত্রজ্ঞানী ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন গৌড় ও বঙ্গে ব্রাহ্মণ বসতি ছিল না এমন নহে, সপ্তসতী নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা ক্রিয়াহীন মুর্খ। কারণ, তখনবৌদ্ধগণ দেশময় স্বীয় ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে নিরত। রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী এবং পরম আস্তিক ছিলেন। সুতরাং তিনি গ্রহযাগ সম্পাদনের নিমিত্ত মন্ত্রীর সাহায্যে সরযূতীর হইতে দ্বাদশটি বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন*। ঐ সকল ব্রাহ্মণের যজ্ঞের প্রভাবে রাজা রোগমুক্ত হইলেন এবং যাগকারী ব্রাহ্মণদিগকে

---

* "শ্রীসূর্য্যং প্রণিপত্যাগ্রে তথৈব কুলদেবতাং।
ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাণাং কুলপঞ্জী যথাবিধি ॥
সুরম্যে সরযূতীরে নানাবৃক্ষসমাকুলে।
সুরসালফলৈঃ পুষ্পৈরাকীর্ণে চ মনোহরে ॥
বসন্তি বিপ্রশার্দ্দূলা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
নানাশাস্ত্রেষু কুশলা জপযজ্ঞপরায়ণাঃ ॥
কদাচিন্নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কো গৌড়ভূপতিঃ।
পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্লেশং প্রাপ স ধার্ম্মিকঃ ॥
বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতঃ সম্যঙ্ ন মুক্তো রোগ-সঙ্কটাৎ।
ততঃ স্বস্ত্যয়নং কর্ত্তুমিয়েষ নরপুঙ্গবঃ ॥
মন্ত্রিণা প্রেরিতা দূতা আনীতা দ্বিজসত্তমাঃ।
আহূয় সরযূতীরাৎ নৃপস্তাদেশতস্ততঃ ॥
* * * *
* * * *
গ্রহজ্ঞানং বিদিত্বাতু তেষাং রাজ্ঞা মহাত্মনাং।
গ্রহযজ্ঞ-বিধানার্থং বৃতাস্তে নিজমন্দিরে ॥
* * * *
* * * *
সম্পাদ্য বিধিবদ্রাজ্ঞো গ্রহযজ্ঞং দ্বিজাতয়ঃ।
সদারা নিবসন্তিস্ম গৌড়দেশে নৃপাজ্ঞয়া ॥"
(নদীয়া-বঙ্গসমাজ—গ্রহবিপ্রকুলপঞ্জিকা)

স্বীয় রাজ্যে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির স্বাভাবিক আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া সপরিবারে আসিয়া এদেশে বসতি স্থাপন করিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের জ্যোতিঃশাস্ত্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল এবং সর্ব্বদাই তাঁহারা গ্রহযাগাদি সম্পন্ন করিতেন, তজ্জন্য এদেশে 'গ্রহবিপ্র' নামে বিখ্যাত হইলেন*। রাজা শশাঙ্কের সময়ে গ্রহবিপ্রগণ সুখে ও মহাসম্মান প্রতি-পত্তির সহিত গৌড়দেশে বাস করিতেছিলেন। কিছুদিন পরে গুপ্তবংশীয় শশাঙ্কের বংশধরগণের রাজ্য গেল, মগধে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশ ও বঙ্গে পুন-রুত্থিত-হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সেনরাজগণ রাজ্য করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত রাজ-বংশের প্রথম রাজা আদিশূর (বীরসেন) কান্যকুব্জ হইতে ৯৯৯ শকাব্দে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। আদিশূর-বংশীয় কয়েকজন নৃপতির পর পালবংশীয়েরা গৌড় অধিকার করেন। অবশেষে সেনবংশ প্রবল হইয়া পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। তখন হিন্দুনরপতির শাসনাধীনে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং বঙ্গের আদিমনিবাসী সপ্তশতী ও সরযূপারী-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের অবস্থা হীন হইয়া পড়িল। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণেরা বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু শেষে দায়ে পড়িয়া বঙ্গের অন্য-তম আদিমনিবাসী আচারহীন শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত সপ্তশতী-ব্রাহ্মণের কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়া বিস্তৃত সপ্তশতী-ব্রাহ্মণসমাজের অধিকাংশ সম্পন্ন গৃহস্থকে নিজকুক্ষিগত করিয়া ফেলিলেন। সপ্তশতীরা আপন আপন গোত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পঞ্চগোত্র গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ নিজ গোত্র রক্ষা করিয়াও কান্যকুব্জা-গত ব্রাহ্মণগণের সহিত চলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কনোজাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গাঞি প্রতিষ্ঠিত হইল। ঘটক বা কুলজ্ঞেরা প্রচার করিলেন ;— "পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঞি ইহা ছাড়া বামন নাই।" এই সময় সকলেরই কান্য-কুব্জাগত ব্রাহ্মণ-সমাজের সহিত মিলিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, অপেক্ষা-

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথবসু নদীয়াবঙ্গসমাজের গ্রহবিপ্র ও অন্যান্য গ্রহবিপ্র, সকলকেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। কিন্তু কুলপঞ্জিকায় সরযূপারীগ্রহবিপ্র ও শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র পৃথক্ পৃথক্ সমাজে বিভক্ত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। রাজা শশাঙ্কের আনীত সরযূপারী ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশকে লইয়া নদীয়াবঙ্গসমাজ গঠিত।

কৃত দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবশিষ্ট আদিম সপ্তশতী ও জ্যোতিষী সরযূপারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ একটু অবস্থাপন্ন হইলেই নানা কৌশলে প্রবল ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ে মিশিতে লাগিলেন। আবার কতকগুলি সপ্তশতী অবস্থা-হীনতা প্রযুক্ত সরযূপারি-গ্রহবিপ্রদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহাও কুলজীতে লিখিত আছে। এই রূপে বঙ্গদেশের সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সমাজের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল ও সরযূপারী গ্রহবিপ্রগণ সমাজের অধিকাংশকে হারাইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায় বঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেনবংশীয়গণ নবদ্বীপ-রাজধানীতে অবস্থান করিয়া বঙ্গদেশ শাসন করেন, তখনও গতাবশিষ্ট গ্রহবিপ্র বা জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলেও নিতান্ত অল্প ছিল না। সেনবংশীয়দের সময়ে ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ সমাদর ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেও নবদ্বীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে তাঁহার জীবনের ভাবি ফলাফল গণনা করিয়া নবদ্বীপের জ্যোতির্ব্বিৎ গ্রহবিপ্রগণ পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দমজুমদার যখন আন্দুলিয়া গ্রামে বাস করেন, সেই সময়ের কয়েকটী জ্যোতির্ব্বিৎ গ্রহবিপ্রবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে যথাক্রমে ঐ সকল বংশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

গর্গ-গোত্রীয়—

হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণব।

হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণব একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি গণিত ও জাতক উভয়বিধ জ্যোতিঃ শাস্ত্রেই বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তদানীন্তন কালে হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণবের ন্যায় কৃতী জ্যোতির্ব্বিৎ বঙ্গে কেহই ছিলেন না। ভবানন্দ মজুমদার এই বিদ্যার্ণব মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। হৃদয়ানন্দের কৃত "জ্যোতিঃসারসংগ্রহ" একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণব বোধ হয় অতিশয় দীর্ঘজীবী ছিলেন, তজ্জন্যই আমরা ভবানন্দমজুমদারের প্রপৌত্র

মহারাজ রামজীবনের সময়েও যে তিনিই নদীয়া রাজধানীর জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত ছিলেন, এইরূপ প্রাচীন পরম্পরার মুখে গল্প শুনিতে পাই। রাজা রঘুরামের সময় হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণবের পুত্র বিষ্ণুদাস জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত হন। ইঁহার কোন উপাধি ছিল কি না জানা যায় না। তাহার পর, রাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়েই নদীয়ার রাজবংশের চরম উন্নতি হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার আকারে স্বীয় রাজধানীতে একটি "পঞ্চরত্নসভা" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় বরাহমিহিরের ন্যায় বিষ্ণুদাসের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রামরুদ্রবিদ্যানিধি অন্যতম রত্ন ছিলেন। এই রামরুদ্রবিদ্যানিধি অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার কৃত কতিপয় জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং পঞ্জিকা গণনার সহজ সঙ্কেত-সূচক পুস্তকসমূহ অদ্যাপি এই বংশের কোন আত্মীয়ের গৃহে বিদ্যমান আছে।

রামরুদ্রবিদ্যানিধি সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। এক সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় স্বীয় বিস্তৃত জমিদারীর কর যথাসময়ে না দিতে পারায় নবাবকর্ত্তৃকআহূতহইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ যখনই মুর্শিদাবাদ যাইতেন, তখনই কয়েকটি প্রিয়পাত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। যে সকল পণ্ডিত মহারাজের প্রীতিভাজন ছিলেন, তন্মধ্যে রামরুদ্রবিদ্যানিধি অন্যতম। প্রতিদিনই মহারাজকে পারিষদগণ সহ নবাবের দরবারে হাজির থাকিতে হইত। নবাব তদানীন্তন বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের রাজা বলিয়া মহারাজকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার নিকট কোন না কোন হিন্দুশাস্ত্রের কথা উত্থাপন করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা-প্রসঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতেন। এক দিবস মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পারিষদগণ সহ নবাবের দরবারে উপস্থিত আছেন, এমন সময় নবাব প্রশ্ন করিলেন;— "আজ কি তিথি?" মহারাজ রামরুদ্রবিদ্যানিধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি বলিলেন "আজ পূর্ণিমা"। নবাবের জানা ছিল, পণ্ডিতদের অনেক সময় ভুল হয়, তিনি একটু রহস্য করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আজ সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎস্নাময় থাকিবে?" বিদ্যানিধি উত্তর করিলেন "হাঁ হুজুর আজ সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎস্নাময় থাকিবে"। নবাব হাঁসিয়া বলিলেন "পণ্ডিতজী আপনি মিথ্যাকথা বলিতেছেন"। বিদ্যানিধি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "না খোদাবন্দ!

আমি ঠিক বলিতেছি"। নবাব একটু রুক্ষভাবে বলিলেন "কেন আপনিই না গণিয়া লিখিয়াছেন, আজ "চন্দ্রগ্রহণ" এখন আবার কেমন করিয়া বলিতেছেন "সমস্তরাত্রি জ্যোৎস্নাময় থাকিবে?" ঐ সময়ে বঙ্গদেশে একখানি মাত্র পঞ্জিকা গণিত হইত, ঐ পঞ্জিকার গণক উক্ত রামরুদ্রবিদ্যানিধি। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় স্বয়ং পঞ্জিকা স্বহস্তে লিখিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একখানি পঞ্জিকা নবাব সরকারে ও বঙ্গের বিশেষ বিশেষ রাজা জমিদার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট কয়েকখানি পঞ্জিকা প্রেরণ করিতেন। ঐ সময় রঘুনন্দনের স্মৃতির অপেক্ষা ও অপ্রতিহতপ্রভাবে এই পঞ্জিকার ব্যবস্থা বঙ্গের সর্ব্বত্র গৃহীত হইত। নবাবের কথায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণ হইল যে, সে দিবস চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ব্ব দিবসেই গ্রহণ কালে কর্ত্তব্য বৈধ কার্য্যাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন 'কি দুর্ভাগ্য! নিতান্ত গ্রহবৈগুণ্যবশতই রুদ্রবিদ্যানিধির নবাবের সম্মুখে এই দুর্দ্দশা ঘটিল'। মহারাজ লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। রামরুদ্রবিদ্যানিধি একটু চিন্তা করিয়াই সপ্রতিভভাবে বলিলেন "খোদাবন্দ! আজ চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাইবেন না, আজ সমস্ত রাত্রি জ্যোৎস্নাময় থাকিবে।" নবাব তখনি পঞ্জিকা আনাইয়া ঐ দিনের নিম্নে রাটিখানিতে অঙ্গুলিসংযোগ পূর্ব্বক বলিলেন "সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ" এ কথাটী কাহার হাতের লেখা?" বিদ্যানিধি বলিলেন "আমি লিখিয়াছি বটে কিন্তু ঐ গ্রহণ আজ দেখা যাইবে না।" নবাব বলিলেন "যদি দেখা না যায়, তাহা হইলে পুরস্কৃত করিব কিন্তু যদি দেখা যায়?" বিদ্যানিধি বলিলেন "আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন।" এমন সময় দরবার ভঙ্গ হইল। মহারাজ বাসায় আসিয়া বলিলেন "বিদ্যানিধি করিলে কি? নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের রাজা বলিয়া নবাবের নিকট যে প্রতিপত্তি টুকু ছিল আজ হইতে সে সমুদয়ই নষ্ট হইল, এখন উপায়? আগামী কল্য তোমার কি দশা হইবে এবং কি প্রকারেই বা আমি নবাবের দরবারে মুখ দেখাইব।" বিদ্যানিধি বলিলেন "মহারাজ চিন্তা করিবেন না, গ্রহণ হইবে না।" মহারাজ বলিলেন "সর্ব্বগ্রাস গ্রহণও কি কখন না হইয়া যায়, তুমি এ কি প্রলাপ বকিতেছ, এক বৎসর মাথা ঘামাইয়া যাহা স্থির করিয়াছ, এক কথায় বলিলে তাহা হইবে না?"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় দুশ্চিন্তায় অভিভূত, তিনি তখন স্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত

হইলেন। রামরুদ্রবিদ্যানিধি মহারাজকে বলিলেন "মহারাজ আপনি নিশ্চিন্তমনে স্নানাদি করুন। আমার একটি নিবেদন, অদ্য দিবারাত্রির মধ্যে আর আমাকে খোঁজ করিবেন না, আগামী কল্য প্রত্যূষে আসিয়া আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" মহারাজ বলিলেন "বুঝিয়াছি তুমি পলাইবে, কিন্তু পলায়ন বৃথা, বাদ্‌সার মুলুক ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যেখানে যাইবে, সেখানেই ধরা পড়িবে।" বিদ্যানিধি বলিলেন "মহারাজ! প্রাণের মায়া কি এতই অধিক যে, মহারাজকে ছাড়িয়া নিজের ধিক্‌কৃত ক্ষুদ্র প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব?" মহারাজ বিদ্যানিধির তেজস্বিতাপূর্ণ স্বভাব অবগত ছিলেন, আর কিছু বলিলেন না কিন্তু নানা সন্দেহ ও কল্পনায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া রহিল। এদিকে বিদ্যানিধি মহারাজের কর্ম্মচারীদের দ্বারা একশত আটটি লোহিতবর্ণ জবাকুসুম সংগ্রহ করিলেন এবং একটি তামার ক্ষুদ্র কলস, একখানি তাম্রথালা ও অন্যান্য পূজোপকরণ লইয়া গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিলেন। তাহার পর, জলের ধার দিয়া বরাবর উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। যতদূর দেখা গেল, মহারাজের লোকেরা তাকাইয়া রহিল; তাহার পর, ফিরিয়া গিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল। মহারাজ কোন কথাই বলিলেন না। বিদ্যানিধি সহর অতিক্রম করিয়া বহুদূরে গঙ্গাগর্ভস্থ এক নির্জ্জন স্থানে পূজার দ্রব্য রাখিয়া স্নান করিলেন। তাহার পর সন্ধ্যা শেষ করিয়া একশত আটটি জবাকুসুম দ্বারা যথাবিধি স্বীয় কৌলিক উপাস্যদেব ভগবান্ সহস্রাংশুর অর্চ্চনা করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই তাম্র-কলসটি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া মন্ত্রবলে রাহুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐ কলসের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাহার পর, উহার উপরিভাগে তাম্রথালাখানি রাখিয়া পাঁচটি শিবলিঙ্গ তদুপরি স্থাপনপূর্ব্বক পূজা শেষ করিয়া একাগ্রমনে জপ আরম্ভ করিলেন। রজনী সমাগত হইল, জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক্ পুলকিত। প্রাসাদের উপরিভাগে ছাদে নবাব ও তাঁহার পারিষদগণের জন্য আসন স্থাপিত হইল। সপারিষদ নবাব উৎসুকচিত্তে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। নক্ষত্রমালা-পরিশোভিত পূর্ণশশধর নবাবের উৎকণ্ঠা দেখিয়া দূর হইতে যেন হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রহরে প্রহরে ঘড়ী বাজিতে লাগিল। যখন রাত্রি একটা বাজিল তখনও আকাশ নির্ম্মল, সামান্য একখণ্ড মেঘ পর্য্যন্ত আকাশে নাই, পূর্ণশশধরের অনন্ত জ্যোৎস্নারাশিতে জগৎ উদ্ভাসিত। নবাবের চক্ষু নিদ্রার আকর্ষণে ঢুলু ঢুলু করিতেছে, আর

বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন—"নদীয়ার রাজার পণ্ডিতটা একটা বুজরুক, কেন না আমি মৌলবী সাহেবের পত্রেও জানিতে পারিয়াছি—দিল্লীর পঞ্জিকায় লেখা আছে, "৭টা রাত্রির সময় গ্রহণ লাগিবে, ১১টার সময় ছাড়িবে এবং পূর্ণগ্রাস হইবে" সেই গ্রহণ হইল না। আর বসিয়া থাকিয়া কি হইবে, চল আমরা শুইতে যাই।" নবাব শয়ন করিতে গেলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে পুলকিত। তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছে যে, বিনিদ্র অবস্থায়ই তিনি রাত্রি কাটাইলেন। এদিকে জনপ্রাণিবিহীন গঙ্গাগর্ভে মাঘমাসের দারুণ হিম-পাতেও অটলদেহ রামরুদ্রবিদ্যানিধি নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। আর রাত্রি নাই, রজনীর বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া নিশানাথের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল। ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্রসকলও ক্রমে ক্রমে কোন্ অজানা প্রদেশে লুকাইতে লাগিল। বিদ্যানিধি জপ শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি শিব পাঁচটি গঙ্গাস্রোতে বিসর্জ্জন করিয়া তাম্রাধারটি তুলিলেই সেই প্রভাতকালে পৃথিবী যেন ধূসর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইল। নবাব শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিলেন গ্রস্তাস্ত চন্দ্রের ছায়া আকাশপটে বিলীন হইতেছে।

যখন, বিদ্যানিধি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাসায় আগমন করিলেন, তখন মহারাজ হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন "বিদ্যানিধি তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ, আজ আমি যথার্থ নবদ্বীপের পণ্ডিতের রাজা।" যথাসময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সপারিষদ নবাবের দরবারের উপস্থিত হইলেন। সেদিন নবাবের দরবারের সমস্ত রাজা, জমিদার, আমির ওমরাহের দৃষ্টি রাজার দিকে পড়িল। সকলেই বিদ্যানিধিকে দেখিবার জন্য উৎসুক। বিদ্যানিধি, গৌরাঙ্গদেহ তেজঃপুঞ্জ-কলেবর গরদের ধুতি উত্তরীয় দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া মহারাজের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। নবাব, জ্যোতিঃশাস্ত্র ও যোগ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং বিদ্যানিধির উত্তরে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর, প্রকাশ্য দরবারে বিদ্যানিধির প্রশংসা করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যানিধি বলিলেন,—"খোদাবন্দ! মহারাজের অভীষ্টের সহিত আমার অভীষ্টের কোনই পার্থক্য নাই। অতএব মহারাজকে সন্তুষ্ট করিলেই আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব।" প্রভুর প্রতি এইরূপ অকৃত্রিম প্রীতি দেখিয়া নবাব অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং বাঁকী রাজস্ব রেহাই দিয়া সে যাত্রায়

মহারাজকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। এই রামরুদ্রবিদ্যানিধি পঞ্চকোট রাজধানী ও নদীয়া-রাজধানী উভয়স্থানেরই জ্যোতির্ব্বিৎ সভাপণ্ডিত ছিলেন। রামরুদ্রবিদ্যানিধির যে সকল ছাত্র ছিলেন, তন্মধ্যে হরিদেববিদ্যানিধিই প্রধান। হরিদেবের গণনার নিপুণতার অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। হরিদেববিদ্যানিধি বর্দ্ধমানের মহারাজের জ্যোতির্ব্বিৎ সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে স্বীয় পাণ্ডিত্যের অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়া বর্দ্ধমান রাজের নিকট হইতে কয়েক সহস্র বিঘা ব্রহ্মত্রভূমি ও বহু অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। হরিদেববিদ্যানিধির বংশধরেরা বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধমান নগরের অনতিদূরে গোবিন্দপুরে বাস করিতেছেন। অদ্যাপি ঐ বংশীয় গ্রহবিপ্রগণই বর্দ্ধমানের মহারাজের জ্যোতির্ব্বিৎ সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় ও পণ্ডিতরামরুদ্র বিদ্যানিধি হইতে রাজবংশের এক এক রাজার সময়ে বিদ্যানিধি-বংশের এক এক পণ্ডিত পঞ্জিকাকার হইয়া আসিতেছিলেন।

	রাজ-বংশ।		পঞ্জিকাকার বংশ।
(১)	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়।	(১৭২৮ খ্রীঃ)	পণ্ডিত রামরুদ্রবিদ্যানিধি।
(২)	,, ,, শিবচন্দ্ররায়।	(১৭৮২ খ্রীঃ)	,, রামকৃষ্ণবিদ্যামণি।
(৩)	,, ,, ঈশ্বর চন্দ্ররায়।	(১৭৮৮ খ্রীঃ)	,, প্রাণনাথবিদ্যাভরণ।
(৪)	,, ,, গিরিশচন্দ্ররায়।	(১৮০২ খ্রীঃ)	,, রামজয়শিরোমণি (১)

রামজয়শিরোমণি, একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই বিচক্ষণ ছিলেন। এক বার তিনি স্বীয় পঞ্জিকায় দুই দিনে শারদীয় দুর্গোৎসবের তিন পূজা হইবে লেখেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে নবদ্বীপের পঞ্জিকা ব্যতীত আরও কয়েকখানি পঞ্জিকা গণিত হইত। ঐ সকল পঞ্জিকায় তিন দিনে দুর্গা পূজার ব্যবস্থা লিখিত হয় কিন্তু অধিকাংশ লোক নবদ্বীপের পঞ্জিকার মতে বৈধ কার্য্য সম্পন্ন করেন, সুতরাং তাঁহারা অত্যন্ত সন্দিহান হইলেন। বঙ্গে একটা হুলু স্থূলু পড়িয়া গেল। এই বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবাটীতে এক মহতী পণ্ডিত-সভা আহূত হয়। তাহাতে বঙ্গদেশের

(১) মহারাজ গিরীশচন্দ্রের রাজ্যকাল হইতে মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের সময়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত রামজয়শিরোমণি জ্যোতির্ব্বিৎ সভাপণ্ডিত ছিলেন।

প্রায় সমস্ত অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। নবদ্বীপ-প্রদেশের অধ্যাপকগণ ব্যতীত সকলেই রামজয়শিরোমণির বিরোধী। সকলেই রামজয়কে অপদস্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু রামজয়শিরোমণি ভীত হইবার পাত্র নহেন, তিনি স্থির অচল। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—"কে কে আমার ব্যবস্থার বিরোধী, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অগ্রসর হউন।" এই সময় স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। তাহার পর, তিনি সকলের মত অনুসারে প্রথমে তিথি গণনা করিয়া দেখান। তিনি যে দিন যে তিথি যতক্ষণ অবস্থিতি করিবে লেখেন, তাহা কেহই উণ্টাইতে পারেন না। তাহার পর, স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার আরম্ভ হয়। শিরোমণি স্মৃতিশাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিন দিন বিচারের পর তাঁহারই লিখিত ব্যবস্থার অনুকূলে অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রদান করেন। তাহার পর, সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে দুইদিন পূজার ব্যবস্থা-পত্রে সমস্ত পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। ঐ বৎসর বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র রামজয় শিরোমণির ব্যবস্থা অনুসারেই শারদীয়-পূজা সম্পন্ন হয়। এই সভায় রামজয় শিরোমণি সর্ব্বোচ্চ বিদায় প্রাপ্ত হন।

একবার গবর্ণর্‌জেনেরাল্ হার্ডিঞ্জ সাহেব নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী পরিদর্শনার্থ আগমন করেন। নদীয়ার সমুদয় পণ্ডিতমণ্ডলী ষ্টিমারে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারকালে লাটসাহেবকে একটু উৎকণ্ঠিত দেখায়। কথা-প্রসঙ্গে লাটসাহেব বলেন "তাঁহার পত্নীর যে দিবস কলিকাতা পৌছিবার কথা ছিল, সে দিবস অতীত হইয়াছে। লেডী হার্ডিঞ্জ বিলাত হইতে যাত্রা করিয়াছেন এ সংবাদও তিনি পাইয়াছেন, অথচ কলিকাতায় জাহাজ না পৌছায় সাহেব বিপদাশঙ্কা করিতেছেন"। সকল পণ্ডিতই রামজয়শিরোমণির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। শিরোমণি, সেই সময় যে লগ্নে প্রশ্ন হইয়াছিল, তদনুসারে গণনা করিয়া বলিলেন :—"আপনার পত্নী এখন কলিকাতার অতি সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। আপনি কলিকাতা উপস্থিত হইলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে"। লাটসাহেবের মুর্শিদাবাদে যাইবার কথা ছিল, তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে পৌছিয়াই দেখেন 'লেডী হার্ডিঞ্জ, লাট-সাহেব মুর্শিদাবাদ গিয়াছেন শুনিয়া সেখানে যাইবার জন্য অন্য একখানি ষ্টিমারে আসিয়া উঠিয়াছেন।' গঙ্গার ঘাটেই

পরস্পর দর্শনোৎসুক পতি পত্নীর সাক্ষাৎ হইল। লাটসাহেব রামজয়শিরোমণির গণনায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া শিরোমণিকে তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত নদীয়ার কলেক্টর-সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। ঐ পত্রে শিরোমণির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং পুরস্কার-প্রদানেচ্ছারও আভাস ছিল। কিন্তু শিরোমণি লাটসাহেবের নিকট হইতে কোন পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।

(৫) ,, শ্রীশচন্দ্র রায় (১৮৪২খ্রীঃ) ,, শ্রীদামবিদ্যাভূষণ।

(৬) ,, ,, সতীশচন্দ্র রায় (১৮৭০ খ্রীঃ)
মহারাণী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী ,, (১৮৭০ খ্রীঃ) } ,, তারিণীচরণবিদ্যাবাগীশ।

(৭) মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় (বর্ত্তমান) ,, দুর্গাদাসবিদ্যারত্ন।

উল্লিখিত রাজগণের অধিকারকালে যে সকল পঞ্জিকা গণিত হইত, উহার মঙ্গলাচরণের শ্লোকে যে রাজার আদেশে এবং যাঁহার কর্ত্তৃক পঞ্জিকা গণিত উভয়েরই নাম থাকিত। নবদ্বীপ রাজবংশের প্রথম হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, ইহা নদীয়ার রাজবংশের হিন্দু-সমাজের উপর অসাধারণ আধিপত্যের প্রধান পরিচায়ক ছিল। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্তক্ষিতীশচন্দ্ররায় বাহাদুর তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির পর কিছুদিন এ প্রথা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর, তিনি ইংরাজি-বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া দেশীয় পঞ্জিকার প্রতি বীতরাগ হ'ন এবং ক্রেকটেবেলের অনুসরণে গণিত ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের প্রকাশিত দুই একখানি পঞ্জিকার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন।

মুসলমান রাজত্বের সময় নদীয়ার মহারাজের হস্তে মুর্শিদাবাদের নবাব প্রতিবৎসর একখানি করিয়া পঞ্জিকা গ্রহণ করিতেন, ঐ পঞ্জিকা অনুসারেই তদানীন্তন কালে রাজকার্য্যাদি সম্পন্ন হইত। ইংরেজ-রাজও উক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করেন নাই।* নদীয়ার জজ্ সাহেবের (এখন কলেক্টর সাহেবের) হস্তে নবদ্বীপের পণ্ডিতের গণিত একখানি পঞ্জিকা প্রতিবৎসর গ্রহণ করেন। উক্ত পঞ্জিকার সাহায্যেই বঙ্গদেশের পর্ব্বদিনের অবকাশাদি সমুদয় নির্ণীত হইয়া থাকে।

---

* এখন, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব ঐ পঞ্জিকা গণনা করেন।

মৌদ্গল্য-গোত্রীয়—

কমলাকরজ্যোতিষী।

নদীয়ার আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌বংশের আদিপুরুষ সুপ্রসিদ্ধ কমলাকরজ্যোতিষী। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কমলাকরের কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রের কয়েকখানি টীকা গ্রন্থ আছে*।

কমলাকরের পুত্র সুধাকর। সুধাকরের পুত্র হৃষীকেশ। হৃষীকেশের পুত্র গোপীনাথ। ইঁহারা সকলেই বংশপরম্পরাগত জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গোপীনাথের যে কয়েকটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রাজীব-লোচনবিদ্যাসাগর দ্বিতীয়। রাজীবলোচন পূর্ব্বোক্ত রামরুদ্রবিদ্যানিধির সম-সাময়িক। তিনি ব্যাকরণ কাব্য, অলঙ্কার ন্যায় স্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সময়ে সময়ে পণ্ডিত-সমাজ বিস্মিত হইতেন। শুনা যায়, রাজীবলোচন-বিদ্যাসাগরের একটি বড় চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাতে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য স্মৃতি জ্যোতিষ সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতেন। গ্রাম্য ছাত্র ব্যতীত অনেক বৈদেশিক ছাত্রও তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। তখনও বোধহয় শ্লেটের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই, কাষ্ঠফলকে ধূলা রাখিয়া বাঁশের কাঠীর সাহায্যে আঁক কসা হইত ‡। রাজীবলোচনের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া কোন কোন রাজা ও

---

* মৌদ্গল্যবংশে গ্রহভূষণানাং
সুধীঃ স আসীৎ কমলাকরাখ্যঃ।
বিবোধকো যঃ খলু বাঙ্ময়ানাং
ভাবান্ যথা পঙ্কজ-কোরকাণাম্।
(গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা)

‡ বিদ্যাসাগরসংজ্ঞয়া স্ববিষয়ে খ্যাতিং পরাং প্রাপ্তবান্
যোঽভূৎ রাজীবলোচনঃ কৃতধিয়াং সংখ্যাবতামগ্রণীঃ।
যঃ খ্যাতো গণিতাগমেষু সততং বিদ্যার্থিভিঃ সেবিতঃ
তত্তাদৃগ্‌গুণঃ সমস্তবিবুধৈরদ্যাপি সংকীর্ত্ত্যতে।
(গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা)

জমিদারের বাটী হইতে তাঁহার জ্যোতির্ব্বিৎ-সভাপণ্ডিতের পদ গ্রহণের অনুরোধ আসে, স্বাধীনচেতাঃ রাজীব বিদ্যাসাগর তাহা গ্রহণ করেন নাই।

রাজীবের পুত্র প্রাণবল্লভ। প্রাণবল্লভের প্রথম পুত্র কেশব-বিশারদ। ইনি যে পঞ্জিকা গণনা করিতেন, তাহাও বহুস্থানে প্রচলিত ছিল। কেশবের দুই পুত্র। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র কমললোচনবিদ্যাবিনোদ। ইঁহার বংশধরেরা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রাণবল্লভের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ভৃগুরামবাচস্পতি। তাঁহার শতানন্দ শ্যামানন্দ প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম পুত্র শতানন্দ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তবাগীশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেরও নবদ্বীপ-প্রদেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি প্রবীণ বয়সে কোন আত্মীয়ের অনুরোধে বর্ত্তমান নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার সন্ধিস্থলে ফরিদপুরের অন্তর্গত ধর্ম্মহাটীতে আসিয়া কিছুদিন থাকেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ নবদ্বীপেই বাস করেন। । নূতন বাসস্থলীতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হওয়াতে সিদ্ধান্তবাগীশ ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানেই সপরিবারে বসতি করেন। তাঁহার পাঁচপুত্র, তন্মধ্যে উমাকান্ত জ্যেষ্ঠ। উমাকান্ত বিদ্যানিধিও সুপণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্রীয় ব্যবসায় ব্যতীত কয়েকখানি গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভারও তাঁহার উপর ছিল। জমিদারে জমিদারে বিবাদ হওয়ায় তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন না করিয়া উক্ত গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার পশ্চিমভাগে রমণীয় চন্দনানাম্নী স্রোতস্বতীর তীরে আসিয়া ভ্রাতৃগণ সহ বসতি করেন। অসংখ্য-নারিকেল-গুবাক-বৃক্ষশ্রেণী-পরিশোভিত উমাকান্তের পল্লীভবনের দৃশ্য নদীতীর হইতে অতি মনোরম বোধ হইত। বিদ্যানিধি শাস্ত্রীয় ব্যবসায়ে বহু অর্থ অর্জ্জন করিতেন কিন্তু ব্রত নিয়ম পূজা অর্চ্চাও দানাদিতে সমস্তই ব্যয়িত হইত। তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল সন্নিহিত জানিতে পারিয়া বহু-ব্যয়-সাধ্য নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক কাশী যাত্রা করেন এবং বারাণসী-ধামে পৌঁছিবার দুইদিন পরে তৃতীয় দিবসের অরুণোদয়-কালে মণিকর্ণিকাতীর্থে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

উমাকান্তের চারিপুত্রের মধ্যে তৃতীয় সুপ্রসিদ্ধ পীতাম্বরবিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শৈশবে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, তাহার পর জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হন। তিনি জন্ম-পত্রিকায় যাহা যাহা লিখিতেন

অবিকল উহা ফলিত। অনেকে উহা পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছেন। কোন সময়ে বঙ্গের কোন ব্রাহ্মণ-জমিদারের একমাত্র পুত্রের এক জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করেন। উহাতে মাস ফল লিখিত হইয়াছিল। উনিশ বৎসর সাত মাসে বিবাহ হইবে লেখা ছিল। ঐ জমিদার প্রতিজ্ঞা করেন, ঐ সময়ের দুই বৎসর পরে পুত্রকে বিবাহ দিবেন। তজ্জন্য অনেক সম্পন্ন কন্যাদায়গ্রস্তকে নিয়ত প্রত্যাখান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে এমন একটী অপরিহার্য্য ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল যে, ঠিক উনিশ বৎসর সাত মাস শেষ হইবার দুই দিন পূর্ব্বে পুত্রের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল। কতকগুলি বিখ্যাত নীলকুঠীর কর্ত্তা এক সাহেবের কোন সময় একটি মূল্যবান্ দ্রব্য অপহৃত হয়। এই দ্রব্যের জন্য কুঠীতে তোলপার উপস্থিত হয়। কুঠীর দেওয়ান্ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর প্রতি সাহেব হুকুম করেন—'যদি এক সপ্তাহের মধ্যে ঐদ্রব্যটি না পাওয়া যায়, দেওয়ান কর্ম্মচ্যুত হইবেন'। মহাসঙ্কটে পড়িয়া দেওয়ান্ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের শরণাগত হন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গণনা করিয়া যে স্থানে দ্রব্যটি আছে বলিয়া দেন। যে ভৃত্য ঐ দ্রব্য হরণ করিয়াছিল, সে মহাবিপদ্ গণনা করিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পায়ে আসিয়া পড়ে। দয়ালু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া বিদায় করেন। দেওয়ানের বিশেষ অনুরোধ-সত্ত্বেও ঐ ভৃত্যের স্পষ্ট নাম করেন নাই।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া স্নান সন্ধ্যা পূজাদি শেষ করিতেন। সমস্ত রাত্রি ঝড় বহিয়াছে, প্রভাতেও বৃষ্টির বিরাম নাই, এ অবস্থায়ও তিনি প্রাতঃ-স্নান পরিত্যাগ করেন নাই। সদাচার ও নিয়ম পালনের নিমিত্ত তাঁহার দেহে কোনই ব্যাধি ছিল না। লোকে তাঁহাকে "বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ" বলিত। তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাই সিদ্ধ হইত। একবার ভাদ্রমাসে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নৌকায় তাঁহার বাটী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে কোন কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন। ঐ গ্রামের একটি প্রধান ব্যক্তির পুত্রের তিনি ইতঃপূর্ব্বে একটি ঠিকুজী লিখিয়াছিলেন। খালের ধারেই ঐ ব্যক্তির বাটী, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নৌকা হইতে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া নৌকা বাঁধিতে বলিয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে শিশুর ঠিকুজী লিখিয়াছিলেন, সেই শিশুকেই প্রাঙ্গণে শয়ান দেখিলেন। শিশুর পিতাও অন্যান্য সকলে পঞ্চমবর্ষীয় সেই মৃতকল্প শিশুর

কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উপস্থিত হইলেই শিশুর মাতা ও পিতামহী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহাদিগকে স্থির হইতে বলিয়া পুনরায় ঠিকুজী দেখিতে চাহিলেন। শিশুর মাতা তাড়াতাড়ি ঠিকুজীটি বাহির করিয়া দিলেন। তিনি অভিনিবেশের সহিত ১০ মিনিট কাল ঠিকুজীটি দেখিয়া শিশুকে আর্দ্র-প্রাঙ্গণ হইতে বারান্দার তুলিতে উপদেশ দিয়া অতি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন;—"এ বালকের এখন মৃত্যু হইবে না, এ নিশ্চয় বাঁচিবে"। মৃতকল্প শিশুর পিতা একটি তালুকদার ও নিজ গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পুরোহিত। অনেকেই ঐ বিপদের সময় উপস্থিত আছেন, বালকের অবস্থা দেখিয়া কেহই আর বালককে বারান্দায় লইতে সাহস করিলেন না। বালকের পিতা ও আচ্ছাদিত বারান্দায় মৃত্যু হইলে অধোগতি হইবে ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বালকের পিতামহী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে বড় বিশ্বাস করিতেন। তিনি শিশুকে বুকে করিয়া বারান্দায় লইয়া শোয়াইলেন। এদিকে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় স্নান সন্ধ্যা শেষ করিয়া জপে বসিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বালকের শুধু হৃদয় একটু একটু স্পন্দিত হইতেছিল, একঘণ্টা পরে সর্ব্বাঙ্গ ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে শিশু একটু দুগ্ধ গিলিতে সমর্থ হইল। অপরাহ্নে বালককে অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ দেখা গেল। বালকের পিতামহী বলিলেন—"আচার্য্য ঠাকুর! আপনি কি পরমেশ্বর, আমার খোকাকে বাঁচাইবার জন্য ছদ্মবেশে আসিয়াছেন?" ঐ শিশু এখন যুবা, সংস্কৃতভাষায় এম এ, পাস্ করিয়া কোন গবর্ণমেণ্ট-কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ঐরূপ জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার ব্যতীত দৈবকার্য্যে সফলতার ও অনেক বিবরণ শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রহযাগের প্রভাবে অনেকে অনেক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। একবার একটি বিস্তৃত জমিদারীর স্বত্বাধিকার লইয়া এক জমিদার-বংশের দুই সরিকের দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদ হয়। নিঃস্ব পক্ষ ক্রমশঃ দুই আদালতে পরাজিত হইয়া হাইকোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোকদ্দমার আপিল করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে মোকদ্দমার ফলাফল জিজ্ঞাসা করেন। তিনি অতি দৃঢ়তার সহিত বলেন "এই মোকদ্দমায় জয় লাভ হইবে"। মোকদ্দমার বিচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে

উঁহারা বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দ্বারা দৈব কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রায় পক্ষকাল ব্যাপী গ্রহপূজা জপ ও হোম করেন। হোমের পূর্ণাহুতি হইবার তিন দিন পরে সংবাদ আসে লিংব পরুই অরী হইয়াছেন।

তিনি গণনায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। যে বালক অধিকদিন বাঁচিবে না, বহু অর্থ ও অনুরোধ সত্ত্বেও সে বালকের তিনি জন্মপত্রিকা লিখিতেন না। তজ্জন্য যাঁহারা তাঁহার প্রকৃতি জানিতেন, তাঁহারা স্বয়ং কিছু না বলিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই নির্ভর করিতেন। বাটীর সন্নিহিত গ্রামবাসী কোন বিখ্যাত অধ্যাপকের একটি পৌত্র উৎপন্ন হয়। অধ্যাপক স্মার্ত্তপণ্ডিত, নিজেও জ্যোতিঃশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। স্বয়ং জাতলগ্নাদির বিচার করিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে অতিশীঘ্র একটি জন্মপত্রিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আজ কাল করিয়া ক্রমশঃ বিলম্ব করিতে থাকেন। অধ্যাপকের ভ্রাতা বলিলেন "ছেলের কোনরূপ রিষ্টি আছে, নচেৎ উনি এত তাগাদা সত্ত্বেও চুপ করিয়া আছেন কেন"? অধ্যাপক বলিলেন—"আমি উত্তমরূপ বিচার করিয়া দেখিয়াছি, বালকের অতি উৎকৃষ্ট লগ্নবল আছে"। তাহার পর, অধ্যাপকের ভ্রাতা একদিন আসিয়া ঠিকুজীর জন্য ধরা দিলেন। তাহার পর, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় স্পষ্টই বলিলেন—"তিনমাস অতীত না হইলে আমি ঠিকুজী লিখিব না, কিন্তু এ কথা আপনি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বা বাটীর অন্য কাহাকেও বলিবেন না"। আশ্চর্য্যের বিষয় তিন মাস অতীত হইবার আট দশ দিন পূর্ব্বেই বালকটি মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন কিন্তু সঞ্চয় করিতেন না, সমুদয়ই সৎকর্ম্মে নিয়োগ করিতেন। দোল দুর্গোৎসব বাসন্তী-পূজা প্রভৃতি নিত্য-ক্রিয়া তাঁহার বাটীতে অতিসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। এতদ্ভিন্ন সমুদায় ব্রত ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি অনেক নৈমিত্তিক ব্যাপারও তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী ছিলেন। কুঠিয়াল সাহেবেরা অনেক সময় প্রজাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং আবদ্ধ করিয়া রাখিত। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পত্র পাইলে দেওয়ান বা অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ ঐ সকল কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্তি দিতেন। ঐ প্রদেশের নীলকুঠির সাহেব, জমিদার, জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট

পোলিশ সুপারিণ্টেণ্ট সকলেই তাঁহাকে জানিতেন এবং বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ ও তাঁহাকে দৈবক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

[illegible]শের সকল লোকেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিত, তাঁহার যে বিভব ছিল, তাহার বিংশতিগুণ টাকাও তাঁহাকে প্রতিভূ রাখিয়া লোকে ঋণ দিত। এ জন্য জামিন হইয়া সেই টাকা অধমর্ণের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিতে তাঁহাকে অনেক সময় বহুকষ্ট ভোগ করিতে হইত। কিন্তু এজন্য পুনঃ পুনঃ কষ্ট পাইয়াও দয়ালু স্বভাব বলিয়া আবার জামিন না হইয়া পারিতেন না। দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের অনেক নিঃস্ব পরিবার তাঁহার বাটী হইতে ধান্য কিংবা চাউল ধার লইত কিন্তু শেষে উহা প্রত্যর্পণ করিতে আসিলেও বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উহা লইতে বারণ করিতেন। একবার তিনি দুর্ভিক্ষের সময় অনেক টাকার ধান চাউল কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, সঙ্গে ধান চাউল বোঝাই কতকগুলি বলদ ছিল। পথিমধ্যে একটি স্ত্রীলোক অনাহার ক্লিষ্ট কয়েকটি সন্তান বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইল। তিনি উহা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, একটি ধান চাউল বোঝাই বলদ সেই দুঃখিনী রমণীর বাড়ী পাঠাইয়া অবশিষ্ট বলদগুলি লইয়া গৃহে আগমন করিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় চিরকাল সদাচার এবং সুস্থদেহে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বাট বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার চারিপুত্র বিদ্যমান। ইঁহারা সকলেই পুনরায় পূর্ব্বপুরুষদের আধ্যুষিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছেন।

প্রথম। শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব। এখন ইনি নবদ্বীপের একমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ্ এবং পঞ্জিকাকার। দুর্গাদাস, বিদ্যানিধিবংশের শেষপুরুষ। তাঁহার পরলোক গমনের পর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ই হাইকোর্টের পঞ্জিকা প্রণয়নের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নদীয়ার কলেক্টরের হস্তে দুইখানি পঞ্জিকা দিতে হয়। একখানি নদীয়ার কলেক্টরের অফিসে থাকে, অপরখানি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রেরিত হয়। গুপ্ত-প্রেস পঞ্জিকাই এখন বাঙ্গালার একমাত্র বিশুদ্ধ পঞ্জিকা। এই পঞ্জিকার প্রণেতা ও জ্যোতিষার্ণব মহাশয়। তাঁহার অঙ্ক-শাস্ত্রে নৈপুণ্য এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বহুদর্শিতাপ্রযুক্ত এই পঞ্জিকার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। এখন সমস্ত বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে বাঙ্গালীর বসতি আছে, সর্ব্বত্রই জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের প্রণীত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মতেই বৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী। ইনি শৈশব হইতে নবদ্বীপ বারাণসী দক্ষিণাপথের পুণা প্রভৃতি বহু স্থানে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। কা সংস্কৃতকলেজে উপাধি-পরীক্ষা ও পুণা নগরীতে শাস্ত্রি-পরীক্ষা প্রদান করিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। শাস্ত্রী মহাশয় আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের অধিকাং স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে ভ্রমণকালে তিনি উজ্জয়িনী, বড়োদা, পুণা-প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের সহিত মাসাধিক কাল নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনে যাপন করিয়াছিলেন। ইনি নানাচ্ছন্দে সুললিত সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারেন। অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও জগদ্বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ ভট্ট মোক্ষমূলর ইঁহার রচিত সুললিত সংস্কৃত কবিতা পাঠে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। আর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে কাশ্মীরের মহারাজের নিকট যে সংস্কৃত অভিনন্দনপত্র প্রেরিত হয় উহারও রচনা শাস্ত্রী মহাশয় করেন। এতদ্ভিন্ন নানা ঘটনায় ইনি অনেক সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছেন। ইঁহার রচিত একখানি সংস্কৃত কাব্য অমুদ্রিত অবস্থায় আছে। এখন ইনি কলিকাতা রাজকীয় হিন্দুবিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক। শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন ইঁহার প্রণীত দক্ষিণাপথভ্রমণ, শঙ্করাচার্য্য-চরিত ও রামানুজ-চরিত প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালাগ্রন্থ এবং স্কুলপাঠ্য সংস্কৃত ও বাঙ্গলা পুস্তক সকল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

তৃতীয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি, এইচ্, ডি.। ইঁহার নাম সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ, সুতরাং ইঁহার বিষয় অধিক লেখা বাহুল্য। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত ও পালিভাষার অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য। এতদ্ভিন্ন ইনি বেঙ্গল এসিয়াটিক্-সোসাইটির কার্য্যকরী সভার সদস্য এবং ভাষাতত্ত্ব-সমিতির সহযোগী সম্পাদক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার বিদ্যাবত্তার পুরস্কার স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভারতবর্ষ, সিংহল ও য়ুরোপের বহু বিদ্বৎসমিতির সদস্য। ইঁহার রচিত ও সম্পাদিত সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও তিব্বতীয় ভাষার বহুগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় Bibl. Indica Series. এর অন্যতম সম্পাদক এবং

তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে জৈনন্যায় সম্বন্ধে মৌলিক অত্যুৎকৃষ্ট এক ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে Ph. D. (Doctor of Philosophy) এই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন।

চতুর্থ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য। ইনিও একজন বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবক। প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায়ই ইনি প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। যতীন্দ্র বাবু এখন সয়ার একসাইজ্-সবইনেস্পেক্টর্।

কাশ্যপ-গোত্রীয়—

সুবুদ্ধি শিরোমণি।

নবদ্বীপের আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ বংশের আদিপুরুষ সুবুদ্ধি শিরোমণি। ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বনিবাস যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ছিল। চৌগাছা গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকায় "চতুঃপলাশী" নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পলাশী অর্থ বৃক্ষ (গাছ) চতুর্ অর্থে (চারি) সুতরাং চতুঃপলাশী অর্থে চৌগাছা। "চিত্রাকুমারোর্ম্মিবিধৌতপাদঃ" চৌগাছা গ্রামের এই বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় ঐ গ্রামের নিকটে চিত্রা এবং কুমার নদের সংযোগ হইয়াছিল ও সর্ব্বদা ঐ নদীদ্বয়ের উর্ম্মিমালা দ্বারা ঐ গ্রামের প্রান্তভাগ বিধৌত হইত। এক সময়ে ইনি কোন কার্য্যবশতঃ নদীয়া জেলার আন্দুলিয়া গ্রামে আগমন করেন। তখনও ভবানন্দমজুমদারের উন্নতির সূত্রপাত হয় নাই। একজন অধ্যাপক ভবানন্দ মজুমদারের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত সুবুদ্ধিশিরোমণির সাক্ষাৎ ও আলাপ হইলে তিনিই শিরোমণিকে সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ মজুমদারের নিকট উপস্থিত করেন*।

---

* যশোহরাখ্যে রমণীয় ক্ষেত্রে
বঙ্গীয়ভাগে সুবিশালদেশে।
লতাবিতানৈঃ পরিশোভমানে
আসিন্নিবাসো মহনীয়কীর্ত্তেঃ ॥১॥
সুবুদ্ধি-সংজ্ঞস্য সুধীবরস্য,
কার্ত্তান্তিকস্যাত্র যশোহন্বিতস্য।

মজুমদার নিজের জীবনের ফলাফল জানিতে চাহেন। সুবুদ্ধিশিরোমণি কোষ্ঠী দেখিয়া বলেন "আপনার অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত জীবনের উৎকৃষ্ট সময়। ঐ সময় আপনার এত সৌভাগ্য হইবে যে, তদ্দ্বারা আপনি চিরসুখী ও বহুসম্মানে সম্মানিত হইতে পারিবেন"। ভবানন্দমজুমদার উহার অর্থ কিছুই বুঝিলেন না, বলিলেন "এমন কি সৌভাগ্যের সম্ভাবনা আছে, যদ্দ্বারা আমি চিরসুখী হইব"। তাহার পরই মানসিংহ জাহাঙ্গীর বাদসাহের সৈন্য সহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালায় আগমন করেন। ভবানন্দ বর্দ্ধমানে গিয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মজুমদারের সাহায্যে মানসিংহ কৃতকার্য্য হইয়া দিল্লি গমনকালে মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া যান। ভবানন্দমজুমদার বাদসাহকে সন্তুষ্টকরতঃ বহু জমিদারির সনন্দ লইয়া গৃহে আগমন করিয়াই সুবুদ্ধিশিরোমণিকে ডাকিয়া পাঠান। শিরোমণি মাটিয়ারিতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন এবং মাটিয়ারিতেই বাস করিতে অনুরোধ করেন। শিরোমণি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ। তিনি এই বয়সে বাসস্থান ও ভূমিবিত্ত ত্যাগ করিয়া আসিতে সম্মত হন না।

তাঁহার প্রপৌত্র গোকুলানন্দবিদ্যামণি বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। নদীর প্রবলবেগে স্বীয় ভবনও ভূমিবিত্ত জলসাৎ হওয়ায় তিনি কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের পরিচয় প্রদান করিয়া কিছু বৃত্তি প্রার্থনা করেন। মহারাজ পরম্পরাগত জনশ্রুতিতে সুবুদ্ধিশিরোমণির গণনার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন "আমি তোমাকে অন্যতম জ্যোতির্ব্বিদ্ পদে নিযুক্ত করিয়া বৃত্তি দিতে পারি কিন্তু এখানে আসিয়া

চতুঃপলাশীতি রাজ গ্রামঃ
চিত্রাকুমার্য্যোর্ম্মি-বিধৌত-পাদঃ ॥২॥
সসোরাবর্ত্তবৈশৈর্য্যখিতজলযমুক্ ভাবনা-ভাবিতাত্মা,
বিত্তানাং লাভকামঃ প্রথিত-জনপদে পুণ্যপূত-প্রদেশে।
দাক্ষিণ্যাদ্যৌগুনাম্না বিপুলবিভববান্ শ্রীভবানন্দসংজ্ঞঃ
লেভে স কাশ্যপের ত্রিভুবনবিদিতং তং হি যোহংকৃষ্ণচরণ্যঃ ॥৩॥ ‡ (গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা)

‡ তৃতীয় শ্লোকটি ব্যাকরণাশুদ্ধি-দোষে দূষিত। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকার লিপিকর-প্রমাদবশতঃ বোধ হয় ঐরূপ লিখিত হইয়াছে। আমরা আর উহার কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না। ঐ কুলপঞ্জিকার আরও অনেক শ্লোকে ঐতিহাসিক কথা দৃষ্ট হয়।

বাস করিতে হইবে। অন্য স্থানে থাকিলে এ বৃত্তি পাইবে না। গোকুলানন্দ মহারাজের নির্দ্দেশ অনুসারে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন। †

গোকুলানন্দ এক উৎকৃষ্ট ঘটীযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন বৈদেশিক ঘড়ীর সৃষ্টি হয় নাই, ঐ ঘড়ীর সাহায্যে সময় নির্ণীত হইত। তাম্রের চারিটি মৎস্য পরস্পর মুখো মুখী করিয়া গঠন করা হইত। ঐ মৎস্যগণের পুচ্ছ ঊর্দ্ধ ও মস্তকস্থিত তাম্রাধারে সংলগ্ন থাকিত। উহাদের মস্তকে একটি তাম্রাধারে অতি উষ্ণ তরল পারদ রাখা হইত। তাম্রাধারের গাত্রে ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র ছিল। ঐ ছিদ্র দিয়া পারদ পরবর্ত্তী আধারে পতিত হইত। পারদের ন্যূনতা অনুসারে দণ্ড পল বিপল অনুপল পর্য্যন্ত স্থির হইত। ছায়াবৃষ্টে অঙ্ক কসিয়া মধ্যাহ্নকাল নিরূপণ পূর্ব্বক তাহাতে পারদ রক্ষিত হইত। পরদিন মধ্যাহ্নে ঘটিকা যন্ত্রের একটি স্থান টিপিলেই মৎস্য পুচ্ছ দিয়া পারদগুলি প্রথম পাত্রে উত্থিত হইত। গোকুলানন্দ নিজে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ঘড়ী নির্ম্মাণের উপদেশ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন।

অতিপূর্ব্বে নবদ্বীপে এক সিদ্ধপুরুষ আগমন করেন। তিনি নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়ায় গঙ্গাতীরে (এখন পুরাতন গঙ্গার চিহ্ন পলতা ঐ স্থানে বিদ্যমান) এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গোকুলানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমাই বহুদিন পরে ঐ স্থানে সমাগত অপর এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়া বামাচার মতে সাধনা করিতেন। গভীর রাত্রিতে নিমাই সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালীর সম্মুখে বসিয়া জপ করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীতে চলিয়া যান। পরে গোকুলানন্দের পৌত্র নন্দরাম ব্রহ্মচারী ও ঐ স্থানেই সিদ্ধ হন। সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালী পল্লীমাতা সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ কালী অতিশয় জাগ্রত। নদীয়ারাজ গোকুলানন্দের প্রতি ঐ কালীর সেবার

† গোকুলানন্দনামাসীৎ সিদ্ধান্ত-কোবিদাগ্রণীঃ
গিষ্পতিরিব বাচি স বিবোধতনয়ঃ সুধীঃ।
তরঙ্গবেগাৎ পরিভজ্যমানে
নিকেতনে তস্য সমূলপাতে।
শশাঙ্করাজিসমকীর্ত্তিভাজং
সমাশ্রিতোহসৌ নৃপকৃষ্ণচন্দ্রম্। (গ্রহবিপ্রকুল-পত্রিকা)

তায় অর্পণ করেন। ঐ কালীর অনেক দেবোত্তর ভূমি ছিল, এখন গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের অনেক প্রসিদ্ধ সাধক পল্লীমাতা বা পাড়ার মার সম্মুখে জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নবদ্বীপের পাড়ার মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনদেবতা, ইনি আগমবিদ্যাবাগীশের প্রতিষ্ঠিত আগমেশ্বরীর অপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তিনী।

গোকুলানন্দের তৃতীয় পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র আচার্য্য রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব ছিল। তিনি "রাজবংশাবলী" নামক নদীয়া-রাজ-বংশের কীর্ত্তি সূচক একখানি বাঙ্গালা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ভবানীশঙ্কর। ভবানীশঙ্করের পুত্র কাশীনাথ আচার্য্যের প্রণীত ও কয়েকখানি বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কাশীনাথের তিন পুত্রের তিন পৌত্র আছেন। প্রথম পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ আচার্য্য। দ্বিতীয় পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন আচার্য্য। তৃতীয় পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কবিভূষণ। ইনি কলিকাতা সেণ্টমেরি হাই স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ্-বংশ।

এতদ্ভিন্ন নদীয়ার গৌতমগোত্র-সম্ভূত গণিতাচার্য্যের বংশ পাণ্ডিত্যের জন্য অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশে বিশ্বেশ্বরবাচস্পতি, হারাধনবিদ্যাভরণ, সন্তোষ তর্কবাগীশ, বিজয়রামবিদ্যার্ণব প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতি বহুশাস্ত্রে কৃতী ছিলেন। দুঃখের বিষয় এইবংশের আর এখন কেহই নাই। অভিরাম চক্রবর্ত্তী, রূপরাম অধিকারী এবং নরসিংহঘুঘুর বংশধরেরাও বেশ পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু শুনা যায়, কিছুকাল পূর্ব্বে ইঁহারা কোন প্রবলসমাজে অন্তর্লীন হইয়াছেন।

নবদ্বীপের আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ মৌদ্গায়নগোত্রীয় গৌরীবরবিদ্যালঙ্কার। তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ যাদবেন্দ্রবিদ্যাবাচস্পতি পূর্ব্ববঙ্গের চন্দনানদীর তীরবর্ত্তী মথুরাপুরে অনেক সময় বাস করিতেন। নবাবী আমলের প্রাচীন বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারী রাধাবল্লভরায় ইঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া পদ্মাতীরে

স্বপ্রতিষ্ঠিত মেখনা গ্রামে লইয়া স্থাপন করেন। ইঁহার বংশধরেরা ধারাবাহিক ক্রমে জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত। এই বংশের পরম পণ্ডিত গৌরচাঁদবিদ্যালঙ্কারের মুখে নৈষধচরিতের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য কাব্যরসজ্ঞেরা একান্ত উৎসুক হইতেন। ইঁহারা রাধাবল্লভ রায়ের প্রদত্ত প্রভূত ব্রহ্মত্রভূমি ভোগ করেন। এখনও এই বংশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চা আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ আচার্য্য প্রভৃতি কয়েকটি বংশধর এখন বিদ্যমান। শান্তিপুরের ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় কালিদাস চক্রবর্ত্তী শিরোমণিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ কৃতীছিলেন। পাটুলির জমিদার হরশঙ্কর রায় ও সীতারাম রায়, শিরোমণি মহাশয়কে অনেক ব্রহ্মত্র ভূমি প্রদান করেন। কয়েক পুরুষ ভোগ করার পর গঙ্গার প্রবল বেগে উক্ত ভূমি জলসাৎ হয়। সেই সময় শান্তিপুর-সংলগ্ন সূত্রগড়ে কেবল নূতন বসতি হইতেছিল। জমিদারের নিকট উক্ত ব্রহ্মত্র নষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়ায় তাঁহারা সূত্রগড়ের মধ্যে পুনরায় ঐ পরিমাণ জমি দান করেন। এখনও চক্রবর্ত্তী শিরোমণির বংশীয়েরা উক্ত ব্রহ্মত্র ভোগ করিতেছেন। কিছুকাল পরে কৃষ্ণনগরের রাজবংশীয় কোন রাজা পাটুলির জমিদারের কন্যা গ্রহণ করায় যৌতুক স্বরূপ সূত্রগড় প্রাপ্ত হন। এখন সূত্রগড় কৃষ্ণনগরের মহারাজার। চক্রবর্ত্তী শিরোমণি-বংশীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল আচার্য্য সুশিক্ষিত। ইনি কিছু কাল তিব্বতের গিয়াংসি নগরে গবর্মেণ্টের অফিসে কার্য্য করিয়া এখন কলিকাতায় অপর কোন গবর্ণমেণ্ট অফিসে চাকুরী করিতেছেন।

যে সকল জ্যোতির্ব্বিৎ বংশের বিষয় উল্লিখিত হইল, উহা ব্যতীত নদীয়া জেলার হরধাম, কৃষ্ণনগর নেদিয়ার পাড়া, নৃসিংহ দে পাড়া, খুরসিদপুর, চুনিয়াদহ, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের বংশধরেরা বাস করিতেছেন। বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয়ের উল্লেখ করা হইল না।

তন্ত্র।

বৌদ্ধদিগের অবনতির পর হইতেই ভারতে তন্ত্রমতের উদ্ভব হয় ;* কিন্তু এতাবৎ বাঙ্গালাদেশে উহার বিস্তৃতি ও চর্চ্চা সেরূপ হয় নাই।

লক্ষণ সেনের রাজ্যচ্যুতির পর বঙ্গদেশ হিন্দুশাসনচ্যুত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ অধোগতির দিকে অগ্রসর হয়। লোক যথেচ্ছাচারী, সুরাপায়ী ও সর্ব্ববিষয়ে ব্যভিচারী হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে বঙ্গে তান্ত্রিক মতের প্রচার হয়। তন্ত্রে মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির সবিশেষ প্রশংসা থাকায় দুর্ব্বলচিত্ত, বাসনাচালিত অনেকেই তন্ত্রমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, কোনও কোনও কুলগুরু স্ব স্ব কাপুরুষ শিষ্যগণকে অত্যাচারী মুসলমানগণের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার জন্য এই উত্তেজনাপূর্ণ বীরাচার গ্রহণে তাহাদিগকে বাধ্য করেন। যে কারণেই হউক, সমগ্র দেশ তখন তান্ত্রিকমতে অনুপ্রাণিত হয়। এই নবদ্বীপ হইতেই উক্ত মত সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তান্ত্রিক গুরুগণ স্থানে স্থানে ঘটস্থাপনা করিয়া স্বীয় স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র সাধন করিতেন; কেহ কেহ বা মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধপুরুষরূপে লোকের নিকট সম্মানিত হইতেন। নবদ্বীপে যে "পোড়ামাতা" দেবীর পাঠাস্থান দৃষ্ট হয়, উহা পূর্ণানন্দ পরমহংস নামক জনৈক তেজস্বী ক্রিয়াবান সন্ন্যাসী দ্বারা স্থাপিত। কথিত আছে, উক্ত সন্ন্যাসী নবদ্বীপের কোনও ব্রাহ্মণকুমারের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন এবং দীক্ষাদানকালে ভ্রমবশতঃ স্বীয় সিদ্ধমন্ত্র উপদেশ দেন। সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ হওয়ায় সন্ন্যাসী বিশেষ দুঃখিত হইয়া উক্ত শিষ্যকে তাঁহার স্থাপিত ঘটে দক্ষিণাকালিকাদেবীর পূজা করিতে উপদেশ দিয়া চিরদিনের নিমিত্ত নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন। ঐ ব্রাহ্মণকুমার ও গ্রামস্থ অনেকেই ঐ ঘটে পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে থাকেন। পরে যখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপের ন্যায়দর্শনের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন, তৎকালে গ্রামের প্রান্ত হইতে এই ঘট আনয়ন করিয়া গ্রামের মধ্যস্থানে এক বটবৃক্ষমূলে স্থাপন করেন। তদবধি উক্ত দেবী গ্রাম্য দেবীরূপে পণ্ডিতমণ্ডলী ও সাধারণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। কিছু

---

*Rockhill's Life of Buddha. Page 227.

দিন পরে উক্ত বটবৃক্ষ অগ্নিদগ্ধ হইলে ঐ স্থান পোড়া বটতলা ও দেবী "পোড়া মা" বা বিদগ্ধ জননী নামে খ্যাত হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'পোড়া মা' শব্দ 'পরামায়া' শব্দের অপভ্রংশ।

তখন পূর্ণানন্দের ন্যায় বহুলোকেই মন্ত্র সিদ্ধ হইতেন। প্রতি গ্রামেই ২।১ জন অমানুসিক ক্ষমতাপন্ন বামাচারী পাওয়া যাইত; তাঁহাদের অনেকেই গভীর নিশীথে দুর্গম শ্মশানে বসিয়া সাধনা করিতেন। "পঞ্চ মকার"* তখন গ্রামে গ্রামে আধিপত্য করিতেছিল এবং দেশ এক বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর স্রোতে বাধা দিতে নবদ্বীপে শীঘ্রই এক শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষ আগমবাগীশ নামে খ্যাত। ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণানন্দ; তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য ও কনিষ্ঠের নাম মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ। এই মাধবানন্দ একজন বিশুদ্ধ শান্ত বৈষ্ণব ছিলেন এবং গোপালের উপাসনা করিতেন। আধুনিক প্রসিদ্ধ কবি ও নৈয়ায়িক অজিত নাথ ন্যায়রত্ন ইঁহার বংশধর। কৃষ্ণানন্দের আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি হইতে ও তাঁহার বংশাবলীর নিকট হইতে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাঁহার "ষ্টাটিসটিকেল অ্যাকাউণ্ট" নামক পুস্তকে নদীয়ার রাজবংশের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণানন্দকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।† কিন্তু এমতটী নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। যাহাহউক তিনি যে একজন মহা ক্ষমতাশালী সাধক ছিলেন, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। কৃষ্ণানন্দই প্রথমে তন্ত্রোক্ত দেবী মূর্ত্তি সকলের সাকার পূজা প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান সময়ে যে শ্যামামূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে, তাহা এই কৃষ্ণানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কথিত আছে, দেবীর তন্ত্রোক্ত মূর্ত্তি কিরূপ গঠিত হইবে এবং বরাভয়প্রদ হস্ত-দ্বয়ের কি ভঙ্গিমা ও জ্রদ্বয় কি রূপে রঞ্জিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি দেবীর শরণাপন্ন হয়েন। দয়াময়ী দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন, "কল্য প্রভাতে উঠিয়া যাহার মূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথমে দেখিবে, তাহারই ভঙ্গিমায় ও রূপে

---

* মৎস্য, মদ্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা।

† Vide Hunter's statistical account Vol II. Page 156.

আমাকে গঠিত করিবে।" কৃষ্ণানন্দ সোৎসুকে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া যেমন বহির্দেশে পদার্পণ করিলেন, অমনি দেখিলেন, এক শ্যামাঙ্গিনী গোপবালা দক্ষিণ-পদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৃহের ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত গোময় গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত উত্থাপিত করিয়া ভিত্তিগাত্রে গোময়পিষ্টক রচনা করিতেছে; শ্রমাধিক্যে ঐ রমণীর কপোল দেশ ঘর্ম্মাক্ত হওয়ায় দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করায় তাহার সীমন্তের সিন্দূরবিন্দু ভ্রূদ্বয় রঞ্জিত করিয়াছে, অবগুণ্ঠন স্থানচ্যুত হওয়ায় আলুলায়িত কেশরাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এতদবস্থায় সহসা তাঁহাকে দর্শন করিয়া তিনি রমণীসুলভ লজ্জায় দন্তাগ্রে জিহ্বা ঈষৎ কর্ত্তন করিলেন, কৃষ্ণানন্দ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ছলছল নেত্রে এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া হৃদয়ে মায়ের কাল্পনিক মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইলেন এবং পরে তাহাই প্রকাশ করিয়া পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিলেন। এতদবধি ভূতচতুর্দ্দশীতে দীপদানের প্রথা সৃজিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে ও ক্রমে এই প্রথা সমগ্র ভারতব্যাপ্ত হইয়াছে।

শিবমুখ হইতে আগত পার্ব্বতী হৃদয়ে গত এবং কেশবের ইহাই মত বলিয়া তন্ত্রের অপর নাম আগম। তন্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি আগমবাগীশ নামে খ্যাত হয়েন। উচ্ছৃঙ্খল বামাচারীগণের যথেচ্ছাচার রহিত করিতে তিনি 'তন্ত্রসার' নামে এক সুবৃহৎ তন্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তন্ত্রের নাম করিয়া যে সকল নিষ্ঠুরতা ও মদ্যপানাদি কুক্রিয়া প্রচলিত ছিল, এই গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতেই দেশ হইতে তাহা অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র গোপাল "তন্ত্রদীপিকা" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন্।

"সিদ্ধান্ত কুমুদ চন্দ্রিকা" গ্রন্থকার স্মার্ত্ত রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র "রামেশ্বর" একজন সাধক বলিয়া খ্যাত। তৎকালে সকলেই ইঁহাকে রামেশ্বর তান্ত্রিক বলিয়া ডাকিত। ইনি দীক্ষা ও হোমাদি বিষয়ে "তন্ত্র প্রমোদন" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার সহোদর রঘুমণি "আগমসার" নামক পুস্তকের গ্রন্থকার, এইরূপ উল্লেখ আছে।

সেই সময়ে দেশের গণ্য মান্য ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও তন্ত্রের প্রচার হইয়াছিল। রাণী ভবানীর পুত্র রামকৃষ্ণ একজন উৎকৃষ্ট সাধক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন সাধনা "আনরে ভোলা জপি মালা" প্রভৃতি গান দেশ-

বিখ্যাত। বিখ্যাত সাধনসঙ্গীতরচয়িতা রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন বামাচারী ছিলেন। রামমোহন রায় নামক একজন বিখ্যাত গায়কের বহুতর সাধনসঙ্গীত দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণনগর রাজবংশের অনেকেই সাধক ছিলেন। রাজা গিরীশচন্দ্র শেষ জীবনে দেবীসাধনায় নিযুক্ত হন এবং নবদ্বীপে দুই বৃহৎ মন্দির স্থাপন পূর্ব্বক ভবতারিণী ও ভবতারণ নামে দুই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারই সময়ে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মশাসন গ্রামে চন্দ্রচূড় ন্যায়পঞ্চানন নামে অনেক ক্রিয়াবান তান্ত্রিক জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি প্রকাশ ও তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। এই সময় হইতেই স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্রেরও অবনতি ঘটিতে থাকে এবং মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম্মের প্রবল স্রোতে তন্ত্রোক্ত মত ভাসিয়া যায়।

ইহাই সংক্ষেপতঃ নবদ্বীপের সংস্কৃতচর্চ্চার ইতিহাস। ৯৯৯ শকে মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ৫জন ব্রাহ্মণ আনিয়া এতদঞ্চলে বিদ্যাচর্চ্চার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, কালে মহারাজ বল্লালসেনের সময় উহা অঙ্কুরিত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যুগে সমগ্র নবদ্বীপকে এক মহান্ কল্পদ্রুমে পরিণত করে। এই সময়ে নবদ্বীপ সর্ব্ববিষয়েই উন্নতির শিখরদেশে আরূঢ়। নৈয়ায়িকপ্রধান সার্ব্বভৌম অজেয় তার্কিক শিরোমণি, তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ আগমবাগীশ এবং পরমভাগবত হরিনাম-মূর্ত্তি মহাপ্রভু ঐ মহাদ্রুমের অমিয় ফল। সমগ্র ভারতবর্ষ তখন এই অমৃতময় ফলের সুধাধিক রসাস্বাদনে মত্ত, কালে কল্পদ্রুম শুষ্ক হইতে থাকে। মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যত্নে এই শুষ্কপ্রায় বৃক্ষে দুই একটী নবমুকুল মুঞ্জরিত হইয়া তাহাদের যশঃসৌরভে দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ইঁহারা—বাণেশ্বর, ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন, বীরেশ্বর প্রভৃতি।

বৈদেশিক শাসনে দেশ তখন সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি দিন দিন হতশ্রদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; কারণ তখন উহা আর অর্থকরী বিদ্যা ছিল না। মুসলমান শাসনে ফারসীর আদর ছিল, কিন্তু এই সময়ে কোম্পানীর হস্তে রাজত্ব যাওয়ায় উহার আদরও কমিয়া আসিতেছিল। ক্রমে এই দুই ভাষার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। শাসন কোম্পানীর হস্তে আসিলেও সর্ব্বদা শাসনসৌকর্য্যার্থে উপযুক্ত সংস্কৃতব্যবস্থাপক ও মৌলবীর সাহায্য প্রয়োজন হইত, কিন্তু অনেক সময়েই উক্ত কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিত। তন্নিমিত্ত এই অভাব দূরীকরণার্থ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের সময়ে মুসলমানগণকে ফারসী ভাষায় শিক্ষা

দিবার জন্য এক মাদ্রাসা ও ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জোনাথান ডান্‌কান নামক কোন ইউরোপীয়ের যত্নে কাশীধামে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির শিক্ষার জন্য চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক ব্যয় নির্দ্ধারণে এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণের সময় উপস্থিত হয় এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে চার্লসগ্র্যাণ্ট এবং ক্রীতদাসের চিরবন্ধু উইলবারফোর্স সাহেব প্রমুখাৎ কতিপয় উন্নতহৃদয় সাহেব ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির সমধিক প্রসার হয়, তৎসংক্রান্ত এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। দেশের অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃতচর্চ্চা দেশ হইতে একরূপ অপসারিত হইয়াছিল বলিলেও হয়; কচিৎ কোথাও দুই একটী পাঠশালা এক কিম্ভূত কিমাকার শিক্ষা বিস্তার করিতেছিল এবং এইসময়ে দেশের এই বিদ্যাহীনভাব গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো বাহাদুর এ সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন।* তাহাতে তিনি

---

*"It is a common remark that science and literature are in a progressive state of decay among the natives of India. From every enquiry which I have been able to make in this interesting subject, that remark appears to me but too well-founded. The number of the learned is not only diminished but the circle of learning even amongst those who still devote themselves to it, appears to be considerably contracted. The abstract sciences are abandoned, polite literature neglected, and no branch of learning cultivated, but what is connected with the peculiar religious doctrines of the people. The immediate consequence of this state of things is the disuse and even actual loss of many books, and it is apprehended, that unless Government interpose with fostering hand, the revival of letters may shortly become hopeless from want of books or of persons capable of explaining them". সুতরাং তিনি প্রস্তাব করেন "I would accordingly recommend that in addition to the College of Beneras (to be subjected, of course, to the reform already noticed) colleges be established at Nadiya and Tirhoot.

Vide

LORD MINTO'S MINUTE, DATED FORT WILLIAM, the 6th March, 1811. as in Rev. J Long's selection from unpub. Records Gov. Appendix D—page, 554

তৎকালীন দেশের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতির বিষয় বর্ণন, ও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "এ দেশে কেবল যে বিদ্বজ্জনের হ্রাস হইতেছে তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যার ক্ষেত্রও নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। মনোবিজ্ঞান, দর্শন আর অধীত হয় না; সুকুমার সাহিত্যের আর আদর নাই এবং জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ ভিন্ন অন্ত সাহিত্যের চর্চ্চা নাই। এই অনাদরের ফলে দেশ হইতে সদ্‌গ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে এবং ভয় হয়, অচিরে উপযুক্ত গ্রন্থ ও অধ্যাপক অভাবে দেশ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা একেবারে তিরোহিত হইবে। আমার মতে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কাশীতে যেরূপ সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, সেইরূপ বিদ্যালয় নদীয়া ও মিথিলাতেও স্থাপিত হউক।" এই মন্তব্যের পর মহামতি মিণ্টো বাহাদুর নদীয়ায় কিরূপ ধরণে ও ব্যয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে কার্য্যকর হইবে, তাহারও একটা আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কেবল প্রস্তাবমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। পরন্তু, নদীয়ার সুবিখ্যাত রাজবংশের বদান্য রাজগণ তাঁহাদের নিজ বিষয়ের আয় হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে নদীয়ার টোলে মাসিক সাহায্য-কল্পে যে ১২০ পাউণ্ড বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি দান করেন এবং কমিটি অব্ রেভিনিউ যাহা এতাবৎ মঞ্জুর করিয়া নিয়মিত দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্ধ করা হয়। পরে নদীয়ার ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের

কিরূপ ব্যয়ে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত ও কি ভাবে ইহা চালিত হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিপিবদ্ধ করেন।

2 Pandits at Rs. 100 each	2400 Rs.
12 Pandits at Rs. 60 each	7200 Rs.
	9600 Rs.

Library.

The librarian to be one of the Pandits receiving pensions.

2 Writers as assistants at Rs. 10	240 Rs.
2 Duftaries at Rs. 4	96 Rs.
Paper, ink etc at Rs.	40 Rs.
Purchase of copying books	1000 Rs.
	1,376 Rs.

Annual Prizes.

For the best scholar	800 Rs.
For the next	400 Rs.
For the 3rd	200 Rs.
For the 4th	100 Rs.
For other good scholars an honarary dress to each (consisting of a cloth of little value)	200 Rs.
	1700

Besides a substantial building to be erected.

এবং মুর্শিদাবাদের কমিসনর সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় উহা আবার মঞ্জুর করা হয়।* তদবধি নিয়মিত মাসিক ২০০৲ টাকা নদীয়ার স্বদেশী ছাত্রগণের বৃত্তি-স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া নদীয়া কালেক্টরেট হইতে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্বর্গীয় স্যার জন উডবরণ মহোদয় নদীয়া দর্শনে আসিয়া পণ্ডিত-দিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আর একশত টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া যান,† তাহাতে গবর্ণমেণ্টবৃত্তি মোট মাসিক ৩০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মহীষাদলের রাজবৃত্তি, ভূদেব বৃত্তি, গিরীশচন্দ্র বসুর দত্ত বৃত্তি, বৈষ্ণবচূড়ামণি বনমালী রায় প্রদত্ত বৃত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি বৃত্তির অর্থে বর্ত্তমান চতুষ্পাঠীগুলি কোনরূপে চলিতেছে। সংপ্রতি নবদ্বীপে টোলের সংখ্যা পঞ্চদশ; ইহাদের মধ্যে চারিখানিতে ন্যায়, আট খানিতে স্মৃতি, একখানিতে বেদান্ত এবং একখানিতে স্মৃতির সহিত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও ষট্‌সন্দর্ভ ও আর একখানিতে স্মৃতির সহিত ব্যাকরণ ও কাব্যের পাঠ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত বিল্বপুষ্করিণী, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, উলা, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান সমূহে আরও কতিপয় চতুষ্পাঠী বিদ্যমান আছে।

যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞানের স্পর্দ্ধা করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃত শিক্ষার্থ এই স্থানে বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। নবদ্বীপনিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব রামগোপাল কবিভূষণ তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। ডাক্তার কেরিসাহেব ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন এখানে অতিবাহিত করেন। ডাক্তার লিডেন বহুদিন এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে, তদানীন্তন কমিটী অব্ পাবলিক ইনসট্রাকশনের সম্পাদক ডাক্তার এইচ, এইচ উইলসন সাহেব এই বিদ্যামন্দিরেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সেকালের পণ্ডিতগণ কিভাবে সভারোহণ করিয়া তর্ক করিতেন ও কি কি গ্রন্থে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা জয়নারায়ণ সেন কৃত চণ্ডীকাব্যে সুচারু-

---

* Vide Hunter's Statistical Account of Nadiya. P. 111.

† এই উপলক্ষে নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী মহাশয় উডবরণ সাহেবকে "ন্যায়নিধি" উপাধি ভূষিত করেন।

ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত অংশটী উদ্ধৃত করিয়া আমরা নদীয়ায় সংস্কৃত বিদ্যা-চর্চ্চার ইতিহাস সম্পন্ন করিব।

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহণে।
কেবল অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম্ম সংস্থাপন কারণে॥
তেজঃপুঞ্জ সুকীরণ, শুক্লবর্ণ সুবসন, ভালেতে গঙ্গা মৃত্তিকা ফোটা।
শুক্ল যজ্ঞ উপবীতে, রক্ত ভোট আসনেতে, বসিতে হি বিচারের ঘটা॥
অনুমান প্রত্যক্ষতে, পরস্পর সম্বন্ধেতে, তার্কিক ঘটায় নানা তর্ক।
প্রমাণ কুসুমাঞ্জলী, নানামতে ব্রহ্ম বলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক॥
পদ পদার্থ বিচারেতে, একদণ্ড সমাসেতে, কার কত নিন্দিত ঘটাইয়া।
বৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার কর্কশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া॥
মধুর কাব্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিকে কহিছে রসেতে।
ধ্বনি বাক্য ক'য়ে ক'য়ে, ব্যঞ্জনাদিকল'য়ে, কাব্য প্রকাশ উদাহরণেতে॥
নানাচ্ছন্দে শ্লোকপাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কত মত বর্ণনা ভাবের।
রসিক বিবুধগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রঘু, ভট্টি, মাঘ, নৈষধের॥
পৌরাণিক পণ্ডিতে, নানামত প্রসঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে।
বশিষ্ঠাদি বেদ জানে, শুনক ভাবগণে, অন্ত প্রত্যন্তর লিখি।
দশা, বিদশা বসতি, জানায় সাধু প্রতি, সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত দেখি॥
সকলেতে ব্রহ্মময়, বেদান্তে এ মত কয়, পাপ পুণ্যালয় নিরঞ্জন।
শত্রু মিত্রময় তিনি, জ্ঞানভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্করাচার্য্যের লিখন॥
পড়িলে বিপত্তি-কালে, দোষ যদি ঘটে বলে, ধর্ম্মশাস্ত্র মতে পাপ নহে।
স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা এই, শূলপাণি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হ'য়ে মনু কহে॥"

বঙ্গভাষা ও শিক্ষা।

বঙ্গভাষা কতদিনের পুরাতন, সে সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে বৌদ্ধদের সময়ে যখন পৃথক্ বঙ্গলিপি ছিল, তখন যে পৃথক্ বঙ্গভাষাও ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা ভাষার আদিমকালে ডাকের বচন সৃষ্ট হয়। ডাক অর্থাৎ প্রচলিত বাক্য প্রথমে একটী, পরে আর একটী, এইরূপ দিনে দিনে উহা বর্দ্ধিতআয়তন হইয়া বংশপরম্পরায় বাঙ্গালীর মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গালাভাষার ক্রমোন্নতির সহিত এগুলিও কালে মার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের আড়ম্বরহীন সরল ভাষা ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহাদের প্রাচীনত্ব বেশ উপলব্ধি হইবে। এই ডাকের পর তাহারই অনুসরণ করিয়া শুভ মুহূর্ত্তে খনার বচন প্রকাশিত হয়, ইহাদের বর্ণিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশমালা চিরদিনই বাঙ্গলাভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। বাঙ্গালীমাত্রেই সাধারণতঃ শাক্ত হিন্দু গৃহস্থ। সাধারণ দেবদেবীতে তাহার চিরদিনই অচলা ভক্তি, সুতরাং যে মুহূর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হয়, সেই মুহূর্ত্তে পৌত্তলিক হিন্দু আবার চিরঅভিলষিত দেবদেবীর গঠনে ও পূজনে নিযুক্ত হয়। বাঙ্গালী তখন আপনার একটা ভাষা পাইয়াছে, সুতরাং আপনার ভাষায় আপনার অভীষ্ট দেবদেবীকে পূজা করিতে ও তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তনে স্বতঃই আগ্রহবান হইয়াছে, সুতরাং তদানীন্তন অব্যবস্থিতধর্ম্ম বাঙ্গালী স্বীয় স্বীয় কল্পনা অনুযায়ী দেবতার মহিমা গাহিয়া গিয়াছেন। কালে শিব, চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনী "পালা" কারে ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং এই আন্তরিক আগ্রহ হইতেই কালে আমরা কৃত্তিবাসের মধুর রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষে এই সুকুমার ভাষা তদীয় অসংখ্য প্রেমিক ভক্ত কর্ত্তৃক নানালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া বর্ত্তমান কমনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। যে দিন নদীয়া দেবগ্রাম-বাসী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ সংস্কৃতে প্রগাঢ় জ্ঞানশালী পণ্ডিতমণ্ডলী বাঙ্গালীর নিমিত্ত গ্রন্থ প্রণয়নে সংস্কৃত অপেক্ষা বাঙ্গলাকে প্রাধান্য দিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল বাঙ্গলাভাষায় প্রণয়ন, এমন কি বঙ্গভাষারচিত

"পদামৃত সমুদ্রের" সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন, সেই দিন বঙ্গভাষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় রহিবে।

বঙ্গভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টি নদীয়ায়। যদিও বাঙ্গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি ও রচনা বহুদিন হইতে দেখা যায় বটে, ও "বিদ্যাপতি" প্রভৃতি আধাবাঙ্গালী কবি বঙ্গকবিরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন বটে, কিন্তু প্রসিদ্ধ রামায়ণকার কৃত্তিবাসই খাস বাঙ্গালী আদি কবি। ইনি নদীয়াজেলার অন্তর্গত ফুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তিনি যে মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া, যাহা এক্ষণে বনাকীর্ণ হইয়া আছে, তাহা তাঁহার সময়ে গঙ্গাতীরস্থ এক সমৃদ্ধ স্থান ছিল। কবি অনেক স্থলেই

"স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ার নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥"

প্রভৃতি বাক্য দ্বারা তাঁহার জন্মভূমির যশোগান করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি ইহাকে "গ্রামরত্ন" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। চঞ্চলা ভাগীরথী এখন ফুলিয়ার বহুদূরে প্রবাহিতা কিন্তু খৃষ্টীয় ১৬৮২ অব্দেও ফুলিয়ার নিম্নে গঙ্গা বহতা ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরি সমূহের এজেণ্ট ও গবর্ণর হেজ সাহেব তাঁহার রোজনামচায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।*

---

* Hedge's Diary Oct. 15th, 1682—Being Sunday, we dined ashore at Fulia under a great shady tree near Santipur where all our Saltpetre boats are ordered to stop.

এই গ্রন্থ রচনাকালে আমি আমার শ্রদ্ধাস্পদবন্ধু "মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনী" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং বহুভাষাবিৎ ও প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত অমূল্যচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহোদয়ের সহিত কৃত্তিবাস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনুসন্ধানের নিমিত্ত ফুলিয়ায় যাইয়া তথাকার কতিপয় অতি বৃদ্ধের নিকটে সন্ধান করিয়া জানিতে পারি যে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় যখন রাণাঘাটে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তৎকালে বহু অনুসন্ধানে কৃত্তিবাসের এক দোলমঞ্চ আবিষ্কার করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি সাধারণের অর্থে ক্রয় করিয়াছিলেন; এবং একটী পাকা ইন্দারা খনন করিয়াছিলেন; উহা অর্দ্ধসমাপ্তভাবে এখন পড়িয়া রহিয়াছে। ইহারই কিয়দ্দূরে একজন বৈষ্ণব, যবন হরিদাস ঠাকুরের পাট আবিষ্কার

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহা তাঁহারই স্বরচিত আত্মচরিত হইতে গৃহীত। সম্প্রতি এই পদ্যময় জীবনীটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হস্তলিখিত বহু পুরাতন পুঁথিতেই এই বিবরণ দেখা যায়; সুতরাং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কবি স্বয়ং নিঃসন্তান। তাঁহার পিতৃব্য অনিরুদ্ধের বংশাবলী অদ্যাপি ফুলিয়াতে বাস করিতেছেন।

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার কালে গৌড়েশ্বরগণ এতদঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা বিদ্যোৎসাহী ও স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন; ইঁহাদের অনেকেই মুসলমান হইলেও উদারহৃদয় ছিলেন এবং নিজেরাও হিন্দু পৌরাণিক-কাহিনী বঙ্গভাষায় লিখিতে ও লিখাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুপ্রসিদ্ধ হুসেন সাহার যত্নেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী কর্ত্তৃক মহাভারত অনুবাদিত হয় এবং গুণরাজ খাঁ শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যান্তে মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত অনুশীলন করিলে আমরা বহু গ্রন্থকারের নাম প্রাপ্ত হই। কত অমূল্য প্রাচীন পুঁথি যত্নাভাবে কত পল্লীতে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যতগুলি এ পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমরা অনেক মেধাবী লেখকের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ভারত-অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত প্রভৃতি এবং মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার ভাসান প্রভৃতি গীত প্রণেতাগণ বাঙ্গালা ছড়ায় গীত রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই সময়েরই কবিতাকুঞ্জের কলকণ্ঠ কবি। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় যে প্রেমের বীজ বপন করিয়া যান, কালে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপ প্রেমবৃক্ষের উদ্ভব হয়। এই মহাপুরুষের অনন্ত কৃপায় দীনা বঙ্গভাষা সমৃদ্ধিসম্পন্না হইয়াছিল। ইঁহারই অসংখ্য ভক্তবৃন্দ, অসংখ্য প্রেমময় পদাবলী রচনা দ্বারা

পূর্ব্বক একটী কুঠারি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। হরিদাসের সমাধি যেখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই উত্তর সীমায় গ্রামবাসীরা কৃত্তিবাসের ভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দোলমঞ্চসম্বন্ধে দেখা যায় যে বহু প্রাচীনেরাও উক্ত স্থানটী কখন কর্ষিত হইতে দেখেন নাই এবং একটী ক্ষুদ্রমৃত্তিকা স্তূপ অদ্যাপি এস্থলে দৃষ্ট হয়।

বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই অসংখ্য মেধাবী গ্রন্থকারগণ দ্বারা সমগ্র বঙ্গভূমি পরিব্যাপ্ত। প্রায় প্রতি জেলাতেই দুই দশজনের আবির্ভাব দেখা যায়। ইঁহাদের কেহ কেহ নদীয়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা আজীবন এখানে বাস করিয়াছেন।* শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্শ্বদবৃন্দ যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, এই নবদ্বীপকেই তাঁহারা প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন এবং এই নবদ্বীপচন্দ্রকে লইয়াই তাঁহাদের কাব্য স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। সুতরাং ইঁহাদের গ্রন্থার্জ্জিত যশের উপর নদীয়ার সম্পূর্ণ দাবী আছে। শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক ও পশ্চাদ্বর্ত্তী ভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক একদিকে বঙ্গভাষার প্রেমের সাহিত্য যেরূপ পুষ্ট হইতেছিল, অন্যদিকে দামুন্যাবাসী প্রসিদ্ধ চণ্ডীলেখক কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি, শিবসংকীর্ত্তন প্রণেতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ঘনরাম চক্রবর্ত্তি, পদ্মাবতীপ্রণেতা আলোয়াল এবং কাশীরাম দাসপ্রমুখ মহাভারত অনুবাদক পণ্ডিতমণ্ডলী ভাষাকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন। চৈতন্যমঙ্গলের গ্রন্থকার জয়ানন্দ এইসময়ের ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সাহিত্যের একটী সুন্দর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথাঃ—

"চৈতন্য অনন্ত রূপ অনন্তাবতার।
অনন্ত কবীন্দ্র গায়ে মহিমা যাঁহার॥
রামায়ণ করিল বাল্মিকী মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত করিল ব্যাস মহাশয়।
গুণরাজ খাঁন্ কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥

* জগদানন্দ দাস, প্রেমদাস, ছোট হরিদাস, বলভদাস, বংশীবদন দাস, মাধব দাস, গদাধর দাস, বৃন্দাবন দাস, রামচন্দ্রদাস গোস্বামী, হরিবল্লভ দাস, মুরারী গুপ্ত, যদুনাথ দাস, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি অসংখ্য বিখ্যাত পদকর্ত্তার জন্মভূমি নদীয়ায়। আবার যাঁহাদের জন্ম নবদ্বীপে নয়, অথচ শ্রীচৈতন্যের প্রেমে বদ্ধ হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অত্যধিক, বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের প্রায় সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রকাশ॥
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥
শ্রী পরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে।
সংক্ষেপে করিল তিঁহি গোবিন্দ বিজয়ে॥
আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড, শেষ খণ্ড করি।
শ্রী বৃন্দাবন দাস রচিল সর্ব্বোপরি॥
গৌরী দাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সংগীত প্রবন্ধ তার পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিনি পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপাল বসু করিলেন সংগীত প্রবন্ধে।
চৈতন্য মঙ্গল তার চামর বিচ্ছন্দে॥
ইবে শব্দ চামর সংগীত বাদ্য রসে।
জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল গাএ শেষে॥"

এই ক্রমোন্নত বঙ্গভাষা পরবর্ত্তী কালে বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যত্নে সমধিক শ্রীসম্পন্না হয়। বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নদীয়া যতটুকু চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে মহাপ্রভুর পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই উল্লেখযোগ্য। ইঁহার অসাধারণ যত্নে ও অর্থব্যয়ে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ কর্ত্তৃক অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষা এই সময়ে আর কষ্টকল্পিত গ্রাম্য ভাব ও ভাষা দুষ্ট পল্লী গীত নহে, ইহা তখন অলঙ্কারবহুল, রসাশ্রিত, কবিকল্পিত, রাজানুগৃহীত, বিদ্বজ্জনাদৃত সুললিত ভাবময় এক মধুর ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যে যেমন মৈথিলী ভাষা ও ব্রজবুলির মিশ্রণ দেখা যায়, এই সময়ে তেমনি মুসলমানী ভাব ও ভাষা প্রকাশ্যরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান অধিকার করে। বাঙ্গালা ভাষা এইরূপে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত এবং মৈথিলী, ব্রজবুলী প্রভৃতি ভাষা দ্বারা পুষ্ট হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে হিন্দী, ফারসী, ইত্যাদি ভাষা দ্বারা অলঙ্কৃত হয়।

এইরূপে সুচারুভাবে অলঙ্কৃত কমনীয় বঙ্গভাষা ক্রমে উন্নত হইয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, দিনবন্ধু মিত্র, অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বিবুধ মনখীগণ কর্ত্তৃক পরিমার্জ্জিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই বর্ত্তমানকাল প্রচলিত বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে যাঁহারা ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, শ্যামাচরণ সরকার, প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি অনেকেরই জন্মভূমি নদীয়ায়। স্থানাভাবে তাঁহাদের কতিপয়ের মাত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপি-বদ্ধ করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইল।

জয় গোপাল তর্কালঙ্কার।

ইনি নদীয়া জেলার (বর্ত্তমান যশোহর জেলার) অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৭৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহঁার পিতা কেবলরাম ভট্টাচার্য্য তর্কপঞ্চানন নাটোররাজের সভাসদ ছিলেন। তাঁহার ৫ পুত্র। জয়গোপাল সর্ব্বকনিষ্ঠ। বৃদ্ধ বয়সে কেবলরাম জয়গোপালকে সঙ্গে লইয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কাশীবাসী হয়েন ও তথায় শিক্ষালাভ করেন। সাহিত্যশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার কালে তাঁহার তুল্য শাব্দিক আর দেখা যায় না। ১৭৯৫ অব্দে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। পরে ৪৬ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। ১৮০৫ অব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়। বহুস্থানে বহুচেষ্টার পর ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুরের কেরী সাহেবের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। পরে ১৮১৩ অব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৬ বৎসর তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন প্রভৃতি মনীষিগণ সকলেই তাঁহার ছাত্র। তিনি তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের জজ পণ্ডিতের অন্যতম ছিলেন। মিসনরী কেরী ও মার্শম্যান সাহেব তাঁহার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলে সর্ব্বপ্রথম অনু-

গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত প্রকাশিত হয়। সুতরাং তিনিই বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির সূত্রপাত করিয়া যান স্বীকার করিতে হয়। তিনি একজন সুকবি ও ক্ষমতাপন্ন লেখক ছিলেন। তিনি যদিও রামায়ণাদি প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রাচীনতম বঙ্গগ্রন্থ রামায়ণের ও মহাভারতের পাঠ বিকৃত করিয়া সাহিত্যের ঘোর অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দুই গ্রন্থ ব্যতীত, বিল্বমঙ্গলকৃত হরিভক্ত্যাখ্যিকা সংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ, 'পারসী অভিধান' নামাভিধেয় একখানি অভিধান ও কতিপয় ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৪৪ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি বিল্বমঙ্গলের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় আপনার আবাসস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন:—

"চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,
ভূমিপতি ভূমিসুর পতি।
তাঁর রাজ্য শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজপূজিত গ্রাম
বজরা পুরেতে নিবসতি॥
শ্রীজয় গোপাল নাম, হরিভক্তি লাভ কাম,
উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।
ভক্তবৃন্দ মধ্য রবি, শ্রীবিল্ব মঙ্গল কবি
কবিতার প্রকাশে পয়ার॥"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

ইনি কাঁচড়াপাড়া নিবাসী হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৩২ শকে (১২১৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুন শুক্রবার ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কাঁচড়াপাড়ার সন্নিহিত শিয়ালডাঙ্গার নীলকুঠীতে চাকুরী করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে সাতিশয় দুরন্ত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার পিতা পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেন।

এই বিবাহ বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়ায় পরম অভিমানী বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া দারুণ ক্রোধে পিতার কাঞ্চনপল্লীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিলেন এবং এখানে থাকিয়া ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত জন্মকবি। বাল্যকালে যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র মহেশচন্দ্র প্রভৃতি পার্শী পড়িতেন, ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাঁহাদের মুখে সেখ সাদী প্রভৃতি কবিতার অর্থ শুনিয়া বাঙ্গলায় পদ্য রচনা করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র মহেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতে কবিতা রচনা করিতেন এবং তিনিও একজন সুকবি ছিলেন। একদিন ঈশ্বরচন্দ্র কৌতুক করিয়া তাঁহাকে বলেন, "দাদা লেজ লুকালে কেন," তাহাতে মহেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—

"ওরে দুই ভায়ের দুই থাকলে লেজ, থাকত না সংসার।
একে তোমার লেজে গেছে মজে, সোণার লঙ্কা ছার খার॥"

যাহাহউক তাঁহাদের দুই ভাইয়ে বেশ সম্প্রীতি ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতানুরাগ তাঁহার ইংরাজী শিক্ষার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তিনি ইংরাজি পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভাষা অনুশীলনে মনোযোগী হয়েন। ১৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গুপ্তিপাড়া নিবাসী গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দুর্গামণি, রূপে কুৎসিত ও নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধি ছিলেন, একারণে স্বামীর সহিত জীবনে একদিনও তাঁহার মিলন হয় নাই।

পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। ইহাঁর সাহায্যে ১২৩৭ সালে ১৬ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র "সংবাদ প্রভাকর" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন, কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে 'প্রভাকর' উঠিয়া যায়। অনন্তর ১২৪২ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার হইতে তিনি কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে পুনরায় প্রভাকর বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে 'প্রভাকর' দৈনিকরূপে বাহির হয়। ইহাই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকা।

১২৫৩ সালের ৭ই আষাঢ় তিনি "পাষণ্ড-পীড়ন" নামে একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় "ভাস্কর" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য) "রসরাজ" নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরও পাষণ্ডপীড়নে তার প্রতিবাদ করিতে থাকিলে

যতদিন ধরিয়া বহু কুৎসাপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়। উহা তখনকার সমাজে একটী আমোদের বিষয় হইয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই পত্র দুখানি উঠিয়া যায়। অতঃপর ১২৫৪ সালে ঈশ্বর গুপ্ত "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রগণের কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে তিনি একখানি বৃহৎ কলেবর মাসিক 'প্রভাকর' বাহির করেন। ইহাতে অধিকাংশই তাঁহার স্বরচিত কবিতা প্রকাশিত হইত। ১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের 'প্রভাকরে' তিনি 'প্রবোধ প্রভাকর' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন। উহা ১লা ভাদ্র শেষ হয়। পরে "হিত প্রভাকর" ও "বোধেন্দু বিকাশ" শেষ করেন। তিনি দশ বৎসর কাল বঙ্গদেশের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া বহুকষ্টে রামপ্রসাদ সেন, রাম বসু, রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বসু, নৃসিংহ প্রভৃতি বহুখ্যাতনামা প্রাচীন বঙ্গ কবির জীবনচরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। পরে ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ ভারতচন্দ্রের জীবনী ও অনেক লুপ্ত পদাবলী প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা ও ক্ষুদ্র ছড়া প্রভৃতি রচনা করিয়া বঙ্গভাষাকে সমধিক গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কবির কাব্য ও জীবনচরিত প্রকাশে তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। এই পরম উদ্যোগী পুরুষ তাঁহার স্বদেশীয় কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ সকলের কর্ত্তৃক সমভাবে সম্মানিত হইয়া ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র 'প্রভাকরের' সম্পাদক হয়েন। তখন প্রাগুক্ত মহেশচন্দ্র দুঃখ করিয়া লেখেন :—

"সাত মেড়াতে জড় হ'য়ে নষ্ট করলে প্রভাকর।
অরে কলম ধরেনিক রাম হ'লেন এডিটর।
আগা পাছা বাদ দিয়ে শ্যাম হলেন কসেওর"।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলায় অন্তর্গত বিল্বগ্রামে মদনমোহন জন্ম গ্রহ

করেন। তাঁহার পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের এক জন পুস্তকলেখক ছিলেন। মদনমোহন অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন এবং প্রথমে স্বগ্রামের চতুষ্পাঠীতে কিছু ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজীতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক কলেজে অধ্যয়ননিরত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই "রসতরঙ্গিণী" ও "বাসবদত্তা" নামে দুই খানি সুললিত পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তি দেখিয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কারপ্রমুখ অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহাকে কাব্যরত্নাকর উপাধি দেন, পরে তিনি বন্ধুগণ কর্তৃক তর্কালঙ্কার উপাধিভূষিত হয়েন। পাঠ সমাপন করিয়া তিনি যথাক্রমে বারাসাত, কলিকাতা ফোর্টউইলিয়ম কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরিশেষে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই সময় তিনি কতিপয় দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি কলিকাতায় 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বহু প্রাচীন অনেক বাঙ্গলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। এই কালে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ জে, ই, ডি, বেথুন সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্যে ও পরামর্শে বেথুন সাহেব, হেদুয়ার ধারে বাঙ্গালী বালিকাগণের শিক্ষার্থে বেথুন কলেজ স্থাপনা করেন। মদনমোহন মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে "কন্যাপেবং পালনীয়া, শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" বচন উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে বালিকাবিদ্যানুরাগী করিতে প্রয়াস পান এবং সমাজের ভ্রূভঙ্গি অবহেলা করিয়া প্রথমেই আপনার দুই কন্যাকে ঐ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই সময় তিনি বালিকাগণের পাঠোপযোগী গ্রন্থের অভাব অনুভব করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ "শিশুশিক্ষা" পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং "সর্ব্ব শুভঙ্করী" নাম্নী এক খানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুরসিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং ছয় বৎসর ঐ কার্য্যে থাকিয়া পরে ঐ স্থানেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়েন। অনন্তর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিসূচিকা রোগে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

মদনমোহন তাঁহার সুন্দর রচনা ও অসাধারণ মানসিক বলে বহু বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সকলের অনু-করণীয়। বাঙ্গালা কবিতা রচনা বিষয়ে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে পরাজিত করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তিনি কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু ততদূর পারক না হইলেও তাঁহার কবিতাও যে অতিশয় মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। "রস তরঙ্গিণী" তাঁহার প্রথম রচনা, বাসব-দত্তার পয়ারে বঙ্গানুবাদ তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যম। অতঃপর তিনি "শিশুশিক্ষা" সঙ্কলন করেন। প্রথমভাগের শেষে অসংযুক্ত হলবর্ণে তিনি যে সরল ও সুমধুর কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা অনুপমেয়। তাঁহার সেই সুললিত কবিতাটী বাঙ্গালীর কে না জানে?

" পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।" ইত্যাদি।

শ্যামাচরণ সরকার।

শ্যামাচরণ নদীয়া জেলার অন্তর্গত মামজোয়ান গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় হরনারায়ণ সরকারের পুত্র। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে শ্যামাচরণের দুঃখিনী মাতা বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের এক আত্মীয় কৃপাপরবশ হইয়া এবং শ্যামাচরণের বিদ্যা-শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া কৃষ্ণনগরের স্বীয় ভবনে রাখিয়া পার্শী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। যাঁহার বাটীতে তিনি থাকিতেন, তাঁহার হাট বাজারাদি ভৃত্যোচিত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত; সুতরাং অবসর মতে পাঠ্য পুস্তকাদি স্বহস্তে লিখিয়া তাহাই পাঠ করিয়া বহু কষ্টে উক্ত ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময় তাঁহার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় তিনি গ্রীড্ সাহেব নামক এক জমিদারের সেরেস্তায় ১০৲ টাকা বেতনে এক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু নানা কারণে শীঘ্রই তিনি এ চাকরী পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত প্রসিদ্ধ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের আলাপ হয়। তাঁহারই পরামর্শে শ্যামাচরণ কলিকাতায় আগমন করেন এবং রামতনু বাবুর বাসায় থাকিয়া ইংরাজি অধ্যয়নে মন দেন।

ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর। এই বয়সে অদম্য উৎসাহে দিবা রাত্র পরিশ্রম করিয়া তিনি ইংরাজী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি প্রত্যহ বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন এবং কোন সাহেবের সহিত আলাপ হইলে যদ্যপি তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করিতেন। এইরূপে বহু সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং কিছু উপার্জ্জনও হইতে থাকে। এই সময়ে বড় লাট সাহেবের কৌন্সিলের মেম্বার সার্ চার্লস্ ট্রিবিলিয়ন সাহেব ইংরাজী, বাঙ্গালা, উর্দ্দুতে একখানি ক্ষুদ্র অভিধান প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। এই উপলক্ষে শ্যামাচরণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং সাহেব তাঁহাকেই একার্য্যের ভারার্পণ করেন। এই সময় তিনি কয়েকখানি উর্দ্দু গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। উক্ত সাহেব তাঁহার এই সকল কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতা মাদ্রাসায় একটী চাকরী করিয়া দেন। এখানে থাকিতে থাকিতে তিনি ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালি প্রভৃতি নানা ভাষার ব্যাকরণ মুখস্থ করেন। এইরূপে ত্রিশবৎসর বয়সের পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ বহুভাষাবিৎ হইয়া উঠেন। এই সময় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়নে রত হয়েন এবং অল্প দিনের মধ্যে ঐ ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইয়া সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। এখান হইতে তিনি সদর দেওয়ানীতে পেস্কারের পদে নিযুক্ত হন। পরে ঐ আদালতে উকিল হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে উক্ত আদালতে ভর্জ্জমা দপ্তরের সৃষ্টি হইলে জজগণ তাঁহাকেই ৪০০৲ টাকা মাহিয়ানায় প্রধান অনুবাদক নিযুক্ত করেন পরে কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য করিলে তিনি ৬০০৲ টাকা বেতনে সুপ্রীম কোর্টের ইনটার প্রেটার অর্থাৎ দ্বিভাষী নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণের যাবতীয় আইন অধ্যয়ন করেন; এবং পরে ইংরাজীতেও বাঙ্গালার দায়ভাগানুযায়ী এক বৃহৎ "ব্যবস্থাদার সংগ্রহ" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। অল্প দিনেই উক্ত গ্রন্থ বাঙ্গালায় ও বিলাতে প্রামাণিক 'গ্রন্থ বলিয়া গণ্য' হয়। এই গ্রন্থের প্রসারে উৎসাহ পাইয়া তিনি মিতাক্ষরানুযায়ী ব্যবস্থা চন্দ্রিকা নামক পুস্তক রচনা করেন। পরে মুসলমানগণের বিবিধ উত্তরা-

গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় আইনের গ্রন্থরচনায় তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায় এবং সাধারণের উপকারের নিমিত্ত স্বগ্রামে একটী স্কুল, দুইটী রাস্তা, দুইটী কূপ, ও একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় C. I. E.

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী গোস্বামী-দুর্গাপুরে ১৮৪৫ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর তারিখে রাধিকাবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দ চরণ মুখোপাধ্যায় এক নীলকুঠীতে কর্ম্ম করিতেন এবং তৎসূত্রে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও অসাধারণ দাতা বিধায় মৃত্যুকালে কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার দুই পুত্র; প্রথম রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর C. I. E. এবং কনিষ্ঠ রাজকৃষ্ণ। পিতার মৃত্যুতে দুই ভাই কষ্টে পড়িলেও লেখা পড়ায় একদিনও কেহ অমনোযোগী হয়েন নাই। জ্যেষ্ঠ রাধিকাপ্রসন্ন প্রশংসার সহিত "জুনিয়ার" "সিনিয়ার" পাশ করিয়া পরে স্বীয় অসাধারণ গুণে বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েন। এই কালে তিনি বঙ্গভাষার বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হয়েন। বহুদিন উক্তপদে অবস্থান করিয়া পরিশেষে কিছুদিন স্পেষল পেন্সন ভোগ করিয়া এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক C. I. E. উপাধি ভূষিত হইয়া চারিটী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে গমন করেন।

কনিষ্ঠ রাজকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের যত্নে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া একে একে F. A., B. A., M. A., ও B. L. পরীক্ষায় অতি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে কলিকাতায় আসিয়া প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত, ফারসী, জার্ম্মনি, উর্দ্দু, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। এইরূপে সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইয়া তিনি ক্রমান্বয়ে জেনারেল এসেম্বিলিজ কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কটক কলেজ, বহরমপুর কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যাপনা কার্য্য করেন। পরে কিছু দিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া পরিশেষে ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ৭০০৲ টাকা বেতনে অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিনিই গবর্ণমেণ্টের প্রথম বাঙ্গালা-অনুবাদক। তিনি কার্য্যোপলক্ষে বহু স্থানে

অবস্থিতি করিলে এবং শত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও চিরদিনই মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত যৌবনউদ্যান, মিত্রবিলাপ, কাব্য-কলাপ, রাজবালা, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালা এলজেবরা, কবিতামালা এবং নানা প্রবন্ধ প্রভৃতি পুস্তকাবলী বাঙ্গালীর মনে চিরদিন তাঁহার নাম জাগরূক রাখিবে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহার সাতিশয় অনুরক্তি দৃষ্ট হইত।* ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত চুপী† নামক গ্রামে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার দিনে অক্ষয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পিতাম্বর, মাতা দয়াময়ী, অক্ষয়কুমারের প্রথম শিক্ষা চুপী গ্রামেই আরম্ভ হয়; পরে ১০ বৎসর বয়সে খিদিরপুর আসিয়া কলিকাতা গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি নামক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় অর্থাভাবে তাঁহাকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু অসীম অধ্যবসায়ী অক্ষয়কুমার এক দিনের জন্যও পাঠে বিরত হইলেন না। বরং অত্যধিক পরিশ্রম সহকারে গৃহে থাকিয়াই ইংরাজী, জর্ম্মাণ, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাপাঠে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহারই অনুরোধক্রমে অক্ষয়কুমার "প্রভাকরে" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৭৬২ শকে কলিকাতায় "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমার

---

*লক্ষণ সেন সম্বৎ যে অদ্যাপি ত্রিহুটে প্রচলিত আছে, এ বিষয় তিনিই আবিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ H. Beveridge সাহেব 1888 সনের জুলাই মাসের Calcutta Review পত্রে ৪৪ পাতে এইরূপ লিখিয়াছেন।

It is pleasant to be able to record that the natives of India no longer neglects the study of history. The venerable Dr. Rajendra Lal Mitra has devoted a lifetime to historical and Philological inquiries and it was another Bengali, Babu Raj Krishna Mukherjee who discovered that the Lachman Sen Era is still current in Tirhoot.

† যদিও চুপী গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বটে, কিন্তু উহা নবদ্বীপ গ্রামের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় অক্ষয়কুমারের জীবনের উপর নদীয়ার প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ইহাতে আট টাকা মাহিনায় ভূগোলশিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হয়—অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি উহা যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন করেন। এই কালেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সমধিক আগ্রহবান হয়েন; ১২৯০ সালের আষাঢ় মাসে একদিন উপাসনা কালে তিনি অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার নিদারুণ শিরঃপীড়ার নিদান। ১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ :—"বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার", চারুপাঠ প্রথম ভাগ, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ, পদার্থ বিদ্যা, ধর্ম্মনীতি। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগ এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ—ইহাই তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ।

দীনবন্ধু মিত্র।

নদীয়া কাঁচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৬ সালে দীনবন্ধু জন্ম গ্রহণ করেন। এই চৌবেড়িয়া পূর্ব্বে বহু সমৃদ্ধ নগরী ছিল এবং চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ নামে খ্যাত ছিল। দীনবন্ধুর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ইহা যশোহরের এলেকাধীন হইয়াছে। দীনবন্ধু আপনাকে নদীয়াবাসী বলিয়া সর্ব্বদা গৌরব অনুভব করিতেন। কলিকাতায় থাকিয়াই দীনবন্ধু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলেজ ছাড়িয়া দেড়শত টাকা বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েন। এই পরে এই পোষ্টাল লাইনের কার্য্যেই তিনি সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদা মফস্বলের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইত; এইরূপে তিনি মনুষ্যচরিত্র পাঠের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার অতুলনীয় নাটক সকলের সৃষ্টি হয়। কার্য্যোপলক্ষে তিনি উড়িষ্যা হইতে নদীয়ায়, পরে নদীয়া হইতে ঢাকায় প্রেরিত হয়েন; এই সময়ে নীলের হাঙ্গামা উপস্থিত

হয়, এবং দীনবন্ধু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান নাটক "নীলদর্পণ" প্রণয়ন করেন। তাহার পর "নবীন তপস্বিনী", 'বিয়ে পাগলা বুড়ো", "সধবার একাদশী" পরে "লীলাবতী"। অতঃপর "সুরধনী কাব্য", এবং "জামাই বারিক", লিখিত হয় ও দ্বাদশ কবিতা প্রকাশিত হয়। "কমলেকামিনী" দীনবন্ধুর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল। "যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ", 'পোড়া মহেশ্বর"; "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ" এবং 'গদ্য সংগ্রহ" নামে আর কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। দীনবন্ধু বড়ই পরিহাস রসিক, খোস খেয়ালী ও সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। পরিহাসের অবসর পাইলে তাহার সদ্ব্যবহার তিনি সর্ব্বদাই করিতেন। তাঁহার লেখাতে তাঁহার চরিত্রের পরিহাস প্রিয়তা পূর্ণভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই গুণেই তাঁহার রচিত নাটক সকল সাফল্য লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"দীনবন্ধুর অনেক গুলি গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনামূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। "সধবার একাদশীর" প্রায় সকল নায়ক নায়িকা গুলিই জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, তদ্বর্ণিত ঘটনা গুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। "জামাই বারিকের" দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। "বিয়ে পাগলা বুড়ো" জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরাজী গ্রন্থ প্রচলিত খোস গল্প হইতে সার সংগ্রহ করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। "নবীন তপস্বিনী"তে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা 'রমণীমোহনের' বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। "হোঁদল-কুৎকুতের" ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক। "জলধর" "জগদম্বা" "মেরী ওয়াইভস অফ উইণ্ডসর" হইতে নীত।"

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু কলিকাতার সুপার নিউমারি ইনস্পেকটিং পোষ্টমাষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েন, পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের সাহায্য করাই এ পদের কার্য্য। ১৮৭১ সালে ইনি যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিতে কাছাড় গমন করেন এবং তথায় অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করায় তিনি গভর্মেণ্ট কর্তৃক "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষিত হয়েন। এই সময়ে কোনও কারণে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ও ডিরেক্টর জেনারেলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত

হয়, দীনবন্ধু পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের পক্ষ অবলম্বন করেন, ফলে তাঁহাকে পোষ্ট বিভাগ ছাড়িয়া কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময়ে তাঁহার বহুমূত্র রোগ দেখা দেয় এবং তাহারই ফলে ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে তিনি কতিপয় কয়েকটী পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র শ্রীললিতমোহন মিত্রও একজন সুলেখক। নীলহাঙ্গামার ইংরাজী ইতিহাস লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহাঁরা এখন কলিকাতাবাসী.

জগদীশ্বর গুপ্ত।

জগদীশ্বর গুপ্ত কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সটীক "চৈতন্য চরিতামৃত" "লীবাস্তবক" এবং "চৈতন্য লীলামৃত" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থমালার সঙ্কলয়িতা ও প্রণেতা। এতদ্ব্যতীত ইঁহার লিখিত বহু গবেষণ পূর্ণ প্রবন্ধ সাময়িক সাহিত্যে দৃষ্ট হয়।

১২৫২ সালের ভাদ্র মাসে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি মেহেরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মেহেরপুরের বিখ্যাত মল্লিক বংশই ইঁহার মাতুলালয়। জগদীশ কৃষ্ণনগরে থাকিয়াই বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং আপনার মেধা প্রভাবে প্রবেশিকা হইতে বি, এল পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেন এবং প্রবেশিকায় চৌদ্দ ও এল, এ, পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। কিছুদিন দিনাজপুরে ওকালতী করিয়া তিনি মুন্সেফী পদ গ্রহণ করেন এবং এতদুপলক্ষে মেদিনীপুর, নীলফামারী, রাঁচি, বাঁকুড়া, জাজপুর, কাটোয়া, যশোহর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি বহুস্থানে অবস্থান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ ও দর্শনীয় স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯২ সালের ৮ই জুলাই যকৃৎ রোগে কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন।

কালীময় ঘটক।

"চরিতাষ্টক" প্রণেতা পণ্ডিত কালীময় ১২[illegible] সালের কোজাগর রাত্রিতে রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত ইঁহাদের আসল উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া

কালীময় পিতা, পিতামহের ন্যায়ই পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার যেমন প্রগাঢ় অনুরাগ দৃষ্ট হইত, তেমনি নর্ম্মালস্কুলে পাঠহেতু বাঙ্গলা ভাষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তাঁহার প্রথম চাকরী নদীয়ান্তর্গত ভালুক্ গ্রামের বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে, পরে তথা হইতে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি বেলেড়া গ্রামে বঙ্গবিদ্যালয়ে আগমন করেন। তথা হইতে নিজগ্রাম রাণাঘাটে আসিয়া রাণাঘাটবাসী জনসাধারণের সাহায্যে একটী বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার প্রধান পণ্ডিত হয়েন। এই বঙ্গবিদ্যালয়টী পরে রাণাঘাটের ইংরাজি বিদ্যালয়ের সহিত এক হইয়া যায় এবং কালীময় ইংরাজি স্কুলের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি বহু পরিশ্রমে, স্বয়ং বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দুইভাগ চরিতাষ্টক রচনা করেন। বাঙ্গলা ভাষায় স্কুলপাঠ্যরূপে এরূপে স্বদেশী লোকের জীবনচরিতপ্রকাশ এই প্রথম; সে কারণে ইহা টেক্সট বুক কমিটী কর্ত্তৃক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়। এই চরিতাষ্টক ব্যতীত তাঁহার "ছিন্নমস্তক" "শর্ব্বানী" "ইংরাজী ফলাহারের বাঙ্গালী চাট" নামে কয়েকখানি উপন্যাস ও "পদ্যময়", "মেলা", "বিরবিলাপ", "কৃষিশিক্ষা", "কৃষিপ্রবেশ" প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কতিপয় পুস্তক দৃষ্ট হয়। সন ১৩০৭ সালে ৭০ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী।

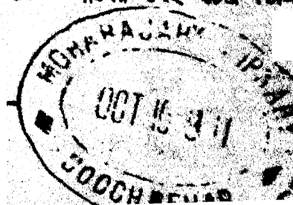
সন ১২৬৫ সালের ২৩শে কার্ত্তিক তারিখে শান্তিপুরে মাতুলাশ্রয়ে জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী জন্ম গ্রহণ করেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিবনিবাস ষ্টেসনের সন্নিকট মাজদিয়া গ্রাম জগদীশের পৈতৃক নিবাস। জগদীশের পিতার নাম উমাচরণ, তাঁহার তিনটী পুত্র, দুইটী কন্যা, জগদীশ পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া জগদীশ তাঁহার পিতামহী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়েন। পাঠদ্দশাতেই জগদীশের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি অনুরাগ স্থাপিত হয়। সে কারণে ১৮৭৯ অব্দে ফাষ্ট' আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জগদীশ মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। বাঙ্গলা দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধির

তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এতদর্থে তিনি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও অকাতরে অর্থ ও সময় ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই অনুকরণীয়। সরল বাঙ্গলায় হোমিওপ্যাথিকসংক্রান্ত পুস্তক রচনায় তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির নাম হইতেই তাঁহার সম্বন্ধ সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইবে যথা—(১) হোমিওপ্যাথি মতে গৃহ চিকিৎসা। (২) হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি খণ্ডন, (৩) ওলাউঠা চিকিৎসা, (৪) নরশরীরতত্ত্ব, (৫) জ্বরচিকিৎসা, (৬) চিকিৎসাতত্ত্ব, (৭) ভৈষজ্যতত্ত্ব, (৮) সদৃশ চিকিৎসা বা "প্রাকটিস অব মেডিসিন", এই সকল পুস্তক ব্যতীত তিনি "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক" নামে একখানি বাঙ্গলা মাসিক পত্র ও "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড" নামক একখানি ইংরাজি মাসিক পত্র সম্পাদন করিতেন। কেবল হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া ও সাময়িক পত্র বাহির করিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, পরন্তু যাহাতে দেশে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের অভাব দূরীভূত হয়, সে কারণে একটী স্কুল ও হোমিওপ্যাথি বিশুদ্ধ ঔষধ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য "লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি" নাম দিয়া কলিকাতায় একটী হোমিওপ্যাথি ঔষধালয় স্থাপন করেন। এই ঔষধালয় এখনও কলিকাতার মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধালয় এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বহুল প্রচারে যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, জগদীশের নাম তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর এই কর্ম্ম-বীরের লোকান্তর হইয়াছে।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষায় চিকিৎসাসম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, ডাক্তার যদুনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট গুণবান ব্যক্তি। ১২৪৬ সালে শান্তিপুরে মাতুলালয়ে ডাক্তার যদুনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীদাস মুখোপাধ্যায়, নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত (সম্প্রতি যশোহর জেলার) খরিবপুর। পিতার যত্নে যদুনাথ ক্রমে ক্রমে জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষা

উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যদুনাথ বহু সম্মানে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং ধাত্রীবিদ্যায় সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। রাণাঘাটই যদুনাথের প্রথম কর্ম্মক্ষেত্র এবং এই স্থানেই তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ ধাত্রীশিক্ষা রচনা করেন। ১২৭৬ সালে যদুনাথ রাণাঘাট ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় গমন করেন, এবং ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার, ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন ৺ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষি গণের সহিত পরিচিত হয়েন। এইখানে তিনি চুঁচুড়া নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষার্থীদিগের জন্য "উদ্ভিদ বিচার নামক" গ্রন্থ রচনা করেন। এবং ইহার পর ভূদেব বাবুর অনুরোধে "শরীর পালন" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করেন ইহা বহুদিন বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। তৎকালে চিকিৎসা বিষয়ক কোনও সাময়িক পত্র না থাকায় যদুনাথ "চিকিৎসাদর্পণ" নাম দিয়া একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন, কিন্তু বহুদিন এ পত্র প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পর "চিকিৎসা কল্পক্রম" নাম দিয়া একখানি সুবৃহৎ পুস্তকের আয়োজন করেন, কিন্তু নানা কারণে ঐ পুস্তক সম্পূর্ণ হয় নাই। এই সময়ে যদুবাবুর নাম চিকিৎসক মহলে জাহির হইয়াছিল এবং তিনিও চুঁচুড়া ছাড়িয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি "ইণ্ডিয়ান এম পায়ার" নামে একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন এবং ইহাতে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই কালে তিনি অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শিক্ষা কল্পে "সরল জর চিকিৎসা" নাম দিয়া তিন খণ্ডে এক সুবৃহৎ পুস্তক বাহির করেন। সেই পুস্তকের কল্যাণে আজ এই ম্যালেরিয়া পীড়িত বঙ্গভূমে বহু ভদ্র সন্তান আপনার জীবিকা সংগ্রহ ও দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। শেষ বয়সে যদুনাথ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার রাণাঘাটের বাটীতে বাস করিতে থাকেন পরে ১২৯৫ সালের পর হইতে নবীবপুরে স্থায়ীরূপে বাস করেন, এই স্থানেই ১৩০০ সালের ১২ই চৈত্র তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।



দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়।

ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ,—"ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত"। এই পুস্তক সংস্কৃত "ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিতম" নামক পুস্তকের অনুকরণে লিখিত। এই সংস্কৃত পুস্তকখানি এখন অতি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে ইহা পার্চ্চ সাহেব কর্তৃক ১৮৫২ খৃঃ অব্দে বার্লিন নগরীতে ছাপা হইয়াছিল। ১২৭৭ সালের কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে কার্ত্তিকেয় বাবু কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের বংশ দেওয়ান চক্রবর্ত্তীর বংশ বলিয়া খ্যাত। এই বংশের অনেকেই কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ানের কার্য্য করাই পুর্ব্বোক্ত খ্যাতির কারণ।

কার্ত্তিক বাবু প্রথম বয়সে পার্শী শিক্ষা করেন, পরে বাঙ্গলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়েন। ইনি কিছুদিন কলিকাতার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে রাজা শ্রীশ চন্দ্রের আগ্রহে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। এইস্থানে থাকিয়া তিনি আপনার আদর্শচরিত্র বলে সামান্য পদ হইতে মাসিক ৩০০৲ শত টাকা বেতনে সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হয়েন। তিনি একদিকে যেমন কৃষ্ণনগরের রাজাগণ ও কৃষ্ণনগরবাসীগণ কর্তৃক পূজিত ও আদৃত হইতেন তেমনি গবর্ণমেন্টেও তাঁহার অতীব সম্মান ছিল। "ক্ষিতিশবংশাবলী" চরিত ব্যতীত আত্মজীবন চরিত নামে আপনার জীবনী কথা লইয়া একখানি সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন এবং গীতমঞ্জরী নামক একখানি সঙ্গীত পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার অন্যান্য গুণের মধ্যে তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর ৪টী কৃতী পুত্র রাখিয়া তিনি স্বর্গ গমন করেন। পুত্রগণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র বাবু বি এল পাস করিয়া উকিল হয়েন, সুরেন্দ্র বাবু নদীয়াধিপতির বর্ত্তমান ম্যানেজার, এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা সুলেখক স্বনাম প্রসিদ্ধ দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয় নিজগুণে দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন। এই মহাত্মার জীবনে আর এক মহর্ষিকল্প মহাপ্রাণের ছায়া সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়াছিল তিনি কৃষ্ণনগরের স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়। ইঁহারা পরস্পর নিকট সম্পর্কীয়। রামতনু ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্ম চরিত্র বলে, আজ প্রাতঃস্মরনীয় হইয়াছেন। ধারাবাহিক সৎকর্ম্মমালা

দ্বারা ইহার সমগ্র জীবন সমুজ্জ্বল। ইনি উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ১৮৯৮ অব্দে ইনি স্বর্গ গমন করেন। কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা এস, কে, লাহিড়ী ইঁহার পুত্র। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও সুবিখ্যাত লেথব্রিজ সাহেব এই মহাত্মার ২খানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামের সন্নিকটস্থ সুবর্ণপুর গ্রামে সৎব্রাহ্মণ কুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সহরেই ইঁহার শিক্ষালাভ হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভরত শিরোমণি জয়নারায়ন তর্করত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির সাহায্যে ইহার শিক্ষা সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয় এবং এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এক দিকে ইংরাজীতে যেমন তিনি বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন তেমনি সংস্কৃত ভাষায় ইহাঁর সবিশেষ দখল ছিল। স্বনামপ্রসিদ্ধ ৺মদন মোহন তর্কলঙ্কারের বিদূষী কন্যাই ইহাঁর প্রথমা স্ত্রী। ক্যাথিড্রাল মিসন কলেজে ইনি কিছু কাল সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। এই সময়েই ইহার 'আর্য্যদর্শন" নামক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন বঙ্গসমাজে আর্য্যদর্শনের সবিশেষ প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অবসর কাল পুস্তক রচনায় সমর্পন করেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন যথা,—(১) গ্যারিবাল্ডির জীবনচরিত, (২) ওয়ালেশের জীবন বৃত্ত; (৩) আত্মোৎসর্গ; (৪) জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্ত; (৫) ম্যাটসিনির জীবন বৃত্ত; (৬) হৃদয়োচ্ছাস, (৭) প্রাণোচ্ছ্বাস, (৮) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন বৃত্ত, (৯) শান্তি পাগল, (১০) কীর্ত্তিমন্দির; (১১) সমালোচনা মালা; (১২) জ্ঞানসোপান; (১৩) চিন্তাতরঙ্গিনী। (১৪—১৬) শিক্ষাসোপান ৩ ভাগ; (১৭—২৪) আইন সংগ্রহ ৮ ভাগ; (২৫-২৭) জ্ঞানসোপান ৩ ভাগ ইত্যাদি। পুস্তক রচনায় অশ্রান্ত পরিশ্রমে এবং মফঃস্বলের দূষিত জল বায়ুতে ভুগিয়া তিনি শীঘ্রই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং ১৩১১ সালের ৩০ জৈষ্ঠ কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। তিনি তদানীন্তন সমাজের একজন

প্রথম সংস্কারকরূপে গণ্য ছিলেন। বর্ত্তমান কালের কলিকাতার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

হরিনাথ মজুমদার।

সাধু হরিনাথ ১২৪০ সালে নদীয়ার কুমারখালি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়, একারণে তাঁহার পিতৃব্য পত্নীই তাঁহাকে লালন পালন করেন। দরিদ্রের সংসারে জন্ম হইলেও পাঠের প্রতি তাঁহার অতিশয় যত্ন ছিল। অর্থের অভাবে স্কুলে যথারিতি পাঠাভ্যাস তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই বটে কিন্তু তিনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা কৃতবিদ্য অনেকের ভাগ্যেও ঘটে না, তাঁহার লিখিত ফকিরচাঁদ ভণিতা যুক্ত সহস্র সহস্র সাধন সঙ্গীত এবং সুবিখ্যাত পুস্তক বিজয়বসন্ত ও পরমার্থগাথা, কবিকল্প, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়া, অক্রুর সংবাদ, ভাবোচ্ছাস, মাতৃমহিমা, ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রভৃতি তাঁহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতেছে। পদ্য রচনায় কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত তাঁহার পথ প্রদর্শক। "সংবাদ প্রভাকরে" তাঁহার বহু প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। ১২৭০ সালে ১লা বৈশাখ "গ্রামবর্ত্তী প্রকাশিতা" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রথমে ইহা ছিল মাসিক পরে হয় পাক্ষিক পরে সাপ্তাহিক। বাইশ বৎসর কাল এই পত্র চলিয়াছিল। হরি নাথ একদিকে যেমন সুলেখক ছিলেন তেমনি অপর দিকে তত্ত্বদর্শী ও সাধক ছিলেন, তাঁহার সরল উদার ভাব তাঁহাকে "কাঙ্গাল" উপাধি দিয়াছিল। ১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে হরিনাথ দেহত্যাগ করেন। তিনি শেষ জীবনে একখানি সুবৃহৎ আত্মচরিত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, উহা এক্ষণে তাঁহার পুত্রের নিকট আছে কিন্তু এখনও ছাপা হয় নাই, তাহাতে কুমার খালির ইতিবৃত্ত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ইতিহাস ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে।

মনমোহন ও লালমোহন ঘোষ।

ভারতের এই দুইটী উপযুক্ত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া নদীয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের নিবাস বিক্রমপুর। ইঁহাদের পিতা রাম লোচন ঘোষ তদানীন্তন "সদরআলা" পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তদুপলক্ষে বহুস্থানে চাকুরী করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণনগরে স্থায়ী বাসবাটী নির্ম্মান করেন, এবং এখানেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। রাম লোচন বাবু তদানীন্তন সমাজ সংস্কারকগণের মধ্যে একজন রাজা রাম মোহন রায়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তাঁহার প্রথম পুত্র মনমোহন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মাঘ ঢাকা 'বয়রাগাড়ীতে" জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার অপর দুই পুত্র সুবিখ্যাত লাল মোহন (১৮৪৯ খৃঃ) ও মুরলী মোহন কৃষ্ণনগরের বাটীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনমোহনের ও লালমোহনের বাল্য শিক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজ স্কুলেই সমাহিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীর গৌরব মণি শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও মনমোহন একসঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন, এবং পরিশেষে একজন প্রথম সিভিলিয়ন ও একজন প্রথম ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। যদিও জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি একদিনও স্বদেশে আসিয়া এই পথ অবলম্বন করেন নাই, সুতরাং মন মোহনকেই এতদ্দেশীয় আদালতে বাঙ্গালীর প্রথম ব্যারিষ্টার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (নভেম্বর ১৮৬৩ খৃঃ) তিনি অচিরকাল মধ্যেই আপনার অনন্য সাধারণ গুণে শীঘ্রই একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার হইয়া উঠেন। * ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লাল মোহনকে ব্যারিষ্টারির জন্য বিলাত প্রেরণ করেন, ইনিও আপনার অগ্রজের ন্যায় আপনার অসাধারণ মেধা বলে

*মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের চালিত বিখ্যাত মকর্দ্দমা সমূহের বিবরণ বাবু রাম গোপাল সান্ন্যাল লিখিত History of celebrated criminal cases নামক পুস্তকে ও messrs. Thacker spink & co. কর্ত্তৃক ১৮৮৭খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Romance of criminal administration of Bengal নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই সকল বিবরণী হইতে তিনি কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে অত্যাচারী ও ভ্রমপরায়ণ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্ম্মচারীগণের কবল হইতে কত দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিগণকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন তাহা জানা যাইবে। কৃষ্ণনগর student's case এও তাঁহার নাম উজ্জলতর করিয়াছিল।

শীঘ্রই সমস্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতায় ও বাগ্মীতা প্রভাবে দেশপূজ্য হইয়া উঠেন। তাঁহার ন্যায় বাগ্মী আজ পর্য্যন্ত ভারতে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। সাহিত্য জগতেও তঁাহার স্থান অতি উচ্চে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধের ইংরাজি অনুবাদে তাঁহার কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ লাভে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতার আন্তরিক যত্নে ও চেষ্টায় ভারতের ন্যাশানাল কংগ্রেস আজি সাফল্য লাভ করিয়াছে। মনমোহন নদীয়ার নীলহাঙ্গামাকালে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রজার পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং "হরিষের" অকাল মৃত্যুতে হিন্দু পেট্রিয়টের অবস্থা হানি ঘটিলে মন মোহনই প্রথমে পাক্ষিক "ইণ্ডিয়ান মিরর বাহির করেন (১৮৬১) খৃঃ পরে মাননীয় নরেন্দ্র নাথ সেনের হস্তে ইহা দৈনিকরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মন মোহন তাঁহার উপযুক্ত পুত্র মহীমোহনকে ১৩বৎসর বয়সে বিলাত লইয়া যান, ইনি এক্ষণে সিবিলিয়ান। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মন-মোহন ঘোষ ও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লালমোহন পরলোক গমন করিয়াছেন।‡

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থকারগণ ব্যতীত নদীয়ার গ্রন্থকারগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদক তন্তুবায় কুলোদ্ভব লালু নন্দ রাম, মেটেরী গ্রামবাসী রামায়ণ লেখক ৺ রাম মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুর নিবাসী কোকিলদূত প্রণেতা ৺ হরিমোহন প্রামাণিক, মেহেরপুর নিবাসী বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সংগ্রহকার ৺ রমণী মোহন মল্লিক, হরিপুর নিবাসী "চপলা" ও কবিতা প্রসূন প্রণেতা ৺ কৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর নিবাসী "বাসুদেব বিজয়ম" "প্রভাত স্বপ্নম" প্রণেতা ৺ রাম নাথ তর্করত্ন, কাঁচড়া পাড়ায় বৈদ্য নাথ আচার্য্য, প্রেমচাঁদ কবিরত্ন, হরি-মোহন সেন গুপ্ত, মুদ্গর সম্পাদক ৺ শ্যাম চরণ সান্যাল, শান্তিপুর নিবাসী বৈষ্ণব গ্রন্থকার ৺ মদন গোপাল গোস্বামী ৺ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, কবির গান রচয়িতা বৈঁচী নিবাসী ৺ সাতু রায়, রাণাঘাট নিবাসী ৺ জয়গোপাল মুখো-পাধ্যায়, প্রসিদ্ধ যাত্রাকার নবদ্বীপবাসী ৺ মতি লাল রায়, সরল ব্যাকরণ প্রণেতা

‡ ইঁহাদের বিস্তৃত জীবনী সকলেরই জানা উচিত সেজন্য সে বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তকাবলী পাঠ করুন।

কৃষ্ণনগরবাসী লোহারাম শিরোমণি, রাণাঘাট বাসী কবি ৺ কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, নবোপাখ্যান নামক, বর্ত্তমান সামাজিক নক্সা প্রণেতা, রাণাঘাট নিবাসী জমিদার ৺ রাধাময় দে চৌধুরী এবং কর্ত্তাভজাদিগের সাধন সঙ্গীত রচয়িতাগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে কুমারখালি নিবাসী সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি গ্রন্থলেখক সাহিত্যসেবী শ্রীযুৎ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, হিমালয়, পথিক প্রভৃতি ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রণেতা, বসুমতীর ও হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুৎ জলধর সেন, মেহেরপুর নিবাসী উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায়, শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুৎ জয় গোপাল গোস্বামী ও তৎপুত্র ব্যঙ্গকবিতা লেখক শ্রীযুৎ বেনোয়ারি লাল গোস্বামী, শিবনিবাস বাসী বঙ্গবাসীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ নিবাসী দক্ষিণাপথ ভ্রমণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুৎ শরশ্চন্দ্র শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণ নগর নিবাসী হাস্যরসিক কবি শ্রেষ্ঠ নাটককর শ্রীযুৎ দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, শ্রীচন্দ্রশেখর কর, আঁইসমালি নিবাসী বিখ্যাত সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, কুড়ুলগাছী নিবাসী লেখক রায় রাধা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উলা (বীরনগর) নিবাসী দার্শনিক লেখক, বেদান্ত দর্শন, সৃষ্টি, অধিকার তত্ত্ব প্রভৃতি প্রণেতা শ্রী চন্দ্র শেখর বসু, ভক্ত কবি স্বরূপ গঞ্জ নিবাসী শ্রীকেদার নাথ ভক্তি বিনোদ ও তৎপুত্র জ্যোতিষী বিমলা প্রসাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত, ভাজনঘাট নিবাসী "দাবানল" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, রাণাঘাট নিবাসী 'বেলা' 'পরিমল' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুকবি গিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়, বাগাঁচড়া নিবাসী "ভূতের খেলা", "স্বদেশরেণু" প্রভৃতি লেখক শ্রীচণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপুর নিবাসী হরিদা প্রভৃতি লেখক, "নবজীবন" প্রকাশক শ্রীহরি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীশিক্ষা প্রভৃতি লেখক ডাক্তার শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বালিকার পদ্য শিক্ষা' 'সাবিত্রী' প্রভৃতি লেখক শ্রীনিত্য চরণ সেন গুপ্ত, জসড়ানিবাসী 'চিত্র গুপ্তের দপ্তর' প্রণেতা ভূতপূর্ব্ব 'সমীরণ' সম্পাদক শ্রীমাখম লাল দত্ত, বিখ্যাত পাঁচালীকার ব্রহ্মশাসনবাসী শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় শান্তিপুরের "অদ্বৈত চরিত" প্রণেতা শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক মেহেরপুরের শ্রীরাধিকাবন্ধু গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কৃষ্ণনগর নিবাসী স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার

মিঃ মনোমোহন ঘোষ ও তদীয় ভ্রাতা মিঃ লাল মোহন ঘোষ; ব্রেজিলের সেনাধ্যক্ষ সুরেশ বিশ্বাস, সাহিত্যসেবী ৺ শ্যামাধব রায় মহাশয়, উমেশ চন্দ্র দত্ত, ৺রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর তদীয় ভ্রাতা কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ ডাক্তার বি, এল, চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান কৃতবিদ্য গণের মধ্যে নদীয়ার বর্ত্তমান মহারাজা দার্শনিক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র রায় বাহাদুর বাগআঁচড়া নিবাসী মুঙ্গের কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীবৈদ্য নাথ বসু, কুমারখালি নিবাসী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীহেরম্ব চন্দ্র মৈত্র কৃষ্ণনগর নিবাসী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীজ্যোতি ভূষণ ভাদুরী ও তদীয় ভ্রাতাগণ বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড ফার্ম্মেসিটিক্যাল ও ওয়ার্কসের সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীরাজ শেখর বসু, রায়চাঁদ স্কলার শান্তিপুরের শ্রীফণীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী মহাশয় বিলাত প্রত্যাগতগণের মধ্যে প্রেসিডেন্সি ডিভিজানের স্কুল ইনস্পেক্টর জয়দিয়াবাসী মিঃ পি, মুখার্জ্জি, কৃষ্ণ নগরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এ, চৌধুরী, মিঃ জে চৌধুরী মি, কে, এন, চৌধুরী, মিঃ এ, চৌধুরী, ডাক্তার চৌধুরী; কৃষ্ণ নগরের মিঃ বি, কে, লাহিড়ী, আড়বন্দী গ্রামবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ এস, সি, ব্যানার্জ্জি। শান্তিপুর নিবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ সতীশচন্দ্র বাগচী শান্তিপুর নিবাসী সিভিলিয়ন মিঃ অতুল চন্দ্র চ্যাটার্জ্জি; সিভিলিয়ন মিঃ জ্যোৎস্না কুমার ঘোষাল, কৃষ্ণ নগর নিবাসী সিভিলিয়ন মিঃ মহী মহোন ঘোষ, কলিকাতার ডাক্তার এম, এন, ব্যানার্জ্জি, ডাক্তার ইউ, এন, ব্যানার্জ্জি, মহেশগঞ্জ নিবাসী দার্শনিক বি, পাল চৌধুরী প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ যোগ্য।

নদীয়ায় ধর্ম্মচর্চ্চা।

একদিকে বাণীর কৃপায় নদীয়ার নাম যেমন চিরউজ্জ্বল, তেমনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি দেব প্রকৃতি মহাত্মা গণের নিমিত্ত নদীয়ার খ্যাতি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। সমগ্র নদীয়ায় যত সংখ্যক শ্রীপাঠ বা বিখ্যাত দেবস্থান, মন্দির ও মসজিদাদি পরিদৃষ্ট হয় নিম্ন বঙ্গের অন্য কোনও জেলায় সেরূপ নাই। এখানে প্রায় প্রতি পল্লীতেই কোনও না কোনও মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার অনন্যসাধারণ চরিত্র বলে লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বা স্বীয় প্রতিভাবলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও নূতন মত গঠন করিয়া এক নব সম্প্রদায় সৃজন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের এদেশের কোনরূপ প্রামাণিক ইতিহাসাদি না থাকিলেও ইহা স্থির নিশ্চয়ে বলা যাইতে পারে যে, যখন আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়ডঙ্কা নিনাদিত হইয়াছিল তখন নির্জ্জীব বঙ্গদেশ কোন মতেই তাহার হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। পরন্তু মগধ রাজ্যের সন্নিহিত বলিয়া এখানে যে বৌদ্ধধর্ম্ম সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষণেও নদীয়ার বক্ষ হইতে উহার চিহ্ন এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন স্থান বর্ত্তমান রাণাঘাটের সন্নিহিত আনুলিয়া গ্রামের বাৎসরিক কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-গাজন, বঙ্গের সুবিখ্যাত পল্লী উলার (বীরনগর) চণ্ডীদেবীর পূর্ব্বকালীন পূজাপদ্ধতি এবং এবম্বিধ আরও বহু স্থানের অজ্ঞাত নানা দেবদেবীর সম্মান ও পূজা প্রণালী মনোযোগ দিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

হুয়েন্ত সাং খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। মুঙ্গের হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত নগর তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ৯৭টী সংঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন, তখন

ঐ সংঘারাম সকলে ১১৫০ জন ভিক্ষু বাস করিতেন। দেবমন্দিরের সংখ্যা ছিল ৪৪২। প্রত্যেক ভিক্ষুর বাৎসরিক ব্যয়ভার অন্ততঃ এক শত গৃহস্থকে বহন করিতে হইত; সুতরাং তখন ঐ সকল স্থানে ১১৫০,০০০ গৃহস্থ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। হুয়েন্ত সাং কেবল ৮টী কি ৯টী নগরের কথা লিখিয়া গিয়াছেন; উহাতেই বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সংখ্যা ১১৫০,০০০; সুতরাং সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমোন্নতির পথে নানা অন্তরায় উপস্থিত হয়। শশাঙ্ক নামে একজন প্রতাপশালী হিন্দু রাজা বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদকল্পে যত্নবান হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্ত নরপতিগণই মগধে রাজত্ব করিতেন। পরে নবম শতাব্দীতে পাল বংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। উঁহাদেরই রাজত্ব কালে হিন্দু কুল চূড়ামণি মহারাজা আদিশূর শ্রীহর্ষ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন এবং বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন। কিন্তু সহসা তিনি কালমুখে পতিত হওয়ায় তদ্বংশীয়গণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া মগধাধিপতি পাল রাজগণ গৌড়বঙ্গের অধীশ্বর হইয়া উঠেন, এবং নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ সুবর্ণ-বিহার নামক স্থানে নিম্ন বঙ্গের রাজধানী স্থাপনা করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন সেই কারণে তাঁহাদের রাজধানীর "সুবর্ণবিহার" এই নাম করণ করেন। এখানে অদ্যাপি তাঁহাদের প্রস্তরাদি নির্ম্মিত প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পাল রাজগণের রাজত্ব কালেই নদীয়ায় বহুল পরিমাণে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার কল্পনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবেনা।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ কিছু কাল রাজত্ব করিলে পর সেন বংশীয় হিন্দুরাজগণ পুনরায় মস্তকোত্তন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দেশ হইতে আবার ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে লাগিল। শৈব ধর্ম্মাবলম্বী সেন রাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলেই পালবংশীয়গণের প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। দেশমধ্যে তখন হিন্দু ও বৌদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল। ভগবান শঙ্করাচার্য্য খৃঃ নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই ফলে উহা এতদিনে ক্রমে হীন হইতে হীন বল হইতেছিল

এক্ষণে রাজশক্তির সাহায্য পাইয়া শৈবধর্ম্ম বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া পড়িল। এই সেন রাজগণের অন্যতম রাজা সামন্ত সেন বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাবাসের নিমিত্ত বর্ত্তমান নবদ্বীপের অনতিদূরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। সামন্ত সেনের প্রপৌত্র সুবিখ্যাত বল্লাল সেন এই নবদ্বীপ নগরীতেই তাঁহার অন্যতম রাজধানী স্থাপনা করেন। কথিত আছে এই নবদ্বীপের প্রাসাদে থাকিয়াই তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত সামাজিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গলার মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। হিন্দু পারিষদ, হিন্দুমন্ত্রী, হিন্দু কবি, হিন্দু দার্শনিকে রাজসভা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পৌত্তলিক হিন্দুপণ্ডিতগণ স্বধর্ম্মী রাজার শান্তিপূর্ণ কোমল আশ্রয়ে থাকিয়া নূতন নূতন ধর্ম্মমত সৃজনে মনোনিবেশ করিলেন। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সকলে মিলিয়া স্ব স্ব ইষ্ট দেবদেবীর উপাসনায় নিরত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোৎপাটনে যত্নবান হইলেন। হিন্দু স্মৃতিকারগণ "নগ্ন" (বৌদ্ধদয়া) দর্শনে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন, কাজেই তখন আশ্রয়হীন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিতাড়িত হইতে লাগিল। যে চিন্তাশীলতা দেশ হইতে বৌদ্ধের উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হইয়াছিল তাহাই এক্ষণে আবার বিষ্ণু, শিব ও শক্তি পূজার মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করিল। কেহ বিষ্ণুর পদাশ্রয় গ্রহণ করিল কেহ শিবকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিল কেহ বা শক্তি পূজায় নিরত হইল। শৈব রাজা লক্ষণ সেন শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের অমৃতময় "গীতগোবিন্দের" সৃষ্টি হইল। এই খানেই দেশে ভাবী দেশোন্মাদকর বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ নিহিত হইল। এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অচিরেই বৈষ্ণবধর্ম্মরূপী মহাপাদপের সৃজন করিতে পারিত কিন্তু এই সময়ে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজীত হওয়ায় নবাগত মুসলমান গণের অত্যাচারে হিন্দু মাত্রেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান, হিন্দুর শিক্ষা সমস্তই বিজেতা যবন ভূপতির নিকট অনাদৃত হইতে লাগিল; তখন লোকে জাতিধর্ম্ম লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। অপ্রতিহত প্রভাব সম্পন্ন দুর্দান্ত মুসলমানগণের সম্মুখে শান্ত প্রকৃতি বৈষ্ণব ও শৈব অনেকটা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল। কেবলমাত্র বীরাচারী তান্ত্রিক গুরুগণ লোককে বামাচারী হইয়া শক্তির আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক অত্যাচারী মুসলমানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করণে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মাচরণের কঠোর বন্ধন

শিথিল করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রের দোহাই দিয়া অবাধে দেশে সুরা ও ব্যভীচারের স্রোত প্রবাহিত হইল এবং কিছু দিনেই প্রলোভন পরিশূন্য মানশক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম, শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক বাঙ্গালী নবাবিষ্কৃত পন্থায় গা ঢালিয়া দিল। অন্তঃসার শূন্য নরনারী তন্ত্রোক্ত সত্যধর্ম্ম ভুলিয়া বামাচারের কৃষ্ণ আবরণে কুকর্ম্মী ও কদাচারী হইয়া উঠিল। যুগধর্ম্মে জগন্মাতা ভগবতীর জগন্মঙ্গল আরাধনা ভুলিয়া লোকে পিশাচ হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, একত্র পান ভোজন আরম্ভ করিল। পৃথক পরিবারস্থ বিভিন্ন বর্ণাশ্রমী স্ত্রী পুরুষ একত্রে বসিয়া পঞ্চমকারের সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। বীরাচার, পশ্বাচার, ভৈরবীচক্র, পঞ্চতত্ত্ব সাধনায় লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সিদ্ধিলাভ করিতে যাইয়া মানুষ ইন্দ্রিয় সেবার দাস হইয়া পড়িল। লোকে তন্ত্রের দোহাই দিয়া হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি নষ্ট করিল। স্ত্রী সংস্রবে লোকে পশ্বাচারী হইয়া উঠিল। এমন কি পূর্ব্বে যে দেশে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল তথায় জীবহিংসা এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত পরম ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইল। ধর্ম্মের নামে ধরিত্রী বক্ষে সহস্র ধারায় শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইল।

কেবলমাত্র তন্ত্রই যে তৎকালান নদীয়ায় এবং সমগ্র বঙ্গদেশের এইরূপ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতির জন্য প্রকৃষ্টরূপে দায়ী তাহা নহে তখনকার মুসলমান নরপতিগণের হিন্দুর প্রতি অমানুষিক বর্ব্বরোচিত অত্যাচার, ও মুসলমান সংস্পর্শে দেশবাসীর বিলাস প্রিয়তাও দেশের এই নৈতিক অবনতি সংঘটনে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছে। মুসলমানের অযথাপীড়নে কত অসংখ্য হিন্দুর যে জাতিনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে কেহ বা সংস্পর্শদোষজনিত পাপে চিরদিনের জন্য "পীরালী" নামে অভিহিত হইয়া সমাজের নিম্নস্তরে যাইয়া পড়িয়াছে।

সমাজ ও ধর্ম্মের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন, সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষাকর্ত্তা ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ভক্তিশূন্য জ্ঞান স্পৃহায় মত্ত হইয়া সমগ্র নবদ্বীপকে এক বিরাট পাঠশালায় পরিণত করিয়াছিলেন। অন্যান্য পাঠের মধ্যে তখন নবদ্বীপে ন্যায়ের চর্চ্চাই বিশদরূপ চলিতেছিল, যে তর্ক বহুল বিফল গ্রন্থ শতবার শাস্ত্রে ভগবানকে স্থাপনা করিতেছে এবং প্রমাণাভাবে সহস্র বার তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছে সেই শুষ্ক ন্যায় দর্শন তখন নদীয়ায় অস্থিমজ্জা ও শোণিতে প্রবেশ

লাভ করিয়াছে ; তখন লোকে প্রমাণ, যুক্তি ও তর্ক দ্বারা মীমাংশিত না হইলে কোন কার্য্য করিত না বা কোন বিষয়ই সুসিদ্ধ হইত না। ধর্ম্মাধর্ম্ম, ক্রিয়াকাণ্ড সমগ্র ভুলিয়া কেবল বিদ্যা বিদ্যা করিয়াই তখন নবদ্বীপ উন্মত্ত। এই সার্ব্বজনীন বিদ্যোন্মাদের সম্মুখে তখন পার্থিব ও অপার্থিব সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিল। ধর্ম্মেরতো কথাই নাই এমনকি মোহময় সংসারও উপেক্ষিত হইতেছিল। তাহার ফলে সমাজমধ্যে এঁকদেশদর্শিতা, যথেচ্ছাচারিতা ও বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিল, তখন দেশ হইতে প্রেমভক্তিময় ধর্ম্মভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল।

প্রায়শঃ দেখা যায় কোনও একটা বিষয় উন্নতি বা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইলে তখন তাহার পুনরায় পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এইরূপে দেশ আধ্যাত্মিক অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইলে, দেশের এই ভক্তিশূন্য শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে নদীয়াবাসী জনকয়েক ভক্ত মহাপুরুষ অতিশয় মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে শান্তিপুর নিবাসী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অগ্রগণ্য। তিনি পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া, কিরূপে এই দুর্দ্দশার বিমোচন হয়, কিসে আশু ধ্বংশের হস্ত হইতে জগৎকে রক্ষা করা যায়, কিসে এই পাপ মোহের অবসান হয়. ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন ভগবানের করুণা ব্যতীত এই দারুণ দুর্গতি দূরীভূত হইবে না, তাই আকুলহৃদয়ে, জীবকল্যানার্থ সেই পরদুঃখকাতর মহর্ষি মহাতপে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পূত হৃদয়ের অকপট প্রার্থনা শীঘ্রই পরম পিতার মহাসিংহাসন সন্নিধানে উপনীত হইল। তখন একদিকে উচ্ছৃঙ্খল তান্ত্রিকের তন্ত্রের নামে যথেচ্ছাচার নিবারণ করিতে নবদ্বীপে যেমন শক্তিধর মহাপুরুষ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাব হইল তেমনি জীবে দয়া, নামে রুচি শিক্ষা দিতে ভক্তাধীন ভগবান ব্যাকুলভক্ত শ্রীঅদ্বৈতের মহাকর্ষণে বিচলিত হইয়া স্বয়ং সপরিবারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্যের ভাগ্যবান পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। পুরন্দর তাঁহার আর এক উপাধি ছিল। তাঁহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে। তাঁহারা বৈদিক শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ

ছিলেন। তিনি অধ্যয়নার্থ বাংলার প্রিয় নিকেতন নবদ্বীপে আগমন করেন এবং পাঠ সমাপনান্তে নবদ্বীপবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা "শান্তমূর্ত্তি শচীদেবীর" পাণিগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের যে পল্লীতে শ্রীহট্টিয়াগণ বাস করিতেন সেই পল্লীতে বসতি স্থাপনা করেন।

শচীর গর্ভে জগন্নাথের পরপর আটটী কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করেন। কিন্তু সকলেই অল্প বয়সে গতাসু হয়েন। শিশু কন্যাগণের শোকে যখন ব্রাহ্মণদম্পতি মিয়মান তখন তাঁহাদের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আদর করিয়া এই রূপবাণ পুত্রের "বিশ্বরূপ" নাম করণ করেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই পুত্র সর্ব্ব শাস্ত্রাদিতে উত্তমরূপে ব্যুৎপন্ন হয়েন। বিশ্বরূপের ষোড়শবর্ষ বয়ঃকালে শ্রীনিমাই জন্ম পরিগ্রহ করেন।

যে শুভ নিশিতে চৈতন্যদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন সেটী সুনির্ম্মল ফাল্গুণী পূর্ণিমা এবং যে মুহুর্ত্তে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েন তখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, সুতরাং সমগ্র হিন্দুস্থান তখন চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী দান ধ্যানাদি সৎকর্ম্মে রত এবং মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনি ও হরিধ্বনিতে তখন সমস্ত নদীয়া মুখরিত। এইরূপ অনন্ত কণ্ঠ নিংসৃত হরিধ্বনির মধ্যে "সিংহরাশী, সিংহলগ্ন, উচ্চগ্রহগণে, ষড়বর্গ অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুভক্ষণে," জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপস্থ ভবনে, নিম্বমূলস্থ সুতিকা-গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ ভুমিষ্ট হয়েন। সুতিকাগারে ডাকিনী, পিশাচ ও উপদেবতার কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে মেয়েরা তাঁহার "নিমাই" নাম রাখেন। পরবর্ত্তী জীবনে অসংখ্য ভক্ত কর্ত্তৃক তিনি সহস্র নামে আখ্যাত হইলেও, সুতিকাগৃহের এই আদরের নাম তাঁহার প্রিয়জনে একদিনও ভুলে নাই। জগন্নাথ অন্নপ্রাশন কালে পুত্রের নাম রাখিলেন "বিশ্বম্ভর", উপনয়ন কালে তাঁহার আর একটি নাম হইল "গৌরহরি"। ভক্তগণ তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম রাখিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার সর্ব্বশেষ নাম হইয়াছিল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"।

শচীদুলাল পিতৃগৃহে শুক্লপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। এই অলৌকিক সুবর্ণলাঞ্ছিত সুউজ্জ্বলবর্ণশালী, সুঠাম গঠন ও মনোহর ভঙ্গিমা-শালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অপ্রাকৃত শিশুটী ঠিক অন্যান্য শিশুর ন্যায় ছিল না। শিশু ক্রন্দন করিতেছে, কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, সহস্র চেষ্টা সহস্র যত্ন বিফল হইয়া যাইতেছে তখন একবার হরিধ্বনি কর, শিশু অমনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে,



সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাগবত শ্রবণ।



মায়ের ক্রোড়ে স্থির হইয়া রহিবে। এইরূপে শিশু নিমাই বাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত শৈশবের দুরন্তপনাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে প্রভু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে, জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন। যে একাগ্রতায় শচীদুলাল শৈশবে চাপল্য ক্রীড়া করিয়াছেন সেই একাগ্রতায় এখন তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় জগন্নাথের সংসারে এক মহা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ এখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। অদ্বৈত সকাশে সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইয়া ও ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, সংসারের অনিত্যতা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় যখন তাঁহার জনকজননী তাঁহার বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন তখন সংসারবিরাগী বিশ্বরূপ এক দিন গভীর নিশায় গৃহত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ পিতমাতা উপযুক্ত পুত্র বিরহে বিহ্বল হইলেন ও অনুক্ষণ তাঁহার নাম ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কালে তাঁহারা দুর্লভ পুত্ররত্ন বিশ্বম্ভরের মুখচন্দ্র অবলোকনে বিশ্বরূপের শোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। এই সময় হইতেই শ্রীনিমাইয়ের দৌরাত্ম্য ও চাপল্য একেবারে অন্তর্হিত হইল এবং তিনি ধীর ও শান্ত ভাবে পিতমাতার সেবা-শুশ্রূষায় ও পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারাও ক্রমে নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বরূপের বিরহ ব্যথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ মিশ্র এইকালে পুত্রের এইরূপ অনন্য সাধারণ জ্ঞানস্পৃহা দেখিয়া সাহ্লাদে তাঁহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন। শীঘ্রই অলৌকিক মেধা বলে ও অসাধানণ অধ্যবসায়গুণে তিনি গঙ্গাদাসের টোলের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র নয় বৎসর সুতরাং জগন্নাথ তাঁহার উপনয়ন দিবার আয়োজন করিলেন। এই উপবীত কালে মণ্ডিত কেশ রক্ত বস্ত্র পরিহিত নবীন ব্রহ্মচারীকে যখন পিতা শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াদির পর কর্ণে মন্ত্র দিলেন তখন শিশু নিমাই আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় পতিত হইলেন। সকলে দেখিলেন তখন সেই দেব শরীর হইতে অলৌকিক তেজ বাহির হইতেছে ও অশ্রু পুলক, বৈবর্ণাদি অষ্ট সাত্বিক ভাব পুনঃ পুনঃ দেহে সঞ্চারিত হইতেছে এবং অবিরল ধারায় নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহিয়া পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী নিমাইয়ের এই

আবেশ ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং তাঁহার দেহে যে গোপাল বিরাজ করিতেছেন ইহাই সকলের ধারণা হইল তাই তাঁহারা সেইক্ষণ হইতে নিমাইয়ের "গৌরহরি" নামকরণ করিলেন।

নিমাইয়ের একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ভাগ্যবান মিশ্র জগন্নাথ ইহধাম ত্যাগ করিলেন। পিতৃ বিয়োগে বালক নিমাই মহাদুঃখে নিপতিত হইলেন; কিন্তু দুঃখে পড়িয়াও তাঁহার বিদ্যানুরাগ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই বরং এই সময় হইতে তিনি আরও নিবিষ্টচিত্তে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই অল্প বয়সে ঘরে বসিয়া নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিপ্পনী করিয়াছিলেন। উহা সেই তদানীন্তন নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জন সমাজে এবং পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র বিশিষ্ট-রূপে আদৃত হইয়াছিল। ব্যাকরণ পাঠ সমাপনান্তে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন। সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠী তখন নদীয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, শত শত বিদ্যার্থী তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিতেন। এই সকল ছাত্রগণের মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকার মিথিলার গর্ব্বখর্ব্ব-কারী রঘুনাথ তখন সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু এই বালক নিমাইয়ের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় তিনিও শীঘ্র মলিন হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে এই রূপবান সুপণ্ডিত সুপাত্রের উপর কুমারী কন্যাগণের পিতা মাত্রেরই দৃষ্টি পড়িল। শচী দেবীও পুত্রকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে নবদ্বীপ নিবাসী বল্লভ আচার্য্যের সাক্ষাৎ কমলা স্বরূপা কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত পুত্রকে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করিলেন।

এই সময়ে নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয় নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে স্বয়ং এক চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিলেন। শীঘ্রই এই তরুণ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং অসংখ্য ছাত্র নিত্য নিত্য যোগদান করতঃ তাঁহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল। এইরূপে দিন দিন তাঁহার টোলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে নবদ্বীপের বিদ্বজ্জন সমাজ আলোড়িত করিয়া নবদ্বীপের জ্ঞানগরিমাকাশে দিগ্বিজয়ীরূপী এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হইল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী ভারতবর্ষীয় যাবতীয় পণ্ডিত প্রধান স্থান জয় করতঃ বহুপরিবার ও শিষ্য সমভিব্যাহারে নদীয়ায় উপস্থিত

হইলেন। নবদ্বীপের যশোহরণ করিয়া বিদ্যারাজ্যে একচ্ছত্রী হওয়া তাঁহার অভিলাষ। তিনি নবদ্বীপে "আটোপটঙ্কারে" ঘোষণা করিলেন "যদি কোন পণ্ডিত সাহসী হন তবে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন নতুবা সমগ্র নবদ্বীপ আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন।" সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কেশবের সহিত বিচার করিতে হইবে ভাবিয়া নবদ্বীপস্থ তাবৎ নবীন প্রবীণ অধ্যাপক ভীত হইলেন; বুঝিবা এতদিনে নবদ্বীপের যশোহানি হয়, কিন্তু তরুণ নিমাই সহাস্যআস্যে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিচারে দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিয়া নদীয়ার যশঃ শ্রী অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। দিগ্বিজয়ীও তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দণ্ড কমণ্ডলু ও কৌপিন গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রাণার্পণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী বিজয়ের পর হইতেই প্রভু নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়েন।

এই তরুণ অধ্যাপকের অনন্য সাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভামণ্ডিত হাস্যে ও শ্লেষে যখন নবদ্বীপস্থ সমগ্র বিবুধজন ব্যতিব্যস্ত, যখন ব্যাকরণের ও ন্যায়ের অতলগর্ভে ভক্তির কথা ডুবিয়া যাইতেছিল তখন একদিন এমন একটী ঘটনা সংঘটিত হইল যে নিমাইয়ের জীবনের স্রোত অন্য পথে প্রধাবিত হইল। এই সময়ে একদিন নিমাই যখন সশিষ্যে রাজপথে যাইতেছিলেন তখন মুকুন্দ দত্তও গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। মুকুন্দ চট্টলবাসী একজন বৈদ্য কুমার, নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং কিয়দ্দিন প্রভুর সহপাঠীও ছিলেন। এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্রের কচ্‌কচি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি মার্গের পথিক হইয়া পরম হরিভক্তি পরায়ণ হইয়াছিলেন এবং সুগায়ক বিধায় অদ্বৈতের সভায় কীর্ত্তন করিতেন। মুকুন্দ হঠাৎ নিমাইকে রাজপথে দেখিয়া পাছে বহির্ম্মুখ সম্ভাষণ করিতে হয় এই ভয়ে তটস্থ হইলেন ও অন্যপথে প্রস্থান করিলেন। পরম মেধাবী নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া শিষ্যগণকে কহিলেন "দেখ, দেখ, মুকুন্দ আমাকে অবৈষ্ণব মনে করিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি—

এমন বৈষ্ণব আমি হইব সংসারে।
অজভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥

এই সময় হইতেই শ্রীনিমাই ধর্ম্মাচরণে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীনন্দাবতারি

ভক্তিগ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিলেও তিনি ভক্তির যাজনা একদিনও করেন নাই। এক্ষণে এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহাতে একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে পরম ভাগবত শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত প্রভুর মৈত্রি জন্মে এবং দুইজনে সর্ব্বদা ভক্তিশাস্ত্র-পঠন ও ভক্তি কথা প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু ঈশ্বরপুরী শীঘ্রই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করেন। এখন নিমাইয়ের বয়স মাত্র অনতিক্রান্ত বিংশতি বৎসর। এই অল্প বয়সেই তাঁহার আচার্য্যখ্যাতি দিগ্ দিগন্তে পরিব্যপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে দয়ালপ্রভু একবার পূর্ব্ববঙ্গে পরিভ্রমণে ইচ্ছা করেন এবং জননী ও পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর নিকট বিদায় লইয়া সশিষ্য পূর্ব্ব বঙ্গে যাত্রা করেন, এবং শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া সজ্জন, দুর্জ্জন, আচারী, বিচারী, পতিত, অধম, নীচ কাঙ্গাল যে যেখানে ছিল সকলকে অকাতরে হরিনাম নিধি বিলাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিমাই ঘরে ফিরিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইলেন। পরে যখন শুনিলেন যে তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী তাঁহার বিচ্ছেদ কালের মধ্যে সর্প দংশনে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছেন তখন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন পরে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শোকাকুলা জননীকে প্রবোধ দিলেন। মাতা আপাতঃ দুঃখে প্রবুদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু সরলমতি পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার আন্তরিক ভয় পাছে বিশ্বরূপের ন্যায় নিমাইও সংসারে বীতরাগ হয়, বিশেষ পুত্রের এই নবযৌবনে তাহাকে বন্ধনহীন অবস্থায় সংসারে রাখিতে শচীমাতার বড় ভয় হইল তাই অনতিবিলম্বে নিমাইয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন। মাতৃ অনুরক্তা শিশুপ্রকৃতি নিমাইও মাতৃ আদেশে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সুশীলা কন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণীগ্রহণ করিলেন।

বিবাহের পর প্রায় ২ বৎসর কাল নিমাই নবদ্বীপের টোলে অসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যাদান করতঃ স্থিরভাবে সংসারে থাকিয়া শচীর মনে হর্ষোৎপাদন করিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ তাঁহার একবিংশতি বর্ষ বয়সে এক দিন তিনি পিতৃঋণ পরিশোধার্থ গয়াক্ষেত্রে যাইবার নিমিত্ত শচীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্নেহময়ী শচীদেবী এ বিষয়ে পুত্রকে নিষেধ করিতে পারিলেন না, তাই সঙ্গে নিমাইয়ের

মেসো চন্দ্রশেখর ও তাঁহার কতিপয় শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আশ্বিন মাসে বাটী হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে বহুপথ অতিক্রম করিয়া শ্রীধাম গয়া প্রবেশ করিলেন। এই পবিত্র গয়াক্ষেত্রে তাঁহার সহিত পূর্ব্বপরিচিত ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরীর মিলন হইল। ভক্ত পুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে ভক্তাবতার নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীরর দেবমূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে অপার্থিব প্রতীয়মান হইল ; আর অমনি আকুলকণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সুগভীর, সুপবিত্র, সুমহান, সুমধুর কৃষ্ণপ্রেমসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। পরে শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে আসিলে গয়ালী বিপ্রগণ ভক্তিগদগদকণ্ঠে যখন শ্রীপদের প্রভাব বর্ণনা করিলেন তখন, সেই বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, অজভবপূজিত, যোগীগণ দুর্ল্লভ শ্রীপাদ দেখিতে দেখিতে প্রেমাবেশে শ্রীনিমাই একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীপুরীর বক্ষে পতিত হইলেন। পরে সঙ্গীগণের যত্নে যখন মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল তখন অজস্র পুলকাশ্রু. গোমুখী নিঃসৃত গঙ্গাসুধারানিভ তাঁহার নয়ন বহিয়া বদনে, বদন হইতে বক্ষে, বক্ষ হইতে সহস্র ধারায় ধরায় পতিত হইয়া সেস্থানকে জলময় করিল। উপস্থিত সকলে সেই পবিত্র বারিতে স্নাত হইয়া জীবনে সর্ব্বপ্রথম এরূপ আশ্চর্য্য প্রেমবিকাশ ও অপূর্ব্ব অশ্রুপাত দর্শন করিতে লাগিলেন। যখন কাঁদিতে কাঁদিতে আর্ত্তি কণ্ঠে নিমাই চন্দ্রশেখরাদি সঙ্গীগণকে কহিলেন "তোমরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর আমি সংসারে যাইব না আমি প্রাণেশের উদ্দেশে মথুরায় চলিলাম, আমার বৃদ্ধা জননীকে তোমরা সান্ত্বনা করিও",। তখন তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন, পরে বহুযত্নে অনেক প্রবোধ দিয়া ও একরূপ বল প্রকাশ করিয়াই তাঁহারা এই আবেশময় ভক্তির প্রতিমাটীকে পৌষ মাসের শেষ ভাগে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন।

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলে দেখিলেন সেই উদ্ধতের শিরোমণি নিমাইয়ের পূর্ব্ব ভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে গৃহে আসিলেও নিমাই গয়ার সেই সুমধুর স্মৃতি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। পরন্ত এই সময়ে তাঁহাতে প্রেমোন্মাদের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইল। এই দিব্য প্রেমোন্মাদের মধ্যে যখন বাহ্য জগৎ তিনি একরূপ বিস্মৃত প্রায় তখন এক দিন তাঁহার অসংখ্য ছাত্র, তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ পাঠ গ্রহণ করিতে

আসিল। তিনিও সকলকে পাঠ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন সে সমস্তই হরিপক্ষে হইতে লাগিল, এভাবও আবার তাঁহার অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বকালের জন্য কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসমান হইলেন। তাঁহার ভাগ্যবান শিষ্যগণও সেই দিন হইতে তাঁহার ভক্তশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইলেন এবং তাহাদের লইয়া তিনিও অপূর্ব্ব নাম কীর্ত্তন সৃষ্টি করিলেন। শীঘ্রই এই শুভসংবাদ নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইল আর শ্রীবাস আদি ভক্তগণ আসিয়া একে একে তাঁহার পার্শ্বে মিলিত হইতে লাগিলেন। এই শ্রীবাসের গৃহেই নিমাই হরিসভা স্থাপন করিলেন ও সমস্ত দিবারাত্র হরিগুণ কথন, ও নাম সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রতি দিন নিতাই, অদ্বৈত, হরিদাস, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারী মুকুন্দ, নরহরি, পুরুষোত্তম, পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, দামোদর, গোবিন্দ, বাসু ঘোষ, বক্রেশ্বর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শত শত ভক্ত আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে যখন প্রেমে মত্ত হইয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাম কীর্ত্তনে রত হইতেন তখন নবদ্বীপস্থ কতকগুলি কুচরিত্র অসূয়া পরায়ণ ব্যক্তি বহির্দ্দেশ হইতে নানাবিধ অত্যাচার ও চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগের তপে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। এই দলের প্রধান ছিল দুই ভ্রাতা। তাহারা সাধারণতঃ জগাই মাধাই নামে খ্যাত। ইহাদের মত পাতকী তখন সমগ্র নদীয়ায় আর ছিল না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা পাপের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাই দয়াল নিত্যানন্দ ও হরিদাস ইহাদের উদ্ধারার্থ দৃঢ় সংকল্প করিলেন। এক দিন নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ যখন জীবে নাম বিলাইয়া ফিরিতেছিলেন তখন জগাই ও মাধাই আসিয়া সহসা তাঁহাদের আক্রমণ করিল। মাধাই একটী ভগ্ন কলসীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় এমন দারুণ আঘাত করিল যে তাঁহার মস্তক হইতে অজস্র শোণিতধারা বহিতে লাগিল। নিতাই সে দারুণ আঘাত উপেক্ষা করিয়া প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে মাধাইকে বক্ষে লইতে উদ্যত হইলে মদোন্মত্ত মাধাই আবার তাঁহাকে প্রহার করিতে আসিল। নিত্যানন্দের সেবদুর্লভ চরিত্র বলে পাষাণও বিগলিত হইল। জগাই এতাবৎ মন্ত্রমুগ্ধবৎ মাধাইয়ের কার্য্য দর্শন করিতেছিল একণে যখন দেখিল সে পুনরায় নিত্যানন্দকে

প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন ক্ষিপ্রগতি আসিয়া বজ্র মুষ্টিতে মাধাইয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে ভৎ'সনা করিল। লোকে আসিয়া যখন প্রভুকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল তখন তিনি লোকশিক্ষার্থ যৎপরোনাস্তি কোপ প্রকাশ করিয়া সেই দুই পাষণ্ডকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে অক্রোধী পরমানন্দ নিত্যানন্দ আসিয়া প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। প্রভুর কৃপায় এই দুই মহাপাতকী ব্রহ্মার দুর্লভ পদ প্রাপ্ত হইল।

জগাই মাধাইয়ের ন্যায় ধনশালী, দুর্দ্দান্ত ও প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্যক্তিদ্বয়ের এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে যদিও অনেকের চিত্ত আলোড়িত হইল তথাপি দুই চারি জন খলস্বভাব ব্যক্তি কিছুতেই শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ নির্ভীকতা ও সম্মান সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা তদানীন্তন নদীয়ার মুসলমান কাজীর নিকট যাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কত মতে নালিস বদ্ধ হইল। কাজীও তাঁর স্বাভাবিক দৈত্য প্রকৃতি বশে চালিত হইয়া নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিল। তখন হরিনামমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের কারণে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রচার করিলেন যে "তিনি অদ্যই কাজী দমনে গমন করিবেন, ভক্ত যে কেহ আছেন, আসিয়া মিলিত হউন।" প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র বিদ্যুৎগতি এ সংবাদ দিকে দিকে রাষ্ট্র হইল, আর অমনি অপরাহ্ণ সময়ে একে একে, দশে দশে, শতে সহস্রে লক্ষ লক্ষ লোক এক এক দীপ ও তদুপযুক্ত তৈলাদি লইয়া প্রভুর বাটী বেষ্টন করিতে লাগিল। কাজী এতাবৎ উদ্বিগ্ন হইলেও বিশেষ ভীত হয়েন নাই এক্ষণে যখন সেই অসংখ্য কণ্ঠের হরিধ্বনি ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল তখন ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন ও পলাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ প্রেমাবিষ্ট ভক্তের চক্ষু হইতে, ঐ উজ্জ্বল আলোকে অল্প সংখ্যক মুসলমান কোথায় পলাইবে? সুতরাং কাজী আর প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকা বৃথা মনে করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে দীনভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের পদে শরণ লইল, তখন অক্রোধী শ্রীগৌরাঙ্গ লৌকিক ক্রোধ অপসারণ করিয়া কাজীকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

এইরূপে প্রভু কাজী দমন পূর্ব্বক হরিধ্বনি দিয়া তাঁহার অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে আশ্বস্ত করিলেন এবং নবদ্বীপে নাম মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে স্থাপনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই অপূর্ব্ব ঘটনার পর হইতে গৌরহরির বাহজ্ঞান

ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। এখন কখন নামরসে বিভোর থাকেন আবার কখন আবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের পূজার্চ্চনা গ্রহণ করেন। কখন বা নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করেন। শ্রীবাসের মৃত পুত্রের প্রাণদান, সদ্যরোপিত বৃক্ষ হইতে অলৌকিকরূপে ফলোৎপাদন, সদ্য অসাধ্য ব্যাধি বিনাশ, স্পর্শ মাত্রেই অপ্রেমিকের প্রেমলাভ ইত্যাদি কত শত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার এই সময় সংঘটিত হইতে থাকে। কিন্তু সেই অলৌকিক প্রেমময় হৃদয়ের অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাসের নিকট এ সকলের মূল্য কি? এই সময় তাঁহার বয়স চতুর্ব্বিংশতি বৎসর মাত্র। এই বয়সে তাঁহার প্রেমবৈকল্য সাতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার দেহ চেষ্টাদিও তিরোহিত হয়, এমন কি দিবারাত্রির প্রভেদ জ্ঞানও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়তা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইল এবং দীন দয়াল প্রভু আসমুদ্র হিমাচল সমগ্রদেশে প্রেমবিলাইতে বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী ও সন্ন্যাসীগণের সান্নিধ্যলাভ করিতে, এবং মূর্খগণের মন হইতে বিদ্বেষ ভাব দূর করিতে কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ বাসনা করিলেন এবং ১৪৩১ শক (১৫১৯ খৃষ্টাব্দে) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির গভীর নিশায় গোপনে গৃহত্যাগ করতঃ মাঘের দারুণ শীত উপেক্ষা করিয়া সন্তরণে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কাঞ্চন নগরে (কাটোয়ায়) উপস্থিত হইয়া শ্রীকেশব ভারতীর সহিত মিলিত হইলেন। ভারতী কিছুদিন পূর্ব্বে একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিমাই তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার সংকল্প বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, ও ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর প্রভুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া কাটোয়ায় প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা এবং সমবেত অসংখ্য জনশ্রেণী কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে এই দারুণ সঙ্কল্প পরিত্যাগের জন্য কত অনুরোধ উপরোধ করিলেন, কিন্তু গৌরের দার্ঢ্য দেখিয়া অবশেষে তাঁহারা সকলেই নিরস্ত হইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের প্রতি বিধিযোগ্য সমস্ত আয়োজনের ভারার্পণ করিলেন। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে শুভ সংক্রান্তিতে যখন গৌরাঙ্গের মস্তক মুণ্ডনের জন্য ক্ষৌরকারকে আহ্বান করা হইল, তখন সেই নরসুন্দর, প্রভুর অলৌকিক রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শে

সাহসী হইল না। পরে প্রভুর নিকটে আশ্বস্ত হইয়া ও বর পাইয়া সেই শোকাবহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। এইরূপে প্রভু ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করতঃ গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক ভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভুর আর এক জগন্মঙ্গল নাম হইল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। দীক্ষার পর প্রভু প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন ও বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া যদৃচ্ছা গমন করিতে লাগিলেন। পরে কিয়দ্দিবস পথে পথে হরি নাম নিধি বিলাইয়া প্রথমে ফুলিয়ায় হরিদাসের আশ্রমে, পরে শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ এমনকি তাঁহার পূর্ব্ব নিন্দুকগণও প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া অতি নিকটেই আসিয়াছেন শুনিয়া, প্রভুকে দেখিতে ফুলিয়া ও শান্তিপুরে আসিয়া মিলিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত শান্তিপুরে এক হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। সেই সংখ্যাতীত ভক্তকণ্ঠের হরিধ্বনিতে তখন শান্তিপুর মুখরিত। কবির কথায়, তখন প্রেমের বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।"

এই আনন্দ নৃত্যে কএক দিবস অতিবাহিত করিয়া প্রভু, মাতা ও ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নীলাচল চন্দ্রের ইন্দু বদন দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া, পথে সর্ব্ব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করিয়া প্রভু পুরীর পথে অগ্রসর হইলেন। বহু পথ অতিবাহন করিয়া তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, ও মুকুন্দ দত্ত এই চারি জনকে লইয়া স্বচ্ছন্দে রেমুণায় উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রেমানন্দে যামিনী যাপন করিয়া তাঁহারা রেমুনা ও কটকের মধ্যবর্ত্তী স্থান যাজপুরে আসিলেন। তথা হইতে শ্রীসাক্ষীগোপাল দর্শনে গমন করিলেন। পরদিন কমলপুরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু ভার্গ নদীতে স্নান দানাদি সমাধা পূর্ব্বক কপোতেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ এই স্থানে প্রভুর সন্ন্যাসের চিন্ ও সম্বল দণ্ড খানিকে ভগ্ন করিয়া নদী জলে ভাসাইয়া দিলেন, তদবধি সেই নদী "দণ্ডভাঙ্গা" নামে খ্যাত হইল। কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আবার চলিলেন। কমলপুর হইতে কিয়দ্দূর যাইতেই, পুরীর শ্রীমন্দিরের চূড়া সকলের নয়নে উদ্ভাসিত হইল, আর সেই এত দিনের অভীষ্ট বস্তু দর্শনে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবাবেশে পুরী প্রবেশ করিয়া

প্রভু চকিতের মধ্যে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং লম্ফ দিয়া যেমন শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করিলেন অমনি, প্রেমবিহ্বলিত হইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দৈবযোগে সেই সময় ভুবন বিখ্যাত, নদীয়ার গৌরবরবি, বাসুদেব সার্ব্বভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব প্রেমবিকাশ ও অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া অজ্ঞাতসারে প্রভুকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন; তাই যত্ন পূর্ব্বক জগন্নাথের পরিকরগণদ্বারা বহন করাইয়া প্রভুকে নিজ বাস ভবনে লইয়া আসিলেন। সগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য কিছু দিন সার্ব্বভৌমের বাটীতেই অবস্থান করিলেন। নিমাইয়ের মধুর সঙ্গে বেদান্তবাদী শত শত সন্ন্যাসীর গুরু, নদীয়ার পণ্ডিত কুলরবি সার্ব্বভৌমের মন ভক্তিপথে ধাবিত হইল এবং শেষে শ্রীপ্রভুকে বেদান্তমতে শিক্ষা দিতে যাইয়া তিনি স্বয়ংই ভক্তি রসে গলিয়া যান ও প্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শনে স্তব করেন। সেই স্তবাবলী "চৈতন্য শতক" নামে আজিও ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস আনিয়া দিতেছে।

এইরূপে পণ্ডিতকুলশেখর সার্ব্বভৌম বিজীত হইলে ক্রমে বহু সন্ন্যাসী, দণ্ডী, মায়াবাদী পণ্ডিত ও অবিশ্বাসী অনেকেই নির্ব্বিচারে শ্রীগৌরাঙ্গ পদে আত্ম সমর্পণ করেন। এমতে নীলাচলে দুই মাস প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইলে পর প্রভু এক দিন দক্ষিণ কূল ভ্রমণে ইচ্ছা প্রকাশ করতঃ ভক্তগণের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া একমাত্র কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ভক্তিমান বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া ১৪৩২ শকের (১৫১৯ খৃঃ অঃ) বৈশাখ মাসে দাক্ষিণত্য উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন* পথে অচিন্ত্যনীয়, পরমাদ্ভুত, অলৌকিক ঐশীশক্তি প্রকাশ করিয়া প্রভু দেহ চেষ্টাদি বিরহিত হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন যখন তিনি কূর্ম্মতীর্থে উপনীত হইলেন তখন, বাসুদেব নামে একজন মহাব্যা গ্রস্থ ভক্তিমান ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। দয়ালঠাকুর তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সেই পূতীগন্ধময়, কীড়াসঙ্কুল ক্ষতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে গা

---

* মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে নানারূপে দেখা যায়, কিন্তু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথ সমস্ত গ্রন্থেই একরূপ নির্দ্দেশ আছে। আমরা এখানে গোবিন্দের ক অনুসরণ করিলাম।



শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির।

এই শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব তাঁহার জীবনের ২৩ বর্ষ যাপন করিয়াছিলেন।

আলিঙ্গন প্রদানে ধন্য করিলেন। ব্রাহ্মণও দেবদুর্লভ শ্রীঅঙ্গের স্পর্শসুখ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ লাভ করতঃ প্রভুর চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন। এইরূপে অবিচারে, পতিত, অধম, দুর্জ্জন, কাঙ্গাল সকলকে সমভাবে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া প্রভু জিয়ড় নৃসিংহাদি তীর্থ দর্শন করিয়া ক্ষীণসলীলা গোদাবরী তীরে উপনীত হইলেন। পরে গোদাবরী পার হইয়া রাজমাহেন্দ্রীনপুরে গমন করিলেন এবং তথায় রসিকশেখর রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দের মধুর সঙ্গে দশরাত্রি অতিবাহিত করিয়া এবং তাহাকে আপনার ভুবনানন্দ মঙ্গলময় রূপ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু যে পথে চলিতে লাগিলেন তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে অমনি অননুভবনীয় ভাবে প্রেমের ঝটিকা বহিতে লাগিল। যে কেহ তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন তিনিই প্রেমে মত্ত হইলেন; আবার তাঁহাকে যিনি দর্শন বা স্পর্শ করিলেন তাঁহারও ঐরূপ অবস্থা হইল। এইরূপে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অল্পকালের মধ্যে হরিনাম প্রচারিত হইল। প্রভু রামানন্দের নিকট বিদায় লইয়া প্রথমে ত্রিমন্দনগরে আগমন করেন; তথা হইতে সিদ্ধবটেশ্বরে উপস্থিত হইলে তীর্থরাম নামক জনৈক ধনা, সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক বেশ্যাদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রভুর শরচ্চন্দ্র মরিচীবৎ শুভ্র চরিত্রের প্রভাবে আপনিই পবিত্র হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সিদ্ধবটেশ্বর হইতে মুন্নানগর, তথা হইতে বেঙ্কটগিরী পরে বগুলাবনে ভীলপন্থ দস্যুকে উদ্ধার করিয়া গিরীশ্বরে গমন করেন। গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদী নগর তথা হইতে পাণা নরসিংহ দর্শন করিয়া বিষ্ণু কাঞ্চিতে, ক্রমে কালতীর্থ, সন্ধিতীর্থ, চাইপল্লী নগর, নাগরনগর, তাঞ্জোর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া চণ্ডালু পর্ব্বত পার হইয়া পদ্মকোটে, তথা হইতে ত্রিপাত্র নগরে তথা হইতে এক সুদীর্ঘ বন অতিক্রম পূর্ব্বক রঙ্গধামে উপনীত হয়েন। তথা হইতে সমুদ্র উপকূলে রামনাথ নগরে, পরে তথা হইতে সেতুবন্ধরামেশ্বরে উপনীত হইলেন। সেতুবন্ধ হইতে বহির্গত হইয়া মাধবীবনে প্রবেশ করেন এবং তাম্রপর্ণী পার হইয়া কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হয়েন। এখান হইতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পদার্পণ করেন ও তদানীন্তন রাজা রুদ্রপতিকে কৃতার্থ করিয়া, পয়োষ্ণী, মৎস্যতীর্থ, কাছাড়, ভদ্রানন্দী, নাগপাতনদী প্রভৃতি পার হইয়া চিত্রলে গমন করেন। তথা হইতে চণ্ডপুর ও গুর্জ্জরী নগর

অতিক্রম করিয়া পূর্ণনগরে অর্থাৎ বর্ত্তমান পূর্ণানগরে উপস্থিত হয়েন। তৎকালে এই পূর্ণানগর বিদ্যাচর্চ্চার জন্ত অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এখান হইতে জোজুরীনগর পরে চোরানদীবন অতিক্রম করিয়া নাসিকে প্রবেশ করেন। নাসিক হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিম্বক, দমননগর, ভঁরোচ প্রভৃতি পশ্চাৎ করিয়া বরদারাজ্যে পদার্পণ করেন। তথা হইতে সমৃদ্ধিশালী আহমদাবাদ, ঘোগা, জাফরাবাদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সোমনাথে আগমন করেন। সোমনাথ হইতে গুণার পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ১লা আশ্বিন দ্বারকা, তথা হইতে ১৬ আশ্বিন নর্ম্মদাতীরে দোহাদনগর, ক্রমে কুক্ষি, আমঝোড়া, মন্দুরা, দেওঘর, চণ্ডীপুর, রায়পুর অতিক্রম করিয়া রায় রামানন্দের বাসভূমি বিদ্যানগরে গমন করেন। তথায় কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগড়ে প্রবেশ করেন। তথা হইতে সম্বলপুর, দাশপাল প্রভৃতি পশ্চাৎ করিয়া আলালনাথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই আলাল-নাথ হইতে প্রভু সমভিব্যাহারী কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। নিত্যা-নন্দাদি তাহার আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া মহাকুতূহলে তথায় আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুও তাঁহাদের প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কীর্ত্তন রঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শত শত যোজন পথ, অরণ্য প্রান্তর, গিরী, নদী অতিক্রম করিয়া এবং পথিমধ্যে শৈব, রামাৎ, বৌদ্ধ, এমন কি মুসলমান, পাঠান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী ও ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এক বৎসর আট মাস ষড়বিংশতি দিন পরে (১৫১১ খৃঃ ১৪৩৩ শকে) ৩রা মাঘ তারিখে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনান্তে কাশীমিশ্রের ভবনে রহিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলবাসী অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ পূজাদি গ্রহণ করতঃ তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। এখানেই চৈতন্যলীলার অর্দ্ধপাত্র শিখি মাইতি রামানন্দের পিতা ভবানন্দ ও তাঁহার আর চারি পুত্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র এবং দুই পূর্ণপাত্র স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হয়। শ্রীপাদ্ অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর প্রত্যাগমনের কুশলবার্ত্তা পাইয়া মহাহ্লাদে মহোৎসবে রত হইলেন, পরে তিনি সমবেত ভক্তগণের ঐকান্তিক ঔৎসুক্যে বিচলিত হইয়া শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আদেশ লইয়া, মুরারী, হরিদাস প্রভৃতি বহু স্ত্রীপুরুষ ভক্ত সমভিব্যবহারে রথযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য

স্মরণ পূর্ব্বক প্রভু মিলনে নীলাচল উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নীলাচলে প্রাণাধিক প্রিয় প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ যাত্রার কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দিন প্রভু প্রত্যূষে স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তবৃন্দ সঙ্গে রথযাত্রা দর্শনে গমন করিলেন। সেই সুসজ্জিত পতাকাদি শোভিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিরাজিত অপূর্ব্ব রথশ্রী দর্শনে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র, যিনি বিষয়ী বিধায় বহু চেষ্টাতেও এতাবৎ প্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হয়েন নাই, দীন বৈষ্ণব-বেশে তথায় গমন করিয়া বাহ্য জ্ঞান বিরহিত প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে সময়োচিত এক শ্লোক পাঠ করিলে প্রেমের পাগল ঠাকুরটী, ভাগবৎ শ্রবণে বাহ্য পাইয়া ও উল্লাসিত হইয়া রাজাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ নানা মহোৎসবে রথযাত্রা সমাপ্ত হইলে গৌড়ীয় ভক্তগণ কার্ত্তিক মাহার উত্থান দ্বাদশী পর্য্যন্ত নীলাচলে বাস করিলেন পরে শ্রীপ্রভুর, আদেশ ক্রমে সকলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে। কেবল মাত্র গঙ্গাধর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি দশজন প্রভুর নিকট রহিলেন। ক্রমে তিন বৎসর অতিবাহিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণও প্রতিবৎসর প্রভু দর্শনে নীলাচলে আসিতে লাগিলেন। এই তৃতীয় বৎসরে প্রভু যখন ভক্তগণকে বিদায় দিতে উদ্যত হইলেন তখন তিনি শ্রীপাদ নিত্যা-নন্দের প্রতি আদেশ করিলেন যে প্রতি বৎসর নীলাচলে না আসিয়া তিনি গৌড়ে রহিয়া আচণ্ডালে নাম বিলাইবেন। প্রভু এইরূপে আরও ২ বৎসর কাল নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণের সম্মতিক্রমে গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন এইরূপ স্থির করিয়া বিজয়া দশমীর দিন প্রভাতে প্রভু নীলাচল চন্দ্রের ইন্দুবদন দর্শন করিয়া শুভযাত্রা করিলেন। পরে কটকে আসিয়া সপরিবার প্রতাপ রুদ্রকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কিছুদিনে শ্রীপাট খড়দহের নিকটবর্ত্তী পাণিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের আলয়ে উপনীত হইলেন। এই রাঘব, প্রভুর একজন অতি প্রিয়ভক্ত ছিলেন। এখান হইতে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের কুমারহট্টস্থ নূতন ভবনে উপস্থিত হইলেন। কুমার হট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর গ্রাম) শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর

জন্মস্থান, তাই এখানে আসিয়া প্রভু দুর্লভ জ্ঞানে কুমার হট্টের ধূলিরেণু উত্তরীয় অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রধান ভাগ্যবান শ্রীবাসকে কৃতার্থ করিয়া ভক্তগত প্রাণ প্রভু কাঞ্চনপল্লীর (বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়া) শিবানন্দের ভবনে গমন করিলেন। তথা হইতে উক্ত গ্রামবাসী বাসুদেবের বাটীগমন করিলেন। এই যে প্রভু নীলাচল, হইতে শত শত ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন সে একাকী আসিতেছেন না; যে অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি হরিনাম প্লাবিত করিয়াছিলেন, এই সমগ্র পথেও সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া চলিতেছেন আর তাঁহার সঙ্গে সংখ্যাতীত জনপ্রবাহ এক মহা আকর্ষণের বলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। শ্রীপ্রভু কাঞ্চনপল্লী ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, আর অমনি অসংখ্য লোক কূলে কূলে তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরূপ অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীঅদ্বৈতের প্রাণনাথ শান্তিপুরে অদ্বৈত মন্দিরে শুভাগমন করিলেন। বহুদিন পরে চিরবাঞ্ছিত হারানিধিকে পাইয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণের যে মহানন্দ জন্মিল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপচন্দ্র, শচীদুলাল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ, নদীয়ার সর্ব্বস্ব প্রভু নবদ্বীপের একাংশ বিদ্যানগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। আর কিছুদিন এই চির প্রিয় ভূমিতে শান্তিতে থাকিবার মানসে গোপনে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে উপনীত হইলেন। বাচস্পতি গৃহদ্বারে বৈকুণ্ঠনাথকে অতিথিপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দে দিশেহারা হইলেন, আর পুলকপূরিত অঙ্গে গোপনে প্রভুর সেবায় রত হইলেন। ক্রমে যখন প্রভুর নবদ্বীপ আগমন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল তখন দলে দলে লোক সকল আসিয়া বাচস্পতির গৃহপ্রাঙ্গণ পূর্ণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল, তখন সকলে নিকটবর্ত্তী রাস্তা ও মাঠ সমবেত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন তাহাতেও স্থান সংকুলান হইল না—তখন লোকে অপথ, বন, জঙ্গল, বৃক্ষশাখা প্রভৃতিতে স্থান গ্রহণ করিল। এইরূপে বিদ্যানগরে যখন মহাজনতা হইল, তখন লীলাময় প্রভু বাচস্পতির গৃহত্যাগ করিয়া গঙ্গার তটস্থ কুলিয়াগ্রামে মাধবদাসের বাটী যাইয়া উপনীত হইলেন। এই কুলিয়াতেই পরম ভাগবত দেবানন্দ ঠাকুরের অপরাধ ভঞ্জন হয়। তিনি পূর্ব্বে মায়াবাদী ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিহীন ব্যাখ্যা করিতেন। প্রভুর নবদ্বীপ বাসকালে দেবানন্দকে

তিনি এ বিষয়ে উপদেশ দিলেও মহান্ধ দেবানন্দ প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার কথা অবহেলা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভক্ত শিরোমণি বক্রেশ্বরের কৃপায় দেবানন্দ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। দয়াময় প্রভুও তাঁহার সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে আপনার সুশীতল বক্ষে গ্রহণ করিলেন। দেবানন্দ তখন শুদ্ধমতি হইয়াছেন, সুতরাং আপনার সুখাপেক্ষা পরের সুখের প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি সমধিক তাই, প্রভুর এই কথায় সাহস পাইয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে, "যে কেহ এই ক্ষেত্রে আসিয়া অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে প্রভু যেন অবিচারে তাহার অপরাধ ভঞ্জন করেন।" প্রভুও ভক্তিমান দেবানন্দের প্রার্থনায় তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তদবধি কুলিয়া "অপরাধ ভঞ্জনের পাট" বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু কলির জীবের এমনি দুর্ভাগ্য যে এই শ্রীপাটের নিদর্শন নবদ্বীপের সন্নিকটে কোথাও পাওয়া যায় না; বুঝি গঙ্গাদেবী এই লোভময় পবিত্র তীর্থের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া আপনার পবিত্র বক্ষে ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। এই কুলিয়া গ্রামেই শ্রীপ্রভু আত্মজনের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। এইখানেই শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন এবং ত্রিলোক পূজ্য স্বামীর স্নেহের শেষ নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার শ্রীপদের কাষ্ঠপাদুকা যোড়াটী প্রাপ্ত হয়েন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীপ্রভুর আদেশ ক্রমে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্থাপিত এই মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন।

কুলিয়া হইতে মহাপ্রভু গঙ্গার তীরে তীরে রামকেলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই রামকেলী গ্রাম তদানীন্তন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের এক অংশ বিশেষ। পাঠান বংশীয় সৈয়দ হুসেন সাহা তখন এখানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই হুসেন সাহার রাজকীয় সভায় রূপ ও সনাতন নামে দুই ভ্রাতা "দবির খাস ও সাকার মল্লিক" পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই ভ্রাতার রাজ সংসারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইহাঁরা সতত মুসলমান সহবাসে যাবনিক ভাব প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ বিলক্ষণ ভক্তিমান ছিলেন। প্রভু ইহাঁদিগকে উদ্ধার করিয়া গৌড় হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে গমন করিলেন। তথায় কিয়দ্দিবস অতি-বাহিত করিয়া পরিশেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানে বর্ষার চারিমাস অতিবাহিত করিয়া তিনি একদা বলভদ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া

রাত্রিশেষে গোপনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ইচ্ছাময় প্রভু লোকচক্ষু হইতে অন্তরালে থাকিবার মানসে বিপথে শ্বাপদ সঙ্কুল দুর্গম অরণ্য মধ্য দিয়া গমন করতঃ অবশেষে কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং তদীয় পুরাতন ভক্ত তপন মিশ্রের ভবনে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিলেন। পরে তদানীন্তন কাশীর জগৎগুরু, মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, দণ্ডী সন্ন্যাসীর রাজা, দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরের ন্যায় মহামান্য প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত সে যাত্রা সাক্ষ্যাৎ না করিয়াই, শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া মথুরাভিমুখে ছুটিলেন এবং শীঘ্রই প্রয়াগে আসিয়া উপণীত হইলেন। এই বৃন্দাবন যাত্রার পথে প্রভু যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই অকাতরে প্রেম বিলাইয়া চলিতেছেন; অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যে অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ করিলেন। এইরূপে পথে প্রেম বিলাইয়া ও স্বয়ং ভাবাতিশয্যে বাহ্য বিরহিত হইয়া প্রভু টলিতে টলিতে বৃন্দাবন উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন; এক্ষণে সম্মুখে চিরাভিলষিত, চিরাকাঙ্খিত শ্রীযমুনাদর্শনে প্রভু প্রেম বিহ্বল হইয়া যমুনায় ঝম্পপ্রদান করিলেন। এইরূপ যেখানে যেখানে যমুনা দর্শন পাইলেন সেইখানেই মহাকুতুহলে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রেমে অচেতন হইয়া প্রভু মথুরায় আসিয়া উপণীত হইলেন এবং তথা হইতে ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে বৃন্দাবনের নামমাত্র শ্রবণে প্রভুর মূর্চ্ছা হয়, যাহার ধূলীরেণু পাইলে দুর্লভ জ্ঞানে মহানন্দে প্রভু কালাতিপাত করেন, বহুদিন হইতে যেখানে আসিবার জন্য তিনি উন্মত্ত আজ সেই মধুর শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া যে প্রেমের ঝটিকা প্রবাহিত করিলেন তাহা বর্ণনাতীত। মুক্তি ছার পরমারাধ্য পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ সে ভাবের কথঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছেন মাত্র। ক্রমে কৃষ্ণ প্রেমে তন্ময় হইয়া প্রভু চৌরাশী ক্রোশ পরিমিত বৃন্দাবন পরিক্রমায় রত হইলেন এবং লুপ্তপ্রায় মহাতীর্থগুলি এক একটী করিয়া প্রকাশ করিলেন। আজ যে বিশাল পুরীকে আমরা শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া পূজা করিয়া থাকি তাহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত।

বৃন্দাবনে কিছুদিন বাস করিয়া ইচ্ছাময় প্রভু পুনরায় প্রয়াগে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি পাঠানকে কৃষ্ণনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন। এই ভাগ্যবান পাঠানগণ প্রভুর কৃপায় মহাভাগবত হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন এবং ইহারা পাঠান গোঁসাই নামে খ্যাত হইলেন। এইরূপে

পথে হরিনাম নিধি বিলাইয়া শ্রীপ্রভু প্রয়াগে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীরূপ গোস্বামী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন; রূপ সনাতন শ্রীপ্রভুর চরণরেণু লাভ পর্য্যন্ত রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপ শ্রীপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ পাইয়া আপনার সমস্ত সম্পদাদি বৈষ্ণবগণকে বণ্টন পূর্ব্বক প্রভু মিলনে যাত্রা করেন এবং বহুপথ পর্য্যটন করতঃ প্রয়াগে আসিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। প্রভু, রূপকে সঙ্গে লইয়া এখান হইতে কাশীধামে উপণীত হয়েন। কাশীধাম তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও দণ্ডীগণের রাজ্য এবং প্রকাশানন্দ স্বামী সেই রাজ্যের রাজা, তাঁহার শিষ্য সংখ্যা তখন দশসহস্র, আবার এই দশসহস্র শিষ্যের প্রত্যেকের দুই, চারি, দশটী করিয়া চেলা; সুতরাং প্রকাশানন্দকে তৎকালীন সন্ন্যাসী শিরোমণি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সন্ন্যাসী প্রধান কাশীধামে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পুনরাগমন করিয়াছেন এই সংবাদে, কাশীবাসী, মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ নানামতে সর্ব্বত্র তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রভুর ভক্তগণ এই নিন্দাবাদে যৎপরোনাস্তি কষ্ট অনুভব করিলেন এবং পরিশেষে সকলে যুক্তি করিয়া একদিন তাঁহাদেরই একজনের বাটীতে কাশীর সমস্ত সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন। সে সভায় তাঁহারা প্রভুকে আহ্বান করিলেন কেননা তাঁহাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে একবার মাত্র শ্রীপ্রভুর চন্দ্রবদন দর্শন করিলে ও তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তাহাঁদের আর সে ভাব কিছুতেই থাকিবে না। ক্রমে সকল সন্ন্যাসী সমবেত হইলে প্রকাশানন্দ স্বামী আসিয়া সভারোহণ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রভু যখন শুনিলেন সভায় দশসহস্রের উপর ও সন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছেন এবং সকলে তাঁহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন, তখন, অতি দীনবেশে সনাতনাদি চারিজন মাত্র সঙ্গী সমভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীগণ এতাবৎ প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়াইলেও কখন তাঁহাকে দর্শন করেন নাই এবং মনে করিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী বুঝি তাঁহাদেরই মত একজন দাম্ভিক পুরুষ—হয়ত তাঁহাদের অপেক্ষাও দাম্ভিক; কিন্তু যখন তাঁহারা প্রভুর দীনাতিদীন মূর্ত্তি ও সকরুণ দৈন্যবেশ দেখিলেন এবং তাঁহার বিনয় নম্র বচন সুধা পান করিলেন তখন তাহাদের মনে হইতে লাগিল যে এই নিরহঙ্কার দেব দুর্লভ পুরুষটীকে অনর্থক হিংসা করিয়া ভাল কার্য্য করেন নাই। আবার যখন পরম পণ্ডিত প্রভু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে তাঁহাদের

সমস্ত কুতর্ক জাল খণ্ডন করিয়া, মায়াবাদের অসারত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক, বিশুদ্ধ মত এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন তখন, তাঁহার অপূর্ব্ব বিচার শক্তি, অলৌকিক ভূয়োদর্শন এবং অসামান্য পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সুকোমল চরিত্র প্রকাশানন্দও প্রভুর প্রেম-ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং ভাবাতিশয্যে প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। এই প্রকাশানন্দই, প্রভুর কৃপাকণা লাভ করতঃ উত্তর কালে বৈষ্ণব জগতে ভক্ত শিরোমণি প্রবোধানন্দ নামে খ্যাত হয়েন। এই মহাপণ্ডিত শ্রীপ্রভুর গুণাবলী স্মরণ করিয়া যে সুমধুর স্তবাবলী রচনা করিয়াছেন তাহাই "চৈতন্য চন্দ্রামৃত" নামে খ্যাত। ইনি এক স্থানে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

"বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মমনাভবৎ ॥
দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য—
—কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে মাধব সকলমেব বিহায় দূরাদ্—
—গৌরাঙ্গচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগং ॥"

এইরূপে কাশীতে হরিনামের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া এবং প্রবোধানন্দ, সনাতনাদিকে শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রেরণ করিয়া শ্রীপ্রভু পুনরায় নীলাচলে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইলে স্বরূপ দামোদর এ সংবাদ গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণও পূর্ব্বের ন্যায় শচীমাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিতে লাগিলেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রভু নিশিদিন বাহ্য বিরহিত হইয়া মহাভাবসাগরের অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে যতই দিন গত হইতে লাগিল শ্রীপ্রভুর প্রেমবৈকল্যও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ অবস্থাও অধিক দিন স্থায়ী হইল না। প্রেমোন্মাদ অবস্থা ক্রমেই অধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রীপ্রভু আর প্রায় কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। এই সময়ে তাঁহার প্রেমবিকার জনিত নানা প্রকার অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব সাত্ত্বিকভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণ একদিন প্রভুকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে জগন্নাথের সিংহদ্বার

সমীপে উপস্থিত হইলে দেখিলেন, শ্রীপ্রভু বাহ্যবিরহিত অবস্থায় ধরাশায়ী রহিয়াছেন। শরীর নিষ্পন্দ—নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাসের লক্ষণ মাত্রও অনুভূত হইতেছে না,—হস্তপদাদির সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হওয়ায় শরীর অত্যন্ত দীর্ঘল হইয়াছে—কেবল চর্ম্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র। প্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ মহাশোকে হাহাকার করিয়া উঠিলেন—

"স্বরূপ গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কানে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা।
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিল।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিল"॥

অপর এক দিবস আচম্বিতে কৃষ্ণবেণু গান শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে শ্রীপ্রভু দক্ষিণ সিংহদ্বারে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ যাইয়া দেখিলেন যে, প্রভুর সেই সুদীর্ঘ শ্রীঅঙ্গ কুষ্মাণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। হস্তপদাদি যাবৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে; তখন সকলে মিলিয়া সেই বরবপু বহন করতঃ গৃহে আনিলেন। আর—

"উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥"

অপর এক নিশিতে প্রভুর প্রেমোম্মাদ সাতিশয় বর্দ্ধিত হওয়ায়, চন্দ্ররশ্মী বিভাসিত, চাকচিক্যময়, তরঙ্গায়িত, সুনীল পয়োধীবক্ষ দর্শনে হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের জলকেলী স্ফুর্ত্তি হওয়ায় যমুনাভ্রমে তিনি সমুদ্রবক্ষে ঝম্পপ্রদান করেন। এ দিন ভক্তগণ বহু অনুসন্ধানেও যখন প্রভুর কোন সংবাদ পাইলেন না, তখন প্রভু বুঝি অন্তর্ধান করিলেন এই মনে করিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই সময়ে স্বরূপ দামোদর একজন ধীবরকে হরিধ্বনি করিয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে দেখিয়া, সন্দিহান হইয়া ঐ ধীবরকে শ্রীপ্রভুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে—

"কহ জালিয়া ঐ দিকে দেখিলে একজন।
তোমার এই দশা কেন কহত কারণ॥

"জালিয়া কহে ইহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতকে দেখিতে মোর ভয় হইল মনে॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হইল।
স্পর্ষ মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ গদ বাণী মোর উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শন মাত্রে মনুষ্যের পশে সেই কায়॥"

ভাগ্যবান জালিয়া যখন এইরূপে প্রভুর স্বরূপ বর্ণন করিলেন, তখন ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং সকলে দ্রুত সমুদ্রতটে যাইয়া দেখিলেন সেই কমলাসেবিত "পুরট-সুন্দর-দ্যুতি কদম্ব সন্দীপীত" শ্রীঅঙ্গ—

"ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ শব কায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম লটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া আননে না যায়॥"

তখন সকলে মিলিয়া প্রভুর সেবায় ব্রত হইলেন। কেহ আদ্র কৌপীন দূর করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দিলেন, কেহ শ্রীঅঙ্গের বালুকাকণা ছাড়াইতে লাগিলেন; কেহ কেহ বহির্ব্বাস পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে সেই শয্যায় শায়িত করিলেন। এবং সকলে মিলিয়া তখন উচ্চ হরি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

"কতক্ষণে প্রভুকাণে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল॥"

উপর্য্যুপরি প্রভুর এইরূপ প্রেমবিকার ও মহাভাব সমাধি অবলোকন করিয়া ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। সকলের মনে কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিল যে, আর বুঝি তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমশৃঙ্খলে প্রভুকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না; কিন্তু এই মর্ম্মগ্রন্থী ছিন্নকারী নিদারুণ কথা মনে হইলেও কেহ মুখে আনিতে পারিলেন

না। তাই সকলেই আপনি আপনি মনে বুঝিয়া সতর্কে প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রেমপূর্ণ সযত্ন অনুবন্ধে কোন ফল হইল না, কেননা ইচ্ছাময়, লীলাময় প্রভু যে মহৎকার্য্য সাধন করিতে গোলক ত্যাগ করিয়া মর্ত্তের আবিল ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মহানকার্য্য, অর্থাৎ "জীবে দয়া, নামে রুচি" আত্ম চরিত্রে আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা দেওয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সেই ভক্তাবতার প্রভুর এই অপূর্ব্ব প্রেমময় লীলার অবসান কাল নিকট হইয়া আসিতেছিল।

একদিন ভক্তগণকে লইয়া বৃন্দাবনলীলারস আস্বাদন করিতে করিতে প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া নীরব হইলেন এবং উঠিয়া দ্রুতপদে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরাভি-মুখে ছুটিলেন। ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। প্রভু দ্রুতগমনে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে মন্দিরদ্বার আপনা হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। বাটীর অভ্যন্তরে ভোগমন্দির প্রভৃতি স্থানে দুই একজন জগন্নাথের সেবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা, প্রভুকে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে দেখিলেন এবং পরক্ষণেই বাহিরে ভক্তগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া দ্রুত আসিয়া দ্বারমোচন করিলেন। ভক্তগণ পথ পাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন কিন্তু কেহই আর প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন সকলে প্রভুর অন্তর্ধান বুঝিতে পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই মহাশোকের বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে শ্রীমন্দির শোকাকুল ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে এ নিদারুণ সংবাদ ভারতবর্ষীয় যাবতীয় ভক্তগণের নিকট প্রচারিত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে যে মহাশোকানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল তাহা বর্ণনা করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

এইরূপে ১৪৫৫ শকে এই অপূর্ব্ব দেবলীলার অবসান হয়। এই অমিয়ময় চরিত, কণকপুত্তলী, প্রেমের মূর্ত্তি দেবশিশুটী ১৪০৭ শকে নবদ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃকালে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট কাঞ্চন নগরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, ক্রমিক ছয় বৎসরকাল ভারতের সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক, জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন ও ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অপ্রকট হয়েন। এই অলৌকিক, অপূর্ব্ব জীবনে যে সুগম্ভীর-

প্রেম, অনন্ত-ভাব-সমাবেশ ও অপূর্ব্ব ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা সুবিস্তারে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমরা এই স্বল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সেই পুণ্যশ্লোক মহান চরিত্রের আভাষ মাত্র দিতে চেষ্টা পাইয়াছি। যে মধুর হইতে সুমধুর পবিত্র কাহিনী বহুদিন ধরিয়া বর্ণনা করিলেও কিছুই বলা হয় না, যাঁহা'র এক এক দিনের জীবনী কথা লইয়া বিচার ও ভাবনা করিলে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে, সেই মহাপুরুষের মহান চরিত্র গাঁথা এই স্বল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। তবে এই মহাপুরুষকে লইয়াই নদীয়া, এবং নদীয়া-কাহিনী বলিতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই প্রেমময় কাহিনী মনে আসে বলিয়া আমার এই হাস্যকর উদ্যম।

নদীয়ার বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়।

বর্ত্তমান নদীয়ার জনসংখ্যা ১,৬৬৭,৪৯১ জন। ইহার মধ্যে ৬৭৬,৩৯১ সংখ্যক নরনারী নানা শ্রেণীভুক্ত হিন্দু; ৯৮২, ৯৮৭ জন মুসলমান, ৮০৯১ জন খৃষ্টান এবং অবশিষ্ট সংখ্যক নানা ধর্ম্মাবলম্বী।

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, নদীয়া, হিন্দু প্রধান স্থান হইলেও জনসংখ্যা হিসাবে এখানে মুসলমানেরই প্রাধান্য অধিক। ইহার কারণ নিম্ন লিখিতরূপ অনুমান করা যায়। ১ম,—মুসলমানাধিকারে সময়ে সময়ে মুসলমানগণ বল প্রকাশ দ্বারা গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়াছিল। ২য়,— হিন্দুর মধ্যে যে সকল হীন জাতীয় ব্যক্তিগণ সমাজের চক্ষে অতি ঘৃণিত ভাবে দৃষ্ট হইত, তাহারা তাৎকালিক দেশের রাজার সহিত সমধর্ম্মী হইয়া কথঞ্চিৎ উন্নত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এখনও যে এতদ্দেশে ভদ্র অপেক্ষা নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে খৃষ্টধর্ম্মানুবর্ত্তন করিয়া থাকে তাহার কারণও এই। ৩য়,—ঢাকা ও মুরসিদাবাদের মুসলমান প্রভাব নদীয়া প্রভৃতি স্থানে প্রবল ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

মুসলমান।

নদীয়া জেলার মুসলমানগণের অধিকাংশই দরিদ্র কৃষিজীবি মাত্র। কচিৎ কোথাও দুই একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল মুসলমানগণের আচার ব্যবহার অনেক বিষয়ে হিন্দুর ন্যায়। এমন কি হিন্দুর কোন কোনও দেব দেবীও ইহাদের অনেকের নিকট বিশেষভাবে পূজা পাইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা অথবা অন্য কোনরূপ উন্নতি কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইহাদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি উভয় শ্রেণীর লোকই বিদ্যমান এবং অধিকাংশস্থলেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহারা একেবারে অন্ধ। যাহা বংশগত প্রথা চলিয়া আসিতেছে, মাত্র তাহাই উদ্‌যাপন করিয়াই ইহারা ধর্ম্মাচরণ সম্পন্ন হইল মনে করে। ইদানীং

পারস্য ভাষার চর্চ্চা আদৌ না থাকায় ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপুস্তক সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই দৃষ্ট হয় না। মুসলমান মোল্লাগণের অচিরাৎ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ, অন্যথা আর কিছু দিনে এই সকল নিরক্ষর মুসলমানের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাড়াইবে ; কারণ, দেখা যায় যখন যে জাতির ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে তখনই সে জাতির আভ্যন্তরীণ অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে। এই জেলায় সিয়া অপেক্ষা সুন্নীর সংখ্যা অধিক। এই সমগ্র মুসলমান সমষ্টি প্রধানতঃ সিয়া ও সুন্নি দুইভাগে বিভক্ত হইলেও, ইহাদের প্রত্যেকের আবার কতকগুলি করিয়া শাখা বিভাগ দৃষ্ট হয় যথা—সাবেক সুন্নী, ফরাজী, টায়ানী, হাসাফিজ, সাফায়িজ, মালিকি ইত্যাদি। এই শাখা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ফরাজী সম্প্রদায়ীর সংখ্যা অত্যধিক।

সিয়াগণ মহম্মদের কন্যা ফতিমার স্বামী আলির অনুচর, তাহারা আলিকেই যথার্থ খলিফা অর্থাৎ মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্বীকার করেন, যাহা সুন্নীরা করেন না ; তাঁহাদের মতে আবুবকর যথার্থ খলিফা। এই মতদ্বৈধতা হেতু উভয় সম্প্রদায় পরস্পরকে বিদ্বেষও করিয়া থাকেন এবং সুন্নীগণ সিয়াদিগকে "রাফেজী" অর্থাৎ সত্যভ্রষ্ট বলিয়া আখ্যাত করেন। মহরমের সময়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধতার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিয়াগণ যখন তাঁহাদের পুজনীয় আলির দ্বিতীয় পুত্র হসেনের গৌরবকর মৃত্যু দিনের স্মৃতি রক্ষা করিতে প্রতিবৎসর মহরম মাসের প্রথম দশদিন তাজিয়া নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উৎসবে মত্ত হইয়া উঠেন, তখন সুন্নীগণ আলিকে খলিফা স্বীকার না করায় তাঁহার পুত্রের মৃত্যু দিনেরও গৌরব রক্ষা করেন না, তবে ঐ মহরম মাসের দশমদিনকে তাঁহারা কোরানোক্ত মতে পৃথিবী সৃষ্টির দিন বলিয়া ঐ দিনকে পবিত্র জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান সুন্নীগণ পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে চলিলেও নিরক্ষর সুন্নীগণ প্রায়শঃ সিয়াগণের সহিত একযোগে এই শোকের উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকে; বিগত কয়েক বৎসর হইতে রাণাঘাট সব্‌ডিভিসান, সদর, ও নদীয়া জেলার অন্যান্য বহু স্থানে সুশিক্ষিত সুন্নী মোল্লাগণ আসিয়া তাঁহাদের নিরক্ষর ভ্রাতাগণকে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহারা এই উপলক্ষে তাজিয়া নির্ম্মাণাদি উৎসবের যাবতীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। এতদঞ্চলের সিয়াগণ এই মহরম ব্যাপারে হুসেন ও হাসেন উভয় ভ্রাতার নিমিত্তই শোক প্রকাশ করিয়া থাকে ; কিন্তু

পারসিয়া এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহে একমাত্র হুসেনের স্মৃতিই জাগরুক করা হয়, ভাবিয়া দেখিলে এই প্রথাই যথার্থ অনুমতি হয় কারণ হুসেন যখন ৬৮০ খৃষ্টাব্দের ১০ই মহরম তারিখে কারবালায় নিহত হইয়াছিলেন হাসেন তাহার ১০বৎসর পূর্ব্বে ২৮ কাফেরে মেদিনায় শত্রুর বিষাক্ত শরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই মহরম ব্যতীত মুসলমানগণের অপর যে সমস্ত পর্ব্ব আছে তন্মধ্যে রমজান শেষে ইদলফেত্তর এবং বক্রীদ, সিয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণই সমভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

রমজান—মুসলমান বৎসরের নবম মাস; নিষ্ঠাবান মুসলমান মাত্রেই এই সমগ্র মাসটীকে পবিত্র জানে প্রত্যহ সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত কঠোর উপবাস দ্বারা উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। এই রমজানের উপবাস কাল মধ্যে যদি কেহ মিথ্যা কথা যে কারণেই হ'ক কহিয়া ফেলেন তবে তাঁহার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় পায়। এই মাস ব্যাপী পর্ব্ব ১লা সওয়াল ইদলফেত্তর পর্ব্বে উদ্‌যাপিত হয়। এই দিন সকলে নব বস্ত্র পরিধান করিয়া সাধ্যমত দান ধ্যানাদিতে রত হয়েন এবং উপাসনার পর আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব আদি পরস্পর আলিঙ্গন, অভিবাদন, প্রত্যাভিবাদন ইত্যাদি করিয়া থাকেন।

এই পর্ব্ব কয়েকটী ব্যতীত আরও কতিপয় পর্ব্ব মুসলমান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। সে গুলি এ জেলার সর্ব্বত্র সমভাবে উদযাপিত না হইলেও, নদীয়ার সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ * এ গুলির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।—

সুবি বরাত—মাহ "সাবান" এর পঞ্চদশম দিবসের রাত্রিকাল; মুসলমানগণের মতে এই দিন আল্লা মনুষ্যের সম্বৎসরের পাপ পুণ্যের হিসাব জমা খরচ করেন।

---

* সুখের বিষয় বিগত কয়েক বৎসর হইতে নদীয়ার সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মুসলমান মহাশয়েরা তাঁহাদের নিরক্ষর সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের উন্নতির জন্ত নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন এবং এতদুপলক্ষে বহু স্থানে সভা মকতব মাদ্রাসা, বোর্ডিং আদি স্থাপিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কুমারখালির সৈয়দ মৌলবী আবদুলকদ্দুস প্রমুখ সুধীগণের যত্নে স্থাপিত আঞ্জুমান এত্তাফার এস্‌লামিয়া, কৃষ্ণনগরে নদীয়ার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট ইলাকাইলে বাহাদুরের নামীয় মাদ্রাসা, শান্তিপুর মাদ্রাসা প্রভৃতি উল্লিখ যোগ্য। সংখ্যার ন্যূনত বিধায় যেমন সম্প্রদায় বিশেষের সমাজে প্রতিপত্তি কম হয় তেমনি সংখ্যাধিক্যে সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধিও হয়, এই কারণে নদীয়ায় হিন্দুর ন্যায় মুসলমানের সামাজিক প্রতিপত্তিও বেশ আছে। এখানকার মুসলমানগণ নম্র স্বভাব, সামাজিক, বিনয়ী ও ভদ্র।

ইদুজ্জুহা—মাহ "জেলহিজ্জার" দশম তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, ইহা বক্রীদ নামেও খ্যাত, এই উপলক্ষে নানাবিধ পশু হত্যা করা হয়।

আশুরা—মাহ "মহরমের" দশম দিবসে সুন্নীগণ কর্ত্তৃক পালিত হয়। তাঁহাদের মতে এই দিন আল্লা কর্ত্তৃক জগৎ, জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ নরক প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃজিত হয়।

আখির-ই-চাহার সুম্বা—মাহ সাফরের শেষ বুধবার। কথিত আছে এই দিন মহম্মদ তাঁহার শেষ পীড়া হইতে কথঞ্চিত নিরাময় হইয়া স্নান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যাঁহারা এই দিনের গৌরব করেন তাঁহারা একখানি কাগজে কোরান হইতে নির্দ্দিষ্ট সাতটী শ্লোক লিখিয়া,ঐ লেখাগুলি জলে ধৌত করিয়া পরম পবিত্র, জ্ঞানে ঐ জল পান করেন।

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্ব গুলি ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ দু একটী পর্ব্ব বিদ্যমান আছে এবং এই জেলার মুসলমানগণকে এই সকল পর্ব্ব ব্যতীত আরও এক প্রকারের পূজা অর্চ্চনার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেগুলি সাধারণতঃ ভগবৎ জানিত পীর, ফকীর বা গাজীগণের পূজা। প্রায়শঃ কোনও একটী বৃক্ষের মূলে এই সকল স্বনাম ধন্য পীর মহাশয়গণের আস্তানা দেখিতে পাওয়া যায়, নদীয়া জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই এইরূপ দু একটী আস্তানা বর্ত্তমান আছে, কোনও কোনও স্থানে ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র দরগাও এতদর্থে দেখা যায়। সাধারণতঃ পীর সরিয়ৎ পীর তরিকৎ,পীর হরিকৎ, এবং পীর মরিফৎ এই চারি প্রকারের পীর এইরূপে পূজা পাইয়া থাকেন। হিন্দুগণও নবপ্রসূত গাভীর দুগ্ধ ও বাতাসা প্রভৃতি দ্বারা ইঁহাদের তুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। নদীয়া জেলার মুসলমানগণ সাতপীর, পাঁচপীর, পীর বদর প্রভৃতি মহাপুরুষগণেরও পূজা করিয়া থাকেন, এবং নদীয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন আস্তানার মধ্যে রাণাঘাটের অদূরস্থিত পাটুলী গ্রামের বড় পীরের আস্তানা, মাটীয়ারীর মল্লিকগণের দরগা এবং পলাশীর অদূরস্থিত মাজনপাড়া ফরীদতলা গ্রামের ফকীর ফরীদ সা সকরগঞ্জ এর দরগার সম্মান করিয়া থাকেন। এই দরগার মধ্যেই সিরাজ-উদ্দৌলার বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদন সমাহিত আছেন।

খৃষ্টান।

এই জেলায় খৃষ্টান অধিবাসীদিগের মধ্যে Roman Catholic ও Protestant উভয়বিধ খৃষ্টানই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইঁহাদের প্রধান আড্ডা কৃষ্ণনগর,

কাপাসডাঙ্গা, রাণাঘাট, মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানে। ইঁহাদের অবস্থাও বিশেষ স্বচ্ছল নহে, অধিকাংশ কৃষিকার্য্যের উপরই জীবিকা নির্ভর করে। কৃষ্ণনগরস্থ ৺রায় দ্বারিকা নাথ দে বাহাদুরের বংশাবলীর ন্যায় সুসভ্য উল্লেখযোগ্য দু দশ ঘর খৃষ্টান বংশও দেখা যায় তবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম। কেহ কেহ বা আবার সামান্য বেতনের কনেষ্টবলী প্রভৃতি কার্য্যও করিয়া থাকেন। সমাজে ইঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি নাই। খৃষ্টান মিসনারিগণ অত্র জেলায় বহু স্থানে স্বধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল প্রচার দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রভৃতির মধ্যে বিখ্যাত সিভিলিয়ান জে, মনরো(J. Monro Esq.C.B)প্রতিষ্ঠীত রাণাঘাটের অদূরস্থিত দয়াবাড়ী নামক দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষ্ণনগরের মিসনারি স্কুল প্রভৃতি লোক হিতকর কার্য্যগুলি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য*। এই সকল মিসনারি সাহেবদের মধ্যে অনেক সময়ে অনেক উদারচেতা মহাত্মা আগমন করিয়াছেন। বিগত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নীলহাঙ্গামার সময় যে সকল মহানুভব ইংরাজ, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জেতা বিজেতার তারতম্য ভুলিয়া নীলকর-পীড়িত-প্রজাকুলের সাহায্যার্থ নির্ভীক হৃদয়ে স্বজাতীয় অত্যাচারী নীলকরগণের বিপক্ষে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শান্তিপুরের মিসনারী সোসাইটীর Rev. C. Bomwelsch, কৃষ্ণনগর সমিতির Rev. C. H, Blumhardt Rev. F. Schurr প্রভৃতি দেব প্রকৃতি সাহেবগণের নাম; এবং বিগত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের নদীয়া দুর্ভিক্ষে Rev. T. C. Lincke; কাপাস ডাঙ্গার Rev. F. Schuar প্রমুখ যে সমস্ত পরদুঃখকাতর সাহেবগণ প্রজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া

* Christians number 8,091, of whom 7,912 are natives. The church of England possesses 5,836 adherents and the Romon Catholic Church 2,172 The church missionary society commenced work in 1831 and had 13 centres presided over by native clergy or catechists and Superintended by 6 or 7 Europeans. The Roman catholic mission was established in 1855 & Krishnagar is now the head quarters of the diocese of central Bengal. In 1877 there was a schism among the adherents of the church Missionary Society and a member of them went over to the church of Rome. The church of England Zenana Mission works at Krishnagar and at Ratanpur and a Medical Mission at Ranaghat.—Imp Gazeteer. (New Edition) vol. xviii page 276.

দুর্ভিক্ষের কঠোরতার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন নদীয়ার ইতিহাসে সেই সব মহাপুরুষের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

হিন্দু।

নদীয়ার হিন্দু অধিবাসীগণ নানা মূলধর্ম্মে ও শাখাধর্ম্মে বিভক্ত,যথা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব এবং কর্ত্তাভজা, বলরামভজা ইত্যাদি। এতন্মধ্যে শ্রীচৈতন্য দেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং কর্ত্তাভজা, বলরামভজা সম্প্রদায় প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তিস্থান এই নদীয়া জেলা। এখানে শাক্ত বা শৈব অপেক্ষা বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক। ব্রাহ্মণগণ প্রায়শঃ শাক্ত অথবা শৈব। এক সময়ে নদীয়ার এই দুই ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান কালে ক্রিয়ান্বিত তান্ত্রিক বা শৈব দুর্লভ।

সাধারণ হিন্দু গৃহস্থগণ ক্রিয়া কর্ম্মে নদীয়ার গৌরব রবি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট কৃত "শ্রীহরিভক্তি বিলাসের" মতেরই প্রচলন দেখা যায়। ভেকধারী এবং খাঁটী বৈষ্ণব মতানুসারী ব্যক্তিগণ ব্যতীত নদীয়ায় সাধারণ লোকে সাম্প্রদায়িক মতভেদ হইতে দূরে রহিয়া নিম্নলিখিত পর্ব্বগুলি অবশ্য করণীয় মনে করেন। নানা কারণে অধিবাসীগণের অবস্থা হীন হওয়ায় ইচ্ছা থাকিলেও সকলে এখন সচরাচর ক্রিয়া, কর্ম্ম, ব্রত, পার্ব্বণাদি করিতে পারেন না,তবে কোনও কোনও ক্রিয়াবান ভাগ্যবন্ত বংশে এই সমস্ত পর্ব্বগুলিই অনুষ্ঠীত হয়,—নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া পার্ব্বণ এবং ব্রত নিয়মাদি কার্য্য, শালগ্রাম শীলা-সেবা, পূজা, ভোগ, শিবপূজা ইত্যাদি,সন্ধ্যা-আহ্নিক-কৃত্য (নিজনিজ, ইষ্টদেবতার আরাধনা, জপ,পূজা ইত্যাদি) অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণভোজন। গঙ্গাস্নান, তর্পণ, যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গাস্নান ও পুরোশ্চারণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন,তুলসী নিবেদন প্রভৃতি ; জাতকর্ম্ম,অন্নপ্রাশন,চূড়াকরণ কর্ণবেধ ইত্যাদি দশবিধ সংস্কার ও তদোপলক্ষে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ইত্যাদি ভোজন। ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া ও আত্মশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ; পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদি, দোলযাত্রা, দশাহরা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, কার্ত্তিক পূজা, রাসযাত্রা, সরস্বতীপূজা, দোলযাত্রা,

শিবের গাজন। এতদ্ব্যতীত ব্রতাদি যথা অক্ষয়তৃতীয়া, সংক্রান্তি, সাবিত্রীব্রত, জন্মাষ্টমী, দুর্ব্বাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দ্দশীব্রত, অরণ্যষষ্ঠীব্রত, একাদশীব্রত, কাত্যায়নী ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য ব্রত, তাল নবমীব্রত, দুর্গানবমী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃত্য, ললিতা সপ্তমী, শিবরাত্রিব্রত, রামনবমীব্রত, সীতা নবমীব্রত, ষট্‌পঞ্চমী ব্রত, জলদান ব্রত। বালিকাদিগের আচরণীয় ব্রত পুণ্যপুকুর, যমপুকুর, সাঁজুতি, তুষুলী, ইতু বা ঋতুপূজা প্রভৃতি।

পুণ্যমাসে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ, কথকতা ও তদঙ্গীভূত ক্রিয়াদি। শ্রীহরিবাসর, শ্রীশ্রীনগর সংকীর্ত্তন এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বাদি এবং "পোষলা" ইত্যাদি গ্রাম্য পর্ব্বাদিতে সাধারণে উৎসবাদি করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

এই গৌড় মণ্ডলে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য এই চারি সম্প্রদায়ই বৈষ্ণবের মধ্যে একমাত্র মাধ্বাচারী সম্প্রদায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ শ্রীগৌরাঙ্গদেব মাধ্বাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান কালে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এতদঞ্চলে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা শ্রীচৈতন্য দেবেরই মতানুসারী। এই বৈষ্ণব সাম্প্রদায়কে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম,—যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কোন মতামত গ্রাহ্য করে না।

২য়,—যাঁহারা গৌরাঙ্গ নিরূপিতমতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন।

৩য়,—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকেই উপাস্য জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।

৪র্থ,—যাঁহারা নামে বৈষ্ণব হইলেও আচার ব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথাবলম্বী।

এতন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণবের সংখ্যা নদীয়ায় নগণ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের সংখ্যা প্রায় সমপরিমাণ এবং চতুর্থ শ্রেণীর সংখ্যা অত্যাধিক। প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধে ব্যক্তব্য কিছুই নাই; তাঁহারা চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম্ম যথাযথ আচরণ করিয়া থাকেন। এই দুয়ের যাজন যাজন, আচার, ব্যবহার, প্রায় সমস্তই একরূপ; কেবল প্রভেদ এই কেহ শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন, কেহ বা

শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে উপাসনা করেন। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণের ভরভিত্তি "প্রেম"। শ্রীমন মহাপ্রভু আত্ম চরিত্রে আচরণ করিয়া এই ধর্ম্ম লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কোনও পুস্তকাদি লিখিয়া এই ধর্ম্মের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই; তবে, সময়ে সময়ে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে সকল অমৃতময়ি উপদেশমালা বহির্গত হইত তাহাই পার্ষদ ভক্ত বৈষ্ণবগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেইগুলি হইতে এই ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ ও অভিপ্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গুলির মধ্যে আবার যে আটটী শ্লোক বৈষ্ণব জগতে শিক্ষাষ্টক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই অষ্ট শ্লোকই এই ধর্ম্মাবলম্বীগণের যথাসর্ব্বস্ব। তিনি এতদ্দ্বারা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের লক্ষণ ও কর্ত্তব্যাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে যে সকল গ্রন্থ বা মত গ্রাহ্য শ্রীচৈতন্য-দেবও সেই সকল গ্রন্থ ও মতানুবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি উপনিষদ শ্রুতি ও আর্য্যঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদয়ের গৌনার্থ ত্যাগ করিয়া মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই ত প্রমাণ॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য সেই কয়।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য নাহি হয়॥"

এইরূপে শাস্ত্র সমুদয়ের ভক্ত্যাত্মক মুখ্যার্থ করায় কোনও কোনও স্থলে তাঁহার মত কিছু নুতন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যাহা দেখিতেন, যাহা করিতেন, যাহা বলিতেন সমস্তই ভক্তির দিক হইতে, সুতরাং তাঁহার মত কেবলি ভক্তি মাখা, অন্যথা তিনি স্বয়ং কোনও নূতন মত উদ্ভাবন করিয়া যান নাই। ইনি প্রমাণ স্বরূপ সর্ব্বদাই শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, অষ্টাদশপুরাণ, ব্রহ্ম সংহিতা প্রভৃতির আবৃত্তি করিতেন। এতদ্ব্যতীত উপানিষদ, শ্রুতি প্রভৃতিরও যথেষ্ট আদর করিতেন। তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান ও সাকার বলিয়া জানিতেন এবং নন্দদুলাল, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং পূর্ণভগবান বলিয়া স্বীকার করিতেন। এই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাকেই তিনি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ করিতেন এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তনকেই কলির জীবের একমাত্র গতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

রামানন্দ রায় যে প্রণালীক্রমে অধিকারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই শ্রীচৈতন্যের অনুমোদিত। জ্ঞানশূন্য ভক্তি প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, কান্তভাব, এই কয়টী সাধনার ক্রমোন্নত উপায়, আবার শ্রীরাধিকার যে প্রেম অর্থাৎ মহাভাব সমাধি তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সখীভাবে আপনাকে তদ্বৎজ্ঞানে যে উপাসনা ও সেবা তাহাই তৎপ্রাপ্তি পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়। পরচর্চ্চা, পরহিংসা, পরস্ত্রী সম্ভাষণ প্রভৃতি একান্ত পরিত্যাজ্য। এ সকল অপরাধে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রের নিকট কাহারও মার্জ্জনা ছিল না; অন্যের কথা কি একদিন তাঁহার প্রিয় পার্ষদ ছোট হরিদাস, শিখিমাইতির বৃদ্ধা ভগ্নী মাধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে প্রভু তাঁহার দ্বারবন্ধ করিয়াছিলেন। হরিদাস নবদ্বীপবাসী, বাল্যকাল হইতে প্রভুর অনুগত, এবং তিনি সুকণ্ঠবিধায় প্রভু তাঁহাকে আপনার কীর্ত্তনীয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ, বর্ত্তমান কালে প্রচলিত "খোল" বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার করায় তিনি বৈষ্ণব জগতে বিশেষ মান্যবান হইয়াছিলেন; কিন্তু, শ্রীপ্রভু, হরিদাসের সকল গুণ ভুলিয়া—

"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥"

এই বলিয়া তাঁহাকে দণ্ড করিলেন। হরিদাসও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রয়াগের ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রীপ্রভু মর্কট বৈরাগ্যের পরম বিদ্বেষী ছিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভু নিরূক্ত এই সমস্ত পন্থারই অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন।

চৈতন্য সম্প্রদায়।

এই তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল উপদেষ্টা নহেন পরন্তু উপাস্য দেবতা। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা বর্ত্তমান কালে অত্যাধিক না হইলেও ইঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের মতে শ্রীচৈতন্যদেবই দ্বাপরের অভেদ শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং পূর্ণাবতার। যিনি কৃষ্ণ অবতারে বলরাম তিনিই চৈতন্য অবতারে নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত সাক্ষাৎ সদাশিব। তাঁহারা এইরূপে শ্রীচৈতন্য দেবের অন্যান্য পার্ষদগণেরও

পূর্ব্বজন্মের অর্থাৎ দ্বাপরাদি লীলাকালীন কে কি ছিলেন তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।

কাচড়াপাড়া নিবাসী কবিকর্ণপুর পরমানন্দ দাস তাঁহার বিরচিত "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় মথুরা ও গৌড়বাসী ভক্তগণের পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্ববিবরণ নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ মহত্তম, নীলাচল বাসীরা মহত্তর এবং দাক্ষিণাত্যবাসী চৈতন্য কৃপাপ্রাপ্ত জনগণ মহান্ত (সংখ্যায় চৌষট্টি) এবং শ্রীচৈতন্য, মহাপ্রভু; অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই দুই প্রভু, নিত্যানন্দের মর্ম্মী সঙ্গীগণ (সংখ্যায় দ্বাদশ)—গোপাল এবং তাঁহাদের সম্পর্কে যাঁহারা এই সম্প্রদায় ভুক্ত তাঁহারা উপগোপাল (সংখ্যায় দ্বাদশ)। এখন যেমন গোস্বামী বংশে জন্ম লইলেই তিনি গোস্বামী হইতে পারেন, তখন সেরূপ ছিল না। "গো" অর্থে ইন্দ্রিয়গণের যিনি স্বামী অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী তিনিই তখন গোস্বামীপদ বাচ্য হইতে পারিতেন, সেই তদানীন্তন অসংখ্য ভক্তিমান বৈষ্ণবের মধ্যেও তখন মাত্র ছয়টী গোস্বামী ছিলেন যথা, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথদাস।

এই সম্প্রদায়ীগণের মতে দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণই ভগবানের কূটস্থ রূপ। পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকা লীলাচ্ছলে অনুপম সুখসম্ভোগ করিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অতুল মাধুর্য্য রসানুভব করিয়া শ্রীরাধিকা যে সুখ ভোগ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ সে রসাস্বাদে বঞ্চিত হইতেন; তাই তিনি আপনার মাধুর্য্য আপনি অনুভব করিতে একদেহে রাধাকৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েন। * ইহা ব্যতীত প্রেমভক্তি বিকাশ ও হরিনাম প্রচারও অন্যতম উদ্দেশ্য। কলিকালে শ্রীভগবান শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিবেন এই মতের পোষকে তাঁহারা অসংখ্য শাস্ত্র হইতে অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের মত পুষ্ট করিয়া থাকেন। সে সকল অখণ্ডনীয় যুক্তির সম্মুখে বৃথা বাক্‌জাল ছিন্ন হইয়া যায়।

ভক্তি ও প্রেম এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বস্ব। তাঁহাদের মতে জীবমাত্রে ঐ প্রেম

---

* শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

ভক্তির অনুষ্ঠানের অধিকারী। এই সম্প্রদায় প্রেমের অন্তর্গত শান্ত, দাস্য, সখ্য, মাধুর্য্য ও বাৎসল্য এই পাঁচ প্রকার ভাব স্বীকার করেন। নামসংকীর্ত্তন এই সম্প্রদায়ে প্রধান সাধন, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামনায় উপবাস, নৃত্য গীত ও রিপু-সংযমাদি চৌষট্টি প্রকার সাধনেরও ব্যবস্থা আছে। তবে সকল সাধনাতেই ইঁহারা গুরুর প্রয়োজন স্বীকার করেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় ইঁহাদের নিকটেও গুরুর স্থান অতি উচ্চে।

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি ও পূর্ব্বোক্ত ছয় গোস্বামীর পুত্র কলত্রাদি ইহাদের গুরু স্থানীয় এবং সকলেই ইহাদেরই কাহার না কাহারও পরিবার। তাঁহারা গৃহী বৈষ্ণবগণকে মন্ত্রদান করিয়া থাকেন কখনও বা শিষ্যদের কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন, আবার কখনও বা চৈতন্য মন্ত্রও দান করিয়া থাকেন। এই সকল বৈষ্ণবগণ গৃহে থাকিয়া গৃহী শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত পন্থানুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আবার যাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বনে জাতি, কুল, মান, পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্মাবলম্বন করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে "ভেক" লইতে হয়। এক্ষেত্রে গোস্বামীগণ শিষ্যকে মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া ডোরকৌপিন বহির্ব্বাস, তিলকমুদ্রা, করঙ্গ বা ঘটী এবং জপমালা ও ত্রিকণ্ঠি গলমালা অর্পণ করিয়া মন্ত্রাদেশ করেন। এক্ষণে তাঁহারা ঐ কার্য্যভার বৈষ্ণবদিগের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পঞ্চতত্ত্বের * ভোগ, ও বৈষ্ণবগণকে মহোৎসব করিয়া ভোজন করাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন নিত্যানন্দ প্রভু এই ভেকাশ্রমের সৃষ্টি করেন।

বর্ত্তমান কাল প্রচলিত রীতি অনুসারে এই ভেকাশ্রমী বৈষ্ণবগণও বিবাহে অধিকারী। এ বিবাহে ছড়িদার বর কন্যার উভয়ের কণ্ঠিবদল করাইয়া দেন এবং স্বয়ং কিঞ্চিৎ দক্ষিণা ও গোস্বামীর নিমিত্ত ন্যূনসংখ্যা পাঁচসিকা গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রেও চৈতন্য প্রভৃতির ভোগ ও মহোৎসব হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ী বৈরাগীদের মধ্যে বিধবা বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে, তবে দ্বিতীয়বার বিবাহের পর স্ত্রীর সীমন্তে সিন্দূর দেওয়ার নিয়ম নাই। গৃহী বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই। এই সকল ভেকধারী বৈষ্ণবগণের মধ্যেই ব্যভিচার, কদাচার প্রভৃতি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে ইহাদের অনেককে বৈষ্ণব বলিতেই কুণ্ঠা জন্মে।

* ১। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ২। শ্রীনিত্যানন্দ, ৩। শ্রীঅদ্বৈত, ৪। শ্রীগদাধর, ৫। শ্রীশ্রীবাস

যাঁহারা চৈতন্যদেবকে উপাস্যরূপে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্যান্য দেবতার ন্যায় শ্রীনিমাইয়েরও ধ্যান, মন্ত্র, পূজাপ্রণালী ও স্তবাদি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

এই সকল সম্প্রদায় ব্যতিত নেড়ানেড়ী, বাউল প্রভৃতি কতিপয় কদাচারী বৈষ্ণব, সম্প্রদায় এতদঞ্চলে দেখা যায়। তাহাদের আচার ব্যবহার, কর্ম্মকাণ্ড বৈষ্ণবগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং মুখে "জয়চাঁদ গৌর, জয়চাঁদ নিত্যানন্দ বা বীর অবধূত" বলিলেও কখনও কার্য্যে তাঁহাদের উপদেশ মানিয়া চলিতে দেখা যায় না; পরন্তু, তাহার ব্যভিচার পদে পদে দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয় চর্চ্চার স্রোত অতি প্রবল এবং সেই কুহকে মজিয়া বহু ইতর জাতিয়লোক এই সকল সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া পড়ে।

হায়! প্রেম ভক্তিমাখা সুনির্ম্মল, জগন্মঙ্গল ধর্ম্মের সেই উচ্চতম আদর্শ হইতে কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন হইয়াছে। ইহা হইতেই দেশের লোকের প্রকৃতি অনেকটা অনুমিত হয়। কি পরিতাপের বিষয়! কিছুদিন পূর্ব্বে বৈষ্ণব বলিলে যে আচারবান ধীর প্রেমিক ভক্তের উজ্জ্বল ছবি মনস নয়নে উদ্ভাষিত হইত এক্ষণে ঠিক তদ্বিপরীত। বৈষ্ণব এখন একটা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। লম্পট, ব্যভিচারী, মর্ক্কট বৈরাগ্যধারী নরনারী এখন অনায়াসে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেছে। হায়! মহাপ্রভু! তোমার স্বহস্ত প্রোথিত মহাদ্রুমের এ অকাল নাশ কেন ঘটাইলে প্রভু? দিলে ত আবার কাড়িয়া লইলে কেন? জানি, আমরা এতই কলুষিত যে তোমার বিমল দয়ার আশা করাও আমাদের ধৃষ্টতা; কিন্তু হে দয়িত, হে প্রিয়তম, হে ভুবনৈকনাথ, তোমারই চন্দ্র সূর্য্য কি পাপী ও পুণ্যাত্মাকে সমভাবে কিরণ দেন না? তুমি ত পতিতেরই নাথ, পুণ্যাত্মা ত নিজের পুণ্যে তোমাকে লাভ করে; কিন্তু তুমি ত পাপীতাপীর অনন্যশরণ, তবে নাথ! ইচ্ছাময় তুমি তোমার ইচ্ছা আমরা কি বুঝিব। ঐ দেখ নাথ! তোমার অকলঙ্ক ধর্ম্মে কেমন কলঙ্কমসী মাখাইতে বসিয়াছি। শিশ্নোদর পরায়ণ ধর্ম্মধ্বজী এক একজন ব্যভিচারীণী দুই দশটী রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছি। এস নাথ! আর একবার এস—তোমার পবিত্র পদস্পর্শে এই কলুষিত ধরা আবার পবিত্র হউক।

কর্ত্তাভজা।

নদীয়া হইতে যে সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তন্মধ্যে কর্ত্তাভজার দল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরই উল্লেখযোগ্য; কারণ, যত সংখ্যক নরনারী এই দলভুক্ত তত লোক এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় না। তবে এ দলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সংখ্যাধিক্য। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা তিন গুণ অধিক এবং সেই কারণই বোধ হয় ইহাদের মধ্যে ব্যভিচারের স্রোত এত প্রবল। এক দিন যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল "মেয়ে হিজরে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা," এখন সেই উচ্চ আদর্শ কিরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও পরস্ত্রীগমন বা তৎচিন্তা পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের সম্পূর্ণ বিধি বিরুদ্ধ তত্রাপি বহু সংখ্যক নরনারী সর্ব্বদা একত্র সহবাস করায় এক্ষণে নরসেবা ও নারী সেবাই এ ধর্ম্মের সর্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও বর্ত্তমানকালে এই সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণের মধ্যে এরূপ অধঃপতন দৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু এই মত প্রবর্ত্তনকালে ইহার প্রবর্ত্তক আউলচাঁদের আদেশ অতি জ্ঞানগর্ভ ও সদুপদেশ পূর্ণ। তাঁহার আদেশ এই পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যাপহরণ, এবং প্রাণীহত্যা সাধন এই ত্রিবিধ কায়িক কর্ম্ম ও ঐ ত্রিবিধ কায়িক কর্ম্মসাধনের ইচ্ছা, মিথ্যাকথন, কটু ভাষণ, বৃথা-ভাষ ও প্রলাপভাষ এই চারিপ্রকার বাককর্ম্ম, সর্ব্ব সমেত এই দশবিধ কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এই সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্রের মূল সূত্র "গুরুসত্য"। কেহ উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে চাহিলে প্রথমতঃ সে ঐ মূলমন্ত্র প্রাপ্ত হয় পরে ইহার প্রতি তাহার বিশ্বাস স্থিরতর হইলে তখন সে "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই, গুরুসত্য বিপদ মিথ্যা।" * ইত্যাকার মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। এই সম্পূর্ণ মন্ত্রের নাম ষোলআনা। যাঁহারা মন্ত্র দেন তাঁহাদের আখ্যা "মহাশয়," এবং শিষ্যের আখ্যা

* এই মন্ত্রের পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। যথা—কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার তুমি আমার তোমার সুখে চলি ফিরি তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি দোহাই মহাপ্রভু।"
Mr. Ward, Asiatic Research এর vol. II এ এই মন্ত্রটির এইরূপ ইংরাজি অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন:—"Oh sinless Lord! Oh great Lord, at thy pleasure I go and return, not a moment am I without Thee, I am even with Thee, save Oh great Lord!

"বরাতি," সাম্প্রাদায়িক ব্যক্তি মাত্রের নাম "ভগবজ্জন" এবং সম্প্রদায় বহির্ভূত লোক মাত্রকেই তাঁহারা ঐহিক লোক বলেন। এই সম্প্রদায়ের কাঁচা অবস্থার নাম প্রবর্ত্তক তার পর সাধক, তার পর সিদ্ধ, সর্ব্বশেষ সিদ্ধের সিদ্ধ। এই সম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে সাধারণতঃ কতকগুলি সাঙ্কেতিক বাক্য আছে, যাহাদ্বারা তাঁহারা তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। ইহাঁরা মৃত্যুকে "দেহরক্ষা" বলেন এবং আপনার বাটীকে "বাসা" বলেন অর্থাৎ ঘোষপাড়া সকলের একমাত্র প্রকৃত বাটী এবং তদ্ব্যতিত অন্য আশ্রয় কেবল বাসা মাত্র। ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবে জাতি:ভেদ প্রথার আঁটাআঁটি কিছুমাত্র নাই এবং ইহাদের পরস্পরের অন্নবিচারও কিছুমাত্র নাই তবে বাহিরে সমাজের নিকট ইহাদিগকে সাধারণ হিন্দুর ন্যায় বর্ণাচার ও কুলাচার মানিয়া চলিতে দেখা যায়। যিনি যে বর্ণে জন্মলাভ করিয়াছেন তিনি সেই বর্ণের সমস্ত ব্যবহারই মানিয়া চলেন এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাবুরা যাঁহারা এই ধর্ম্মের ধুরন্ধর, তাঁহাদেরই সাধারণ সদ্গোপের ন্যায় সমস্ত হিন্দু আচার মানিয়া চলিতে হয় এবং বিবাহাদি সমস্ত কার্য্যই সাধারণ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী স্ববর্ণে হইয়া থাকে, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের এই প্রকার আটপৌরে ও পোষাকীভাবদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ব্যবহার ও পরমার্থ দুইই সত্য, সুতরাং দুইই সমভাবে পালনীয়; ইহার পোষকে ইহাদের মধ্যে একটী বচনও দেখা যায়। "লোকের মধ্যে লোকাচার সদ্গুরুর মধ্যে একাকার" এই ধর্ম্ম সাধারণতঃ সমাজের হীন জাতির ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আচরিত হইলেও স্থানে স্থানে দুদশজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও এই মতানুবর্ত্তী দেখা যায়। *

* Few respectable Hindoos have joined the Karthabhajas, yet they are spreading, but chiefly among the lower orders, one of their pretences is to substitute an actual vision of the Goddess of every individual instead of a material image, each one is allowed to retain the duty he has been most accustomed to honour ; a secret and darkned apartment is chosen and the initiated are made to see their own God, ie. they are turned first to a strong light and then to a darkness, where fancy conjures up the image. Their chief principle is "that by devotion, God will give them eyes and then of Him, and through that sight Salvation." * * *

* * * * *

Ishar Chandra Pal "the present head of the sect, lives in the style of

এই দলের উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদঞ্চলে বহুবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। উহাদের মধ্যে কোন আখ্যানটী প্রকৃত, কোনটী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এ সকল অবধারণ করা অতীব দুরূহ; সুতরাং, যে মতটী বহুজন মান্য তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে।

এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ আউল চাঁদ। তাঁহার সম্প্রদায়ী লোকেরা তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব, টোটা গোপীনাথের অঙ্গে অপ্রকট হইয়া অলক্ষে সন্ন্যাসীর বেশে আলোরপুর পরগণার খোলাভুবলী উৎপলি গ্রামে বহুকাল যাপন করিয়া পরিশেষে ১৬১৬ শকের ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবারে নদীয়াস্থ উলাগ্রামে মহাদেব বারুই-য়ের পানের বরোজে এক অষ্টমবর্ষীয় বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি মায়াবশে এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকটীকে গৃহে লইয়া পালন করিতে থাকেন। তিনি ঐ বালকের নামকরণ করেন পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র প্রায় ২২ বৎসর কাল ঐ মহাদেবের গৃহে থাকিয়া পরে ছলক্রমে তথা হইতে যাইয়া এক গন্ধবণিকের গৃহে দুই বৎসর বাস করেন, পরে সেখান হইতে এক জমিদারের গৃহে কিছুকাল থাকিয়া পরিশেষে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও অন্যান্য বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে "বেজরা" গ্রামে উপনীত হয়েন। এই গ্রামে থাকিয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথম জাহির হয়েন এবং হটুঘোষ তাঁহার সর্ব্বপ্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, পরে একে একে আরও ২১ জন ব্যক্তি সর্ব্বসমেত ২২ জন তাঁহার প্রধান শিষ্য ও অনুচর হইয়া উঠেন। * এই ২২ জন শিষ্য সম্বন্ধে এই

Rajah, his grandfather was a Guala or Keeper of cows. Drs. Marshman and Carry visited Ramdulal his father in 1802, they found a Ratha near his house which was handsome, stately, exceeding that of many Rajahs" he was "no less plump than Bacchus and about 20 years of age," he argued with them, defending the doctrine of panthism. Some of their secret rites are of the most disgustingly licentious description. Vide Foot note page 407. Cal. Review Vol. VI. 1846.

১। হটু ঘোষ ২। লক্ষ্মীকান্ত, ৩। নয়ন, ৪। বেচুঘোষ, ৫। নিত্যানন্দ দাস, ৬। কৃষ্ণদাস, ৭। নিধিরাম দাস, ৮। শিশুরাম, ৯। হরিঘোষ, ১০। মেলারাম দাস, ১১। শ্যাম কাঁসারি, ১২। শঙ্কর, ১৩। কানাই ঘোষ, ১৪। রামশরণ পাল ১৫। আনন্দ পাল, ১৬। নিতাই ঘোষ, ১৭। মনোহর দাস, ১৮। ভীম রাজপুত, ১৯। কিনু, ২০। বিষ্ণুদাস, ২১। গোবিন্দ, ২২। পাঁচুরুইদাস

সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ বচন প্রচলিত আছে, যথা "আউলে চাঁদ দোয়া গরু, সঙ্গে বাইশ থাকির বাছুর তার" আবার :—

"এ ভবের মানুষ কোথা হ'তে এল।
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল॥
এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একটী মন, জয় কর্ত্তা বলে,
বাহুতুলে কল্লে প্রেমে ঢলাঢল।
এ যে হারা দেওয়ায় মরা বাঁচায়
এর হুকুমে গঙ্গা শুকাল॥

এই সময়ে যেমন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল তেমনি আউলেচাঁদের অদ্ভুত খ্যাতিও বিস্তার হইতে লাগিল এবং তাঁহার ভক্তগণও তাঁহাকে নানারূপে সম্বোধন করিয়া তাঁহার নামের অভিধান বাড়াইতে লাগিলেন। আউলচাঁদের অসংখ্য নামের মধ্যে এই কয়টী প্রধান, যথা, আউলে মহাপ্রভু, ঠাকুর, প্রভু, আউলে ব্রহ্মচারী, কাঙ্গালী প্রভু, গোঁসাই ও কর্ত্তা। এতন্মধ্যে আবার কর্ত্তা নামটাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। "কর্ত্তা" অর্থে ঈশ্বর, যিনি এই জগতের স্রষ্টা, পোষ্টা ও হর্ত্তা সুতরাং কর্ত্তা এবং তাঁহাকে যাহারা ভজনা করে তাহারা কর্ত্তাভজা। এইরূপে বহুদিন বহুলোকের ভক্তিশ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়া এবং চাকদহের নিকটবর্ত্তী "পরারী" নামক স্থানে বহুদিন বাস করিয়া ১৬৯১ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁহার দেহ রক্ষার পর তাঁহার অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে রামশরণ পাল, হটুঘোষ, হরিঘোষ, শ্যামবৈরাগী, কানাইঘোষ, সহস্ররাম ঘোষ, ভীম রজপুত, এবং বেচুঘোষ প্রভৃতি ৮ জন প্রধান শিষ্য বোয়ালে গ্রামে তাঁহার কন্থার সমাধি দেন পরে চাকদহের তিনক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী পরারী গ্রামে তাঁহার দেহের সমাধি করেন।

আউলচাঁদের ২২ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে এক রামশরণ পাল ব্যতিরেকে অন্য কোনও শিষ্যের নাম বা খ্যাতি তত অধিক নাই। ইহাদের মধ্যে ২।১ জন শিষ্যের বংশ নদীয়ার এখানে ওখানে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় তবে এক রামশরণ পালের বংশীয়েরাই সাধারণতঃ কর্ত্তাভজা বলিয়া খ্যাত।

এই রামশরণ পাল চাকদহের নিকটবর্ত্তী জগদীশপুরগ্রামে সদ্গোপ বংশীয় এক গৃহস্থ ছিলেন। ইহার পিতার নাম নন্দরাম পাল এই নন্দরামের এক ভ্রাতা

ছিলেন তাঁহার নাম সভারাম। উঁহারা একান্নবর্ত্তী ছিলেন। সভারামের বংশাবলী অদ্যাপি জগদীশপুরে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত এই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের কোনরূপ সংস্রব নাই। রামশরণের অল্প বয়সে জগপুর গ্রামের শিশুঘোষের কন্যা গৌরীর সহিত বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে রামশরণের দুইটী কন্যা সন্তান হয় কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কন্যা দুইটীর সহিত তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি গোবিন্দপুরবাসী গোবিন্দ ঘোষের সরস্বতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সরস্বতীই দেহান্তে "সতীমা, শচীমা" বা "কর্ত্তামা" নামে খ্যাতাপন্ন হইয়া উঠেন।

রামশরণের বংশ পরিচয় ও আউলচাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে যে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এতদূর পর্য্যন্ত সকল গুলিতেই একরূপ বর্ণিত হয় কিন্তু ইহার পরে আউলচাঁদের সহিত রামশরণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় বিবরণী গুলি বিভিন্ন মতানুযায়ী। কেহ কেহ বলেন, রামশরণ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের পর বিষয় কার্য্যের অনুসন্ধানে নদীয়া জেলার মুরতীপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন পরে তথাকার জমীদার বেনা-পুরের খাঁ রাজাদিগের বংশোদ্ভব রায়রায়ান দেওয়ান পদ্মলোচন বাহাদুরের জমিদারীতে নায়েবের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন এবং এইখানেই তাঁহার সহিত আউলচাঁদের সাক্ষাৎ হয়। আউলচাঁদ স্বভাব বিনীত রামশরণের আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কমণ্ডলু-স্থিত জলে মৃত্যুশয্যাশায়িনী রামশরণের স্ত্রীকে ব্যাধি মুক্ত করিলে, রামশরণ তাঁহার চরণে শরণ লয়েন। আবার কেহ বলেন ছেয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় রামশরণ পাল সুখসাগরের বাজারে চাউল খরিদ করিতে যাইয়া সেখানে আউলচাঁদের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং পরে তিনি তাঁহাকে আপন বাটীতে আনয়ন করেন। আবার কেহ বলেন, একদিন কৃষী রামশরণ গোচারণে যাইলে একজন তেজস্বী সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট দুগ্ধ যাচঞা করেন। রামশরণ ভক্তি গদ গদ চিত্তে এই সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা পূর্ব্বক দুগ্ধপান করিতে দেন। সন্ন্যাসী যখন দুগ্ধপান পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এমন সময় একজন ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া রামশরণকে তাঁহার পীড়িতা স্ত্রীর মুমূর্ষ সংবাদ জ্ঞাপন করে। দয়াবান সন্ন্যাসী রামশরণের পরিচর্য্যায় পূর্ব্বেই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহার এই শোকসংবাদে দুঃখিত হইয়া তাহার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং, রামশরণকে নিকটস্থ পুষ্করণী হইতে ত্বরায় একলোটা জল আনয়ন করিতে বলেন। রামশরণ জল আনিলে সন্ন্যাসী ঐ

জল মন্ত্রপূত করিয়া মুমূর্ষার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে অনুজ্ঞা করেন। রামশরণের মনের আবেগে ও অতীব উৎকণ্ঠায় তাহার হস্ত হইতে ঐ পাত্র স্খলিত হইয়া এক দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলে পতিত হয়। সন্ন্যাসী তদ্দর্শনে কর্দ্দম হস্তে যাইয়া রোগীণীর সর্ব্বাঙ্গে উহাই মাখাইয়া দেন; তাহাতেই রামশরণের স্ত্রী একেবারে নিরাময় হইয়া উঠেন। রামশরণ সন্ন্যাসীর ঐরূপ অলৌকিক, অমানুষী ক্ষমতা দৃষ্টে তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন এবং পরে ঐ মহাপুরুষের কৃপায় স্বয়ং ঐরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের সৃজন করেন এই সময় হইতেই নদীয়ার ঘুরতীপুর গ্রামের ঘোষপল্লী বা ঘোষপাড়া বঙ্গের মধ্যে সুবিখ্যাত হইয়া উঠে।

এই সময়ে রামশরণের সরস্বতী গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে, ঐ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং রামশরণের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ পুত্রের নাম রামদুলাল। রামদুলালের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিল। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত, পারস্য প্রভৃতি নানা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বুদ্ধিও অতি প্রখর ছিল, তিনি সাম্প্রদায়িক সামান্য ব্যক্তিগণের বোধসুগমার্থে সরল বাঙ্গলায় বহুশত গীত ও শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গীতের ভাব ও ভাষা আপাতঃ দৃষ্টে সরল বোধ হইলেও বহু গীতের অনেকাংশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। ঐ গীত গুলি হইতে সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে জানা যায়। ইহাদের মধ্যে কোন কোনও গীত হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী, আবার, কতকগুলি মুসলমানদিগের সুফী সম্প্রদায় সিদ্ধ। ঐ অসংখ্য গীতের মধ্যে অধিকাংশই এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ রচিত গীতাবলী সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে।

রামদুলালের চারি পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে ৫টী পুত্র সন্তান হয়। ১মা স্ত্রীর গর্ভে কুঞ্জবিহারি, ইনি নিঃসন্তান। মধ্যমার গর্ভে রাধামোহন ও মথুরামোহন এই দুই ভ্রাতাও নিঃসন্তান। তৃতীয়ার গর্ভে ঈশ্বরচন্দ্র পাল এবং ৪র্থার গর্ভে ইন্দ্রচন্দ্র পাল জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রামদুলাল বর্ত্তমানেই প্রথম ও দ্বিতীয়ের ৺প্রাপ্তি হয়। রামদুলাল ৪৮ বৎসর বয়ক্রমে বাঙ্গালা ১২৩১ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণীর দিবস শরীর রক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সরস্বতী ঠাকুরাণী জীবিত থাকায় তিনিই সাম্প্রদায়িক “কর্ত্তামা” বা

"শচীমা" (সতীমা) নামে আখ্যাত হইয়া সম্প্রদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকেন। তিনি স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার সময়ে সাম্প্রদায়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পরে ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাহায় দেবী পক্ষে প্রতিপদের দিন তাঁহার ৺প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার চতুর্থ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল গদীর মালিক হইয়া সম্প্রদায়ের কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাহার ফলে এমন কি তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য ইংরাজের কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হয়; কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহার সম্প্রদায়ী লোকের চক্ষে কিছুমাত্র হীন হইতে হয় নাই। তাহারা ইহাকে কর্ত্তার লীলারূপে গ্রহণ করিয়া সেই জেলখানাতেই দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্নাদি প্রভৃতি ভারে ভারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই কর্ত্তার অনুকরণে নানাবিধ দোষ সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয় এবং কর্ত্তাভজা দলের নৈতিক অধোগতি আরম্ভ হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের ভ্রাতা ইন্দ্রচন্দ্র তাঁহারাই সংসার ভুক্ত ছিলেন কিন্তু ইন্দ্রচন্দ্রের দ্বারা এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন কার্য্যই হইত না তবে তাঁহাকে সমচক্ষেই দেখিত। ঈশ্বর চন্দ্রের দুই পুত্র। ধরণীধর পাল ও বীরচাঁদ পাল। ইন্দ্রচন্দ্রের তিন পুত্র। পূর্ণচন্দ্র, রসিকলাল ও সত্যচরণ। ইন্দ্র পাল লোকান্তরিত হইলে ঈশ্বর চন্দ্রের অসম্মতিতে রসিক ও সত্যচরণ পৃথক গদী স্থাপনা করেন। যাত্রীগণের মধ্যে কেহ ঈশ্বর পালের গদীতে, কেহবা নূতন গদীতে খাজনা করিত। ঈশ্বর পালের জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধরণী, তাঁহার বর্ত্তমান হরিদাস পাল নামক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্র বীরচাঁদ বিকৃত মস্তিষ্ক বিধায় স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র, দুই পৌত্রকে লইয়াই গদীতে বসিতেন। তাঁহার লোকান্তরে এই দুই পৌত্রই গদীর অধিকারী হয়েন। এক্ষণে উপস্থিত বীর চাঁদের পুত্র শৈলেশ্বর পালের মৃত্যুর পর হইতে একা হরিদাসই গদীতে বসিয়া থাকেন।

রসিকলাল পাল তাঁহার একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্র নাথকে রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে সত্যচরণ তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের সহিত একযোগে গদীতে বসিতেন কয়েকবৎসর হইতে সত্যচরণ তাহার পুত্র শ্রীগোপালকৃষ্ণ ও ভ্রাতষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে সাবেক গদী দিয়া স্বয়ং স্বাধীনভাবে আর একটী গদী স্থাপনা করিয়াছেন। হায়! কালের ক্রীড়ায় গদীর সংখ্যা এবং সাম্প্রদায়িক লোকের সংখ্যা এবং

অন্যান্য বাহ্যিক বহুবিষয়ের উন্নতি হইলেও সেই পূর্ব্বের সাত্ত্বিক ভাব, সেই ভক্তি ও প্রেম, সেই সত্যনিষ্ঠা ও সেই শ্রী ও সৌষ্ঠব এবং প্রতি শুক্রবারের সেই পবিত্র মজলিষ আর নাই—আছে কেবল অর্থের জন্য বাহ্যাড়ম্বর—ধর্ম্মের কুহক, রোগমুক্ত করিবার ক্ষমতার বৃথা ভান; আর আছে সেই নির্জ্জীব সমাজ ঘর—যেখানে সতীমা সমাহিত এবং প্রাণহীন ঠাকুর ঘর—যথায়, রামশরণের খড়ম, আউলিয়া চাঁদের আশাবাড়ী ও কন্থা এবং রামদুলালের কয়েকখানি পবিত্র অস্থি বিদ্যমান এবং শ্রীযুক্তের স্থান। ভক্ত, আজিও ঐ ছিন্নকন্থা ও প্রাণহীন ঠাকুর বাড়ীতে কতই আনন্দে তাহার অভীষ্ট দেবকে প্রত্যক্ষ করে কিন্তু কালবশে সেরূপ ভক্ত আর কয়জন দৃষ্ট হয়!

ঘোষ পাড়ায় এক্ষণে নিম্ন লিখিত কয়টী কার্য্য বিশেষ সমৃদ্ধি সহকারে সমাহিত হইয়া থাকে—

১। দোলযাত্রা—প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হইয়া থাকে। ঐ দিনে এখানে রাসযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দোল মঞ্চটীতে ও রাসের কাঠরায় যদিও রাধাবল্লভ জীউর * মূর্ত্তি স্থাপিত হয় এবং সেই সঙ্গে রামশরণ পালের ব্যবহার্য্য বালিশ ও খড়মও উঠান হয়। এই পর্ব্বই এখানে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এই সময়েই এখানে বহু ব্যক্তি সমাগম হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে পালবাবুদের যত অর্থাগম হইয়া থাকে সম্বৎসরের মধ্যে আর কোনও পর্ব্বে এত হয় না।

২। রথযাত্রা—উহা প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় হইয়া থাকে। রথের উপরেও উক্ত বালিসটী স্থান পাইয়া থাকে।

৩। রামশরণ পালের মহোৎসব—উহা আষাঢ় মাসের রথযাত্রার পর চতুর্থী তিথিতে সমাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে গৌড় বৈষ্ণবগণের প্রথানুযায়ী অধিবাস মহোৎসব ও পূর্ণ মহোৎসব এই তিন প্রকার মহোৎসব তিন দিন হইয়া থাকে; ইহাতেও বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে।

৪। শচীমার মহোৎসব—ইহা প্রতিবৎসর মহালয়ার পরদিন প্রতিপদে সমাহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহোৎসবাদি হইয়া থাকে।

৫। কোজাগর লক্ষ্মী পূজা—এ দিনেও ঘোষপাড়ায় বহুজন সমাগম হইয়া থাকে।

---

* এই বিগ্রহ পাল বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নহে। সোণাখালি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর ইহাকে আনা হইয়া থাকে।

৬। রামদুলাল পালের মহোৎসব—উঁহার নাম কেহ ধরিত না বলিয়া সকলে তাঁহাকে শ্রীযুৎ বলিয়া ডাকিত; একারণে ইঁহার মহোৎসবের নামও "শ্রীযুতের মহোৎসব," ইহা প্রতিবৎসর চৈত্র মাহার বারুণী তিথিতে সমাহিত হয়।

এই সকল পর্ব্বাদিতে পালবাবুদের ত্রিবিধ প্রকারে আয় হইয়া থাকে, ১। খাজনা, ২। ভোগ ৩। মানসিক অর্থাৎ উহাদের মতে প্রত্যেকের দেহের মালিক কর্ত্তা, সুতরাং তোমার আত্মা যে উহাতে বাস করিতেছে,তজ্জন্য কর্ত্তাকে তোমার খাজনা দিতে হয়। শচীমা কি ঠাকুর ঘরে যাহা ভক্তি পূর্ব্বক দেও তাহা ভোগ আর রোগমুক্তি বা দায় উদ্ধারের নিমিত্ত যে মানসায় পূজা তাহাই মানসিক। এতদ্ব্যতীত অসাম্প্রদায়িক লোক যাহারা যাইয়া থাকেন তাঁহারাও দর্শনী স্বরূপ বহু অর্থ দিয়া থাকেন।

স্থূলতঃ ইহাই কর্ত্তাভজা সাম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এতদ্বতীত তাঁহাদের মধ্যে যে সকল গুহ্য সাধন প্রথাদি প্রচলিত আছে সেগুলি প্রকাশ করা সাম্প্রদায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনায় পরিত্যাক্ত হইল।

সাহেবধনী।

নদীয়া জেলার দোগাছিয়া গ্রামের দুঃখীরাম পাল ও বাগাড়ে নিবাসী রঘুনাথ দাস প্রভৃতি কয়েক জন হিন্দু ও একজন মুসলমান, সাহেবধনী নামে এক উদাসীনের নিকট মন্ত্রোপদেশ পাইয়া এই ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করে। ইহা কর্ত্তা ভজারই শাখা বিশেষ। ইহাদের উপাসনার স্থানের নাম আসন। ঐ আসন একখানি চৌকি বিশেষ। প্রতি বৃহস্পতি-বারে এই আসন সন্নিধানে সকলে সমবেত হইয়া সাধনা করে। উহাদের দলে হিন্দু ও মুসলমান সকল জাতিয়েরই প্রবেশ অধিকার আছে। দুঃখীরাম পালের পুত্র চরণ পাল এ সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান, ঐ স্থানেও ঘোষপাড়ার ন্যায় বহু রোগী তাপীর, নিরাময় হইবার আশায় সমাগম হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে বহু অর্থ সংগৃহীত হয় এবং ঐ অর্থে প্রতি বৎসর চৈত্র-মাসে অগ্রদ্বীপে ইহাদের একটি মহোৎসব হইয়া থাকে। ধর্ম্মের জন্ম না হউক ব্যাধি বিদূরিত করিতে নীচ জাতীয়গণের মধ্যে এ সম্প্রদায়ের প্রসার বেশ আছে,কিন্তু ইহাদের সাম্প্রদায়িক লোক সংখ্যা দিন দিন যেরূপ হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে আর কিছু দিনে ইহাদের নিদর্শন থাকিবে কি না সন্দেহ হয়।

আউল সম্প্রদায়।

আউল সম্প্রদায় কর্ত্তাভজারই একটি শাখা মাত্র। ইহাদের অপর নাম সহজ কর্ত্তাভজা। প্রকৃতি লইয়া সাধন করা ইহাদের উপাসনার একটি অঙ্গ। এক একজন আউলের সহিত অনেকগুলি করিয়া প্রকৃতি থাকে ইহাদের কেহ বা কুলবতী কেহ কুলপাংশুলা। ইহাদের মধ্যে জাতি ভেদ প্রথা আদৌ নাই। সকল জাতির প্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গে পানভোজন করে তাহাতে জাতি বিচার করে না। ইহাদের মন নিতান্ত উদার এমন কি একজনের প্রকৃতি অন্যের নিকট যাইলেও ইহারা কখন ঈর্ষা করে না। ইহাদের মধ্যে নানা প্রকার গুহ্য সাধনা প্রচলিত আছে। সাধারণের পক্ষে সে গুলি নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ। এ সম্প্রদায়ী লোকের সংখ্যাও দিন দিন হ্রাস হইতেছে।

বাউল সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থান নদীয়া জেলা। হরিগুরু, বনচারি সেবা কমলিনী ও অখিলচাঁদ এই চারিজন ফকিরকে ইহারা আপনাদের মত প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকেন। ইহারা শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় হইতেই মত গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্প্রদায় গঠন করেন। ইহাদের মতে এই নরদেহে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই বিদ্যমান আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, গোলক, বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবন সমস্তই এই দেহ মধ্যে। এক কথায় তাঁহাদের মত "যাহা নাই ভাণ্ডে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"। এই কারণে তাঁহাদের মত দেহতত্ত্ব বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মাভাবে মানবহৃদয়ে বিদ্যমান আছেন, সুতরাং নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের তত্ত্ব পাইবার নিমিত্ত অন্যত্র গমনের প্রয়োজন নাই। স্ব স্ব দেহস্থিত এই পরম দেবতার প্রতি প্রেমানুষ্ঠানই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন। তাঁহারা বলেন যে প্রকৃতি পুরুষের পরস্পরের প্রেমেতেই ঐ প্রেম পরিপুষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং প্রকৃতি সাধনাই ইহাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। ঐ সাধন প্রকারণ অতীব গুহ্য এবং সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের জানিবার উপায় নাই, কারণ, এবিষয়ে ইহারা নিতান্ত সাবধান। ইহারা আপনাদের সাধন প্রণালী কাহাকেও প্রকাশ করে না এবং এবিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসু হইলে বলিয়া থাকেন,—

"আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা।
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান॥"

তবে এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে কাম রিপুর চরিতার্থতা সাধনপূর্ব্বক চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা এই সাধনার উদ্দেশ্য। ইহাদের মতে যখন ঐ প্রেম পরিপুষ্ট হয় তখন স্ত্রী পুরুষ উভয়ে আত্ম বিস্মৃত হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। ঐ সাধনার একাঙ্গীভূত চারি চন্দ্র ভেদ নামে একটি প্রক্রিয়া আছে। উহা প্রকাশ করা সাধারণের রুচি বিরুদ্ধ হইবে মনে করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনা করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল না।

ইহাদের অন্তরের ভাব যাহাই হউক, বাহ্যিক বেশভুষা ও আচারাদি বিশেষ লোকাচার বিরুদ্ধ নহে। ইহাদের বেশ, পরিধানে ডোর কৌপিন ও বহির্ব্বাস, গাত্রে খেল্কা পিরাণ বা আলখাল্লা, যাহা সাধারণতঃ নানারূপ বস্ত্রে প্রস্তুত। স্কন্ধে ঝুলি, হস্তে বক্র যষ্টী ও কিস্তী যাহা দরিয়ার নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের নাসাগ্রে তিলক ও গলদেশে মালা, যাহা কাঁচ, প্রবাল, পদ্মবীজ প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। ইহারা ক্ষৌর কর্ম্ম করে না; এবং কেশ ও শশ্রু ও ওষ্ঠ লোম যত্নে রক্ষা করে এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটী ঝুঁটি বাঁধিয়া রাখে। অনেকে আবার পায়ে ঝাঁঝ ও হস্তে গোপীযন্ত্র লইয়া দেহ-তত্ত্ব ও নায়িকা সাধন প্রভৃতি বিষয়ক গীত গাহিয়া বেড়ান। এই সকল গীতের ভাব ও ভাষা সাদাসিধা হইলেও বহুতর সাম্প্রদায়িক সাঙ্কেতিক কথা সন্নিবেশিত থাকায় সাধারণের পক্ষে ইহাদের যথার্থ অর্থ পরিগ্রহ করা সুকঠিন।

নায়িকা সিদ্ধি, রাগময়ীকণা, ব্রজ উপাসনাতত্ব, প্রভৃতি বঙ্গভাষায় লিখিত কয়েকখানি সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রগ্রন্থে ইহাদের সাধন প্রণালী প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচিত আছে। এতদ্ব্যতীত, কর্ত্তাভজাদের ন্যায় ইহাদেরও বহু গীত, কবিতা ও বচন প্রচলিত আছে।

সহজে সম্প্রদায়।

সহজে সম্প্রদায় বাউলেরই সম্প্রদায় ভেদ মাত্র। তবে, ইহাদের আচার

অনুষ্ঠানের সহিত বাউলদিগের আচার ব্যবহার কোনও কোনও স্থলে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারের। এই সহজে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থল নদীয়া, আজিও নবদ্বীপে সহজে পাড়া বলিয়া একটী স্বতন্ত্র পল্লী বিদ্যমান রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ যোগাবলম্বনের সহিত ইহারা প্রকৃতি সাধন করিয়া থাকে। গুরু শ্রীকৃষ্ণ বা জগৎপতি এবং শিষ্যা রাধিকা এই ভাবের তন্ময়তা আনিয়া সাধনা করাই সহজ সাধন। এক গুরুর অনেক শিষ্যা ও এক শিষ্যার অনেক গুরু হইতে পারে ; যথা—

"গুরু করব শত শত মন্ত্র করব সার
মনের অঁাধার যে ঘুচাবে দায় দিব তার।"

ইহাদের সাধনের পঞ্চ অঙ্গ যথা—নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম ও রস। ইহার মধ্যে প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়ই সর্ব্বপ্রধান।

বলরাম ভজা।

নদীয়া, পাবনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে যে একদল হীনজাতীয় লোক অধুনা আপনাদিগকে বলরাম ভজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে তাহাদেরও উৎপত্তি স্থান এই নদীয়া জেলার মেহেরপুর গ্রাম। ইহারা অধিকাংশই বৈষ্ণবদিগের ন্যায় ভিক্ষোপজীবী। ইহাদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীন উভয়বিধ লোকই দৃষ্ট হয়। উদাসীনেরা বিবাহ করে না, গৃহস্থেরা আপনাপন কুলাচারানুযায়ী বিবহাদি করিয়া থাকে তবে জাতিভেদের বাঁধাবাধি ইহাদের মধ্যেও অতি শিথীল। ইহাদের সাম্প্রদায়িক কোনও গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না এবং গুরুরও কোনও বাঁধাবাধি নাই। এই মত প্রবর্ত্তক বলরামের কতিপয় আদেশ মাত্র মান্য করিয়া ইহারা চলিয়া থাকে।

প্রবর্ত্তক বলরাম হাড়ী কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ায় এক হাড়ীর গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। বলরাম বাল্যাবধি সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে সে স্থানীয় জমিদার পদ্মলোচন মল্লিক বাবুর বাটীতে চৌকিদারি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। এই সময়ে মল্লিক বাবুদের গৃহ বিগ্রহ আনন্দবিহারী দেবের কতকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় বাবুরা বলরামকে চোর সন্দেহে কিছু শাসন করেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া মনের আবেগে বলরাম উদাসীন হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মানুযায়ী যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত

হয় এবং স্বনাম প্রসিদ্ধ উপাসক সম্প্রদায় গঠন করেন। বলরামের শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া মনে করিত এবং বলরামও তাহাদিগকে আভাষে ইহাই বুঝাইতেন। তিনি বলিতেন যে আমি আপন শরীর হইতে এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছি। লোকে আমাকে নীচ হাড়ী বলিয়া জানে, কিন্তু আমি সাধারণ হাড়ী নহি আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি তাই আমি হাড়ী। বলরাম বিশেষ বাকচতুর ছিলেন। এ সম্বন্ধে নানারূপ বচন এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। আশ্বিন মাসের অপর পক্ষে একদিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দেখিলেন যে দলে দলে ব্রাহ্মণগণ পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশে জলদান করিতেছেন। বলরামও তাঁহাদের ভঙ্গীর অনুকরণে অঞ্জলিপুরিয়া জল লইয়া নদীকুলে সেচন করিতে বসিলেন। তাঁহার এবম্বিধ কার্য্যে কৌতূহলী হইয়া একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তদ্রূপ করণের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, বলরাম উত্তর করিলেন, "যে, আমি ধান্যের ক্ষেত্রে জল দিতেছি," তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন যে "তুই কি পাগল হইয়াছিস্? এখানে ধান্যের ক্ষেত কোথা?" তখন বলরাম উত্তর করিলেন, "আপনারা যে পিতৃ-পুরুষকে জল দিতেছেন তাঁহারাই বা এখানে কোথায়? যদি নদীর জল নদীতে দিলে তাঁহাদের নিকট যাইয়া পৌঁছে তবে এখানে জল সেচন করিলে কেন তাহা ধান্যের ক্ষেতে না যাইবে?"

দোলাদি উৎসবে বলরাম স্বয়ং বিগ্রহ সাজিয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিত। প্রায় ৬৫ বৎসরকাল এইরূপ জীবনাতিবাহিত করিয়া ১২৫৭ সালের ৩০এ অগ্রহায়ণ তাঁহার বর্ত্তমান আশ্রমের দক্ষিণে ৯।১০ রশি ব্যবধানে ভৈরব তটে বলরাম ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক তাঁহার মৃত্যু স্থানে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বলরামের একখণ্ড অস্থি সযত্নে রক্ষা করিয়া প্রত্যহ তথায় প্রদীপাদি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সম্প্রতি বলরামের সাম্প্রদায়িক একটী শিষ্য নদীর অপর কূলে একটী নূতন আশ্রম স্থাপন করিয়াছে। প্রত্যেক রামনবমীতে এই সাম্প্রদায়িক শিষ্যবৃন্দ এই আশ্রমে সমাগত হইয়া ঐ অস্থি-খণ্ডের দোল উৎসব নির্ব্বাহ করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে আর কতকগুলি শিষ্য বলরামের এরূপ আদেশ নাই বলিয়া বলরামের মৃত্যুস্থানের

কোনও গৌরব করে না। এইরূপে বলরাম ভজা সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

বলরামের শিষ্যাবলীর মধ্যে অনেকেই বলরামের ন্যায় উদারস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে ইহাদের সকলেই অশিক্ষিত ও হীন জাতির; ইহারা জাতিভেদ প্রথার গৌরব করে না। সকলের অন্নই সকলে খাইয়া থাকে। ইহারা পীড়িত হইলে প্রায়ই ঔষধাদি সেবন করে না, বিশ্বাস বলরামের নামেই পীড়া দূর হইবে। এ সম্প্রদায়ীগণের মধ্যে যাহারা ভিক্ষোপজীবী তাহারা গৃহস্থর বাটী উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা না পাইলে এক কথাতেই চলিয়া যায়, দ্বিরুক্তি করে না। ভিক্ষায়, ও কি দুঃখে কি সুখে তাহাদের একমাত্র উক্তি "জয় বলরাম"। কেহ বা আবার "হাড় হাড্ডি বলরামও" বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় গুলি ব্যতীত নদীয়ার হজরৎ, গোবরা, পাগল নাথ ও খুসী বিশ্বাস প্রভৃতি কতিপয় মুসলমান এক একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া আপনাদের মত প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছে। আর শান্তিপুরের দর্পনারায়ণ নামে একটী চর্ম্মকারও আপনার এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় ভুক্ত লোক সংখ্যা অতি বিরল বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখা হইল না।

এতদ্ব্যতীত নদীয়ার নাগা, অবধূত, কিশোরীভজনী, গোবরাই, চূড়াধারী, তিলকদাসী, রাধাবল্লভী, গৌরবাদী, হরিবোলা, সখীভাবক, ন্যাড়া, দরবেশ প্রভৃতি কতিপয় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আড়ংঘাটার এক নাগাদিগের মঠ ব্যতীত নদীয়ার মধ্যে এই সকল সম্প্রদায়ীগণের কোন আড্ডা বা মঠ নাই, এবং ইহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বিধায় বৈষ্ণব সমাজে তাহাদের প্রতিপত্তিও কিছুমাত্র নাই।

নদীয়ার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মেলা।

ভারতবর্ষীয়েরা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অন্য সকল জাতি অপেক্ষা ধর্ম্ম-অনুপ্রাণিত। উঁহাদের প্রতি কার্য্য ধর্ম্মস্মৃতি বিজড়িত। ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ীর মধ্যে হিন্দুগণ আবার সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মশীল। তাঁহাদের আহার, বিহার, আনন্দ, উৎসব সকলই ধর্ম্মমাখা। তাই যেখানে এতটুকু ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বা ধার্ম্মিকের স্মৃতিমাখা সেখানেই গুণগ্রাহী আর্য্যসন্তান পুরুষানুক্রমে ভক্তিতে বিভোর হইয়া সদা যান বদ্ধ, তাই ভারতে এত তীর্থ, গ্রামে গ্রামে এত মেলার সৃষ্টি।

নদীয়া চিরদিনই পূতস্থান। কত মহাত্মা, মহাপ্রাণ এখানে উদ্ভূত হইয়া কালে এখানেই লয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের না হউক, অনেকের স্মৃতি আজিও মেলাকারে সুরক্ষিত। আজিও দলে দলে হিন্দুসন্তানগণ এই সকল স্থানে সমবেত হইয়া মহোৎসবে রত হয়েন এবং আপনার জন্ম সফল মনে করেন।

নদীয়ার প্রায় সকল গ্রামেই বৎসরের কোনও না কোনও সময়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। এ সকলে সাধারণতঃ স্থানীয় ব্যক্তিগণই আনন্দোৎ-সবে রত হয়েন; তবে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বহুজন সমাবেশ হইয়া থাকে এবং বহু প্রাচীন কাল হইতে এই সকল মেলা চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। এই সকল মেলাগুলি একদিকে যেমন ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট তেমনি অপরদিকে ইহাদের সহিত দেশের অন্তর্বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব দেখা যায়।

শ্রীধাম নবদ্বীপ।—গঙ্গা জালাঙ্গীর পবিত্র সঙ্গম স্থলে অবস্থিত, ইহা বৈষ্ণব-দিগের সর্ব্বপ্রধান শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব স্থান। কালবশে শ্রীপ্রভুর জন্মভূমি গঙ্গাগর্ভে, মতান্তরে নবদ্বীপের পর পার "মায়াপুরে"। প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীধাম নবদ্বীপে এবং শ্রী৺ মায়াপুরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর মাঘী শুক্লৈকাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ দিন ধরিয়া ধূলোট নামে আর একটী বড় মেলা

নবদ্বীপে হইয়া থাকে, এতদুপলক্ষে নানা দিক দেশ হইতে প্রায় দশ সহস্র বৈষ্ণবের আগমন হয়, নৃত্যগীত ও মহোৎসবে নবদ্বীপ এই দ্বাদশ দিন আত্মহারা হইয়া যায়। এই সময়ে বঙ্গের প্রায় সমুদয় বিখ্যাত কীর্ত্তন সম্প্রদায় একত্রে মিলিত হয়েন। হুগলীর ৺মাধবচন্দ্র দত্ত (কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মাধব বাবু বাজার যাঁহার) মহাশয়ের উদ্যোগে ও অর্থে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম এই উৎসবটী সৃষ্ট হয়।

পট্ট পূর্ণিমা (কার্ত্তিকী পূর্ণিমা) নদীয়ার আর একটী উল্লেখযোগ্য মেলা। সুবৃহৎ এবং সু-উচ্চ অথচ সুগঠিত মৃণ্ময়ী দেবী কালীকার মূর্ত্তি ভীতি ও ভক্তি উদ্দীপক। এই উপলক্ষে দুই দিন মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা স্থান বলিয়া যেমন বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীবৃন্দাবন তুল্য মান্য, তেমনি আবার ইহা শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণের কাহারও কাহারও জন্মস্থান বা আবাস ভূমি বলিয়া বৈষ্ণবগণসকাশে শ্রীপাট বলিয়াও খ্যাত। এই নবদ্বীপ ব্যতীত আধুনিক নদীয়া জেলার মধ্যে আরও কতিপয় গ্রাম ঐরূপ শ্রীপাট বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট মান্য। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার ভেদ তেমনি তাঁহার শ্রীচৈতন্য লীলার পার্শ্বদ গোপাল, উপগোপল এবং মোহান্তগণও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলারই অভেদ সঙ্গী। তাঁহাদের মতানুযায়ী নদীয়াবাসী মহাপুরুষগণের নাম ও শ্রীপাট স্থান এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়। *

পূর্ব্ব লীলায়	গৌর লীলায়	পাট
মধুমঙ্গল	শ্রীধর (খোলা বেচা)	নবদ্বীপ

* নদীয়াবাসী সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণের মধ্যে কতিপয় প্রধানের পাট মাত্র এখানে লিপিবদ্ধ হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সকল শ্রীপাটের অধিকাংশই অতি হীন অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেবার বন্দবস্তও অধিকাংশ স্থলে অতি শোচনীয়। আবার কোনও কোনও পাট স্থান একেবারেই লোপ পাইয়াছে, আবার কোথাও নূতন পাট বসিয়াছে। যেমন সুখসাগর ভাঙ্গিয়া সুখসাগরের পাট চাঁদুড়ে উঠিয়া আসিয়াছে, তেমনি নূতন কুলিয়ার পাট স্থাপিত হইয়াছে। পাট গুলির প্রতি বৈষ্ণব সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নতুবা আর কিছু দিনে এ গুলির লোপ অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বলীলায়	গৌরলীলায়	পাট
গন্ধর্ব্ব গোপাল	মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত	নবদ্বীপ।
নারদ	শ্রীবাস	নবদ্বীপ।
হনুমান	মুরারী গুপ্ত	নবদ্বীপ।
অঙ্গদ	পুরন্দর পণ্ডিত	নবদ্বীপ।
সুগ্রীব	গোবিন্দানন্দ	নবদ্বীপ
বশিষ্ঠ	গঙ্গাদাস পণ্ডিত	(বিদ্যানগর)।
বিভীষণ	রামচন্দ্রপুরী	নবদ্বীপ।
ব্রহ্মা	গোপীনাথাচার্য্য	নবদ্বীপ।
শঙ্খনিধি	আচার্য্যরত্ন	নবদ্বীপ।
বিশ্বামিত্র	বনমালী আচার্য্য	নবদ্বীপ।
ভদ্রা	শঙ্কর পণ্ডিত	,, (পাহাড়পুর)।
বিশাখা	স্বরূপ দামোদর	নবদ্বীপ।
মধুরেক্ষণা	বলভদ্র ভট্টাচার্য্য	নবদ্বীপ।
মধুরা	বিদ্যাবাচস্পতি	,, (কাঁউগাছি)
কামমঞ্জরী	নন্দন ব্রহ্মচারী	নবদ্বীপ।
কলভাষিণী	বাণীনাথ পণ্ডিত	,, (গাদিগাছা)।
সুকেশী	মকরধ্বজ	,, (বড়গাছি)।
কলাপিনী	জগদানন্দ পণ্ডিত।	নবদ্বীপ।
সুধীরা	মাধবাচার্য্য	নবদ্বীপ।
নান্দীমুখী	সারঙ্গ ঠাকুর	,, (মাউগাছি)।
সদাশিব	অদ্বৈতাচার্য্য	শান্তিপুর।
সুরঙ্গিণী	শ্রীহর্ষ	শান্তিপুর।
গোপালিকা	গোপালাচার্য্য	শান্তিপুর।
বীরা	শিবানন্দ সেন	কাঁচড়াপাড়া।
গোপালী	কর্ণপুর	কাঁচড়াপাড়া।
চিত্রাঙ্গদী	শ্রীনাথ পণ্ডিত	কাঁচড়াপাড়া।
গুণচূড়া	পরমানন্দ সেন	কাঁচড়াপাড়া।
স্তোককৃষ্ণ	ঠাকুর পুরুষোত্তম	সুখসাগর।
চন্দ্রলতিকা	জগদীশ পণ্ডিত	যশোড়া।
ভাগুড়ী	দেবানন্দ পণ্ডিত	কুলিয়া।
	প্রভৃতি।	

শান্তিপুর।—রাণাঘাট কৃষ্ণনগর লাইট রেলের উপর। ইহা অদ্বৈত-প্রভুর বংশধরগণের প্রিয় আবাস ভূমি। এখানকার কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসমেলা সমগ্র ভারতে সুবিখ্যাত, এমন কি সুদূর মণিপুর হইতেও এখানে শত শত ভক্তের সমাবেশ হইয়া থাকে। মেলা তিন দিবস স্থায়ী, এই তিন দিন নৃত্য-গীত-মহোৎসবে শান্তিপুর মুখরিত হইয়া উঠে। শেষ দিন গোস্বামী প্রভুগণ বিগ্রহাদি সুবর্ণ খচিত রৌপ্যমণ্ডিত হাওদা সকলে সুসজ্জিত করিয়া বাদ্যোদ্দাম সমভিব্যাহারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয়েন। এই উপলক্ষে ৩০ হইতে ৪০ সহস্র লোক সমাবেশ হয়, এবং বহু সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

উলা বা বীরনগর।—রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেল লাইনের উপর। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় মা চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে তিন দিবস স্থায়ী মেলা হইয়া থাকে, এবং এই কালে উলার উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় বিশেষ সমৃদ্ধির সহিত দুইখানি বারোয়ারী পূজা হয়। উত্তর পাড়ায় বিন্দু-বাসিনী ও দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির পূজা হয়। পূর্ব্বকালের এমন কি ১৮৪৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সাহিত্য সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই মেলার কয়দিন উলার গৃহস্থ মাত্রেই সমাগত বিদেশীয়গণের সেবায় রত হইতেন এবং যে কেহ এইরূপে অতিথী অভ্যাগতের সমাদর না করিত সেই গ্রামের প্রধান কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত হইত। * পূর্ব্বে উলার কৌতুকী ব্রাহ্মণগণ সমগ্র বাঙ্গলা হইতে ভিক্ষা সাধিয়া মায়ের পূজায় সমারোহ ব্যাপার করিতেন।

---

* The headman of the town (Ula) has passed a by-law that any man who on this occasion refuses to entertain guests shall be considered infamous and shall be excluded from society.

Article "The banks of Bhagirathi"
in Cal Review Vol VI 1846.

অনেকের মতে উলার এই দেবী বৌদ্ধ পূজার রূপান্তর মাত্র, তাঁহাদের অন্যান্য যুক্তির মধ্যে হাড়ীঘারা দেবীর প্রথম পূজা ও শুকর বলীদান প্রভৃতি প্রবাদগুলি অন্যতম।

বিরহীগ্রামেও এক অতি প্রাচীন চণ্ডীদেবী আছেন তাঁহার নাম হইতে• ডিহি চণ্ডীর নাম হইয়াছে। ইনি কতদিনের প্রাচীন তাহা বলা যায় না, তবে দেখা যায় যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই চণ্ডীদেবীর বহু জমী লইয়া বিরহীর মদন গোপাল বিগ্রহের নামে ছাড়পত্র দেন। এই মদন গোপাল সম্বন্ধে এতদঞ্চলে বহু অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে।

এই উপলক্ষে অনেক কৌতুক কাহিনী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। কথিত আছে উলার মায়ের সেবক কোনও ব্রাহ্মণ কোনও এক কৃপণ ধনীর নিকট মায়ের পূজার কারণ চাঁদা ভিক্ষা করিতে গমন করেন। বাবুটী বয়সে প্রবীণ, স্থূল কলেবর, এক চক্ষু হীন, নিজের বুদ্ধিবলে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াও অসম্ভব কৃপণ ছিলেন। বাবুটী ব্রাহ্মণের পৌনঃপুনিক কাতর প্রার্থনায় উত্তেজিত হইয়া যখন বলিলেন "দেখ ঠাকুর বার বার কেন আর ও প্রসঙ্গ আনিতেছ; আমার নিকট কিছু প্রত্যাশা করিও না কারণ দেখিতেই তো পাইতেছ যে বাজে খরচ আমার আদৌ নাই ওটা আমার কুষ্ঠীতেই লিখে না," তখন ব্রাহ্মণ অনন্যগতি হইয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন "মহাশয় যাহা আদেশ করিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু বাজে খরচ যে আপনার আদৌ নাই তাহাতো বোধ হইতেছে না, দেখিতেছি আপনার একটী চক্ষু নাই, যেটী আছে সেটীও ক্ষীণশক্তি, সেইটীর জন্যই পরকলা ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাজে খরচ যদি নাই তবে যে চক্ষুটী একেবারে দৃষ্টিশক্তিহীন সেটীতে পরকলা কেন?" বাবু নিরুত্তর, ব্রাহ্মণ সফল মনোরথ হইয়া বিলক্ষণ দক্ষিণার সহিত বিদায় পাইলেন।

আর একবার হেষ্টিংসের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কার্য্যোপলক্ষে ভাগিরথী দিয়া গমনকালে শান্তিপুরের ঘাটে কিয়দ্দিবসের জন্য অবস্থান করেন। উলার ব্রাহ্মণ মায়ের সেবকগণ এই সংবাদ পাইয়া কৌশলে দেওয়ানের নিকট হইতে বিলক্ষণ কিছু মায়ের পূজার পার্ব্বনী আদায় করিবার মানসে সদলে শান্তিপুরের ঘাটে দেওয়ানের বজরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলের তখন মল্লবেশ হস্তে এক এক গাছি রজ্জু, এই বেশে বজরার সম্মুখে আসিয়া তাঁহারা সমস্বরে "বেটা সিংহ কোথায়, বেটা সিংহ কোথায়" রবে এক মহা কোলাহল উত্থিত করিলেন। সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণগণের এইরূপ সদম্ভ আহ্বানে সচকিতে বজরা হইতে বাহির হইলে, মায়ের প্রধান পাণ্ডা রজ্জু হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "বেটা সিংহ, মহামায়ের সিংহের পায়ে ব্যথা হইয়াছে, কাল রাত্রিতে তাই দয়াময়ি আমাদের প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে মায়ের সিংহের স্থানে তোমায় লইয়া যাইতে হইবে; এবার মায়ের ইচ্ছা তোমার স্কন্ধে চাপিয়া আসেন, তাই আমরা রজ্জু হস্তে তোমাকে লইতে

আসিয়াছি, এখন মায়ের আসিবার ভার তোমার উপর"; ভক্তি গদ্গদ চিত্তে সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণগণের কৌতুকাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইলেন এবং সেবার মায়ের পূজার সমগ্র ব্যয়ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিতে স্বীকার হইলেন।

এখন দেশের লোকেরও ভক্তির আর সে প্রবলা শক্তি নাই, উলায় মা চণ্ডীরও আর সে সমৃদ্ধিশালী পূজা নাই, মেলা হয় লোক যায়, তামাসা দেখে, কিন্তু হায়! সভক্তি মায়ের পূজা কয়জনে করে।

ঘোষপাড়া।—ই, বি, এস, রেলের কাঁচড়াপাড়া' ষ্টেশনের নিকট। ইহা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া অন্যূন দুই ক্রোশ উত্তর পশ্চিমমুখে যাইতে হয়। সম্বৎসরে এখানে যতগুলি পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোলপর্ব্বই সবিশেষ প্রসিদ্ধ ও এই উপলক্ষে রেল, ষ্টীমার ও নৌকাযোগে বহু সহস্র নরনারীর সমাগম এবং বহু সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

ত্রিহট্ট, (তেওট বা তেহাটা)।—মেহেপুর সবডিভিসনের অধীন। পৌষ সংক্রান্তিতে তিন দিবস ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে, ইহা কৃষ্ণরায়ের মেলা নামে খ্যাত। এই কৃষ্ণরায়জী নদীয়ারাজের বিগ্রহ। কৃষ্ণরায়জী বিগ্রহের বাম পার্শ্বে শ্রীমতি রাধিকা মূর্ত্তি নাই কৃষ্ণরায়জী একক। কথিত আছে কোনও সময়ে ঠাকুরাণীর গাত্র হইতে যবন জাতীয় চোরে অলঙ্কার অপহরণ করিলে পূজারিরা তাঁহাকে মন্দির সন্নিহিত দীর্ঘিকায় বিসর্জ্জন দেন, তদবধি ঠাকুরের অদৃষ্টে আর দেবী মিলে নাই। এই মেলায় প্রায় ৩৪ সহস্র লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই মেলার পর দিবস এতদঞ্চলের যাবতীয় গৃহস্থ তাহাদের গৃহজাত উৎকৃষ্ট সর্ব্ববিধ ফল কৃষ্ণরায়জীকে উপহার দেয়। সেই সকল উৎকৃষ্ট ফল রাশি দেখিয়া ইহাকে কৃষী প্রদর্শনী বলিয়া মনে হয়।

মাটিয়ারী।—প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় এখানে প্রায় পক্ষকাল ব্যাপী এক মেলা বসিয়া থাকে। নদীয়া জেলার মুসলমানগণের যতগুলি দরগা বা পীরের আস্তানা আছে তন্মধ্যে এইটী সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার পীর "মল্লিক গস্" নামে খ্যাত। "মল্লিকগস্" উপাধি বিশেষ, "মলি-অল গস" হইতে উহার উৎপত্তি। গস্ শব্দে ফকির বুঝায় মলি-অল

অর্থে বাদসা অর্থাৎ ফকীরের বাদসা। এই আস্তানাটী কত দিনের প্রাচীন তাহা স্থির নিশ্চয়ে বলা যায় না, তবে কিম্বদন্তী এইরূপ যে যখন কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার এই মাটিয়ারীতে তাঁহাব রাজধানী স্থাপনা করেন তখন উক্ত পীর ও তদীয় ভ্রাতা করিম দুইটি শিষ্য (একজন রজক অপর নাপিত) সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করেন। স্থানীয় মুসলমানগণ করিমের বিবাহ প্রস্তাব করিলে করিম তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া এখান হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোবিন্দপুরে গমন করেন ও তথায় তিনি জাহির হয়েন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এইখানেই তাঁহার কবর হয়। দুই ভ্রাতাই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, যাহাকে যাহা বলিতেন তাহাই সিদ্ধ হইত। মল্লিকগণের পার্শ্বে তাঁহার শিষ্য দুটীরও কবর হয়। এই পীরের কৃষ্ণনগরের রাজাদের দত্ত অনেক পীরোত্তর ছিল কিন্তু এখন উহা কতক জমীদারের খাস দখলে কতক সেবাইতগণের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। মেলার প্রথম তিন দিন ৮।১০ সহস্র লোক সমবেত হয়। এই মেলায় মুসলমানগণের ছুপী, হাতা, বেড়ী, কড়া প্রভৃতি লোহার সামগ্রী, কাটকাটরা ও মনোহারী দ্রব্য ইত্যাদি বিক্রীত হয়।

সুন্দরপুর।—ইহা করিমপুর থানার অধীন। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে পক্ষ ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে এতদুপলক্ষে প্রায় দশ সহস্র ব্যক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। এখানকার শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজী তাঁহারি উদ্দেশে তুলসী বিহার মেলা হইয়া থাকে।

গোস্বামী দুর্গাপুর।—আলমডাঙ্গা রেল ষ্টেসন হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ মুখে দুই ক্রোশ ব্যবধানে এই গ্রামটী সংস্থাপিত। প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পক্ষব্যাপী এক মেলা হইয়া থাকে এবং অন্যূন দশ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। এখানকার শ্রীবিগ্রহ রাধারমণ জীউ। কথিত আছে যে শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান গোস্বামী দুর্গাপুর যে স্থানে অবস্থিত তথায় নিবিড় বন ছিল। এক পরম রূপবান সিদ্ধ সন্ন্যাসী সেই বনে বাস করিতেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে গোস্বামী বলিত। একদিন কতকগুলি দস্যু কোন স্থান লুণ্ঠন পূর্ব্বক এই বন মধ্য দিয়া প্রত্যাগমন কালে পিপাসার্ত্ত হইলে এই গোস্বামী যোগবলে আপনার ক্ষুদ্র কমণ্ডলু হইতে তাহাদের সকলকে জলদানে

পরিতুষ্ট করিলে দস্যুগণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে তাহাদের লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্য হইতে এই রাধারমণ জীউ বিগ্রহ তাঁহাকে অর্পণ করে। যোগীও তদবধি সাদরে এই শ্রীবিগ্রহের সেবা চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিছুদিন পরে এই গোস্বামী দুর্গাপুরের প্রায় ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত জয়দিয়া বাসী রাজা রায় মুকুট মৃগয়ার্থ এই বনে আগমন করেন এবং এই নবীন গোস্বামীর অপরূপ রূপ ও অলৌকিক যোগবল প্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় একমাত্র দুহিতা দুর্গাবতী দেবীকে তদীয় করে সমর্পণ করেন এবং বন কাটাইয়া নগর স্থাপনপূর্ব্বক ইহার "গোস্বামী দুর্গাপুর" নামকরণ করেন। পরে রায় মুকুটের পুত্র রাজা শ্রীকৃষ্ণ রায় ১৫৯৬ শকে রাধারমন দেবের নিমিত্ত ইষ্টক নির্ম্মিত একটী শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। শ্রীমন্দিরটির অনেকাংশ যদিও এক্ষণে মৃত্তিকাপ্রোথিত হইয়া গিয়াছে ও উহা ক্রমেই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে তথাপি মনোযোগ সহকারে ইহার ইষ্টকের উপর খোদিত কারুকার্য্য দেখিলে মোহিত হইতে হয়। মন্দিরটি পূর্ব্বদ্বারী এবং উহার দক্ষিণ পার্শ্বে এই সংস্কৃত কবিতাটি খোদিত আছে—

"কালাঙ্ক বাণেন্দু মিতে শকাব্দে
জ্যৈষ্ঠে শুভে মাসি সুনির্ম্মলাশয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণ রায়ঃ শুভ সৌধ মন্দিরঃ।
শ্রীযুক্ত রাধারমণায় সন্দদৌ॥"

আড়ংঘাটা।—ই, বি, এস, রেলের উপর। প্রতি বৎসর সমগ্র জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যপি এখানকার শ্রীবিগ্রহ যুগলকিশোর দেবের এক মেলা বসিয়া থাকে। এই যুগলকিশোর দেব বহুকাল হইতে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ঠাকুরের গৃহপ্রাঙ্গনস্থিত ধান্য গোলা হইতে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার "কৃষ্ণপান্তীর" প্রথম সৌভাগ্য সূচিত হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে বহু নাগা সন্ন্যাসীর বাস ছিল। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এখানকার তদানীন্তন মোহান্ত কর্ত্তৃক এই বর্ত্তমান মেলাটি স্থাপিত হয়। প্রবাদ যে জ্যৈষ্ঠমাসে যুগলরূপ দর্শন করিলে স্ত্রীলোকের আর বৈধব্য সঙ্ঘটিত হয় না, তাই এই এক মাস ধরিয়া অন্যূন এক লক্ষ স্ত্রীলোক এই স্থানে আসিয়া দেবদর্শন করিয়া থাকেন।

কুলিয়া—কাঁচড়াপাড়া রেল ষ্টেসন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ পূর্ব্বদিকে

অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর পৌষী কৃষ্ণৈকাদশী হইতে তিন দিন ব্যপী মেলা ও উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় ৮।১০ সহস্র লোক এই উপলক্ষে সমবেত হয়। ইহা দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ বলিয়াও খ্যাত। কিন্তু মায়াবাদী পণ্ডিত দেবা-যে কোনও দিন এইস্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। শ্রীচৈতন্ত ভাগবত, শ্রীচৈতন্ত-চন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, শ্রীনরহরি দাসের নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি, বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রেমদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্ত্তাগণের বিরচিত পদসমূহ ও অন্যান্ত বহু প্রামাণিক গ্রন্থরাজি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে কুলিয়া গ্রামে পতিতপাবনাবতার শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ প্রভু অধ্যাপক চাপাল গোপালকে 'শ্রীবাস-অপরাধ' হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন যে স্থানে শ্রীপ্রভু ভাগবতবেত্তা মায়াবাদী পণ্ডিত দেবানন্দের ভক্তাপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক বর দিয়াছিলেন এবং যে স্থানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোনও পণ্ডিত বৈষ্ণবা-পরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই যোগীজন দুর্ল্লভ মহাতীর্থ কুলীয়া তদানীন্তন নবদ্বীপের সন্নিহিত একটী পল্লী বিশেষ ছিল এবং উহা তৎকালীন গঙ্গার পশ্চিম কূলে (এখন যেখানে নবদ্বীপ অবস্থিত প্রায় সেই স্থানে) অবস্থিত ছিল, সুতরাং বর্ত্তমান কুলিয়ার সহিত শ্রীপাঠ কুলিয়া গ্রাম বা কোলদ্বীপের কোনওরূপ সম্বন্ধ ঘটান যায় না, তবে বর্ত্তমান কুলিয়ার গৌরব রক্ষা করিতে, "পুরাণম্ পঠণম্ যত্র, যত্র পদ্ম বনানী চ তুলসী কাননম্ যত্র, তত্র সন্নিহিত হরি" ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা যদি ঐ স্থানের ভগবৎ সান্নিধ্য প্রমাণ করিতে চাহ তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। বরং বিস্মৃতির অতল গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া যাঁহারা ভক্তের মনে দেবনন্দাদির অপরাধ ভঞ্জনরূপ মহাঘটনার স্মৃতির জাগরুক রাখিয়াছেন তা সে যে স্থানেই হউক না কেন তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। নতুবা সেই পরম পরিত্রাতা ভূমির সম্বন্ধে শ্রীনরহরি দাস "নবদ্বীপ মণ্ডল" বর্ণনাকালে ইহাকে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ দ্বীপরূপে উল্লেখ করিয়া ইহার এইরূপ ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন যথা,—

"কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দ ধাম
প্রভু প্রিয় ভক্ত কোলদ্বীপে। পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোল রূপে॥

কোল দ্বীপ নাম এইমতে। অত্যন্ত মধুর কথা আছয়ে ইহাতে॥"

শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে নবম অঙ্কে সুবিখ্যাত কবিকর্ণপুর মহাশয় কুলিয়া সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু কুলিয়ায় আছেন শুনিয়া কুলিয়া কোথায় তাহা সর্ব্বভৌমকে পুছিলে, তিনি বলিলেন,—

"সার্ব্বভৌম বলে রাজা নবদ্বীপ পারে।
কুলিয়া নামেতে গ্রাম গঙ্গার ওধারে॥"

পুনশ্চ ঐ,—"নবদ্বীপ পারে সে কুলিয়া নামে গ্রাম।
শ্রীমাধব দাস তথা আছে ভাগ্যবান॥"

পুনশ্চ ঐ,—"সপ্তদিন এইমতে কুলিয়া নগরে।
ভাসাইলা সর্ব্বলোক আনন্দ সাগরে॥
প্রাতঃকালে চলিলেন গঙ্গা তটে তটে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে হরিধ্বনি কলরব উঠে॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কুলিয়ারে গঙ্গার উপর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

"তবে নিত্যানন্দ সর্ব্বপার্ষদের সঙ্গে। প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্ত্তনের রঙ্গে॥
খানা যোড়া বড় গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপারে কভু যায়েন কুলিয়া॥"

পুনশ্চ ঐ অন্ত্য খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে,—

"কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসীমণি। সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়। শুনি মাত্র সর্ব্ব লোক মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতি গ্রামেতে যত গহন আছিল। তায় কোটী কোটী গুণ সকল পুরিল॥

* * * * *

"ক্ষণেকে আইল" মহাশয় বাচস্পতি। তিনি নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥
কতক্ষণে মাত্র বাচস্পতি একেশ্বর। ডাকি আনিলেন প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ। গোপাল বিপ্রেরে ক্ষমা শ্রীবাস অপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে। অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥"

এ বর্ণনা পাঠে কুলিয়ার অবস্থান সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা হয় না, বিশেষতঃ কবিরাজ গোস্বামী বহুস্থলেই শ্রীবৃন্দাবনদাসের বিস্তারিতরূপে বর্ণিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিখিয়া সারিয়াছেন যথা,—

"শান্তিপুর পুন কৈল দশ দিন বাস। বিস্তারি কহিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
অতএব ইহা তার না কৈল বিস্তার। পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে বিস্তর॥"

এক্ষেত্রে তাঁহার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা আশা করা যায় না, তিনি চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে লিখিয়াছেন যে শ্রীপ্রভু পাণিহাটী হইতে কুমারহট্টে শ্রীবাসকে দর্শন দিয়া, কাঞ্চন পল্লীতে শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করতঃ বাচস্পতি গৃহে উপনীত হইলেন ও তথা হইতে কুলিয়ায় গেলেন। এই বাচস্পতির গৃহ কুলিয়ার নিতান্ত সন্নিহিত না হইলে চৈতন্য ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের অনুযায়ী তিনি কদাপি "ক্ষণেকের" মধ্যে কুলিয়ায় শ্রীপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেন না। এখন দেখিতে হইবে এই বাচস্পতির গৃহ কোথায় ছিল,

চৈতন্যভাগবতে—

"সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।"

পুনশ্চ ঐ মধ্যখণ্ডে ২১ অধ্যায়ে—

"হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥
একদিবস প্রভু করে নগর ভ্রমণ। চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাহার জাঙ্গালে গেল প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ।"

উহা হইতে জানা যাইতেছে যে মহেশ্বর বিশারদ, সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস নবদ্বীপেরই এক অংশে ছিল, আবার তাঁহার নিবাস নবদ্বীপের যে অংশে ছিল কুলিয়া তাহারই সন্নিকটবর্ত্তী ছিল, তাই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র "ক্ষণেকের" মধ্যে বিশারদ মহাশয় প্রভুর নিকট যাইতে পারিয়াছিলেন।

আবার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায়,—

"গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশে গিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
গুরু আশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। নবদ্বীপ আইলা প্রভু এই তার মর্ম্ম॥

মায়ের বচনে পুনঃ গেল নবদ্বীপ। বারকোনা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥"

উহা হইতে কুলিয়া যে তদানীন্তন নবদ্বীপেরই অংশ বিশেষ তাহাই প্রমাণ হইতেছে।

একখানি প্রাচীন গ্রন্থে কুলিয়া যে নবদ্বীপের পর পারে অবস্থিত তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে,—

"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিত বাট্যা মধ্যাখণ্ডে। ততো অদ্বৈত বাটী-মধ্যোতা হরিদাসে নাস্তিবন্দিত স্তথৈব তরণীবর্ত্তনা নবদ্বীপস্থ পারে কুলিয়া নাম গ্রামে মাধবদাস বাট্যা মূর্ত্তির্ণবান।"

বিখ্যাত পদকর্ত্তা প্রেমদাস বংশীবদন ঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

"নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে, কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম শ্রীছকড়ি নাম মহাতেজা কুলীন সন্তান ॥"

এই সকল এবং অন্যান্য বহু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলেন যে কাঁচড়াপাড়ার উত্তর পূর্ব্বস্থিত কুলিয়া গ্রাম কোনও ক্রমেই দেবানন্দাদির অপরাধভঞ্জনের স্থান হইতে পারে না। সে কুলিয়া গ্রাম প্রাচীন নবদ্বীপের পরপারে বিদ্যমান ছিল এবং এই স্থানেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কর্তৃক দেবানন্দাদির অপরাধ মোচন হয়। শ্রীপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া উদার হৃদয় ভাগ্যবান দেবানন্দ শুধু আপনার অপরাধ মোচনে উল্লসিত না হইয়া, সমগ্র জীবের প্রতি কৃপা পরতন্ত্র হইয়া শ্রীপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করেন যেন এই পবিত্রধামে যেখানে তিনি শ্রীপ্রভুর চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন সেখানে অপরাধী যে কেহ তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, সেই যেন নির্ব্বিচারে তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হয়। শ্রীপ্রভুও দেবানন্দের এই পরম উদার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলে কুলিয়া গ্রাম দেবানন্দের পাট বা শ্রীপাট কুলিয়া নামে খ্যাত হয়। কিন্তু কলির জীবের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পরম পবিত্রতা ভূমির কোনও নিদর্শনই এখন পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান নবদ্বীপের দক্ষিণাংশে এই কুলিয়া সংস্থাপিত ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়।

বর্ত্তমান কুলিয়ার পাটের ইতিবৃত্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে আমরা নিম্নলিখিত রূপ বিবরণগুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। "প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এইস্থানে

এক উদাসীন বৈষ্ণব বাস করিতেন, তিনি এখানে নিতাই চৈতন্য ও অন্যান্য বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া পরম ভক্তি সহকারে পূজার্চ্চনা করিতেন, এই সময়ে খড়দহের এক গোস্বামী এখানে শিষ্য গৃহে আসিয়া এই উদাসীনের ক্রিয়াকর্ম্ম দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতির উদয় হইলে তিনিও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এখানে রহিয়া যজন যাজন করিতে থাকেন এবং ঐ উদাসীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া বিগ্রহাদির যথানিয়ম সেবা চালাইতে থাকেন। পরে তাঁহারও পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার দৌহিত্রেরা আসিয়া তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার করেন। এই সময়ে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খুল্লতাত বংশীয় রামকুমার রায় মহাশয় সুখসাগর, পলতা, কুলিয়া প্রভৃতি গ্রাম সকলের জমীদার ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে তৃতীয় মাধবচাঁদ রায় মহাশয় সুবিখ্যাত জর্জ ব্যারেটো সাহেবের সুখসাগর কন্‌সারণ নামক নীলের কুঠী জন্ লার্লিটা সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত চালাইতে ছিলেন সুতরাং এতদঞ্চলে তখন তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল। এই মাধবচাঁদের সহিত বলাগড়ের অচ্যুতানন্দ গোস্বামীর বিশেষ সদ্ভাব ছিল তাই অচ্যুতানন্দের অনুরোধ ক্রমে বন্ধুতার খাতিরে মাধবচাঁদ তাঁহার লাঠিয়াল দিয়া উদীয়মান কুলিয়ার পাঠটী খড়দহের গোস্বামীগণের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া অচ্যুতানন্দকে দেওয়াই দিলেন। এই অচ্যুতানন্দ ও তদ্বংশীয়গণের যত্নে কুলিয়ার পাঠের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে পরে কলিকাতা মলঙ্গা বৌবাজারের কিষণ দয়াল ধর মন্দিরাদি করিয়া দেওয়ায় এখন ইহা বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে।

নদীয়ার এই কয়েকটী সুবিখ্যাত মেলা ব্যতীত প্রতিবৎসর মাঘীপূর্ণিমায় চাকদহে, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে চাকদহের সন্নিকটবর্ত্তী শলাকির বিলে; কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে আড়ুলিয়া কায়েত পাড়ায়, *

---

* এই মেলা ধর্ম্মগাজন নামে বিখ্যাত, ইহার মন্ত্রাদি ও পূজাপ্রণালী দৃষ্টে ইহাকে বৌদ্ধ পূজার রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। ইহার পূজা অদ্যাপী হাড়ীতেই করিয়া থাকে।

আড়ুলিয়ার বর্ত্তমান বারয়ারি তলার সন্নিকটে যে বহু প্রাচীন 'বামদেবের' মূর্ত্তি নামে এক প্রস্তর মূর্ত্তির পূজা হয় তাহাও বৌদ্ধযুগের শেষ নিদর্শন বলিয়াই অনুমিত হয়। এখানকার

নৃসিংহ দেপাড়া ও নবলায় পাঁচুঠাকুরের নিত্য মেলা, ভীম একাদশীতে শিবনিবাসের হরিসভার মেলা, অগ্রহায়ণের শুক্ল চতুর্থীতে কৃষ্ণনগর দোগাছিয়ার মূলায় মহোৎসব যাহাতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমস্তকের একটী পাগড়ী প্রদর্শিত হয়, পৌষী শুক্লতৃতীয়ায় যশোড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের মহোৎসব, মাঘীপূর্ণিমায় পাটুলীর মেলা; ভোমরায় মেলা, মেহেরপুরের মধ্যে মুরটীয়ায় জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রায় মেলা, ও শ্রীরামনবমীর মেলা, আমঝুপি গ্রামে রাসযাত্রায় মেলা, রাণাঘাটে প্রতিবৎসর রাসপূর্ণিমায় পরের অষ্টমীতে এবং মাঘীপূর্ণিমায় পরের সপ্তমীতে দুইটী মেলা, চৈত্র শুক্ল একাদশী হইতে ৩ দিন কৃষ্ণনগর রাজবাটীর বারোদোল মেলা ও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় মেলা নদীয়ায় হইয়া থাকে।

এই সকল মেলা ব্যতিত নদীয়ায় প্রতিবৎসর গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থানে বহু দূরদেশ হইতে জনসমাগম হইয়া থাকে। গঙ্গা হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থ; শাস্ত্রে বলে "সর্ব্বতীর্থময়ি গঙ্গা" গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ যাহা প্রত্যেক হিন্দু তাহার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভুলিয়া একবাক্যে পবিত্রতম তীর্থ বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। নদীয়া সেই গঙ্গাময়ি মহাতীর্থ, পবিত্র গঙ্গা মৃত্তিকা হইতে সমদ্ভূত। এখানে বহু দূরদেশ হইতে এমন কি সুদূর মণিপুর হইতেও হিন্দুগণ কলুষনাশিণী গঙ্গাসলিলে নিজ নিজ পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত সমবেত হন। প্রথমতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমি গঙ্গাজালাঙ্গী সঙ্গমেই অধিক সংখ্যক লোক সমাবেশ হইয়া থাকে। তৎপরে শান্তিপুর, পূর্ব্বে ঠিক শান্তিপুরের নিম্ন দিয়াই গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন এক্ষণে গঙ্গা ও শান্তিপুরের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ চড়া পড়িয়াছে। এখানেও গঙ্গাস্নানে ও অদ্বৈত বংশজ গোস্বামী প্রভুগণের বাসভবন বলিয়া গুরু-পাঠ দর্শনে বহুলোক সমাবেশ হয়। তদ্ভিন্নে চাকদহ বা চক্রতীর্থে এখানেও যশোহর খুলনা প্রভৃতি স্থান হইতে গঙ্গাস্নানার্থ বহুজন সমাগম হইয়া থাকে, তবে গঙ্গা এখন চাকদহ হইতে সরিয়া যাইতেছেন বলিয়া যাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

*

প্রাচীন মূর্ত্তিটী প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এই বর্ত্তমান মূর্ত্তিটী দে-গাঁ হইতে লইয়া আসিয়া এখানে স্থাপিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে মূর্ত্তিটী ছিল সেটী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। বর্ত্তমান মূর্ত্তিটী হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি।

নদীয়ার সামাজিক বিবরণ।

মহারাজ অশোকের সময় হইতে বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তীকালে নানাকারণে ইহা বিকৃত হইয়া "নষ্টজ্ঞান" আখ্যায় অভিহিত হয়। এই সময়ে দেশের সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে জাতি মধ্যে উচ্চ নীচভেদ একেবারে তিরোহিত হয় এবং বেদপুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমধিক অবনতি দৃষ্ট হয়। হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তি গৌড়েশ্বর মাহারাজ আদিশূর, দেশকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে ৯৯৯ শকে অগ্রবর্ত্তী হয়েন, এবং কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামিয় পাঁচজন বেদজ্ঞব্রাহ্মণ আনিয়া এদেশের নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীহর্ষ-ভরদ্বাজগোত্রজ, ভট্টণারায়ণ-শাণ্ডিল্য, দক্ষ কাশ্যপ, বেদগর্ভ-শাবর্ণ এবং ছান্দড়-বাৎস গোত্রজ। এই পঞ্চব্রাহ্মণের যে কয়জন অনুচর আসিয়াছিলেন তাঁহারাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ। ইঁহাদেরই বংশাবলী পরে "রাঢ়ীয়" ও "বারেন্দ্র" নামে অভিহিত হয়েন। মহারাজ আদিশূর ও পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দ এই সকল ব্রাহ্মণগণকে বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। আদিশূরবংশীয় রাজগণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া পালবংশীয়েরা প্রবল হইয়া উঠেন, কিন্তু কিছুদিনের পরেই সেন রাজাগণ এদেশ পুনরাধিকার করেন। এই সেনবংশীয় নরপতি সুবিখ্যাত বল্লালসেন নবদ্বীপে রীতিমত রাজধানী স্থাপন করেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশাবলী বহুবিস্তৃত হইয়া পড়ায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই আচার ব্যবহার কলুষিত হইয়া পড়ে, সুতরাং এই সময়ে বিশৃঙ্খল সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়, সে কারণ বল্লালসেন পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধির জন্য 'কৌলিন্য মর্য্যাদা" সৃষ্টি করেন, এবং আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ, দান, এই নয়টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কুলীন আখ্যা প্রদান করেন। আদি পঞ্চব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বর্ত্তমান বংশাবলী এই সময়ে বাঙ্গলার বিভিন্নস্থানে বিস্তীর্ণ হওয়ায় তাহাদের সমষ্টি গ্রহণ করিয়া

মোট ৫৬ গ্রামে বাস করিতে দেখা যায়। এই সকল গ্রামের নাম হইতে বিভিন্ন গাঁইয়ের (গ্রামীন) সৃষ্টি হয় এবং বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক কায়স্থ সমাজে পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া সমপর্য্যায়ে বিবাহাদি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়।

মহারাজ আদিশূর, বল্লালসেন লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গালী রাজার অধীনে দেশে, সংস্কৃত কাব্যাদি, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানাশাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং তৎসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। বল্লালের পূর্ব্ব হইতেও নবদ্বীপ "সমাজ স্থান" বলিয়া বিখ্যাত থাকিলেও বল্লালের সময় হইতেই উহা হিন্দু-সমাজের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে।

বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি হিন্দুনরপতিগণ যখন নবদ্বীপে থাকিয়া গৌড়রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখনকার শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা করিতে হইলে জনশ্রুতি, তাম্রশাসনোল্লিখিত রাজকর্ম্মচারীগণের সংখ্যা ও পদবিজ্ঞাপক উপাধি এবং প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। এই সকল উপাদান হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখা যায় যে দেশ সুশাসিত ছিল। অশেষ রাজরাজন্যক পদ হইতে দেশে তখন সামন্তপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া বোধ হয়, যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন "মহাসন্ধি- বিগ্রহিক" তাঁহার উপর ছিলেন "মহাসেনাপতি"; যুদ্ধ ভাণ্ডারের অধ্যক্ষের নাম ছিল "রণভাণ্ডাগারাধিকরণ." এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্র শাসনে যে সকল রাজকর্ম্মচারীর নাম উল্লিখিত আছে তাহাতে জানা যায় যে সে সময়ে রাজ্যের প্রধান বিচারপতির নাম ছিল "মহাক্ষপটলিক" ও "মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ", "ফৌজদারী" বিভাগের কার্য্যপরিদর্শকের নাম ছিল "বৃহদুপরিক" ও "দণ্ডনায়ক"। করসংগ্রাহক কর্ম্মচারীকে 'মহা-ভোগিক' ও বন বিভাগের কর্ম্মচারীকে "মহাপীলুপতি" বলিত, কেহ কেহ মহা-ভোগিক ও মহাপীলুপতি শব্দের গজ রক্ষক ও অশ্ব রক্ষক অর্থ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্তঃপুর রক্ষীগণকে 'অন্তরঙ্গ বৃহদুপরীক"। বৃহৎ মন্দির সমূহের অধ্যক্ষকে "মহা-প্রতিহার"। শান্তি রক্ষাকর্ত্তাকে "দণ্ডপাশিক" নগর রক্ষককে "বৈশাল্যাধিষ্ঠানধিক" বলিত। এতদ্ব্যতীত "মহাগণস্থ" "চৌরদ্ধরণিক" "দৌসসাধিক" প্রভৃতি পদধারী বহুতর রাজকর্ম্মচারী রাজ্য শাসনে সহায়তা করিতেন। রাজাও এই

সকল উপযুক্ত কর্ম্মচারীর সহায়তায় প্রজাসাধারণের মনস্তুষ্টি করিয়া সনাতন হিন্দু প্রথানুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেন এবং যে কোনও কার্য্য করিতে হইলে তৎপ্রতি সাধারণের সহানুভূতি ও অনুমোদন লাভাশায় লিখিতেন—"মতমস্ত্তভবতাম্"।

রাজোচিত দানাদি কর্ম্মেও তাঁহাদের বিশেষ মতি ছিল। ব্রাহ্মণকে "ব্রহ্মোত্তর" দান করিতে হইলে তাম্রপট্টে উহা খোদিত হইত। এযাবৎ সেন নরপতিগণের অনেকগুলি এইরূপ "তাম্র শাসন লিপি" নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে লক্ষ্মণসনদেবের চারি খানি। দুইখানি পূর্ব্বাবিষ্কৃত; দুইখানি নবাবিষ্কৃত; ইহাদের একখানি পাবনার অন্তর্গত মাধাই নগরে পাওয়া যায় ও সর্ব্বশেষ খানি এই নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী অনুলিয়া গ্রামের সীতানাথ ঘোষ কিছু দিন পূর্ব্বে ভূমি খননোপলক্ষে প্রাপ্ত হয়েন,* ফলকখানি বহুকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় নিতান্ত বিবর্ণ ও স্থানে স্থানে কালিমালিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার আয়তন ১০½×১২½ ইঞ্চি, শিরোভাগে একটী দশভুজ সমন্বিত দেবমূর্ত্তি কীলকযোগে ফলকের সহিত দৃঢ় বদ্ধ। প্রথম পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৮ পংক্তি পরিমিত সংস্কৃতে রচিত পদ্যগদ্যময় ভাষায় বল্লালসেনের পুত্র মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমবৈষ্ণব, পরম ভট্টারক শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব কর্ত্তৃক বিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার হইতে স্বকীয় রাজ্যাব্দের তৃতীয় বর্ষীয় নবম ভাদ্র দিবসে যজুর্ব্বেদান্তর্গত কাণ্ব শাখাধ্যায়ী কৌশিক গোত্রীয় বিশ্বামিত্র বন্ধুল কৌশিক প্রবরের রঘুদেব শর্ম্মা নামক কোনও ব্রাহ্মণকে যে ভূমিদান করা হয় ইহাতে তদ্বিবরণ খোদিত আছে। এই তাম্রপট্টে কীলক যোগে যে অংশ মূল ফলকের সহিত সংযুক্ত তাহা সেন রাজবংশের প্রচলিত রাজমুদ্রা বলিয়াই অনুমিত হয় ইহা খোদিত নহে ছাঁচে ঢালাই করা বলিয়াই বোধ হয়।

১১৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে গৌড়ে মুসলমান প্রভাব কালের আরম্ভ, এই সময় হইতে

* এই তাম্র ফলকখানি বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয় তিনি পণ্ডিতবর রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধার করিয়া তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক চিত্র নামীয় ত্রৈমাসিক পত্রের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় উহা প্রকাশ ও উহার বিষয় আলোচনা করেন সম্প্রতি এই তাম্র শাসন খানি কলিকাতা সাহিত্য পরিষদ গৃহে রক্ষিত হইয়াছে।

মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত মুসলমানগণের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে হিন্দুর সমাজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া আইসে ও এই সময় হইতেই বহু হিন্দু নিদারুণ অত্যাচারে, অনিচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। * ক্বচিৎ কেহ রমণীর-রূপ-মোহে বা অর্থলোভে স্বইচ্ছায় উক্ত ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকারে যে সমস্ত নীচ জাতিয় হিন্দু, মুসলমান হইয়াছে তাহাদের, পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ রীতি নীতি, আচার ব্যবহার অধিকাংশ স্থলেই হিন্দুদের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়, এমন কি তাহারা কোন বিপদে পতিত হইলে হিন্দু দেবদেবীর পূজা মানত করিয়া থাকে। ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি "ফৌজদারী" দেবতা ত "খোদা তাল্লার" সহিত সমান সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই সময়ের লিখিত কাব্যাদিতে তৎকাল প্রচলিত রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের অনেক আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে দেশের লোককে ডিঙ্গা সাজাইয়া বহুবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া বিদেশে যাইতে দেখা যায়। ব্যবসাদিতে বট, বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যক কড়ি দ্বারা বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। "পুরুষ" নামে এক প্রকার ভূম্যাদি মাপিবার মাপ প্রচলিত ছিল।

এই সময়ে জ্যোতিষে লোকের অকৃত্রিম বিশ্বাস দেখা যায়। এমন কি হাঁচি, টিকটিকী, কাক প্রভৃতির শব্দানুযায়ী শুভাশুভ নির্দ্দিষ্ট হইত। লক্ষ্মণসেনের জ্যোতিষের প্রতি এরূপ অন্ধ বিশ্বাসই বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া কথিত।

তাৎকালীক উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদির মধ্যে পাটের পাছুয়া * প্রভৃতি পট্টবস্ত্রের সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।

তখন স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার অধিকাংশ স্থলেই রৌপ্য নির্ম্মিত হইত এবং "মদনকড়ি," "নীলমণিকাচ," "মণ্ডতাড়ল," "ঘণ্টি" এবং পদে পিত্তলের "খাড়ু"

---

* এই অত্যাচার সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

"দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্রের রাজার না দেয় কর। ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গা মণ্ডপে বাসা কৈল। অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধিল॥"

অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ

অপর—

"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা ছিঁড়ে ফেলে থুথু দেয় মুখে॥"

বিজয় গুপ্ত

* "রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছুয়া।" কীর্ত্তিবাস

প্রভৃতি অলঙ্কারই রূপসীগণের বিশেষ আদরের ছিল; পুরুষেও কর্ণে ফুল এবং প্রকোষ্ঠে বলয় ব্যবহার করিত।

রাজা ও ধনশালীব্যক্তিগণ বিদ্যার সম্মান করিতেন এবং অবসর পাইলে গীত বাদ্যে আমোদ করিতেন।

ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল, মুসলমানগণের সংস্পর্শে ও শিক্ষায় দেশ ততই বিলাসিতার প্লাবনে মগ্ন হইতে লাগিল। বহু বিবাহ এই সময়ে দেশ মধ্যে বাহুল্যরূপে প্রচারিত হয়, দেশে খাদ্যাখাদ্যের বিচারে লোকের আস্থা কমিয়া যায় এমন কি কোন কোন নীতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ মদ্যপান ও গোমাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে থাকে। * এই বিলাসিতা স্রোতে দেশ হইতে নিত্য সত্য প্রেমভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। চৈতন্য ভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবনদাস এই সময়ের নদীয়ার একটী প্রাঞ্জল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে। মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিবাহে। এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যম পাশে বান্ধি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দোষ বহি কার গুণ না করে বাখন॥
যে বা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। তা সবার মুখেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরিকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়। ভক্তির বাখান নাই তাহার জিহ্বায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কারবাসে॥
বাসলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥"

যখন নদীয়ার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব জন্ম-পরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রচারিত সুমধুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেমভক্তির প্লাবনে জাতীয় জীবনের সঞ্চিত কলুষরাশি বহুল পরিমাণে ধৌত হইয়া যায়।

এই সময়ে স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার

* "ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য, গোমাংস ভক্ষণ। ডাকাচুরি পরগৃহ দাহ সর্ব্বক্ষণ॥"
চৈতন্য ভাগবত। মধ্য খণ্ড॥

করিতে আরম্ভ করেন। কর্ণপুট, কুণ্ডল, বলয়, শঙ্খ, কঙ্কণ প্রভৃতি সে কালের সৌখিন অলঙ্কার। তাঁহারা এই সকল অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া "লোটন খেপায়" কেশ বিন্যাস করিয়া "মেঘডুম্বর কাপড়" ও চারু কারুকার্য্যখচিত কাচুলি পরিধান করিয়া পুষ্পমালা কণ্ঠে দিয়া হস্তে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া রাত্রিতে স্বামী সম্ভাষণে গমন করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ উৎসবকালে "খুঞা" নামক বস্ত্র আদরের সহিত পরিধান করিত।

তখন গৃহে গৃহে নবপঞ্জিকা বিরাজ করিত না। লগ্নাচার্য্যগণ পঞ্জিকা শুনাইতেন এবং শুভ কার্য্যের দিনস্থির করিতেন। অগ্রদানীগণ নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তখন বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা ছিল না, অথবা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া লোক লৌকিকতা করিতে হইত না। পাঁচটি হরিতকী দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেই চলিত।

সে সময়ে দেশের লোকের ঘরে খাদ্যের অভাব ছিল না। তাঁহারা আহারকালীন চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি সমস্ত রসগুলি আস্বাদ করিতেন। নিম্নের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তদানীন্তন মধ্যাহ্নিক আহার্য্যের একটা আভাস পাওয়া যাইবে। যথা চরিতামৃতে :—

"দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত শুক্ত ঝোল। মরিচের ঝাল, ছানা, বড়া ঘোল॥
দুগ্ধ তুম্বী দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, বেশারি লাফরা। মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা।
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ির ব্যঞ্জন অপার। ফুল বড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥
নবনিম্ব পত্রসহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকি। ফুল বড়ী পটলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি॥
ভ্রষ্টমান মুদ্গ সূপ অমৃত নিন্দয়। মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট। ক্ষিরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট॥
কাঞ্জি বড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধ লকলকি। আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃত সিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি॥
সরলা মথিত দধি সন্দেশ অপার। গৌড় প্রদেশে যত ভক্ষের প্রকার॥

এই সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহের আমূল পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সংশোধন দ্বারা তাহাদের কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া দেন। কেবল বিধবাগণের পালনীয় নিয়ম সম্বন্ধে, সমাজে ব্যাভিচারাদি দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা প্রচলন করেন। স্মার্ত্ত, বিধবা রমণীর সহমৃতা হইবার প্রথার উচ্চ মহিমা কীর্ত্তন করিলে লুপ্তপ্রায় এই রীতি দেশমধ্যে পুনঃ প্রচলিত হয়।

এই সময়ে নদীয়ায় বিদ্যা চর্চ্চার একটা স্রোত বহিতে থাকে। কেবলমাত্র যে উচ্চ বর্ণের মধ্যে এইরূপ বিদ্যার প্রসার ছিল তাহা নহে, নিম্ন শ্রেণীর শূদ্রাদির মধ্যেও উহার সম্যক আলোচনা হইতে ছিল। এমন কি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও দুই একজন বিদুষী রমণীর নাম পাওয়া যায়।

এই সময়ে নদীয়ায় ভাস্কর বিদ্যার সম্যক উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবদেবীর সুন্দর মূর্ত্তি গঠনে সুনিপুণ কারিকরের অভাব ছিল না এবং বস্ত্রবয়ন শিল্পে নদীয়া ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছিল। পরবর্ত্তীকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এই সকল চারু-কলা সম্যক পুষ্ট হইয়াছিল।

এই সময়ে নদীয়ার যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল এবং সমসাময়িক কবিগণ যেরূপে নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তখনকার নবদ্বীপ এখনকার কলিকাতার অপেক্ষা শোভা সমৃদ্ধিতে ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কবি জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে তদানীন্তন নদীয়ার বাটী, ঘর, হাট, বাজার প্রভৃতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

নানা চিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী নানা জাতি বৈসে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেহারা নানা বর্ণে বৃক্ষলতা॥
জয় জয় ধন্য নদীয়া নগরী অলকানন্দার কূলে।
কমলা ভবানী ক্রীড়া করে তথি বিরাজিত বকুল শালে॥
প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চঞ্চল পতাকা উড়ে।
পূর্ব্বে যেন ছিল অযোধ্যা নগরী বিজুরী ছটাক পড়ে॥
নাট পাঠশালা দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।
মাঠ মণ্ডপ সুযন্ত্রিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরোপন॥
প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতি গলি নৃত্যগীত—আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদ পাঠ॥
পুনশ্চঃ—গোধূলী সময়ে মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খধ্বনি প্রতি ঘরে।
শ্বেত চামর ময়ূর পাখা হাতে চন্দ্রাতপ শোভা করে॥
ইষ্টক রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গন সুযন্ত্রিত গৃহ দ্বারে।
হিঙ্গুল হরিতাল কাঁচা ঢাল চৌখণ্ডী চৌকাট সাজে॥
সাজে রসাল বিশালক স্তম্ভ রাজি চন্দ্রার্ক তিলকে।
ময়ূর শুক সারস পারাবত সিংহ হংস চক্রবাকে॥
খাট পাট সিংহাসন আসন চৌখড়ি ময়ূর পাখা।

বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা ॥

পুনশ্চঃ—নদীয়ার হাটে কি কি দ্রব্য বিকাইত তাহার তালিকা এইরূপ,—

ডাবর বাটা শুক সংপুট দর্পন রস বাটিকা।
তাম্রহাণ্ডি রস পিত্তল কলস বারানসীর ত্রিপদিকা ॥
শঙ্খ বাটা বাটী সর্ব্বাঙ্গ থাল রসময় রসথুরী।
তিরোহুত গাড়ু তাম্র মুথার মণ্ডল শীতল পিত্তল ঝরি ॥
পাষাণ ভাজন অতি সুগঠন খড়িকা রঙ্গি কাপড়া।
উড়িয়া গৌড়িয়া চিরুণী বিচিত্র সাপুড়া ॥
টাড় পাঠা কড়ি হিরণ্য মাদলী কেয়ূর কঙ্কন রত্ন নুপুরে ॥
হেমকিরা পাতা বিক্রম মুকুতা কাশ্মীর দেশের পুরে ॥
তবক সুর পানবাটা কাকিদেশের বিচিত্র বেলি।
পাটনেত ভোট সকলাতে কম্বল শ্রীরাম থানি জমকা।
ভোট দেশের ইন্দ্রনীলমণি লক্ষীবিলাস তারকা ॥
লেখিতে না পারি যত দাসদাসী প্রেমের মন্দিরে থাটে।
যে যে দ্রব্য সব ভুবন দুর্লভ বিকায় নদীয়া হাটে ॥

পূর্ব্বোক্ত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে নদীয়ার বাটী, ঘর, দ্বার, দেউল দেহারা হাট বাজার সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানা জানা যায়, সে তথ্য আমাদের গৌরবের তথ্য কেননা চূর্ণে বিলেপিত সেই সব "দেউল দেহারা" "প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস তাহাতে "চঞ্চল পতাকা" সেই "নৃত্যগীত—আনন্দিত" "প্রতিঘর" "ইষ্টক রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গন সুসজ্জিত গৃহদ্বার" প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের গৌরবব্যঞ্জক। নদীয়ার হাটে যে সকল "ভুবনদুর্লভ" দ্রব্য বিকাইত তাহাও ত্রিহুট, উৎকল, কাশী, কাকি কাশ্মীর, ভোট দেশ প্রভৃতি বহুদূর দূরান্তর হইতে আনীত। ইহাও সেই তদানীন্তন পথ ঘাট রেল ষ্টীমার বিহীন কালের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও ক্রেতার আধিক্য না থাকিলে আর এ সকল দ্রব্য সংগৃহীত হয় নাই।

এই কালেই দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীনগণের মধ্যে নূতন করিয়া মেল বন্ধন করিয়াছিলেন। দেবীবরের পূর্ব্বেই কুলীনগণের মধ্যে দোষ সংস্পর্শ হইয়াছিল। তিনি এক এক প্রকার দোষাশ্রিত কুলীনকে এক এক দলে রাখিলেন এইরূপে দোষ মিলাইয়া শ্রেণীবিভাগ করা হইল বলিয়া ইহা "দোষ—মেলন" বা "মেল" নামে

খ্যাত হইল। এই মেলের সমষ্টি হইয়াছিল ৩৬ ছত্রিশ ইহাকে ছত্রিশের দাগও বলে * (১) ফুলিয়া (২) খড়দহ (৩) বল্লভী (৪) সর্ব্বানন্দ (৫) সুরাই (৬) আচার্য্য শেখরী (৭) পণ্ডিত রত্নী (৮) বাঙ্গাল পাশ, (৯) গোপালঘটকী, (১০) ছায়া নরেন্দ্রী, (১১) বিজয় পণ্ডিতী, (১২) চান্দাই, (১৩) মাধাই, (১৪) বিদ্যাধরী, (১৫) পারিয়াল, (১৬) শ্রীরঙ্গভট্টি, (১৭) মালাধর খান, (১৮) কাকুস্থী, (১৯) হরি মজুমদারী, (২০) শ্রীমন্তখানী (২১), প্রমোদিনী, (২২) দশরথ ঘটকী, (২৩) শুভরাজখানী, (২৪) নড়িয়া (২৫) রায়, (২৬) চট্টরাঘবী, (২৭) দেহাট্যা (২৮) ছয়ী, (২৯) ভৈরব ঘটকী, (৩০) আচম্বিতা (৩১) ধরাধরী, (৩২) রাঘব ঘোষালী, (৩৩) শুঙ্গ সর্ব্বানন্দী, (৩৪) শতানন্দ-খানী, (৩৫) চন্দ্রপতী, (৩৬) বালী। এই সকল গুলির মধ্যে ফুলিয়া ও আচম্বিতা মেল বর্ত্তমান নদীয়া জেলার মধ্যে পড়ে। ফুলিয়া শান্তিপুরের নিকট এবং "আচম্বিতা" চাকদহের পূর্ব্বকালীন সজ্ঞান্তর বিশেষ। কবি কৃত্তি-বাসের পূর্ব্ব পুরুষ মুখুটী বংশোদ্ভব গঙ্গানন্দ হইতে ফুলিয়া মেল সৃষ্ট হয়। যথা "মেল প্রকাশে—

"ফুলিয়া সরস কুল মেলের প্রধান। গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য সূর্য্যের সমান॥
হিরণ্য উদয় মধ্যে নাথাই নন্দন। গঙ্গানন্দ কুলে কৃতী ঘোষে সর্ব্বজন॥

"ফুলিয়া" র সরস কুল বলিয়া খ্যাতি থাকিলেও এই কালে তাহাতে দোষাঘাত হয় এবং ঐ দোষ ক্রমে নানা শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয় যথা "দোষ চন্দ্র প্রকাশে"

কাশীশ্বর-সুত হরিচন্দ্র ফুলিয়ার মুখুটী। ভাল বিভাছিল তার জুনিদ খাঁর বেটী॥

---

* মুলা পঞ্চাননের কারিকায় দেবীবর ঘটককে চৈতন্য দেবের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করা আছে এবং তাঁহার দ্বারা ছত্রিশ ভাগে কুল ভাগের কথাও লিখিত আছে ;—

"চৈয়ে ছোঁড়া দুষ্ট বড় নিমে তার নাম। রঘো বেটা মোটা বুদ্ধি ঘটে করে বাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ। মিথিলায় পক্ষধরে যে করেছে মাথ॥
তিনজনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ। ন্যায়, স্মৃতি, ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কানার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত। প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হতে গত॥
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়। মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে বড়॥
এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধূম। বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥
এই কালে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে। নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ। সেই হতে কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥"

বিধির বিধান ছিল পজা মরে রণ্ডে। ধরিল ছাড়িল ধরা আনচানের পিণ্ডে ॥
চতুর্ভুজ তাজে আর্ত্তি শ্রীগোপালে। নীলকণ্ঠ খোঁদা বাদ লেগে গেল গলে ॥
এই দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ি জন্মেজয়। তদবধি ফুলিয়া মেল হইল নিশ্চয় ॥
কাজীর বেটা জাফর আলী নবাই বাজারে। নান্দা বন্দা সুতা ঘরে আফিঙ্গ বিহরে ॥
পান দোষে নারায়ণ দাসে এতেক ফুলিয়া যায়। বীরভূমের বসন্ত ফুটিল কাব্যগায় ॥

আচম্বিতা মেলের দোষ সম্বন্ধে "দোষাবলীতে" এইরূপ লিখিত আছে ;—

আচম্বিতা হইল মেল নানা দোষ পাইয়া। গোবিন্দ সুত বিদ্যাধর গুড়ে করে বিয়া ॥
চক্রপাণি মুখে মেল হ'ল আচম্বিত। গৌতম ঘটক পালটী নাহি হিতাহিত ॥

এইরূপে হিন্দুর শীর্ষ সমাজে নানা দোষ প্রবিষ্ট হওয়ায় সমাজে ক্রমেই বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশ যদিও মুসলমানগণের অধীন ছিল তথাপি বহু ভূস্বামী স্বাধীন ভাবে নিজাধিকার শাসন করিতেন। এই সকল ভূস্বামীগণ ভুঞা নামেও খ্যাত হইতেন। ইঁহারা দেবদ্বিজে ভক্তিমান ছিলেন ও সর্ব্বদা দাননিরত ও শাস্ত্রচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। দেশে, এই সময়ে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীগণের মধ্যে সর্ব্বদাই কোন্দল হইত। মুসলমানীভাব ও ভাষা তখন নদীয়ায় বদ্ধমূল হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিদ্যার পূর্ব্বগৌরব অপেক্ষাকৃত মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকে গ্রাম অপেক্ষা সহরে তখন আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং দেবভাষা অপেক্ষা পারশীতে "জবান দুরস্ত" করিতে শিখিয়াছে। এই সময়ে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দর অত্যন্ত সুলভ ছিল। মুসলমান অধিকারে সমাজ ক্রমে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় তাহার পুনঃ সংস্কার করিতে চেষ্টা পান। তিনি স্বয়ং, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ ও কুশদ্বীপ এই চারি সমাজের সমাজপতি ছিলেন এবং লোকের জাতিদান ও জাতি গ্রহণ করিতে তুল্যরূপে শক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

মুসলমান অধিকারের ফলে সমাজে, তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনাপরতা প্রবেশ করিয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে তাঁহার পিতৃব্যের অধিকার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও এ বিষয়ে অপটু ছিলেন না—তাঁহার পুত্র শম্ভুচন্দ্র একবার তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার মৃত্যু রটনা করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। এই সময়েই রাজা রাজবল্লভ তাঁহার বিধবা কন্যার

পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে উহা ব্যর্থ করেন।

রাজসভায় তখন ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাপেক্ষা বিদ্যাসুন্দরের আদর অধিক ছিল এবং সাধারণ লোকেরও রামায়ণ বা চণ্ডীর গান অপেক্ষা "খেঁউড়ে" অনুরক্তি দেখা যাইত।

এই সময়ে দেশে স্থপতিবিদ্যার সবিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্ম্মিত বহু অট্টালিকা ও কারুকার্য্য খচিত দেবমন্দির সে সকলের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জনসাধারণ তখন অট্টালিকায় বাস করিত না, ইট গাড়িতে হইলে তখন রাজদ্বারে অনুমতি লইতে হইত।

নদীয়ার কুম্ভকারগণ মৃত্তিকার পুত্তলিকা গঠনে এই সময়ে সবিশেষ উন্নতি লাভ করে এবং শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ধুতি এই সময়ে জগদ্বিখ্যাত হয়। অপর দিকে উৎকৃষ্ট ঢাল তরোয়ালাদি, উৎকৃষ্ট খাড়া এমন কি কামানাদি প্রস্তুত করিতেও নদীয়ার কর্ম্মকারগণ সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে নদীয়ার প্রস্তুত একটী কামান মুরসিদাবাদ নবাবের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে থাকিয়া অদ্যাপি এই বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। *

কামান গাত্রে, যে কর্ম্মকার ইহা প্রস্তুত করিয়াছে, যিনি কুঁদিয়া হরপ লিখিয়াছেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার আদেশে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে এই তিন জনের নামই ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। কি সূত্রে এই কামানটী মুরসিদাবাদের নবাব গৃহে

---

* Vide note by Pandit Haraprasad Sastri in the proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1893. Page 24-26, :—

"Mr. Beveridge found in the armoury of the Nawab of Murshidabad a brass gun of native manufacture. It is mounted on a carrige and stards in armoury on the ground floor of the palace. It is some 3 feet in length and is of small bore 4 or 6 pounds. It has floral decoration. The head and the mouth are in the shape of a demon or a monoster's head with long pointed ears a heman face and a crocodile's jaws. There is an inscription on it in raised Bengali letters in a shield on the upper part of the gun and about the middle.

The inscription runs as follows :—

স্থান পাইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে বলা না যাইলেও, ইহা নবাব আলিবর্দ্দিকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপহার বা এমনি কিছু একটা অনুমান করা যাইতে পারে।

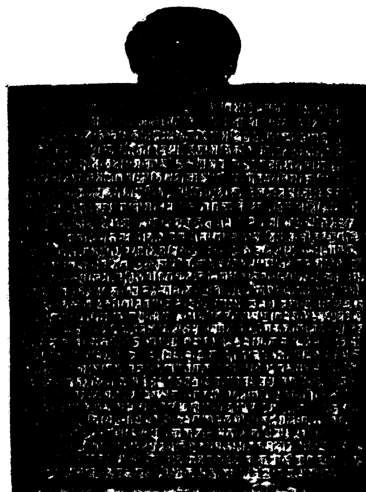
এই সময়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই পরিচ্ছদে মুসলমানী ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। পুরুষে বাটীতে সর্ব্বদা ধুতী ও গামোছা (দোসুতী) ব্যবহার করিলেও, কোনও উৎসবে বা রাজদরবারে যাইতে হইলেই "আবা" "কাবা" "চোগা" "জোব্বা" প্রভৃতিতে দেহযষ্টী আবৃত করিতেন। "চাপকান" "মচকান" "চুড়ীদার পায়জামা" পায়ে "নোকাদার জুতা" সৌখীনতার পরিচয় দিত। এই সময়ে হিন্দুমাত্রেই কর্ণবেধ করিতেন সুতরাং কানে একটা আভরণ অন্ততঃ দুটী সোনার ওজি সকলেই ব্যবহার করিতেন। ধনীলোকে অঙ্গুলে আংটী গলায় হার, কোমরে গোট, বাহুতে নবরত্ন বাজু, পাগরীতে শিরপেচ কল্‌সা এবং কেহ কেহ মণিবন্ধে বালাও ব্যবহার করিতেন। অলঙ্কার হীন দেহ কেহই রাখিতেন না অন্ততঃ কোমরে একটা ঘুনসী তাহাতে একটা চাবী সবাই পরিতেন। আটপৌরে বাবুয়ানা পোষাকে গায়ে মেরজাই, মাথায় কামরাঙ্গা টুপী, পরিধানে ধুতী ও স্কন্ধে উত্তরীয় পদে পাদুক ব্যবহৃত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে ধুতী উত্তরীয় বা শীতকালে ঐ উত্তরীয়ের উপর কম্বল বনাৎ বা শাল ও পদে খড়ম ব্যবহার করিতেন।

দেহের পারিপাট্টে বিশেষ যত্ন সকলের দেখা যাইত। শরীর সুস্থ থাকিবে বলিয়া "ঋতু-হরিতকীর" ব্যবহার ভদ্র সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে শরীরও থাকিত ভাল। আয়ের অধিকাংশ এখনকার মতন ডাক্তারের ঘরে উঠিত না। জ্বরাধিকারে সাধারণতঃ লঙ্ঘনই ব্যবস্থা ছিল তাহাতে উপসম না হইলে টোটকা বা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হইত সর্ব্বশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈদ্য ডাকা হইত। এ সময়ে মুসলমান অনুকরণে কেহ বা "হাকিমীর" আশ্রয়ও লইতেন।

জয়
কালিকা
য ও তৎ সৎ

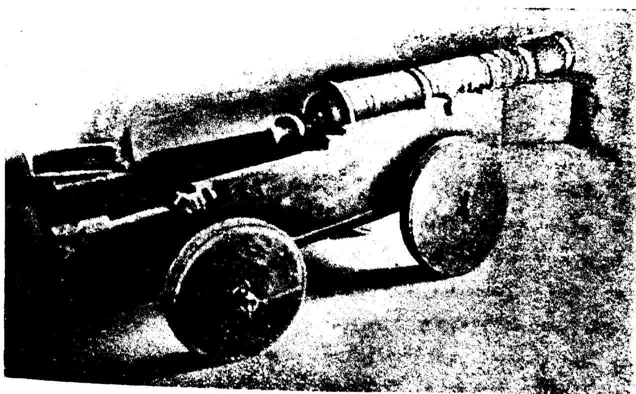
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র রায় মহারাজা মহাশয় ধীরাজ	শ্রীযুক্ত রূপরাম চট্টোপাধ্যায় মুত্রাঙ্কিত

কিশোরদাস কর্ম্মকার



লক্ষ্মণ সেন দেবের আনুলিয়ায় আবিষ্কৃত তাম্র শাসন।





নদীয়ায় ঢালাই কামান।

সৌখীনের সম্প্রদায়ের ভিতর আতর, গোলাপ ও ফুলেল এর ব্যবহার খুবই চলিয়াছিল। তবে সাধারণতঃ "কুঙ্কুম, কস্তুরী জাফরানই বিশেষ প্রচলিত ছিল দরিদ্রে শুধু চন্দন মাখিত। কেহ কেহ চন্দনের সহিত মৃগনাভী, বা মুচুকুন্দ কি চম্পক কি কোয়ার রেণু মিশাইয়া, তাহাই কাঁচা হলুদ, কাবাব চিনি খাঁড়ি মসুরী বা কেলেজিরে সর বা নবনীতের সহিত বাটিয়া দেহের পরিমার্জ্জনা করিতেন। মোট কথা দেহের পারিপাট্য এই সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তাহাতে মুসলমানী প্রথা আসিয়া যোগ দিয়াছিল।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেও মুসলমানগণের অনুকরণে নানাপ্রকার রৌপ্য ও সুবর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে আরম্ভ করে। অলঙ্কারে হীরা মুক্তা ব্যবহারের প্রথা এই সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তপুরবাসীনীরা সক্ করিয়া পেশোয়াজ ইত্যাদি পরিতেন। নদীয়ার কোনও কোনও স্থানের স্ত্রীলোকগণের খোপার পারিপাট্যও এসময় প্রচলিত হয় এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে যথা,—

"উলার মেয়ে কুল কুলুটী। নদের মেয়ের খোপা॥
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়। গুপ্তিপাড়ার চোপা॥"

অর্থাৎ উলার মেয়ে কুলের বড়াই করে, নদের মেয়ে বড় বাবু, শান্তিপুরের মেয়ে কলহ পটু ও গুপ্তিপাড়ার মেয়ে বাচাল।

উলা নিবাসী "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী" প্রণেতা প্রায় সমসাময়িক কবি গঙ্গাদাস তদানীন্তন স্ত্রীলোকগণের ব্যবহার্য্য অলঙ্কারের এইরূপ তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

"চেড়ি, চাঁপি, মাকড়ি, কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পড়ে হীরার কমল নহে ভুল॥
নাসিকাতে নথ করে মুক্তা চুণী ভাল। লবঙ্গ বেশরে কার মুখ করে আল॥
কিবা গজ মুক্তা কারও নাসিকায় দোলে। দোলে সে অপূর্ব্বভাবে হাসির হিল্লোলে॥
কুন্দ কলিকার মত কার দন্তপাতি। দাড়িম্বের বীচ মুক্তা কার দন্ত ভাতি॥
মুখ শোভা করে কার মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥
পড়িল গলায় কেহ তেনরী সোনার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥
ধুকধুকী জড়াও পদক পরে সুখে। সোনার কঙ্কন কার শঙ্খের সম্মুখে॥
পতির আয়ত চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পয়ান বাঁধান লোহা সকলের হাতে॥
পাতামল পাসুলি আঙট বিছা পায়। গুজরীপঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥"

উৎসবকালে বা রাজদরবারে কি কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে যাইতে হইলে মস্তকে একটা যে কোনও রকমের উষ্ণীষ সকলেই ব্যবহার করিতেন এ প্রথার অবশেষ এখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্মে উষ্ণীষের স্থলে মাথায় একখানা "গামোছা" বন্ধন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতীয়গণের মধ্যে কচিত দু একজন ক্ষৌরকার পরামাণিকের মধ্যে মাথায় পাগড়ি বন্ধন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমাণিকগণের তখন সমাজের উচ্চ নীচ সকলেরই সহিত বিশেষ মেশামিশি থাকায় তাহাদের মধ্যে এই প্রথা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহারা তখন প্রকৃতই নরসুন্দর নামের অধিকারী ছিল, তাহাদের কার্য্যও যথেষ্ট ছিল। লোমশ স্থান কামাইয়া লোমনাশ করিতে আবার লোমহীন স্থানে লোমোৎপাদনে তাহাদের বহু সময় ব্যয়িত হইত। মাথার চুলের তদ্বির ব্রাহ্মণেতর জাতীয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণগণ প্রায়শঃ মাথায় ঝুটী রাখিতেন, সে ঝুটীর বড় বড় কৃষ্ণ কেশদাম নানা ঢঙ্গে পৃষ্ঠের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত লতাইয়া পড়িত প্রতি একাদশীতে সে ঝুটীর কেয়ারী হইত, সাজিমাটি আমলা ও তেঁতুল দিয়া তাহার পরিষ্কার সাধন করা হইত। অধ্যাপকমণ্ডলী ও পুরোহিত মহাশয়েরা ও বৈদ্যগণ ভ্রূর উপর হইতে এক বিঘৎ পরিমাণ স্থান কামাইয়া ফেলিতেন। ইঁহাদের মধ্যে ওষ্ঠলোম বা শুম্ফ রাখাও নিন্দনীয় ছিল তবে তান্ত্রিক বামাচারী ব্রাহ্মণে দাড়ী রাখিতেন। 'টিকির' প্রচলন হিন্দুগণের মধ্যে বিশিষ্টরূপই ছিল। ব্রাহ্মণ মাত্রেই শিখা রাখিতেন এবং বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাক প্রভৃতি জল-চল্ সকল জাতিতেই শিখা রাখার প্রথা ছিল। শূদ্রের মাথায় শিখা ও গলায় মালা (কণ্ঠি) না থাকিলে ব্রাহ্মণে তাহার জলগ্রহণ করিতেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতীয়ের মধ্যে শিখা রাখার প্রচলন এত অধিক থাকিলেও তাহাদের কেশের, গোঁফের ও ভ্রূর বাহার খুব ছিল। বাবরী কাটা চুল প্রায় সকলেই রাখিত এখন যেমন মস্তকের সম্মুখের চুল বড় রাখিয়া পশ্চাৎদিকের চুল ছোট করিয়া কাটা ঢং হইয়াছে তখন এমন ছিল না বরং তদ্বিপরিত প্রথা ছিল অর্থাৎ তখন মাথার সম্মুখের কেশ ছোট করিয়া পিছনে ক্রমশঃ বড় রাখা হইত কেহ কেহ আবার ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর খানিকটা কামাইয়া রাখিতেন ও স্নানাদির পর তাহাতে চন্দন তিলবাটা ও গোলাপ দিতেন। দাড়ি ও গোঁফের তোবাজ তদ্বিরও কম হইত না মুখের

দুই পার্শ্বে গালপাট্টা বা বড় জুলফী শোভা পাইত তবে বৃদ্ধেরা সকলেই প্রায় কেশ শ্মশ্রুহীন মুখ করিতেন। টানা ভ্রূ তখনকার সখের ঢং ছিল, ছাটিয়া, কাটিয়া বা ভ্রূহীন স্থানে ক্ষুর দিয়া কামাইয়া ভ্রূ গজাইয়া তুলিয়া টানা ভ্রূ গড়া হইত।

এই সময়ে ডন, কুস্তি, লাঠিখেলা, সড়কী, বল্লম, রায়বাঁশ, তলোয়ারখেলা প্রভৃতির ভদ্রাভদ্র সকলের মধ্যেই অত্যন্ত প্রচলিত ছিল, দেশের দস্যুভীতিই এ সকলের সমধিক প্রচলনের কারণ। দস্যুর ভয়ে লোকের সংস্থান থাকিলেও কেহ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত না, পাকাবাটী প্রায়ই ছিল না যাঁহাদের ছিল তাঁহারাও দস্যুভীতির জন্য বড় দুয়ার জানালা রাখিতেন না, দ্বিতলে যাহাদের বাসের ঘর থাকিত তাঁহারা সিঁড়ির মুখে চাপা দুয়ার রাখিতেন আর সে দুয়ারের তক্তাও ডুমুরের কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইত, কেন না ডুমুরের কাষ্ঠে সহজে কুঠারের দাগ বসে না। গৃহস্থে কলসীর মধ্যে টাকা ও অলঙ্কার রাখিয়া মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিতেন বা চৌকীতে বাক্স নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর রাত্রিতে শয্যা পাতিয়া শয়ন করিতেন। এইরূপ তক্তাপোষের বাক্সের নাম ছিল "ইস্‌-কাতর' ও ঐ তক্তাপোষের নাম ছিল "মাইপোষ"। বড় বড় জমীদারের ঘরে জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যাদি বেশীর ভাগ রাত্রিকালেই সমাহিত হইত, কেন না তাহা হইলে লোকজন সকলেই সজাগ থাকিত সুতরাং দস্যুভয়ও অল্প থাকিত। যেমন দস্যুভয় ছিল তেমনি দেশের লোকেও শক্তিশালী ও শস্ত্রপাণি ছিল সুতরাং লোকে বিশেষ অক্ষম বা ভীরু ছিল না। একদিকে ডন কুস্তীগীরিতে সকলে যেমন পটু ছিলেন অপরদিকে পথ চলিতে, দৌড়াইতে, সন্তরণে গঙ্গাপার হইতেও সকলে বিশেষ মজবুত ছিলেন। এখনকার মত পদে পদে রেলগাড়ী ট্রামগাড়ী মোটরগাড়া বা ঘোড়ারগাড়ী কি বাইসিকেলের অস্তিত্বও ছিল না আবার ম্যালেরিয়া পীড়িত হইয়া এমন অক্ষম ও তখনকার কেহ ছিলেন না সুতরাং একদমে ১০।২০ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করাও তখন আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। তখন যানের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল গো-যান ও অশ্ব এবং জমীদারগণ হাতীও পুষিতেন। পাল্কীর চলনও বেশ ছিল। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ পাল্কীতে বা ডুলিতে চড়িতেন। বাণিজ্যাদি নদীবক্ষে নৌকাযোগেই সম্পন্ন হইত; অন্নসন্ন দ্রব্যাদি বলদের পৃষ্ঠে ছালা বোঝাই দিয়া লইয়া যাওয়া হইত।

শ্রীহরিদাস (যবন) ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত হরিরলুটের প্রসার এই সময়ে নদীয়ায় খুব অধিক হইয়াছিল। যবনের অনুকরণে সত্যনারায়ণের সত্যপীর আখ্যায় সিরনীর প্রচলনও এই কালের মধ্যে হয়। জাঁকজমকের সহিত বারইয়ারী পূজার সৃষ্টিও এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে কৃষ্ণনগরের 'স্বনামখ্যাত' মল্লিকগণ কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজা স্বয়ং এই পূজার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। বারইয়ারী তলায় উৎসব মণ্ডপ দেবদারু পাতায় কদলী বৃক্ষে পূর্ণকুম্ভে ও "রচনায়" ফলে সুসজ্জিত হইত, কাঁদি সমেত রম্ভা, কাঁদি সমেত ডাব, শাখা সহিত বাতাবীলেবু ও অন্য ফল পূজাগৃহে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত উহারই নাম "রচনা" চণ্ডীমণ্ডপ নানারূপে বিচিত্রিত "আলিপণায়" চিত্রিত করা হইত। রাত্রে সর্ষপ ও রেড়ীর তৈলের তরবেতর আলোক দেওয়া হইত।

এইকালে মেয়েরা বালিকা বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ ব্রতাদি গ্রহণ করিতেন। সুদূর পল্লীতে এখনও ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। তীর্থ যাত্রা এখনকার মত সুলভ ছিল না সুতরাং সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকদের প্রায়ই তীর্থ দর্শনাদি ঘটিত না। পুরুষেও পদব্রজে বা নৌকাযানে বহু কষ্টে ও বহু দিনে উহা সমাধা করিতেন, কিন্তু তাহাই কয়জনের ভাগ্যে ঘটিত বা একজনে কয়টা তীর্থই বা দেখিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথাই তখন সমাজে প্রচলিত ছিল, এখনকার মতন "ভাই, ভাই, ঠাঁই, ঠাঁই" তখন ছিল না। বংশে একজন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি জন্মিলে তাহার রোজগারে ২০ জন বসিয়া খাইত।

যাহার যেমন উপার্জ্জন তিনি তেমনি ক্রিয়া কর্ম্মাদিতে ব্যয় করিতেন। যাহা হউক কিছু কীর্ত্তি রাখিয়া মরিতে পারিলেই তখন সকলে সার্থক জন্ম মনে করিতেন। শালগ্রাম শিলা বা কোনও বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্রেই গৃহে স্থাপনা করিতেন। অতিথি অভ্যাগতের সম্মান ও আদর যত্ন সকলেই করিতেন।

লোকে সাধারণতঃ অল্পে সন্তুষ্ট ছিল সুতরাং অধিক উপার্জ্জনের জন্য বিদেশ গমন প্রায় কেহই করিতেন না। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান থাকিলেই ভরা পেটে সকলে হাসি তামাসা করিয়া বেড়াইতেন। বিকালে বসিয়া তাস, দাবা পাসা সকলেই খেলিতেন। ছেলেরাও কপাটী, ছাঁই, চুঁই, ডাণ্ডাগুলি

বাস্তাবন্দী, চাকলুটী খেলিত। জলে পানকৌড়ী খুবই আমোদের ছিল সে সব খেলা এখনকার ছেলেরা খেলিতে পারেও না, জানেও না।

ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাবান গৃহী মাত্রেই অরুনোদয়ের পূর্ব্বে উঠিতেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা অনেকের মধ্যে প্রাতঃস্নানের প্রথা এসময় প্রচলিত ছিল। বাটীর মেয়েদের রাত্রি থাকিতেই উঠিতে হইত। নিতান্ত বড় মানুষের বাটী না হইলে শৌচাগার প্রায় কোন বাটীতে ছিল না, সুতরাং গাত্রোত্থান করিয়াই ঝারি, গাড়ু বা অন্য কোন জলপাত্র হাতে লইয়া ময়দানের দিকে বা পুষ্করিণীর পাড়ে যাইতে হইত। পরে নিমের বা কচার দাঁতনের সাহায্যে দন্তধাবন করিয়া স্নানের আয়োজন হইত, স্নানের পর সন্ধ্যা তর্পণ শেষ করিয়া সকলে বাটী ফিরিতেন, বাটীতে গৃহ দেবতা থাকিলে এইবার তাঁহার পূজা করিতে হইত; পূজা সারিয়া এক কাঠা ছোলা চাউল ভাজা চিবাইয়া যে যাহার বিষয় কর্ম্মে রত হইতেন, প্রায়শঃ লোকে চাষবাসের তদ্বিরে মন দিতেন, মাঠ হইতে দেড় প্রহরের সময় গৃহে ফিরিয়া সরবৎ পান করিতেন পরে গৃহ কর্ম্মে মন দিতেন। বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পরে আহার হইত; সে আহার এখনকার হিসাবে "রাক্ষসের আহার"। আহারের পর আড়াই দণ্ড নিদ্রা, অপরাহ্নে আবার সেই কৃষিকার্য্যের বা অন্য কার্য্যের আলোচনা সারিয়া সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া আমোদ উৎসবে সকলে রত হইতেন। তখন সকল পল্লীতেই সকল জাতীর মধ্যে কতকগুলি করিয়া একত্র সমবেত হইবার স্থান বা আড্ডা থাকিত এই আড্ডাই তখনকার সমাজ শাসন করিত। গ্রামস্থ বিভিন্ন আড্ডার মধ্যে কলহ ও দলাদলী খুবই চলিত সুতরাং সমাজেও দলাদলী খুব ছিল। সন্ধ্যার সময় সকলেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আড্ডায় মিলিত হইয়া নানাবিধ বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ করিতেন কচিৎ কোথাও নেশা ভাঙও চলিত মদের চলন খুবই কম ছিল, তামাক সিদ্ধি ও গাঁজারই তখন রাজ্য ছিল। সঙ্গীতের চর্চ্চা তখন খুবই হইত। বীণা তম্বুরা, বেহালা ও সেতারের আদর খুব ছিল। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে খেয়াল টপ্পা কীর্ত্তন, পাঁচালী কবি ইত্যাদির আলোচনা চলিত এবং ইতর জাতীয়-দিগের মধ্যে মনসার ভাষান ও বেহুলার গানের চলন ছিল। রাত্রি দেড় প্রহরের পর প্রায়ই সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেন এবং কিছু জলযোগ

করিয়া শয়ন করিতেন। সেকালে লোকে প্রায়ই একাহারী ছিল, সেই একাহার এখনকার দশজনের আহার। এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে লোকে যথার্থই ভোজন বিলাসী ছিল। অলঙ্কার, ভাব ও ভাষায় যেমন মুসলমানী ভাব প্রবেশ করিতেছিল, তেমনি আহার্য্য তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও যাবনিক আহার্য্যের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই কথিত আছে স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভোজন-বিলাসীগণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার নিমিত্ত প্রত্যহ নানাবিধ সুস্বাদু চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি প্রস্তুত হইত; তিনি তাহা হইতে যথেচ্ছা গ্রহণ করিতেন। "হৈয়ঙ্গবীন" অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের গাভী প্রত্যূষে দোহন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নবনীভাগ গ্রহণ করিয়া সদ্য যে ঘৃত প্রস্তুত হয় তিনি প্রত্যহ তাহাই ব্যবহার করিতেন। অন্নদামঙ্গল হইতে আমরা এই সময়ের একটী লোভনীয় রসনা আপ্রকর আহার্য্য তালিকা সংগ্রহ করিতেছি।

"হাস্তমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক। শড় শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রাঁধে ঘনতর ছোলা অড়হরে। মুগ মাষ বরবটি বাটুলা মটরে॥
বড়াবড়ি কলা মুলা নারিকেল ভাজা। দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট ভাজা।
কাঁটালের বীজ রাঁধে চিনিরসে বুড়া। তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে। আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা ঝোল। শীকপোড়া 'ঝুড়ী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রাঁধে চিতল মলই। কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই।
মায়া সোনা খড়কীর ঝোল ভাজা সার। চিঙ্গড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার।
কণ্ঠ রাঁধি রাঁধে কই কাতলার মুড়া। তিত দিয়া পচা মাছে রাঁধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শোল মাছ ঝোল চড়চড়ী। আড়ি রাঁধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী।
রুই কাতলার তৈলে রাঁধে তেল শাক। মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক।
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা। অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত। ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম। গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম।
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা। কালিয়া কোলমা বাগা সেকচী সমসা॥
অজ মাংস শীক ভাজা কাবাব করিয়া। রান্ধিলেন মুড়া আগে মশলা পুরিয়া॥
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা। মৎস্য মূলা বড়াবড়ী চিনি আদি দিলা॥
আম আমসত্ব আর আমসী আচার। চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মাদার॥
। রাঁধিয়া বাবা আরম্ভিলা পিঠা। সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥"

বড়া এলো আসিয়া পিযুষী পুরী পুলী। চুষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী॥
কলা বড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজা পুলী। সুধারুটী মুচমুচী লুচী কতগুলি॥
পিঠা হইল পরে পরমান্ন আরম্ভিল। চালু চিনা ভুরা রাজবড়া চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রাঁধে আর। বিষ্ণুভোগ রাখিলা রাঁধুনী লক্ষ্মী যার॥'

ভূত, পিশাচ, ডাইন প্রভৃতির উপদ্রব ও ওঝা বা রোঝা দ্বারা তাহার নিরাময় প্রথা, শৃগাল কুক্কুর ও সর্প প্রভৃতির বিষ চিকিৎসায় মন্ত্রৌষধির ব্যবস্থা, নানাবিধ তুকতাক দ্বারা ব্যাধি সারান ও অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি নিবারণে মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রথা এই সময়ে সমধিক প্রচলিত হয়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরেই ইংরাজরাজ এদেশ অধিকার করেন। ইঁহাদের সুশাসনে নদীয়ায় পশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশের লোকের কূপমণ্ডূকত্ব অপবাদ ঘুচিয়া গিয়াছে, বিদেশে অর্থার্জ্জনে সকলেরই স্পৃহা বাড়িয়াছে, চৌর ডাকাতের উপদ্রব রহিত হইয়া দেশের সুখশান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, রাজদ্বারে বিচার সহজলভ্য হওয়ায় অত্যাচারীর অত্যাচার লোপ পাইয়াছে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, শিল্প, ভাষা প্রভৃতির উন্নতির দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতীগণের সভ্যতার অক্ষম অনুকরণ করিতে যাইয়া সমাজ না প্রাচ্য না প্রতীচ্য এক নবরূপ ধারণ করিতেছে। প্রাচীন সমাজ-বিহিত যে যার জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সকলেই আত্মোন্নতির উপায় দেখিতেছে।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রথার সহিত আধুনিক নর নারীর জীবনী তুলনা করিলে পুরুষের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতির যেমন সম্যক্ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, স্ত্রীলোকের জীবনে তত অধিক পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয় না; অন্তঃপুরে কেবল অবরোধ প্রথার কঠোরতা রেল-ওয়ের প্রচলন, বিদেশ গমন, ইত্যাদি নানা কারণে কথঞ্চিত হ্রাস হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রমহিলাগণকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া ট্রেণে তুলিতে ও ট্রেণ হইতে নামাইতে প্রতি ষ্টেষনে পর্দ্দা ও পাল্কীর প্রাচুর্য্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হইত। আর এখন মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোকেরা বিনা পর্দ্দা বা পাল্কী অনায়াসে যত্রতত্র গমনাগমন করিতেছেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে, এখন ক্রমশ

নদীয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে বৎসরে বহু সংখ্যক বালিকা লেখাপড়া শিখিতেছে কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে এমন কি বর্ত্তমানকাল হইতে ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষা করা সমাজের চক্ষুতে নিতান্ত দূষনীয় ছিল। কচিৎ কোন বিধবা রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন। অধুনা বালিকা শিক্ষার বিস্তারের সহিত শৈশব বিবাহ একেবারে উঠিয়া না যাইলেও বিলক্ষণ কমিয়া গিয়াছে। পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা একরূপ লুপ্ত প্রায়। এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে স্ত্রীলোকের মধ্যে মৃতপতির সহমরণ বা স্বামীর বিদেশে মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুমরণ প্রথার প্রসার বিলক্ষণ ছিল. এমন কি দেশে ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইলেও প্রথম প্রথমে বঙ্গের প্রতি গ্রামেই প্রতি মাসে দু চারিজন রমনী এই নৃশংস প্রথার সম্মুখে বলীপ্রদত্ত হইতেন, যাঁহারা মৃতপতির সহ বা অনুমরণ না করিতেন তাঁহারা আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া সংসারে একরূপ জীবন্মৃত হইয়া রহিতেন। মনু প্রবর্ত্তিত এই নির্ম্মম প্রথার প্রসার কমিয়া আসিলে বর্ত্তমান যুগের মনু. স্মার্ত্ত রঘুনন্দন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমাজের বক্ষে যে ভয়ঙ্করী চিতা-বহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিলেন তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাকে গ্রাস করিয়া পরে খৃষ্টীয় ১৮২৯ অব্দে ইংরাজ শাসনকর্ত্তা মহামনা লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। * এই সকল নির্ম্মম কাহিনীর অনেকগুলি, ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে নদীয়ার মধ্যে শান্তিপুর, চাকদহ, নবদ্বীপ প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ স্থান গুলিতেই ইহার শোচনীয় অভিনয় বেশী হইত।

---

* In short two women on an average calculation were to be destroyed every day in the year.

* * *

Speaking roundly more than 500 women were allowed to imolate themselves every year between 1814 & 1829, while the British government patronized the show. vide W. H. Carrey's The good old age of Honble John Company.

Lord William Bentinck carried a regulation in council on December 4,—1829, by which all who abetted Suttee were declared guilty of "culpable homicide."

Vide Imperial Gazetter of India (New Edition) The Indian Empire Vol II. Page 498.

যে দিন কোথাও সতী দাহ হইত সে দিন দিকদিগন্তর হইতে দলে দলে নারী পুরুষ আসিয়া সেই শোচনীয় ঘটনা স্থলকে যেন এক পবিত্র তীর্থে পরিণত করিত। স্ত্রীলোকেরা একবার সেই "সতীমা"র পদধুলী লইতে পাইলে, সেই সতী হস্ত দত্ত সিন্দুর একটুকু পাইলে, বা সেই সতীর পরিহিত বস্ত্রের একটুকু ছিন্নাংশ পাইলে নিজেদের সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতেন। সতী প্রণয়ে এই জন সমুদ্র মধ্য হইতে বাহির হইয়া জাহ্নবীর পুতসলিলে নিজে স্নান করিয়া পুত্রাদির সাহায্যে মৃত স্বামীকে স্নান করাইয়া সজ্জিত চিতায় স্বামীকে তুলিয়া দিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া সিন্দুরে আরক্ত সীমন্ত হইয়া যথা সাধ্য দান ধ্যান করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি ও গভীর বাদ্যোদ্দমের মধ্যে সূর্য্যার্ঘ দিয়া চিতা প্রদক্ষিণান্তর চিতারোহণ করিতেন পরে ইহজীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা স্বামীর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বামী-নারায়ণের ধ্যানে তন্ময় হইতেন, প্রায়শঃ হাসিতে হাসিতে স্বামীর পদ হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহারা পুড়িয়া মরিতেন, কচিৎ কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হইত, চিতা ত্যাগ করিয়া কেহ কেহ বা অন্যত্র পলাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সে চেষ্টা বিফল হইত। * এই মর্ম্মন্তুদ ভয়ানক প্রথা রহিত করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রকৃতই ধন্য হইয়াছেন সমগ্র নদীয়ায় এ যাবৎ কত সহস্র সহস্র সতীদাহ সমাহিত হইয়াছে তাহার ধারাবাহিক বিবরণ পাইবার কোনও উপায় নাই। তবে ব্রিটীশ শাসনাধিকার কালের মধ্যে খৃঃ ১৮১৬ হইতে খৃঃ ১৮২৯ পর্য্যন্ত অনেকগুলি ঘটনা ইংরাজ দপ্তরে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে দেখা যায় যে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৫৬ জন ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ৮৮ জন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮০ জন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৪৭ জন ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ৫৯ জন স্ত্রীলোক এবং নদীয়া

* ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামনাথ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে উলা নিবাসী মুক্তারাম নামক জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার তের জন সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার সহমৃতা হয়েন। যখন চিতাগ্নি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল তখন তথায় তাঁহার আর দুইটী স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের একজন সহমৃতা হইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু যখন সূর্য্যার্ঘ্য দিবার মন্ত্র পাঠ হইতেছে তখন তাঁহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল, সুতরাং তিনি তথা হইতে পলাইতে উদ্যত হইলে, মুক্তারামের এক পুত্র ঐ বিমাতাকে ধরিয়া প্রজ্জ্বলিত পিতৃচিতানলে নিক্ষেপ করিলেন অপর স্ত্রীটী তথায় দাঁড়াইয়া ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন উক্ত পুত্রটী তাঁহাকেও চিতার আগুনে ঠেলিয়া দিলেন।

জেলাতে প্রকাশ্যভাবে "সতীদাহ" ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৫৬ জনের মধ্যে এক শান্তিপুরের সংখ্যাই ছিল ২০ জন। এই সকল সতীর বিবরণ ইংরাজী বহুপুস্তকে দেখা যায় * এই সকল স্থানে এই সময়ে যে কেবল মাত্র সতীদাহের জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল এমন নহে। নির্ম্মম ভাবে গঙ্গাসাগর সঙ্গমেত এবং গঙ্গাবক্ষে পুত্র কন্যা বিসর্জ্জন; † এবং বৃদ্ধ জরাতুর ব্যক্তিকে তীরস্থ করিবার জন্যও ইহাদের খ্যাতি কম ছিল না; পূর্ব্ব ও উত্তর অঞ্চলের বহু দূর দেশ হইতেও এই সকল স্থানে মৃত অথবা মৃতকল্প ব্যক্তিগনকে গঙ্গা সমর্পনের নিমিত্ত আনয়ন করা হইত। ‡ মৃত্যু আসিয়া প্রায়শঃ

* স্থানাভাবে দু একটী মাত্র এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে,—

A Kulin Cuandra Bandopadhya was killed here 30 years ago, he was married to 100 wives and was murdered by the brother of one of them on account of his profligate conduct towards his sister. 8 of his wives performed Suttee on his funeral pyre.

In 1799 at Bagnapara 37 widows were burnt with their husbands, the fire was burning 3 days; on the first day 3 were burnt, on the second 15, and on the third day 19; th[illegible]ceased had over 100 wives.

Vide Calcutta Review Vol VI nor XI & XII
Page 398—448.

† In 1813 two women cast their children into the river, but the fathers took them out again and paid a certain sum of money to the Bramhins for their ransom. People from Decca and Jessore used to throw their children to the Ganges here (Nadiya).

Calcutta Review Vol VI Page 421—29.

Chogdah as well as Bansberia and Gangasagar were formerly noted for human sacrifices by drowning the aged, and children were thrown into the river; In November 1801 some pilots saw 11 persons at sagar throw themselves to sharks and that month. 29 persons were devoured by them. It is still a famous place (A. D. 1846) for burning the dead and for bathing. Corpses are brought there from all parts of the country, often from great distances when they become putrid ere they reach Chogdah, the persons carrying the corpse are not allowed to enter a house, must pay double ferry fare, and must take fire with them as no one will give it. মৃতের সংকারীগণের পক্ষে এ নিয়ম নদীয়ার এখনও প্রচলিত আছে। Travanier mentions seeing corpses brought to Chogdah from a place 20 days distance all ratton and smelling dreadfuly.

‡ Chogdah has been notorious for ghat murders, there are various

এই সকল অন্তিম শয্যাশায়ী নর নারীর ভব যন্ত্রনা দূর করিয়া দিত ; কিন্তু এত কষ্ট সহিয়াও যাঁহাদের প্রান বাঁচিত তাঁহারাও আর দেশে ফিরিতেন না এই চাকদাহ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে ভাগীরথী তীরে বাস করিয়া সদা শমনের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিতেন ; শুনা যায় শান্তিপুরের লোক সংখ্যার বৃদ্ধি নাকি এইরূপ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত নর নারী লইয়া হইয়াছিল * সুখের বিষয় এই নির্ম্মম প্রথাও অধুনা লুপ্ত প্রায়। এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগেই ইংরাজগন এ দেশ অধিকার করেন, কোম্পানির রাজত্ব হইলেও দেশ হইতে তখনও পূর্ব্বকার নরবলি প্রথা প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই তখনও এমনকি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোপনে ও প্রকাশ্যে নরবলি চলিতেছিল দেখা যায় † ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে

---

persons now living there, who have been taken to the river to die, but have recovered & are outcastes.

Vide Calcutta Review vol VI page 411.

* When a patient, thus situated, happens to recover, he considers that he has, as it was, acquired a new life, and thenceforth all his former relations and friends are treated as strangers; he never returns to the dwelling in which he had formerly resided, but wanders down the ganges, until he arrives at Santipore near Calcuttta, where he settles himself; and it is a curious fact, that the whole population of Santipore is composed of such persons.—Honigberger.

(বিশ্বকোষ Part I, page 315).

† Human sacrifices were also frequent even as late as 1832, a Hindu at Kalighat (near Santipore) sent for a Musalman barber to shave him, he asked him afterwards to hold a goat while he cut off its head as an offering to Kali, the barber did so, but the Hindu cut off the barber s head and offered it to Kali, he was sentenced by the Nizamut to be hung. A few years ago a number of Bramhins assembeled at Santipore and began to drink and carouse after it, one proposed a sacrifice to Kali, they assented, but having nothing to sacrifice one cried out where is the goat, on which another more drunken than the rest exclaimed, I will be the goat and at once placed himself on his knees, one of the company then cut off his head with the sacrifical knife, when they woke the next morning from their drunken fit they found the man with his head off, they had the corpse taken to the Ghat burned and reported the man died of Cholera.

Vide the Banks of the Bhagirathi.

Vol. VI. Calcutta Review No. XI and XII.

ও "তপ্তমুক্তি" বা অত্যুষ্ণ ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা দোষী বা নির্দ্দোষী অবধারণ করার প্রথা দৃষ্ট হয়। * এই সময়ে সমাজিক শাসন পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়ৎ পরিমানে শিথিল হইলেও দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। হিন্দুর পক্ষে যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহার বা যাহা সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইত তাহার যথোচিত শাস্তি বিধান এ কালেও চলিত, এই কালে কৃষ্ণনগরে কোনও ব্রাহ্মণ সন্তানকে কোনও দুরাচার বলপূর্ব্বক গোমাংস ভক্ষন করাইলে তদানীন্তন বাঙ্গলার সর্ব্বময় কর্ত্তা পলাশী বিজয়ী লর্ডক্লাইব সাহেবের আন্তরিক যত্নেও কোনও ব্রাহ্মন উহাকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান না দেওয়ায় উক্ত হতভাগ্য ব্রাহ্মন শোক দুঃখে হতাশে প্রান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন † এই কালের সামাজিক শাসনের আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রবর্ত্তিত নদীয়ার দশঠাকুরী প্রথা। গ্রামের দশজন প্রধান একত্রিত হইয়া যাবতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী সামাজিক ‡ ও পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তি করিয়া দিতেন ইংরাজ বিচার কর্ত্তারও তখন প্রায় ইহাদের রায়ই বাহাল রাখিতেন। অন্যান্য শাস্তির মধ্যে সমাজে হুঁকা বন্ধ, ধোপা নাপিত বন্ধ সুতিকাগারে ধাত্রী নিষেধ ইত্যাদি কঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল।

---

* In 1807 the Tapta Mukti or ordeal by hot clarified butter was tried before 7000 spectators on a young woman accused by her husband of adultery.

Vol. VI. Calcutta Review No. XI and XII.

† A meeting of Bramhans was held in 1760 at Krishnagar before Clive and Verelst, who wished to have a Bramhan restored to his caste, which he had lost by being compelled to swallow a drop of Cow's soup, the Bramhans declared it was impossible to restore him. * ** and the man died soon after of broken heart.

Vide Cal Review Vol VI Page 421—27.

‡ In 1835 a Dharmashova was established called that of the Ten Thakurs, they punished offenders by excluding them from caste, by sending them when they transgressed the Regulations to the Magistrate of Krisnagar, or by prohibiting midwives attending their wives in confinement.

Cal Review Vol VI Page 421—27.

সমাজ হইতে এই সকল সামাজিক কঠোর শাস্তি এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে।

আহার, বিহার, লোক-লৌকিকতাদি সামাজিক সর্ব্ববিষয়ে যেরূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের প্রতি লোকের যেরূপ মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুদিনে সামাজিক কোনও বিষয়েই প্রাচীনভাবের লেশ মাত্র রহিবে না বলিয়া অনুমান হয়, ধনী দরিদ্র, ইতর, ভদ্র নির্ব্বিশেষে উন্নত শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় সকলেরই আচার ব্যবহার রীতি নীতি পূর্ব্বের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করিতেছে। শুধু এ দেশ বলিয়া নহে অধুনা পৃথিবীর সমগ্র জাতির সকল সমাজেই এই বিরাট সামাজিক পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়াছে সমাজের ন্যায় ধর্ম্মেও নবভাব দেখা দিয়াছে।

অসন বসনেও রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এমন কি সেদিনও যেথানে "ফলাহারে" চিড়া, দধি, দুগ্ধ, বাতাসা, চিনি, রম্ভা ও সন্দেশ সাদরে চলিত। অথবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিতে হইলে—

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচার আদার কুচী,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাক ভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা
ফলারের যোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপী গজা, ছানাবড়া বড় মজা
শুনে সক্ সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মোণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই তত‌ই হয় ভোলা॥
খুরি পুরি ক্ষীর তায়, চাহিলে আরও পায়,
কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাথে
উত্তম ফলার তারে কই॥"

ছত্রিশ ব্যঞ্জন ও ছাপ্যান্ন প্রকার মিষ্টান্ন ও শত প্রকার "রকম" না হইলে ভদ্রোপযোগী ফলাহারই হয় না। *

একটু বিশিষ্টরূপে আয়োজন করিতে হইলে এখানে একটা ভোজে নিম্নরূপ আহার্য্য তালিকা হওয়া উচিত, ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর করিতে হইলে আরও বিস্তৃত আয়োজন হইয়া থাকে, তবে সাধারণতঃ এই রূপই সমাজে চলিয়া থাকে।

* জিলাপী, ছানার জিলাপী, কমলা বরফী, বালুসাই, অমৃতি সিতেভোগ, ছানারমুড়কী লুচি, মতিচুর, হালুয়া, ছানাবড়া, আবাবখাবো রাধাবল্লভী মিহিদানা, মালপোয়া লেডিক্যানিং চপ, সন্দেশ, পরোটা পানতুয়া, অমৃতরসাবলী, পাপর, রসকদম্ব, সিঙ্গেড়া, এম্প্রেসগজা রসগোল্লা, রস সরোবরের মাধুরি, কচুরি, লালমোহন, লবঙ্গ লতিকা, বরফী, বাদামতক্তী নিমকি, দরবেশ, মুগেরলাড়ু, আমসন্দেশ, ছানার পায়েস, গজা, বঁদে, পেরাগি, আতা, সরভাজা, মিঠেগজা, নিকুতি, ঘিওর, চমচম, খৈচুর, মোয়া, মনহরা, রসকরা, সরেরলাড়ু;

পূর্ব্বে যেখানে সামান্ত মূল্যের কাপড়ে ও মিষ্টান্নে "তত্ত্ব" করা চলিত, এখন উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি সহজ প্রাপ্য হওয়ায় সেখানে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক "তত্ত্ব" করিলেও যেন মনের আকাঙ্খা মিটে না। এই বিলাসিতার ভাব হইতে দরিদ্রের ও পরিত্রাণ নাই। এবম্বিধ ব্যসনাসক্তি দেশের লোকের্ আর্থিক স্বচ্ছলতাই প্রকাশ করে।

পূর্ব্বে যে বিবাহে সমগ্র ব্যাপারে মোট একশত মুদ্রা ব্যয় হইত, এখন সেই টাকার স্থান বিশেষে হয়তো একটা পাত্র হরিদ্রার "তত্ত্বই" হইয়া উঠে না। বিবাহে পণ গ্রহণ প্রথার প্রসারত বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দেশে ইতর-ভদ্র নির্ব্বিশেষে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহার ফলে ভূত, পিশাচ, ডাইন সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার কমিয়া আসিতেছে; বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ; প্রভৃতিও কমিয়া গিয়াছে। রাজার নিকট জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে গুণীর আদর থাকায় উচ্চতর শিক্ষার দিকে সকলেরই মন আকৃষ্ট হইয়াছে।

লৌহবর্ত্ম ও সংবাদ পত্রাদির সমাধিক প্রচলন হওয়ায় লোকের আলস্য ও সর্ব্ববিষয়ে ঔদাসীন্য ভাব কমিয়া গিয়াছে; বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিচয় ও সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছে, তীর্থাদি দর্শন সহজ সাধ্য হওয়ায় লোকের ধর্ম্মার্জ্জনের পথ সুগম হইয়াছে। নবদ্বীপের পট পূর্ণিমা, শান্তিপুরের রাস, ঘোষ পাড়ার মেলা বা মাটিয়ারীর মহামেলা সকলই সহজগম্য হইয়াছে।

লোকের আত্মোন্নতির দিকে দৃষ্টি হওয়ায় সমাজে স্বাতন্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং একজনের উপার্জ্জনে দশজনে বসিয়া খাওয়া উঠিয়া যাইতেছে। সমাজে কর্ম্মী লোকেরসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলহ ও দলাদলীভাব কমিয়া গিয়াছে, বিশেষ ম্যালেরিয়াদিতে লোকের স্বাস্থ্যহানী হওয়ায় বৃথা কলহে বড় কাহারও প্রবৃত্তি দেখা যায় না। নীতি ও রুচির প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে, ভাষাও তদনুযায়ি উৎকৃষ্টতর ভাব ধারণ করিয়াছে।

স্থূলতঃ ইহাই আজ পর্য্যন্ত নদীয়ার সামাজিক বিবরণ নদীয়ার শাসন বিভাগের বাৎসরিক বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে স্বতই মনে হইবে যে নদীয়াবাসী-গণ অন্যান্ত জেলার লোকের তুলনায় অতি নিরীহ স্বভাবের ব্যক্তি; নির্ম্মম খুন ভীষণ ডাকাতি, বিষম দাগাবাজী বা জাল প্রতারণা প্রভৃতি নিজ নদীয়াবাসী-গণ কর্ত্তৃক অতি অল্পমাত্রায় সমাহিত হয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ ইহাকে 'শান্ত-জেলা', নামে অভিহিত করেন। এখানকার অধিবাসীগণের প্রকৃতি সাধারণতঃ মধুর ইঁহারা বিনয়ী, নম্রস্বভাব, বচনপটু, সুরসিক, অভিমানী, অলস, অল্পে সন্তুষ্ট, শান্তিপ্রিয় ও রোগপ্রবন।

ফালাকন্দ, গুঁজিয়া, ক্ষিরের রকম, নানারূপ আচার, ও মোরব্বা, ফল ১দফা—ক্ষির, দধি, রাবড়ী।

নদীয়ার কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক স্থান।

বর্ত্তমান নদীয়া জেলা ৫টী মহকুমায় বিভক্ত; যথা, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া। এতন্মধ্যে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট, এই দুই মহকুমার অধীনেই নদীয়ার যাবতীয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক স্থানগুলি বিদ্যমান। বিশেষ,রাণাঘাট মহকুমার এলেকায় যত সংখ্যক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে,নদীয়ার আর কোন মহকুমায় তাহা নাই। রাণাঘাট, আড়ংঘাট, শান্তিপুর, বাবলা বা বাউগাছী, উলা (বীরনগর) মামজোয়ান, চাকদহ, জশড়া, হরধাম, আনন্দধাম,সুখসাগর, জাগুলী, শ্রীনগর,আমুলিয়া,দে-গাঁ,কুলিয়া, বয়রা,ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, বাগআঁচড়া, কাঁচড়াপাড়া; হালিসহর, (অধুনা ২৪ পরগণা জেলাভুক্ত) মুরতীপুর-ঘোষপাড়া, আড়ংঘাটা প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রামগুলি রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণনগর সদরের অধীনে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রাম বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে অগ্রদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলী, চুপী, বাগোয়ান, মীরা, নবদ্বীপ, বেলপুকুর, ধর্ম্মদা, দেবগ্রাম, হাঁসখালি, শিবনিবাস, ভাজনঘাট, পলাশী, মুড়াগাছা, শ্রীবন, মাটিয়ারী, বালিগঞ্জ, মহৎপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, দোগাছিয়া প্রভৃতি গ্রাম প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য। মেহেরপুর গ্রামখানি নিজে প্রাচীন হইলেও ইহার এলাকাধীনে প্রাচীন উল্লেখযোগ্য স্থান বিরল। রামনগর, জগবন্ধুপুর, আমঝুপি, তেহাটা,কেশবনগর,করমদী,কাজীপুর,শিকারপুর, পিয়ারপুর বা ছোলেমার অন্দরকোটা, বামনদী, তেতুলবেড়ে নন্দনপুর নারাণপুর কথুনপুর মোয়াখালী শ্যামনগর পিপুলকোলা সুন্দুলপুর প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম নীলের হাঙ্গামা কালে প্রসিদ্ধি লাভকরে। চুয়াডাঙ্গা আধুনিক স্থান এবং ইহার :অধিনেও উল্লেখযোগ্য স্থানোসংখ্যা অতি কম তবে ইহারই মধ্যে নাটুদা, মুন্সীগঞ্জ, জহরপুর, কুতুবপুর, সিন্দিরিয়া, খাঁড়াগেদা, বেগমপুর, জীবননগর, আন্দুলবেড়ে, ফতেপুর লোকনাথপুর, কুড়ুলগাছি. খাসবেড়ো, দোকী, বাগাদী, ওসমানপুর কুমুরী আলমডাঙ্গা," কাপাসডাঙ্গা, দামুরহুদা, জয়রামপুর, ডুমুরদিয়া, প্রভৃতি গ্রামের নাম উল্লেখ করা যায় মাত্র। কুষ্টিয়া সমগ্র জেলার মধ্যে লোকসংখ্যা ও বিস্তৃতি হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও বৃহৎ মহকুমা হইলেও ইহার অধীনে উল্লেখ-

যোগ্য প্রাচীন গ্রাম নাই বলিলেই হয় তবে গোঁসাইদুর্গপুর, পাটকাবাড়ী, ধরমপুর, হালসা, জুনাদ, পোড়াদ, মথুরাপুর, ভালুকা, চাপড়া, হাজিপুর; জগতী কুমারখালি প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের নাম উল্লেখ করা যায় মাত্র। উল্লিখিত স্থানগুলির মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে লিখিত হইল।

কৃষ্ণনগরের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিবৃত্ত দিয়া আমরা কৃষ্ণনগরের ইতিহাস সম্পন্ন করিতেছি।

নদীয়া রাজবংশ।

নদীয়ার রাজাগণ আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের নেতা অন্যতম ভট্টনারায়ণের বংশজ। ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জ প্রদেশের ক্ষীতীশ নামক রাজার পুত্র। তিনি এদেশে আসিবার সময় বহু অর্থ সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন একারণে বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূর তাঁহাকে কতিপয় গ্রাম দান করিতে চাহিলে তিনি তাঁহার দান লইতে অস্বীকার করিয়া মূল্যপ্রদান পূর্ব্বক প্রস্তাবিত কয়েকখানি গ্রাম গ্রহণ করিলেন এবং অপর লোকের নিকট হইতে আরও কতিপয় নিষ্কর গ্রাম ক্রয় করিয়া বিক্রমপুর প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। তিনি তাঁহার জীবনের চতুর্ব্বিংশতি বৎসর এই সকল গ্রাম নিষ্কররূপ ভোগ করেন।*

ভট্টনারায়ণের পুত্র নিপু হইতে অধঃস্তন একাদশ পুরুষে মহাত্মা কামদেব জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বশুদ্ধ ইঁহাদের বিষয় ভোগকাল ৩২২ বৎসর। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মভীরু, নিষ্ঠাবান ও বিদ্বান্ ছিলেন। কামদেবের চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ পিতৃগদী প্রাপ্ত হইয়া ১৪শ খৃষ্টাব্দে দিল্লীযাত্রা করেন এবং স্বকীয় অসাধারণ বিদ্যাবত্তাগুণে মহামান্য দিল্লীদরবার হইতে রাজোপাধি এবং পৈত্রিক অধিকার ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট কর ধার্য্যে আরও অনেকগুলি গ্রাম খেলায়েৎ পান। বিশ্বনাথ সর্ব্ববিষয়ে নিজের বিস্তীর্ণ সম্পত্তির উন্নতি করিয়া যান। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পরগণা কাঁকদি ও অন্যান্য ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন।

তাঁহার পরেই উল্লেখযোগ্য রাজা কাশীনাথ। ইনি অসাধারণ বীর ও সাতিশয় বুদ্ধিমান হইলেও চক্রান্তে পড়িয়া অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন এবং পরিশেষে ঘাতকের হস্তে প্রাণদান করেন।

* ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্।

এই বিপত্তিকালে তাঁহার অনাথিনী গর্ভবতী স্ত্রী একজন ব্রাহ্মণ, একজন দাস ও একটী দাসী এবং দুইশত সুবর্ণমুদ্রা সহিত বাগোয়ান পরগণার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বাটীতে যাইয়া লুক্কায়িত থাকেন। শীঘ্রই তাঁহার একটী সুকুমার ভূমিষ্ঠ হয়েন। এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র। হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তিনি রামচন্দ্রকেই আপনার ক্ষুদ্র জমিদারি পাটকাবারি ও বাগোয়ান প্রভৃতির অধিকারী করিয়া যান। সুবিদ্বান রামচন্দ্রও পরমোপকারী মিত্র হরেকৃষ্ণ সমদ্দারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রাম সমাদ্দার নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার দুর্গাদাস, জগদীশ, হরিবল্লভ এবং সুবুদ্ধি নামে চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

এই দুর্গাদাসই পরে "মহারাজ ভবানন্দ মজুমদার" নামে অভিহিত হয়েন। দুর্গাদাস বাল্যকাল হইতেই চতুর ছিলেন এবং আপনার বুদ্ধিকৌশলে, হুগলীর ফৌজদারের সাহায্যে ঢাকার নবাবকে সন্তুষ্ট করিয়া হুগলীর কাননও পদ লাভ করেন। উত্তরকালে কিরূপে ভবানন্দ, বঙ্গের শেষ স্বাধীন বাঙ্গালী ভূপতি প্রতাপের খুল্লতাত পুত্র কচু রায় ও চাঁচরা রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহাতাপ রাম রায়ের সাহায্যে প্রতাপের রাজধানী প্রবেশের গুপ্ত পথ দেখাইয়া, ও রসদাদি দিয়া তদানীন্তন দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহকে নদীয়া সমুদ্রগড়ে সসৈন্য পার হইবার সহায়তা করিয়া প্রতাপের এবং সমগ্র বাঙ্গলী জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, বঙ্গের ইতিহাস পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

মানসিংহের সহায়তারূপ সৎকার্য্যের জন্য তদানীন্তন সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে কচু রায়কে বিগত শ্রী যশোহর রাজ্য, ও মহাতাপ রাম রায়কে সৈয়দপুর মাণিকপুর, আহামদপুর ও মুড়াগাছা এই চারি পরগণার জমিদারী স্বত্ত্ব ও এক ফারমান দ্বারা ভবানন্দকে তাঁহার পিতামহ কাশীনাথের সুবিস্তীর্ণ জমিদারী ও নদীয়া, মহৎপুর, লেপা, সুলতানপুর, প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন। মজুমদার এই সময়ে তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীর সুচারুরূপে শাসন করিবার জন্য বাগোয়ান ব্যতীত মাটিয়ারীতে আর একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। কালের প্রভাবে এই মাটিয়ারী এখন বনাকীর্ণ। প্রাসাদের ধ্বংশাবশিষ্ট ইষ্টক গুলিও ই, বি, রেলের খোয়ায় পরিণত হইয়াছে। কেবলমাত্র একটি মন্দির স্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সময়ে

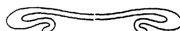
১০২২ হিজারিতে (বা ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) তিনি বাদসাহের অনুগ্রহে উখড়া, ভালুকা, এসমাইলপুর ও এসলামপুর প্রভৃতি আর কয়েকখানি পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। এই বিস্তীর্ণ জমিদারী জাহাঙ্গীরার তদানীন্তন সুবেদারের চক্ষুঃ শূল হইয়া উঠে। এবং তিনি কৌশলে মজুমদারকে বন্দী করেন। সে যাত্রা মজুমদার তাঁহার পৌত্র গোপীরমণ কর্ত্তৃক মুক্ত হয়েন।

ভবানন্দের তিন পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। এই তিন জনের মধ্যে মধ্যম গোপাল নিতান্ত পিতৃ অনুগত, বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ বিধায় ভবানন্দ অপর পুত্রদ্বয়ের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া গোপালকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়া যান। এ কারণে জেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ, পিতার সহিত কলহ করিয়া মাটিয়ারীর শ্রীনারায়ণ মল্লিক নামক এক বিশ্বস্ত কার্য্যদক্ষ বহুভাষাবিৎ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে দিল্লী গমন করেন। তথায় আপনার বুদ্ধিবলে ও উক্ত কর্ম্মচারীর লিপি কুশলতায় বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া পরগণা উখুড়া ও কুশদহের উপর চিরস্থায়ী দখলের ফারমান এবং বাদসাহ-দত্ত সম্মান প্রাপ্তে তিনি দেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার কনিষ্ঠ গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। রাজা গোপালও বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকাদি কয়েক পরগণার জমিদারি প্রাপ্ত হন। তিনি নরেন্দ্র, রামেশ্বর, ও রাঘব নামে তিন পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই তিন জনের মধ্যে কনিষ্ঠ রাঘব সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মদক্ষ বিধায় পিতৃ নিদেশানুযায়ী পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি অতি সুশীল ও ধার্ম্মিক নরপতি বলিয়া খ্যাত। তিনি তাঁহার পিতামহ স্থাপিত মাটিয়ারী প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া রেউই নামক স্থানে রাজধানি স্থাপনা করিয়া উহার চতুর্দ্দিক পরিখা বেষ্টিত করেন। ঐ পরিখা সাধারণতঃ "সহর পানার গড়" নামে খ্যাত। সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ মানসে শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মধ্যস্থলে বিংশতি সহস্র মুদ্রাব্যয়ে এক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তদুপরিস্থিত গ্রামের দীর্ঘিকা নগর বা "দীগনগর" নাম করণ করেন।" এই দীঘিটী দৈর্ঘে ১৪৫২ হস্ত ও প্রস্থে ৪২০ হস্ত পরিমিত। দিন দিন নিকটস্থ প্রান্তর ধৌত হইয়া রাশি রাশি মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনাদি পড়িয়া ইহা ক্রমেই অপরিসার হইয়া পড়িতেছে। রাজা রাঘব এই জলাশয় খনন করিয়া ইহার পূর্ব্বতটে এক



ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চের ধ্বংশাবশেষ।

১। দোলমঞ্চ। ২। ইন্দারা।





(চক)।

কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের প্রথম প্রবেশদ্বার।

বৃহৎ ঘাট ও তদুপরি এক রম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহার অনতিদূরে দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাঘবেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।* অট্টালিকা ও ঘাট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, মন্দির দুইটীর মধ্যে একটী ভগ্ন ও আর একটী কোন রূপে বজায় আছে। রাজা রাঘব এই দীঘি ও মন্দির অতি সমৃদ্ধির সহিত উৎসর্গ করেন। রাজা রাঘব "মর্দ্দানা" নামক গ্রামে আর একটি আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার সন্নিহিত বিল, তড়াগাদিতে অজস্র ফুল্লারবিন্দের শোভায় আকৃষ্ট হইয়া ইহার শ্রীনগর নাম করণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীনগর এখন বনাকীর্ণ; ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপে ইহা জনশূন্য এখানে প্রাসাদাদীর ধ্বংশাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে ও একটী মন্দির স্বীয় ললাটে রাঘবের নাম বহন করিয়া কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে।

রাজা রাঘবের দুই পুত্র—রুদ্র ও প্রতাপ নারায়ণ। প্রতাপ পিতার অবাধ্য বিধায় রাঘব সম্রাটের অনুমতিক্রমে রুদ্রকে বিষয়ের অধিকাংশ অর্পণ করেন। ইনিও তাঁহার পিতার ন্যায় লোক হিতার্থে বহু জলাশয় খনন, রাজবর্ত্ম প্রস্তুত প্রভৃতি অশেষ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। দিল্লীশ্বর আলমগীর তাঁহার এই সকল সৎকীর্ত্তি গাথা শ্রবণ করিয়া ১৬৭৬ অব্দে (১০৮৭ হিজারতে) এক ফারমান দ্বারা গয়েশপুর, হোসেনপুর, খাড়ি, জুড়ি প্রভৃতি কয়েকটী বিস্তীর্ণ পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রাসাদের উপরিভাগে দিল্লীশ্বরের প্রাসাদের অনুকরণে কাঙ্গরা নির্ম্মাণের অধিকার দেন। ইনি নবদ্বীপে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একটী শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন এবং তাঁহার পিতার স্থাপিত রাজধানী রেউইয়ের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যার্থে কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন।

---

* এই মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে :—

"শাকে সোমনবেষু চন্দ্রগণিতে পুণ্যৈকরত্না করো
ধীর শ্রীযুত রাঘবোদ্বিজমনি ভূমীভুজামগ্রণীঃ।
নির্ম্মায় স্ফুরদূর্ম্মিনির্ম্মল জল প্রোদ্যোতিনীং দীর্ঘিকাং
তত্তীরে কৃত রম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমাস্থাপয়ৎ॥

অর্থ—১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মণ শিরোমণি রাজশ্রেষ্ঠ ধীরমতি রাজারাঘব এই স্বচ্ছ জলসঙ্কুল উর্ম্মীময় দীর্ঘিকা খনন করাইয়া ও তত্তীরে এই সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শিব স্থাপনা করিলেন।

ইহাঁর সহিত জাহাঙ্গীরার তাৎকালীক সুবেদারের প্রথমে তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না, পরে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হইলে রাজা রুদ্র রায় জাহাঙ্গীরা হইতে এক সুনিপুণ পূর্ত্তকার্য্যক্ষম স্থপতিকে আনয়ন করিয়া কৃষ্ণনগরে তাহার সহায়তায় নিজ কাছারি, কেল্লা, ও পূজার বাটী, নাচঘর, চক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। ইহাঁর নির্ম্মিত নাচঘর এবং পিলখানা, চক ও নহবতখানা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজা সম্প্রতি ইহার সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুরের সুপ্রশস্ত রাজ বর্ত্মটিও রাজা রুদ্রের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কথিত আছে তাঁহার প্রাসাদ পাদচারিণী অঞ্জনা নদী তখন স্রোতস্বতী ছিল। এই নদীবিহারি কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ইহাঁর স্রোতঃবেগ রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

রাজা রুদ্রের দুই রাণী—জেষ্ঠার গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন ও কনিষ্ঠার গর্ভে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। রুদ্র তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনায় তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর জেষ্ঠ রামচন্দ্র হুগলীর ফৌজদার ও ঢাকার নবাবের সহায়তায় পৈতৃক জমিদারী অধিকার করেন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রামজীবন শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহাকে অধিকার চ্যুত করেন কিন্তু তিনি শীঘ্রই আবার জেষ্ঠ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মধ্যম রাম জীবন আবার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের কৌশলে তিনি ঢাকার নবাব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। রাজা রুদ্র যেমন কির্ত্তীমান ছিলেন তেমনি এতদঞ্চলে বিদ্যার উন্নতিসাধন মানসে অধ্যাপক মণ্ডলীকে বহু নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যান এবং নবদ্বীপের বিদেশী ছাত্রগণের ব্যয়ের নিমিত্ত বহু টাকার ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

রাজা রামকৃষ্ণের সহিত তাৎকালীক নবাব মুরসিদকুলী খাঁর সাতিশয় অসদ্ভাব দাঁড়াইয়াছিল তাই তিনি কৌশলে রামকৃষ্ণকে ঢাকার বৈকুণ্ঠে বন্দী করেন। কারাগারের দারুণ ক্লেশে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামজীবন কারামুক্ত হইয়া নদীয়া রাজ্য পুনরাধিকার করেন। তিনি কবি ছিলেন; তাঁহার শেষ জীবন নাটক রচনায় ও নাট্য ক্রীড়ায় অতিবাহিত হয়।

তাঁহার তিন রাণী—প্রথমার গর্ভে রাজারাম ও কৃষ্ণরাম, দ্বিতীয়ার গর্ভে রঘুরাম ও তৃতীয়ার গর্ভে রামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। রঘুরাম সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন এ কারণে রামজীবন মৃত্যুকালে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান। রঘুরাম হৃদয়বান ও যুদ্ধকুশলী ছিলেন। তিনি বীরকাটির যুদ্ধে সুবেদার জাফর খাঁর সেনাপতি লহরীমলকে বিশেষ সাহায্য করেন। রঘুরামের যৌবনের প্রারম্ভে ১৬৩২ শকে (১৭১০ খৃষ্টাব্দে) এক মহা তেজস্বী রূপবান কুমার জন্মগ্রহণ করেন। এই কুমারই নদীয়া রাজবংশের সুবিখ্যাত মহারাজা বাজপেয়ী কৃষ্ণচন্দ্র।

এই সময়ে রঘুরাম যথা নিয়মে রাজকর দিতে না পারায় সুবেদার জাফর খাঁ কর্ত্তৃক তাঁহার নূতন রাজধানী মুরসিদাবাদে বন্দীকৃত হয়েন। তিনি বন্দী অবস্থাতেও শত শত দরিদ্রকে ধন দান করিতেন এবং পরিশেষে মুক্ত হইয়া ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী নীরে তনুত্যাগ করেন।

রাজারঘুরামের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে পিতৃ গদীতে আরোহণ করেন। কথিত আছে রঘুরাম তাঁহাকে আপন উত্তরাধিকারী না করিয়া নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু পিতার পরলোক হইলে কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র তাম্রকূট অনুরাগী দীর্ঘসূত্রী পিতৃব্যকে কৌশলে পথিমধ্যে তাম্রকূট সেবনে নিরত রাখিয়া স্বয়ং যাইয়া তৎপূর্ব্বে নবাব দরবারে উপস্থিত হয়েন এবং আপনার নামে জমিদারীর ফারমান লইয়া বাহিরে আসিলে রামগোপালের চৈতন্যোদয় হয় তখন ব্যস্ত হইয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে বিদায় দেন।

কৃষ্ণচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সংস্কৃত ও পারস্য প্রভৃতি ভাষায় সবিশেষ বুৎপন্ন হন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার পদের উপযুক্ত নানা বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কালীদাস সিদ্ধান্ত নামক এক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র, কালোয়াৎ বিশ্রাম খাঁর নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র এবং মুজাফার হুসেনের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই মুজাফার হুসেন নবাব মুরসিদকুলী খাঁর ভাগিনেয়। কোন কারণে ক্রোধ করিয়া তিনি মুরসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আগমন

করেন। রাজা প্রচুর পরিমাণে মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে নিকটে রাখেন।

রাজা স্বয়ং যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি অতিশয় গুণের আদর করিতেন এ কারণে তাঁহার সভায় সর্ব্বদা প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সমাগম হইত। তিনি সজ্জন সহবাসে ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে অবকাশকাল অতিবাহিত করিতেন। ইঁহার সভা প্রাচীন ভারতবর্ষাধিপতি বিক্রমাদিত্যের তুল্য ছিল। রাজা বিক্রমের সভায়, খপনক, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ, শঙ্কুক, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালীদাস, বরাহমিহির ও বররুচি প্রভৃতি নবরত্নের যেমন সমাবেশ ছিল ইঁহার সভাও তদ্রূপ নবদ্বীপের ন্যায়বিৎ হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত রামরুদ্র বিদ্যানিধি কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন, ষড়দর্শন বেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার কান্ত বিদ্যালঙ্কার শঙ্কর তর্কবাগীশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরের রামমোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ ও গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও হালিসহরবাসী রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি সুকবিগণ এবং মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপালভাঁড়, ও হাস্যার্ণব প্রভৃতি অসাধারণ হাস্য রসিক ও উপস্থিত বক্তা প্রভৃতির অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল ছিল। ইহাদের মধ্যে বাণেশ্বর, ভারতচন্দ্র, গোপালভাঁড়, মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় ও রামরুদ্র বিদ্যানিধি রাজার নিত্য সহচর ছিলেন।

বঙ্গ কবিকুলরবি ভারতচন্দ্র বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তপাতি ভুরস্ুট পরগণায় পাণ্ডুয়া বসন্তপুর গ্রামের সন্নিধ্য নরেন্দ্রপুরের বদান্য জমিদার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের পুত্র। ইহাঁদের বংশের উপাধী মুখোপাধ্যায়। লক্ষ্মী শ্রী থাকায় রায় বা রাজা নামে অভিহিত হইতেন। ভারত বাল্যকাল হইতে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ইনি সংক্ষিপ্তসার নামক জটিল ব্যাকরণ গ্রন্থ আয়ত্ব করেন। মুসলমান ভাবভাষা প্লাবিত তদানীন্তন বাঙ্গলায় সংস্কৃত অপেক্ষা ফারসীর আদর অধিক ছিল সুতরাং ভারতের সংস্কৃতানুরাগ তাঁহার পিতা ও অন্য আত্মীয়ের নিকট বিরাগের কারণ হইয়া উঠে সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি ফারসী অধ্যয়নে মন দেন এবং অল্পদিনেই উহাতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা তাঁহার পিতার জমিদারী বৰ্দ্ধমান সরকারে

বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ায় তিনি গাজীপুর যাইয়া কষ্টে অধ্যয়ন করিতে থাকেন; পরে ইনি তদানীন্তন চন্দননগরের ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রনারায়ণই ১১৫৯ সালে তাঁহাকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্গভাষার সবিশেষ উন্নতি করিয়া যান এবং কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমত্যানুসারে সুবিখ্যাত অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহাঁকে "রায় গুণাকর" এই সম্মানজনক উপাধীতে ভূষিত করেন ও মূলাযোড় গ্রামে বাৎসরিক ৬০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইজারা দিয়া তথায় তাঁহাকে বাস করাইয়াছিলেন। এই সময়ে বর্গীর উৎপীড়নে উৎপিড়ীত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্রের মাতা সপুত্র মূলাযোড়ের পূর্ব্বদক্ষিণ কাউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং নবদ্বীপাধিপতির নিকট আপনার কর্ম্মচারী কামদেব নাগের নামে মূলাযোড় পত্তনী লয়েন। এই নাগ কর্ত্তা হইয়া গ্রামবাসীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ভারত তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও স্বয়ং নাগের দংশনে পীড়িত হইয়া অষ্ট শ্লোকাত্মক নাগাষ্টক নামে এক অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমীপে প্রেরণ করেন। উহা পাঠে রাজা অনতিবিলম্বে নাগের বিষদন্তভগ্ন করিয়া দেন। ভারত ১৬৩৪ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন।

গোপালভাঁড —নরসুন্দর বংশীয় ছিলেন কেহ কেহ ইহাঁকে কায়স্থও বলিয়া থাকেন। তাঁহার নিবাস শান্তিপুরে ছিল। তাঁহার ন্যায় হাস্য রসিক আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। গোপালের সরস বাকচাতুর্য্য বাঙ্গলায় কে না অবগত আছেন।

মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়—নিবাস উলা। রসিক বিধায় রাজা তাঁহাকে বৈবাহিক সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। গোপালের ন্যায় ইহাঁরও বহু সরস বাক্য এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেমন বিদ্বানের আদর করিতেন তেমনি সুনিপুণ শিল্পী ও দক্ষকারিকরগণের উৎসাহ দাতা ছিলেন। তাঁহার নিজেরও এ সকল বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা ছিল।

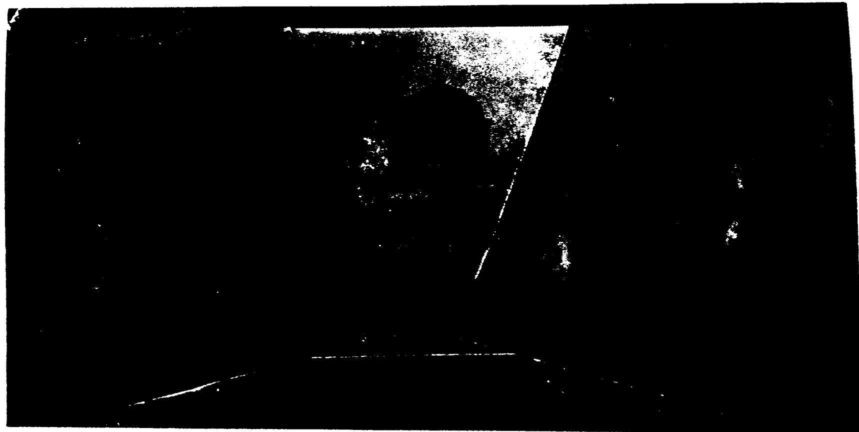
ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভ স্বীয় বালবিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দিবার পক্ষে বহুপণ্ডিতের মত প্রাপ্ত হইয়া নদীয়া সমাজের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে

ব্যবস্থা সংগ্রহের নিমিত্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করেন ও কতিপয় পণ্ডিতকে রাজসভায় প্রেরণ করান। সুকৌশলী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বহু বিষয়ে রাজবল্লভের মুখাপেক্ষী ছিলেন সুতরাং স্বয়ং প্রকাশ্যে পণ্ডিতগণকে মত দিতে অনুরোধ ও এমন কি শাসন বাক্য প্রয়োগ করিলেও গোপনে তাহাদের অমত প্রকাশে দার্ঢ্য দেখাইতে উপদেশ দিয়া রাজবল্লভকে হতাশ করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে একটী কৌতুকাবহ প্রবাদ আছে। কথিত আছে যে রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিত-গণের নিকট রাজবাটী হইতে যে সিধা প্রেরিত হয় উহার সহিত একটী মহিষ শাবক প্রেরণ করা হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত মহিষশাবক দর্শনে কুপিত হইয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলে রাজকর্ম্মচারীরা নিবেদন করেন যে যখন কোন কোন শাস্ত্রে মহিষমাংস ভক্ষণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তখন উহা গ্রহণে কি আপত্তি থাকিতে পারে? রাজবল্লভের পণ্ডিতগণ উত্তর করেন, "হাঁ যদিও কোন কোন শাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু এদেশে মহিষ মাংস ভোজনের ব্যবহার নাই সুতরাং ইহা অভক্ষ্য।" সুশিক্ষিত রাজকর্ম্মচারীগণ তখন সাহ্লাদে বলিলেন "যখন শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিয়াও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া আপনারা ইহা ভোজনে আপত্তি করিতেছেন তখন চির অপ্রচলিত দেশাচার বিরুদ্ধ বিধবা বিবাহে আপনারা কিরূপে মত প্রকাশ করিলেন।"

কথিত আছে রাজবল্লভের পণ্ডিতগণ এই বাক্যে নিরুত্তর হইয়া ও পরে রাজ সভাস্থ পণ্ডিতগণের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া নিজেদের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত করিলেও তিনি শিবনিবাস, কৃষ্ণপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, চূর্ণিতীরবর্ত্তী হরধাম, ও আনন্দধাম, নবদ্বীপের নিকটে গঙ্গাবাস ও যাত্রাপুর প্রভৃতি বহুতর স্থান স্থাপনা পূর্ব্বক প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া অনেক সময়ে সপরিবারে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন মুরসিদাবাদের নবাবের উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে তিনি এইরূপে নানা স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি স্বীয় পিতা ও পিতামহের ও আপনার বাকী পড়া রাজস্ব ও নজরানার দায়ে নবাব আলিবর্দ্দী কর্তৃক একবার মুরসিদাবাদে বন্দী হইয়াছিলেন।

শিবনিবাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র



শিবনিবাসের মন্দিরত্রয়।

রাজ্ঞীশ্বর।　　　শ্রীরাম চন্দ্র।　　　রাজ্যেশ্বর।

নসরত খাঁ নামক একজন দুর্দ্দান্ত দস্যুকে তাঁহার রাজ্য মধ্যে উৎপাত করিতে দেখিয়া চুর্ণীনদীর পূর্ব্বকূলে এক গভীর অরণ্যে তাহার আড্ডার সন্ধান পাইয়া তাহাকে শাসনার্থ উপযুক্ত সজ্জায় আসিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করেন। দস্যু দমন করিয়া তিনি একরাত্রি তথায় বাস করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যখন নদীকূলে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন তখন একটী রোহিৎমৎস্য জল হইতে লাফাইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হয়। আন্দুলিয়া নিবাসী কৃপারাম রায় নামক জনৈক রাজজ্ঞাতি এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ এস্থান অতি রমণীয়, রাজভোগ্য সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়া আপনার নজররূপে উপস্থিত হইল। এখানে বাস করিলে আপনি সুখী হইবেন!" রাজাও তখন বর্গীর উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার্থ এইরূপ একটী নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে এই স্থানটী সকলে মনোনীত করিলে তিনি উক্ত স্থানটীকে কঙ্কণাকারে নদীবেষ্টিত করিয়া স্বীয় দেওয়ান রঘুনন্দনের মতানুযায়ী এক সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন ও আপনার বাসভবন ও দুইটী সুবৃহৎ শিবমন্দির স্থাপনা করিয়া দুইটী দুর্জ্জয় শিবলিঙ্গ ও অপর মন্দিরে রামসীতা স্থাপনা করিলেন এবং শিবের নামে গ্রামের শিবনিবাস নামকরণ করিলেন।* এই কঙ্কনাবেষ্টিত শিবনিবাসেই তিনি মহা সমারোহে অগ্নিহোত্র বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এরূপ সমৃদ্ধ যজ্ঞ কলিতে এই শেষ। এতদুপলক্ষে কাশী. কাঞ্চী প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী আখ্যা প্রদান করেন। কালের ক্রীড়ায় এই শিবনিবাস এখন বনাকীর্ণ হইয়া ব্যাঘ্র শার্দ্দুলাদির নিবাসরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাসাদ ধ্বংশ প্রাপ্ত এবং মন্দির কয়েকটীও সংস্কারাভাবে দিন দিন হতশ্রী হইতেছে† এখনও পর্য্যালোচনা করিলে এই মন্দির ত্রয়ের ভিত্তি গাত্রে নিম্ন লিখিত শ্লোক কয়টী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে,—

---

*এই শিবনিবাস তৎকালে কাশীতুল্য স্থান বলিয়া খ্যাত হয় যথা প্রবাদ বাক্য—

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা। উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠঙ্কনা॥

† এই মন্দির ৩টী ও রাজপ্রাসাদাদি মহারাজা শিবচন্দ্রের পর হইতেই হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লর্ড বিসপ হেবার সাহেব জলভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া যখন এই স্থানে উনীপত হইয়াছিলেন তখনও তিনি এই প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন

প্রথম শিব মন্দিরে (১৬৭৬ শক বা ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত,—

যো জাতঃ খলু ভারতে সুরতরুস্তৈষ্টাদিসী শাংশকে
সেনানীমুখ বাজিরাজ বিলসৎ সংখ্যাবতী দম্পুরে।
কৃত্বা মন্দিরমিন্দুচুম্বিশিখরং ভূপাল চূড়ামণিঃ
পৌত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতিঃ শম্ভুং সমস্থাপয়ৎ॥

দ্বিতীয় শিবমন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) ;—

যঃ সাক্ষাৎকৃতশৈব মূর্ত্তি বসুধে শাংসকে সম্ভবাৎ সংখ্যাতঃ
ক্ষিতিদেব রাজপদভাক্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভুঃ।
তস্য ক্ষৌণিপতে দ্বিতীয় মহিষী মূর্ত্তেব লক্ষ্মীস্বয়ম
প্রাসাদ প্রবরে প্রাসাদ সম্মুখং শম্ভুং সমস্থাপয়ৎ॥

শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত),—

দেব শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রঃ ক্ষিতিপতি তিলকো ব্রহ্ম রাজর্ষি বংশে
যোঽসৌ ভুকঙ্গশাখী শ্রুতি বসুবসুধে শাংশকে তুল্য সংখ্যে।
প্রেয়স্যাস্তস্মহিষ্যাঃ পরমকৃতিকৃতে জানকী লক্ষণাভ্যাং
প্রাসাদে প্রাদুরাসীৎ ত্রিজগদধিপতি শ্রীযুত রামচন্দ্রঃ॥

এবং এই স্থান সম্বন্ধে Hebbers Journal vol I. P. 120 তে বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন ; তিন প্রাসাদ ও মন্দির ত্রয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

The first temple which we visited was evidently the most modern, being, as the officiating Brahmin told us, only fifty seven years old. In England we should have thought it at least 200: but in this climate a building soon assumes, without constant care, all the venerable tokens of antiquity. It was very clean, however, and of good architecture; a square tower, surmounted by a pyramidal roof, with a high cloister of pointed arches surrounding it externally to within ten feet of the springing of the vault. The cloister was also vaulted, so that, as the Brahmin made me observe, with visible pride the whole roof was "pucka" or brick, and "belathee" or foreign. A very handsome Gothic arch, with an arabesque border opened on the south side, and shewed within the statue of Rama, seated on a lotus, with a gilt but tarnished umbrella over his head, and his wife the earth born Seeta, beside him. A sort of dessert of rice, ghee, fruit, sugar candy, &c. was ranged before them on what had the appearance of silver dishes; * * * * *
* * * * *

এই শিবনিবাসের রাজবংশের যখন এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়া আসিতেছিল, তখন এখানে তিলিকুলে রাণাঘাটের কৃষ্ণপান্তীর ভাগিনেয়স্বরূপ সরকার চৌধুরী মহাশয় (যাঁহার নাম হইতে নদীয়ার স্বরূপগঞ্জের নাম হইয়াছে) ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া বিপুল জমিদারী ক্রয় করিতেছিলেন। শিবনিবাস স্বরূপের পুত্র বৃন্দাবন সরকার

From hence we went to two of the other temples which were both octagonal, with domes not unlike those of glass houses. They were both dedicated to Siva, (who Abdullah, according to his Mussnlman notions, said was the same with Asan, and contained nothing but the symbol of the deity, of black marble.)

The villagers asked if I would see the Raja's palace. On my assenting, they led to a really noble Gothic gateway, overgrown with beantiful broad leaved ivy but in good preservation and decidedly handsomer though in pretty much the same style, with the "Holy Gate" of the Kremlin in Moscow. Within this, which had apparently been the entrance into the city, extended a broken but still stately avenue of tall trees, and on either side a wilderness of ruined buildings, over grown with trees and brushwood, which reminded Stowe of the baths of Caracalla, and me of the upper part of the city of Caffa. I asked who had destroyed the place, and was told Serajh Dowla, an answer which (as it was evidently a Hindu ruin) fortunately suggested to me the name of the Raja Kissen Chand. On asking whether this had been his residence, one of the peasants answered in the affirmative, adding that the Raja's grand children yet lived hard by. By this I supposed he meant some where in the neighbourhood, since nothing here promised shelter to any beings but wild beasts.

* * * * * *

Our guide meantime turned short to the right, and led us into what were evidently the ruins of a very extensive palace, Some parts of it reminded me of Conway castle, and others of Bolton Abbey. It had towers like the former, though of less stately height, and had also long and striking cloisters of Gothic arches, but all overgrown with ivy and jungle, roofless and desolate. Here, however, in a court, whose gate way had still its old folding doors on their hinges and the two boys whom we had seen on the beach came forward to meet us, were aunounced to us as the great grand sons of Raja Kjssen Chund, and invited us very coarteously in Persian, to enter their fathers dwelliong."

চৌধুরীর সময়ে আবার জমজমাট হইয়া উঠিয়াছিল; বৃন্দাবন অতিশয় ক্রিয়াবান চতুর ও প্রাজ্ঞ ছিলেন, তিনি নীল বিদ্রোহের সময়ে প্রজার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই তাঁহার বংশের সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ জীবনে বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়; ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইলে মহামান্য ইংরাজগণ এদেশ অধিকার করেন। ভারতে কল্যাণকর বৃটিশরাজ্য স্থাপনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরামর্শ ও সহায়তা কম কার্য্যকারী হয় নাই। লর্ড ক্লাইব বাহাদুর তাঁহার কৃত উপকারের স্মৃতি নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধী ও পলাশীক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্বাদশটী কামান উপহার প্রদান করেন অদ্যাপী ঐ গুলি রাজ বাটীর প্রাঙ্গনে রক্ষিত আছে। রাজার দুই রাজ্ঞি ছিলেন। প্রথমার সহিত পিতা বর্ত্তমানে বিবাহ হয় এবং স্বয়ং রাজা হইয়া রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া দ্বিতীয়ার পাণি গ্রহণ করেন। এই ছোট রাণীর বিবাহ সম্বন্ধে একটী মনোরম আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। রাণাঘাটের এক মাইল উত্তর পূর্ব্বে নৌকাড়ী বলিয়া একখানি বহু প্রাচীন গ্রাম বিদ্যমান আছে। উহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া "বাচকোর খাল" নামে একটী চূর্ণী নদীর শাখা আছে। পূর্ব্বে ঐ খাল একটী বেগবতী নদী ছিল। একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই নদী দিয়া তাঁহার শ্রীনগরস্থ প্রাসাদে গমনকালে নৌকাড়ীর ঘাটে এক অনিন্দ্য সুন্দরী অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে জল ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যার পিতাকে আহ্বান করিয়া কন্যাটীর পাণিপ্রার্থী হইলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু কিশোরকুণীকে কন্যাদান করিলে সমাজে আমাকে হীন হইতে হইবে।" যাহা হউক পরিশেষে ব্রাহ্মণের সে আপত্তি রহিল না। রাজা সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে লইয়া যাইলেন এবং নিশিথে বাসরগৃহে নব প্রণয়ণীকে রজত পর্য্যাঙ্কে শয়ন করাইয়া রাজা কহিলেন "দেখ, আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি রূপার খাটে শয়ন করিলে"। তেজস্বিনী রাজমহিষি উত্তর করিলেন "আর একটু উত্তরে যাইলে, সোনার খাটে শয়ন করিতে পারিতাম।" ইহার তাৎপর্য্য এই আমার পিতা পরম কুলীন হইয়া যখন কিশোরকুণী মহারাজাকে কন্যা দিলেন, তখন আর আর একটু হীনতা স্বীকার করিয়া মুরস্দাবাদে নবাবের সহিত বিবাহ

দিলে সুবর্ণপালঙ্কে শয়ন করিতে পাইতাম। মহারাজ স্ত্রীর এই তেজগর্ভ স্পষ্ট উত্তর শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র এবং তেজস্বিনী ছোট রাণীর গর্ভে শম্ভূচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র রূপে গুণে ও চরিত্রবলে সাক্ষাৎ শিবতুল্যই ছিলেন এবং কনিষ্ঠ শম্ভূচন্দ্র মাতার ন্যায় তেজস্বী ছিলেন এবং তাঁহার স্বভাবও নিতান্ত উদ্ধত ছিল। যৎকালে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবাব মীরকাশিম কর্ত্তৃক মুঙ্গেরে কারাবদ্ধ হয়েন সে সময়ে শম্ভূচন্দ্র তাঁহাদের নিধন নিশ্চয় জানিয়া পৈত্রিক জমিদারী ও ধনাগার অধিকার করেন এবং যখন মুঙ্গের কারাগারস্থ অপরাপর বন্দীগণের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় তখন তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু ঘোষণা করিয়া দিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত পিতৃগদীতে অধিরূঢ় হয়েন। কিন্তু যখন সপুত্র মহারাজা সুস্থ শরীরে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মুরসিদাবাদে থাকিয়া শম্ভূচন্দ্রের ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলেন তখন শম্ভূচন্দ্র নিতান্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া কতরূপ ক্রটী স্বীকার করিয়া পিতা ও ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিলেন। তদুত্তরে বৃদ্ধ মহারাজা তাঁহার মুন্সী লিখিত পত্রে সাক্ষরের নিম্নদেশে স্বহস্তে এই কয়েক পুংক্তি লিখিয়া দেন :—

"হস্তি শুণ্ডে লকড়ী দিলে ছাড়ান মস্কিল।
তুষার ভূমিতে বীজ কাড়ান মস্কিল॥
মনঃশীলা ভাঙ্গিলে যোড়া লাগান মস্কিল।
জাঁহাদিদা থামিদেরে ভুলান মস্কিল॥"

যাহা হউক সে যাত্রা গোলযোগ মিটিয়া যাইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেখিলেন যে যখন তাঁহার জীবদ্দশাতেই শম্ভূচন্দ্র এরূপ ব্যবহার করিতেছেন না জানি তাঁহার প্রাণান্তে তিনি ভ্রাতাদের সহিত আরও কি কুব্যবহার করিবেন। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১.৮৬ সালে তাৎকালিক গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংশ বাহাদুরের নিকট আবেদন পূর্ব্বক তাঁহার একজন সদস্য ও একজন মুন্সীকে রাজবাটীতে লইয়া যাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে বঙ্গভাষায় এক দানপত্র ও পারস্য ভাষায় এক তফবীজ্ নামা লেখাইয়া তাহাতে ঐ সভাসদ সাহেবের ও মুন্সীর সাক্ষর ও মোহর করিয়া লয়েন। এতদ্বারা তাঁহার যাবতীয়

সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে দান করিয়া অন্যান্য পুত্রগণের খরচাদির নিমিত্ত সালিয়ানা মোট ৪০০০০৲ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই দানপত্র লেখা হইলে শম্ভুচন্দ্র স্বীয় স্বাভাবিক চতুরতার সাহায্যে হেষ্টীংশের দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দকে মহামান্য স্বীয় পক্ষভুক্ত করিয়া আপনার নামে পূর্ব্বেই বাহাদুরের কোম্পানির নিকট হইতে জমিদারীর সনন্দ বাহির করিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠান :—"পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ"। যাহা হউক মহারাজ সে যাত্রা তাঁহার সুচতুর দেওয়ান কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের দ্বারা মহামান্য হেষ্টিংসের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন পূর্ব্বক শিবচন্দ্রের নামেই জমীদারীর সনন্দ ও মহারাজাধিরাজ উপাধীর এক ফারমান বাহির করিয়া লন। এই ঘটনার অব্যাবহিত পরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সস্ত্রীক কুমার শিবচন্দ্রকে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এইরূপ পুত্রের স্কন্ধে রাজ্যের দুর্ব্বহ ভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ মহারাজা গঙ্গাবাসের নিমিত্ত নবদ্বীপের ক্রোশৈক পূর্ব্বাস্থত অলকানন্দ তীরে এক সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ স্থানকে গঙ্গা-বাস নাম দিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই গঙ্গাবাসের সমস্ত প্রাসাদ ও অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে কেবল হরিহরের মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। * কালের স্রোতে খড়িয়া হইতে উদ্ভূত অলকানন্দের গর্ভ মৃত্তিকা পূর্ণ হইয়াছে। এই পবিত্র অলকানন্দা তীরে ১১৮৯ সনের ২২ শে আষাঢ় (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে)

---

* এই "হরিহর" মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে :—

"গঙ্গাবাসে বিধিকৃত্যানুগত সুকৃত ক্ষৌণিপালঃ শকেস্মিন্
শ্রীযুক্ত বাজপেয়ী ভুবি বিজিত মহারাজ রাজেন্দ্র দেবঃ।
ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারি ত্রিপুরহরভিদাসজ্ঞাতাং পামরানাং
অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহর মৃন্ময়া স্থাপয়ন্নোনয়াচ॥"

ভাবার্থ :—যে পামরসকল শিব ও বিষ্ণুকে পৃথক জ্ঞানে একের বিদ্বেষ করে সেই সকল নিরয়গামী ব্যক্তিগণের ভ্রান্তি বিনোদনার্থ, ভুবন বিদিত বাজপেয়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক ১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও তন্মধ্যে হরিহরের অদ্বৈত মূর্ত্তি লক্ষ্মী ও উমার সহিত স্থাপিত হইল।

সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী নানা বিপদ ধীরভাবে সহ্য করিয়া অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর রায় কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ ৭৩ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা শিবচন্দ্র ইংরাজের নব প্রবর্ত্তিত মেয়াদী বন্দোবস্তানুসারে জমিদারী অধিকার করেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ এইরূপে ভগ্ন মনোরথ হইয়া শিবনিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করেন। মহারাজাধিরাজ শিবচন্দ্র অধিকাংশ সময় শিবনিবাসে এবং কখন কখন কৃষ্ণনগরেও বাস করিতে থাকেন। তিনি পিতা অপেক্ষাও শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কেবল যথা সময়ে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়াতেই কুবেজপুর পরগণা নিলাম হইয়া যায়। কথিত আছে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণে আপনাকে অশক্ত বিবেচনা করিয়া আপনাকে পাপগ্রস্থ মনে করেন এবং ত্রিরাত্রী উপবাস করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রোগাক্রান্ত হইয়া একদান পত্র দ্বারা স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে অর্পণ করিয়া ঐ অব্দে ৬০ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন।

পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র অতি বিলাসী ছিলেন। কৃষ্ণনগর হইতে দুই মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অঞ্জনা নামক নদীতীরে শ্রীবন নামে এক প্রমোদ ভবন নির্ম্মাণ করিয়া আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ইনি ১.৯৭ সন হইতে ১২০৬ সন পর্য্যন্ত ১০ বৎসর মেয়াদে নদীয়া জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। প্রথম বৎসরে ৮৪৬০২ টাকা ও পরবর্ষাবধি বৎসর বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়া ১২০৬ অব্দ পর্য্যন্ত ৮৫১৫১২ টাকা জমা অবধারণে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২২ শে মার্চ্চ ঐ বন্দোবস্তই চিরস্থায়ীরূপে গণ্য হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর বাহাদুরের সদস্য ও মুন্সীর সমক্ষে যে দানপত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য পুত্রদের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান; রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় প্রথমে "দশসালা" পরে "চিরস্থায়ী" বন্দোবস্ত স্থষ্ট হইলে কৃষ্ণচন্দ্র যে সকল পুত্রের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান তাঁহাদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র পৈত্রিক জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্য উপযুক্ত ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করেন। মকর্দ্দমায় ঈশ্বরচন্দ্র জয়লাভ করিলেও মকর্দ্দমায়

খরচ কুলাইতে বহু অর্থ ব্যয় হওয়ায় এবং যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারায় তাঁহার জমিদারী সকল নিলামে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই সময়ে নদীয়া রাজ বংশের সাতিশয় আর্থিক অবনতি সংঘটিত হয় এবং পরাক্রান্ত ইংরাজের শাসনে সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমতারও হ্রাস হইয়া যায়।

মহারাজা ঈশ্বরচন্দ্র একপুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে লোকান্তর হন। পুত্র গিরীশচন্দ্র ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন। নাবালগ বিধায় তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীন হয়; পরে সাবালক হইয়া তিনি পিতার ন্যায় অযথা ব্যয়ে ঋণগ্রস্থ হন। তিনি কৃষ্ণনগরে দুইটী ছোট বড় মন্দির প্রস্তুত করাইয়া বড় মন্দিরে "আনন্দময়ী" নামে এক কালী প্রতিমা ও ছোট মন্দিরে আনন্দময় নামে এক শিব স্থাপনা করেন। তিনি নবদ্বীপের ভাগিরথী তীরস্থ ভূগর্ভে এক গোপাল মূর্ত্তি অবস্থান করিতেছেন স্বপ্নে অবগত হইয়া সমারোহে ঐ বিগ্রহ উত্তোলন করিয়া নবদ্বীপনাথ নামে নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব না দেওয়ায় তাঁহার বিষয়ের অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া যায়। হায়! কালের কি কুটীলগতি যে বিশাল রাজত্ব একদিন ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং বিপুল বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল তাহা এখন মাত্র দেবত্ব সম্পত্তির আয় একলক্ষ মুদ্রা ও ঋণগ্রস্থ কতকগুলি জমিদারী মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ইহাঁর সময়ে আত্মীয়গণের কুটিল ব্যবহারে নদীয়া রাজের প্রধান সম্পত্তি উখুড়া পরগণা নিলাম হইয়া যাইলে তিনি দারুণ মনকষ্টে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

গিরীশ চন্দ্রের সভায় কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি নামক একজন হাস্য রসিক কবি বিদ্যমান ছিলেন। রাজা তাঁহাকে আদর করিয়া রসসাগর বলিয়া ডাকিতেন। ১১৯৮ সালে নদীয়ান্তর্গত বাড়েবাঁকা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণনগরে বিবাহ করিয়া ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে জামাতৃ ভবনে তনুত্যাগ করেন ইনি একজন অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন। বিশেষতঃ উপস্থিত মতে পদ্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গিরীশচন্দ্রের দুই স্ত্রী। কিন্তু একের গর্ভেও সন্তান হয় নাই। নদীয়ার প্রাচীন বংশ সাক্ষ্যাৎ শোনিত সম্বন্ধে নদীয়ার তক্তে এই খানেই শেষ। ১২৪৮

সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন বশতঃ ৫৫ বৎসর বয়সে রাজা গিরীশচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র শ্রীশচন্দ্র ১৮৪২ খৃঃ দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি প্রথম হইতেই বিষয় বৃদ্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট শ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া সুযোগ্য দেওয়ান স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের সুপরামর্শে অনেক বিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই রাজা পাশ্চাত্য মতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এ কারণে নদীয়ার পণ্ডিতগণের মতের সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিত। ইনি নিজ ব্যয়ে কৃষ্ণনগরে ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের নিমিত্ত অনেক পরিমাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। রাজা শিবচন্দ্রের পর রাজা শ্রীশচন্দ্রই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজা উপাধীতে ভূষিত হন।

ইঁহার পুত্রের নাম সতীশচন্দ্র। ইনিও পিতার ন্যায় পাশ্চাত্য বিদ্যা পারদর্শী ছিলেন। বিষয়াধিকারী হইবার অব্যাবহিত পরেই ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে পৈত্রিক উপাধী ও খেলায়েৎ প্রাপ্ত হন। ইনি ইঁহার পিতামহ গিরীশচন্দ্রের ন্যায় আয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন এবং অতিশয় ভ্রমণ প্রিয় ছিলেন। ইনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মসৌরি পাহাড়ে ৩৩ বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন।

মহারাজা লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠা রাণী ভুবনেশ্বরী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ৫ জানুয়ারি উহা কোর্ট অবওয়ার্ডে অর্পণ করেন এবং ১৮৭১ খৃঃ ২৪ নবেম্বর বর্ত্তমান মহারাজা ক্ষিতীশ চন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই কুমার ১২৭৫ সনের ৩০ বৈশাখ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রূপে গুণে প্রকৃতই নদীয়া সিংহাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী। এমন সর্ব্বদর্শী, সর্ব্ব শাস্ত্র পারদর্শী, এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সুপুরুষ সাধারণতঃ দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। ইঁহার যত্নে নদীয়ার রাজশ্রী সর্ব্ব বিষয়েই সমুজ্জ্বল

হইয়াছে। * ইহাঁর এক পুত্র তাঁহার নাম কুমার ক্ষৌণিশচন্দ্র রায় নদীয়ার রাজবংশ নদীয়ার ইতিহাসে প্রধান বর্ণনীয় ও উল্লেখযোগ্য সামগ্রী। নদীয়ার বিদ্যা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব অতি বিশাল ও বিস্তীর্ণ। নদীয়া রাজবংশের ন্যায় ব্রহ্মোত্তর বা পীরোত্তর বা মহত্রাণ প্রভৃতি অপরিমেয় দান অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীয়ার যে ব্রাহ্মণের রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর নাই নদীয়ায় তিনি ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন না। নদীয়ার রাজবংশ ভারতে মুসলমান রাজত্ব ধ্বংশের ও ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতের মূল। এবং এই রাজবংশ লইয়াই নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস গঠিত।

এই রাজ বংশ ব্যতীত কৃষ্ণনগরে রাজ দৌহিত্র ৺শ্যামাধব রায় মহাশয়ের বংশ, রাজ দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বংশ, ৺রামতনু লাহিড়ীর বংশ, রায় বাহাদুর ৺যদুনাথ ও তদীয় ভ্রাতার বংশ, মল্লিক বংশ, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ৺মনমোহন ঘোষের বংশ, ৺দুর্গাদাস চৌধুরীর বংশ, ৺দ্বারিকানাথ দে বাহাদুরের বংশ, ৺রামগোপাল চেতলাঙ্গীর বংশ প্রভৃতি বংশাবলী উল্লেখযোগ্য।

এখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাজ প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন "চক", স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, কৃষ্ণনগর কলেজ, আদালত গৃহাদি, দেবী আনন্দময়ীর মন্দির, লাইব্রেরি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

---

* "This prince received his education from an Englishman Mr. George Deverex Oswell M. A. (Oxon) and is a thoroughly educated English scholar and a man of high scientific attainments. He is also well versed in the Sanskrit erudition and is a man of extraordinary intelligence and of strong common sense and is an original thinker. Being a learned man himself, he is a great lover and encourager of learning and spends large sems of money for the education and other helps of the poor and needy. His contribution to other good and charitable purposes i. e. Schools, hospitals, etc. are innumerable. He received his title "Moharaja Bahadur" from the Government on the 1st of January 1890.

He has made great improvements in the estate and vast improvements in the palace buildings. His greatness of mind, liberality and earnest desire to help the poor are truly commendable and are well worthy of a prince of this Raj."

(পিতা)



নদীয়াধিপতি স্বর্গীয় ক্ষিতীশ চন্দ্র।

(পুত্র)



নবীন নদীয়াধিপতি ক্ষৌণীশ চন্দ্র।

এখানকার উৎপন্ন উল্লেখ যোগ্য সামগ্রীর মধ্যে কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর স্বনামখ্যাত "মাটীর পুতুল" খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে "সরপুরিয়া," "সরভাজা," প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

হরধাম।

(নদীয়া-রাজবংশ—হরধাম শাখা)

বাঙ্গালার ইতিহাসে নদীয়া রাজবংশ সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া পরিচিত। এই মহামহিম বংশে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে তাহার কয়েকটী রাজধানী স্থাপনা করিয়া গ্রামপত্তন করেন। হরধাম এইরূপে তাঁহারই স্থাপিত একটী গণ্ডগ্রাম। পূর্ব্বে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী থাকিলেও এক্ষণে ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ শোণিত সম্পর্কীয় বংশাবলী একমাত্র এখানেই অতি হীন অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

নদীয়া রাজবংশের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দুই মহিষী ছিলেন। বড় রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র এবং অন্নপূর্ণা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা রাজ্ঞীর কন্যা অন্নপূর্ণার বংশীয় দিগের মধ্যে কেহ কেহ শিব-নিবাসে, কেহ কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন। ছোট রাণীর গর্ভে কেবলমাত্র শম্ভূচন্দ্র নামে একপুত্র এবং বিশ্বেশ্বরী, উমেশ্বরী, দুর্গেশ্বরী নামে তিন কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই তিন জনের মধ্যে দুর্গেশ্বরীর সন্তানেরা হরধামে বাস করিতেছেন, সুপ্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের আদি স্থান ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী কুলীন প্রধান শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী দুর্গেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে শশিভূষণ, চন্দ্রভূষণ ও বিধুভূষণ নামে শ্রীগোপালের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যম পুত্র চন্দ্রভূষণের তারাবিলাস নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বক্ষমতায় অনেক বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তারাবিলাসের বৈদ্যনাথ নামে এক পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। তারাবিলাসের পুত্র রায় মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকন্যাগণসহ এক্ষণে হরধামে বাস করিতেছেন। উমেশ্বরী নিঃসন্তান এবং বিশ্বেশ্বরীর বংশ ধ্বংস পাইয়াছে।

রাজকুমার দিগের মধ্যে শিবচন্দ্র যেমন শান্তস্বভাব ও পিতৃভক্ত, শম্ভূচন্দ্র তেমনই উদ্ধত ও পিতার অবাধ্য ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন করিলে শম্ভূচন্দ্র প্রভৃতি পুত্রেরা পিতার অসদৃশ বণ্টনে বিরক্ত হইয়া শিবনিবাস পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বাস করেন। জলাঙ্গীর মোহানার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে মাথাভাঙ্গা নদী, নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া চূর্ণী নামে চুয়াডাঙ্গা, রামনগর, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি ও রাণাঘাট পূর্ব্ব পারে রাখিয়া ভাগিরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। যে স্থানে উভয়ের মিলন হইয়াছে, সেই স্থানকে বর্ত্তমানে "পেট কাটার মোহানা" কহে। পূর্ব্বোক্ত রাণাঘাট মহকুমার দুইক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব চূর্ণী নদীর উভয় পারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দুইটী গ্রাম পত্তন করেন এইরূপ প্রবাদ। এ সম্বন্ধে দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"যে অঞ্জনা নদী যাত্রাপুরের নিকট দ্বিধারা হয় ও পরে উভয় ধরা মামজোয়ান গ্রামের নিকট সমবেত হইয়া দক্ষিণে যায়; ঐ নদী শেষে হরধামের উত্তর দিয়া গিয়া চাকদহের সমীপবর্ত্তী জগপুর ও শিবপুরের মধ্যস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। হরধাম হইতে শিবপুরের মধ্যস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। হরধাম হইতে শিবপুরের সমীপস্থ ভাগিরথী অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। একারণ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাস্নানের সুগমের জন্য হরধাম হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত এক খাল কাটাইয়া দেন। তাহাতেই শিবপুরের নিকট ত্রিমোহানীর সৃষ্টি হয়। ইহাতে হরধামের রাজবাটীও চতুর্দ্দিকে পরিখা বেষ্টিত একটি সুরক্ষিত স্থান হইয়া উঠে। শিবনিবাস হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত (বর্ত্তমানে গৌরনগর পর্য্যন্ত) যে নদী আছে, তাহার "চূর্ণী" নামকৃষ্ণচন্দ্র দেন, কি এই নদীর যে অংশ পূর্ব্বে ছিল, তাহারই এই নাম ছিল, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। শিবপুরের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে এই নদীর উভয় তটে দুইটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার একটীর নাম 'হরধাম' ও অপরটীর নাম 'আনন্দধাম' রাখেন এবং এই দুই বাটীর নামানুসারে গ্রামের নামও 'হরধাম' ও "আনন্দধাম" হয়। ইহার মধ্যে আনন্দধামের বাটী অতি সামান্য কিন্তু হরধামের বাটী যেমন বৃহৎ, তেমনই শোভনীয় ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এই বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন।" স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের মতানুসারে আনন্দধামের বাটী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্ম্মিত। কিন্তু আনন্দধাম বাসী ঈশানচন্দ্রের বর্ত্তমান বংশধর দিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়

যে, আনন্দধামের বাটী রাজকুমার ঈশানচন্দ্রের নির্ম্মিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর ছোটরাণী ও তদীয় পুত্র কুমার শম্ভুচন্দ্র হরধামের বাটীতে আসিয়া বাস করিলে, ঈশানচন্দ্রও আসিয়া হরধামের পশ্চিমদিকবর্ত্তী চূর্ণীর অপর পারস্থ নিবিড় জঙ্গল কাটিয়া তথায় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন এবং নিজ ক্ষমতায় সামান্য সম্পত্তি করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। এ কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, মহারাজের মৃত্যুর পর অপরাপর পুত্রদিগের মধ্যে শিব নিবাসে মহেশচন্দ্র বাস করিলেন এবং পুত্রহীনতা নিবন্ধন ভৈরবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে শিবচন্দ্রের নিকট রহিলেন। শিবচন্দ্রই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সুতরাং তিনিই পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইলেন। অন্যান্য পুত্রদিগের মাসোহারা বন্দোবস্ত হইল। এখনও পর্য্যন্ত আনন্দধামের রাজবংশীয়েরা কৃষ্ণনগর হইতে মাসোহারা পাইয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মধ্যে শম্ভূচন্দ্র নিজক্ষমতায় বহুসংখ্যক নগদ টাকা ও অনেক টাকার ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। কুমার শম্ভূচন্দ্র সাধারণতঃ 'মধ্যম কুমার' বা 'মধ্যম ঠাকুর' নামেই পরিচিত।

হরধামের বাটী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নির্ম্মাণ করান এবং তাঁহার মৃত্যুর পর শম্ভূচন্দ্র আসিয়া এখানে বাস করেন। এই বাটী অতিশয় বৃহৎ ও পরমসুদৃশ্য ছিল। এখনও তাহার কতকাংশ এবং দেবালয়, মন্দির, পূজার বাটী, ঘড়িখানা প্রভৃতির কতক কতক অংশ বর্ত্তমান, কিন্তু তাহাও সংস্কারাভাবে দিন দিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছে। রাজপ্রসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর লতাগুল্ম দেহবিস্তার করিতেছে। চতুস্তল পরিমিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ, যাহা এক সময়ে রাজ পরিবারের আনন্দ কোলাহলে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ জীর্ণ, পতনোদ্যত কয়েকটী গৃহ সৌভাগ্যের নীরব সাক্ষী স্বরূপ ধ্বংসাবশেষের ইষ্টক-স্তূপের মধ্যে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। হরধাম রাজবংশের সুখসূর্য্য অস্ত-গমনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই অস্তমিত হইয়াছে।

প্রবাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন শম্ভূচন্দ্র হরধামে আসিয়া বাস করেন, সে সময়ে হরধামে লোকসংখ্যা অতি অল্প ছিল। একারণ শম্ভূচন্দ্র হরধামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে চেষ্টিত হন। তিনি নানা স্থান হইতে রাজ-কুটুম্বদিগকে আনাইয়া হরধামে বাস করান এবং রাজসংসারের আবশ্যকীয় কর্ম্মচারিবর্গেরও গ্রাসোচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময়ে রাজজ্যোতিষী হরিধর আচার্য্য

মহাশয়কে "সুতার গাছি" নামক স্থান হইতে (সন ১২০৭ সাল) আনাইয়া ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ নিষ্কর ভূমি দান করাইয়া হরধামে বাস করান। জ্যোতিষী আচার্য্য মহাশয় যেমন জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই অসাধারণ বলিষ্ঠ ও সাহসী বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইঁহার দর্পনারায়ণ, নিমচাঁদ ও প্রেমচাঁদ নামে তিন পুত্র ও কয়েকটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দর্পনারায়ণ প্রায় পিতার অনুরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন। অপর দুই ভ্রাতার মধ্যে মধ্যম নিমচাঁদ জ্যেষ্ঠের অনুরূপ সুপণ্ডিত না হইলেও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। বাঙ্গালা ১২৮৪ সালে সপ্ততিতমাধিক বর্ষ বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। এক্ষনে তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র শ্রীরজনীকান্ত আচার্য্য হরধামে বাস করিতেছেন। ইনি নানা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের লেখক এবং গ্রন্থকার।

রাজকুমার শম্ভুচন্দ্রের ছয় পুত্র যথা—বিষ্ণুচন্দ্র, পৃথ্বিচন্দ্র, আনন্দচন্দ্র, বিজয়-চন্দ্র, নীলচন্দ্র ও বৈকুণ্ঠচন্দ্র। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তন্মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র নিঃসন্তান, পৃথ্বীচন্দ্রের গণেশচন্দ্র নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনিও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আনন্দচন্দ্রের মহামায়া নামে একমাত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। রাজকুমারী মহামায়া বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে সোমশেখর মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া হরধামেই বাস করেন। মহামায়ার সন্তানেরা এখন হরধামেই বাস করিতেছেন। বিজয়চন্দ্রের অদ্বৈতচন্দ্র, শ্যামচন্দ্র, দামোদরচন্দ্র, শ্রীধরচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র, এই পাঁচ জনের মধ্যে শ্যামচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র নিঃসন্তান। কেবল অদ্বৈতচন্দ্রের দৌহিত্র বংশ এবং দামোদরচন্দ্র ও শ্রীধরচন্দ্রের পৌত্রেরা হরধামে বাস করিতে-ছেন। হরধামের রাজবাটীর সংলগ্ন মন্দিরে যে 'চিন্ময়ী' নামে কালিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাহা নীলচন্দ্রের পত্নী রাণী রাধামণি দেবীর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মন্দিরে গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা সেবকগণের শোচনীয় অবস্থা দর্শনেই বোধ হয় অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। গ্রামাধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়ী দেবীর নিত্য সেবার জন্য রাজদত্ত ভূমি সম্পত্তি আছে, তাহার আয় হইতেই দেবসেবা চলিয়া থাকে। ভাগিরথী তীরবর্ত্তী 'সুখসাগর' নামক স্থানে যে 'উগ্রচণ্ডী' নাম্নী কালিকামূর্ত্তি বিরাজিতা ছিলেন, তাহাও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। সুখসাগর গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হওয়ায়

বিগ্রহ মূর্ত্তি হরধামে আনীত হইয়া চিন্ময়ী দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরেই রক্ষিত হইয়াছেন।

মধ্যম ঠাকুর শম্ভুচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র নীলচন্দ্রের, হরিশ্চন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে। হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন, তাহার জননীই রাধামনি দেবী 'চিন্ময়ী' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজসম্পত্তি দেবসেবায় অর্পণ করেন। বিজয়-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অদ্বৈতচন্দ্রের পুত্র গোপালচন্দ্র। ইহাঁর শিবচন্দ্র নামে এক পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। পুত্রটী অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। কন্যা দুইটী জীবিতা আছে। গোপালচন্দ্র প্রৌঢ়াবস্থায় নশ্বর দেহত্যাগ করেন। সুপ্রসিদ্ধ নাটককার ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার "সুরধুনী কাব্যে" ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম,
যথায় বিরাজে একরাজা গুণগ্রাম,
রক্তগন্ধ ফোঁটা ভালে উজ্জ্বল শরীর,
তাঁর শিরে বহে কৃষ্ণচন্দ্রের রুধির।"

বাস্তবিক যতদূর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে গোপালচন্দ্রের রক্তচন্দন-চর্চ্চিত প্রশস্ত ললাট সমন্বিত সুবিশাল দেহ ও ধীর সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের মনে ভক্তির সঞ্চার হইত। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র হরধামেই মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রকৃত বংশধরগণ বিরাজ করিতেছেন, যাঁহাদের দেহে কৃষ্ণচন্দ্রের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া গৌরব করিতে পারেন। নচেৎ জয়হরিচন্দ্রের * পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দধামের † এবং গঙ্গেশচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে শিব-নিবাসের ‡ রাজবংশ পুত্রাদিক্রমে লোপ পাইয়াছে, দৌহিত্র বংশ চলিতেছে। কৃষ্ণনগরেও মহারাজ গিরীশচন্দ্রের পর হইতে পোষ্যপুত্র গৃহীত হইয়াছেন, কেবল একমাত্র হরধামেই প্রকৃত বংশধরগণ বর্ত্তমান।

* "জাল প্রতাপচাঁদ" লেখক ভ্রমক্রমে গ্রন্থে ইঁহাকে হরধামের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† আনন্দধামের রাজবংশ—ঈশানচন্দ্র। তাঁহার তিন পুত্র—নরহরিচন্দ্র, শ্রীহরিচন্দ্র ও জয়-হরিচন্দ্র। নরহরি চন্দ্রের পুত্র—চন্দ্রধর। জয়হরি চন্দ্রের পুত্র—হরেন্দ্র চন্দ্র ও শিবেন্দ্র চন্দ্র। উভয়েই মৃত।

‡ শিবনিবাসের রাজবংশ—মহেশচন্দ্র, তৎপুত্র উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্রের পুত্র গঙ্গেশচন্দ্র।

বিজয়চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র দামোদরচন্দ্রের দুই পুত্র দেবেন্দ্রচন্দ্র ও নরেন্দ্রচন্দ্র। নরেন্দ্রচন্দ্র অল্প বয়সেই দেহ ত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কাশীধামে অতিবাহিত করিয়া বাঙ্গালা ১৩০২ সালে সুখসাগরে জাহ্নবীতীরে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র বিশ্বেশ্বরচন্দ্র বর্ত্তমান, চতুর্থ শ্রীধরচন্দ্রের গিরিধরচন্দ্র ও গঙ্গাধরচন্দ্র নামে দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গিরিধরচন্দ্র ও কন্যাটী বহুদিন লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ গঙ্গাধরচন্দ্র জীবনের শেষ বয়স্থায় মস্তিষ্কের বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া ১৩০৬ সালে গঙ্গালাভ করিয়াছেন এক্ষণে গিরিধর চন্দ্রের মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রচন্দ্র ও গঙ্গাধরচন্দ্রের কেদারচন্দ্র ও জিতেন্দ্রচন্দ্র নামে দুই পুত্র হরধামে বিরাজ করিতেছেন।

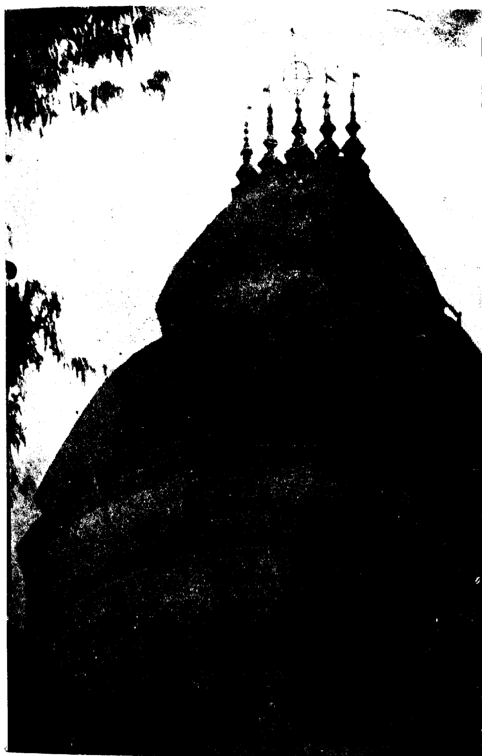
কালের ক্রীড়ায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজবংশ এক্ষণে ধ্বংশ প্রায় এবং নিতান্ত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রামও ম্যালেরিয়াদি নানা কারণে ক্রমেই জন হীন হওয়ায় দিন দিন শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। হরধামের বর্ত্তমান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-গণের মধ্যে হরধামের বাবুদিগের নাম উল্লেখ যোগ্য, ইঁহারা পশ্চিম দেশীয় আহিরী গোপ-সন্তান পূর্ব্বে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রাজ সংসারে চাকরী করিতেন এবং তখন হইতেই ইহাঁদের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়। এই বংশের বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ রায় একজন বিনয়ী মহাশয় ব্যক্তি।

শান্তিপুর।

শান্তিপুর কতদিনের পুরাতন গ্রাম নিশ্চিতরূপে বলা না যাইলেও ইহা যে ন্যূনাধিক আটশত বৎসর হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বর্ত্তমান কালের কিঞ্চিন্ন্যূন ৫৫০ পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুর জনপূর্ণ একটী গণনীয় স্থান ছিল। এই কালে শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদ স্বনামখ্যাত শ্রীঅদ্বৈতের প্রপিতামহ নরসিংহ মিশ্র এই শান্তিপুর গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। যথা লঘুভারতে :—

"শূন্য সপ্ত বেদ বেদ মিতেষে বিগতে কলেঃ।
দোগাছাতে কুলীনানাং বিবাদোহ ভবন্মহান্।
তং প্রাক্ শান্তিপুরে হ্যাসীন্নরসিংহ দ্বিজোত্তমঃ।"



শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের শ্রীমন্দির।

অর্থাৎ যে সময়ে দোষাঘাতে কুলীনদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে দ্বিজোত্তম নরসিংহ শান্তিপুরে আগমন করেন। ১২৯১ শকের কিছু পূর্ব্বে। এই নরসিংহ কে ছিলেন তাহা লঘু ভারতে এইরূপ লিখিত আছে যথা—

"নরসিংহোপি গৌড়স্থ কার্য্যকারক পালিতঃ।"

নরসিংহ গৌড় বাদসাহের কার্য্যকারকছিলেন। টোগলক্ বংশীয় গিয়াসুদ্দিনের পৌত্র তৎকালে গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হয়েন, সুতরাং শান্তিপুরের অস্তিত্ব সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসরেরও উপর স্বীকার করিতে হয়। আর এক কথা, মহম্মদ বক্তিয়ার ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ অধিকার করেন। প্রবাদ আছে তিনি এই শান্তিপুর বয়ড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপাভিমুখে গমন করেন। এই ঘাট আজিও "বক্তারের ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং তখনও অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক সাত শত বৎসর পুর্ব্বেও এই স্থান যে বর্ত্তমান ছিল তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

শুনা যায় বহুপূর্ব্বে এই সকল স্থান গঙ্গার গর্ভবর্ত্তী ছিল; এখনও উহাদের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে গঙ্গাগর্ভ মৃত্তিকাপুর্ণ হইয়া শান্তিপুর, ফুলিয়া, বেলগড়ে প্রভৃতি স্থান, অর্থাৎ উলা ও অম্বিকা কালনার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমুদয় উদ্ভূত হইয়াছে; এখনও বন্যা বা বর্ষাদি কারণে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইলেই এই সকল স্থানের অধিকাংশই জলমগ্ন হয়, বিশেষতঃ রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর গমনাগমনের যে "ফেরীফাণ্ড রোড" নামক রাস্তা আছে তাহার উপর দিয়া যাইবার সময় উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হইবে যে এই উভয় পার্শ্বস্থ স্থান সমুদয় একটী প্রাচীন বিশাল নদীর খাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রবল বন্যার সময়ে আজিও এই খাতে গঙ্গার প্রবাহ দেখা যায়।

শান্তিপুর গ্রাম যে বহুপূর্ব্বকালে জলমগ্ন ভূখণ্ড ছিল তাহার বহু চিহ্ন ও নিদর্শন সময় সময় পাওয়া যায়। কূপাদি খননকালে এখানে একবিংশতি হস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নিম্নদেশ হইতে নৌকাদির ভগ্নাবশেষ বা হাইল এবং শালকাষ্ঠ ইত্যাদি নদী বক্ষের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। রামনগর পাড়ার একটী কূপের তলদেশের এক পার্শ্বে একখানি চৌকয় কাষ্ঠ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বহু পূর্ব্বে শান্তিপুরের উত্তর, পূর্ব্ব, ও দক্ষিণ এই তিনদিকে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। * উত্তরে বাবলা গ্রামের প্রান্তে ও পূর্ব্বে ঘোড়ালিয়া হইতে বাবলা পর্য্যন্ত গঙ্গার খাত এখনও বর্ত্তমান। বর্ষাকালে এই খাত গঙ্গার জলে পূর্ণ হয়। দক্ষিণে গঙ্গা এখনও বাহিত, তবে ইহার গতি ও অবস্থান বহু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জেমস্ রেনেল কর্ত্তৃক শতাধিক বর্ষপূর্ব্বে অঙ্কিত নদীয়ার মানচিত্রে গঙ্গা হইতে শান্তিপুর বহুদূরে দেখান আছে; মধ্যে কিছুকাল গঙ্গা গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া বাহিতা ছিল, এক্ষণে পুনরায় দূরে সরিয়া যাইতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বর্ত্তমান শান্তিপুরের দুইক্রোশ উত্তরে "নিঝরের" সন্নিকটবর্ত্তী বাবলা নামকস্থানে পূর্ব্বে শান্ত নামে একজন বেদাচার্য্য বাস করিতেন। তাঁহার চলিত নাম শান্তমুনি; এই শান্তমুনির নাম হইতেই শান্তিপুর নামের উৎপত্তি; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে শান্তমুনি হইতে শান্তিপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কেননা "শান্তিপুর" নামটী শান্তমুনির পূর্ব্ব হইতেও প্রচলিত দেখা যায়। শান্তমুনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সমসাময়িক। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিকট যে সময়ে বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন অদ্বৈতের বয়স অনধিক দ্বাদশ বৎসর বলিয়া কথিত, সুতরাং শান্তমুনির বয়স পঞ্চাশ বা ষাটি বৎসর ভিন্ন আর কতই হইতে পারে? ষাটি বৎসর হইলেও তিনি শ্রীঅদ্বৈত অপেক্ষা আটচল্লিশ বৎসরের বড়। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার পিতার আশীবৎসর বয়ঃক্রম কালে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার পিতা শান্তমুনির জন্মগ্রহণের বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅদ্বৈতের প্রপিতামহ গৌড় বাদশাহের কার্য্যোপলক্ষে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন, তিনি শান্তমুনির জন্মগ্রহণ করিবার কতবৎসর পূর্ব্বের লোক হইবেন? প্রায় একশত বৎসরের; তখনও শান্তিপুর গননীয় স্থান, এবং "শান্তিপুর" নাম দূর দূরান্তর বিশ্রুত।

আবার কেহ বলেন যে পূর্ব্বে এই স্থানে হিন্দুরা তাহাদের মৃতকল্প পিতামাতাকে সজ্ঞানে তীরস্থ করিয়া লইয়া আসিত। যাহারা এখানে আসিয়া রোগমুক্ত হইত তাহারা পুনরায় সংসারে যাইলে পাছে সংসারে কোনরূপ অমঙ্গল প্রবেশ করে এই ভয়ে তাহারা আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া, সংসারের সুখ দুঃখ হইতে নিরপেক্ষভাবে এখানে জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিতে অতিবাহিত করিতেন

* "শান্তিপুরে সুরধনী বহে তিন দিকে।" অদ্বৈতমঙ্গল।

বলিয়া, এবং এইরূপ সংসারবিরাগী, শান্তিঅভিলাষী লোক লইয়া গ্রাম গঠিত হওয়ায় এই স্থান শান্তিপুর নামে খ্যাত হয়।

শান্তিপুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত ভেদ হইলেও ইহা সামান্য পল্লী হইতে এক্ষণে নদীয়ার মধ্যে জনসংখ্যাও বিস্তৃতির পরিমাণে সর্ব্বপ্রধান নগর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা এক্ষণে ৩৮ মৌজায় বিভক্ত। এক এক মৌজার মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন পল্লী সন্নিবিষ্ট। পল্লীর সংখ্যা অনেক; গোস্বামী পল্লীই তিনটী (বড় গোস্বামী পল্লী, মদনগোপাল গোস্বামী পল্লী; ও হাটখোলা গোস্বামী পল্লী)। রামনগর প্রভৃতি কয়েকটী পল্লী অতি বিস্তৃত। বিস্তৃত বেড় পল্লীতে কেবল মুসলমানের বাস। তিলি পল্লীর মধ্যে অধিকাংশ লোকই তিলি। বেজ পল্লা নামক যে পল্লী আছে তথায় কতকগুলি বৈদ্যের বসতি। কাশুপ পল্লীর মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণের বাস। দত্ত পল্লীর মধ্যে অনেক গুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোক বাস করেন। শান্তিপুরের কোন কোন পল্লীর নাম বড় অদ্ভুত রকমের, যেমন ডাবরে বা ডাবরিয়া পাড়া। এই পাড়াটী ক্ষুদ্র। পূর্ব্বকালে এখানে ডাবরে উপাধি খ্যাত কতকগুলি অবস্থাপন্ন তন্তুবায়ের বসতি ছিল। তাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। এক্ষণে এই পল্লীতে উক্ত উপাধিধারী কতিপয় হীনবস্থার তন্তুবায় বিদ্যমান।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে শ্রীঅদ্বৈতের বাসভূমি বলিয়া শান্তিপুরের খ্যাতি দেশময় পরিব্যাপ্ত হয়। এই কালে দেখা যায় একজন কাজী এখানে থাকিয়া গৌড়ের হুসেন সাহের নামে এই স্থান শাসন করিতেন; পরে মহামতি আকবর বাদসাহের সময় এই শান্তিপুর গ্রাম ইহার পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী সুতরাগড় নিবাসী কোনও খুন্দকার বাদশাহ প্রদত্ত এক ছাড় পত্র দ্বারা খেলায়ত প্রাপ্ত হয়েন। বাদসাহ আকবর প্রদত্ত এই পাঞ্জা অদ্যাপি খুন্দকার বংশধরগণের নিকট বর্ত্তমান আছে; তাহাতে দেখা যায় "দক্ষিণে গঙ্গানদী, উত্তরে নির্ঝর, পূর্ব্বে সুরুগড় (বর্ত্তমান সাড়াগড়) ও পশ্চিমে গোর্ফেয়া এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী স্থান তোমাকে দেওয়া গেল।" পরে কিরূপে এই স্থানটী খুন্দকারগণের অধিকারচ্যুত হইয়া নদীয়াধিপতি গণের অধীন হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না।

নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব কালে এই স্থান বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বলিয়া পরিচিত ছিল। "কলিকাতা অন্ধকূপের" প্রধান নায়ক হলওয়েল সাহেবকে "অন্ধকূপ"

হইতে মুক্ত করিয়া নবাবের সৈন্যগণ যখন তাঁহাকে মুর্সিদাবাদে লইয়া যায়, তখন তাঁহাকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় দ্বিপ্রহরের দারুণ রৌদ্রে পদব্রজে হাঁটাইয়া এই শান্তিপুরের কোন জমিদারের নিকট লইয়া যায়। এই অজ্ঞাতনামা জমিদার সেই অবস্থায় উক্ত সাহেবকে একখানি অনাবৃত জেলে ডিঙ্গিতে উঠাইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। *

১৮২৮ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক কমারসিয়াল রেসিডেন্সী এই শান্তিপুরে স্থাপিত ছিল। ১,৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সুক্ষ্মবস্ত্র প্রতি বৎসর এখান হইতে বিলাতে রপ্তানী হইত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এখানে গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত এক সুবৃহৎ মদের ভাঁটী স্থাপিত হয়। লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে এই রেসিডেন্সার নিমিত্ত এক মর্ম্মর খচিত প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রেসিডেন্সীর এই প্রাসাদ মাত্র দুই হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এই রেসিডেন্সিতে বাৎসরিক ৪২,৩৫১৲ টাকা বেতনে একজন রেসিডেণ্ট বাস করিতেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রায়গড়ের কারখানায় ৫০০০ লোকের অন্ন সংস্থান হইত। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব ওয়েলেসলী ২ দিন এই রেসিডেন্সীতে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। এই রেসিডেন্সী হইতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ১৪০০৲ টন চিনি বিলাতে রপ্তানী হইয়াছিল। মার্জ্জরি বুক সাহেব এই রেসিডেন্সীর শেষ রেসিডেণ্ট।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাধরপুর, রাণীঘাট, নাদঘাট হৈড়োর খাল প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি সাহেবী নীলকুঠী ছিল। ইংরাজ

* "Here Holwell was landed as a prisoner on his way to Mursidabad ; after surviving the misery of the Blackhole" he was marched up to the Zemindar of Santipur "in a scorching sun near noon. For more than a mile and a half, his legs runing in a stream of blood from the irritations of the irons." From thence he was sent in an open fishery boat to Mursidabad, "exposed to a succession of heavy rain or intense sunshine." He was lodged in an open stable ; he experienced however every act of kindness from Messrs Law and Vernit, the French and Dutch chiefs of Kasimbazar as also from the Armenian merchants. He was led about the city in chains as a spectacle to the inhabitants to show the condition the English were reduced to."

Vide Cal. Review vol. VI. 1846 A. D.

রাজত্বের প্রথম আমলে "মে," নামে এক সাহেব নদীয়া রিভারের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি শান্তিপুরের নিম্নবাহিনী গঙ্গা হইতে নবগঙ্গার উপরিস্থিত মগরা নামক স্থান পর্য্যন্ত একটী খাল কাটিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎকালে শান্তিপুরের ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাবক্ষে অতিশয় দস্যুভীতি ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলে এবং নদীবক্ষে জলপুলিশের বন্দোবস্ত হইলে এই উপদ্রব প্রশমিত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হিল, ওয়ার্ডেন, ও ট্রইন নামে তিনজন লণ্ডন মিসনারি সোসাইটীর সাহেব এইখানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করেন। তাঁহারা তদানীন্তন শান্তিপুরের অধিবাসীগণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এখানকার অধিবাসীগণ সরলচিত্ত ও তাহারা সাধারণ বঙ্গবাসী অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত এই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।" তাঁহারা তৎকালিন শান্তিপুরের জনসংখ্যা ৫০,০০০ ও গৃহের সংখ্যা ২০,০০০ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গৃহের অধিকাংশই প্রাচীন ও ইষ্টক নির্ম্মিত বলিয়াও উল্লিখিত আছে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লর্ড বিশপ সাহেবও এখানকার ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে গোস্বামী, দর্জ্জি ও তাঁতির জন্য বিখ্যাত বলিয়াছেন। তিনি শান্তিপুর হইতে দুই মাইল দূরে একটী বৃহৎ চিনির কারখানার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই কারখানায় সেই সময়ে প্রত্যহ ৫০০ মণ চিনি পরিষ্কৃত হইত এবং ৭০০ জন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটীর সংস্কারের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ২০,০০০৲ টাকা প্রদত্ত হয়।

পূর্ব্বে এই স্থানে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চা খুবই ছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ সাহেব এখানে ৩০ ত্রিশখানি টোল দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এখানে সুরার প্রচলন ও তন্ত্রের নামে ব্যভিচারাদি খুবই ছিল ও সতী দাহও বৎসরে কম হইত না। সাহেব আরও লিখিয়াছেন যে "কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে একজন ৪৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষ আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পুড়িয়া মরিবার অনুমতি চায়, তাহার অজুহাত এই যে, জীবন তাহার নিকট নিতান্তই ভারবহ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অর্থ দিতে চাহিলেও সে ইহা গ্রহণে অস্বীকার করে এবং সেই রজনীতেই পুড়িয়া মরে।"

বিশপ সাহেব ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় দেখিয়াছিলেন। কলিকাতার, বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে পর এই বিদ্যালয়টী উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এক্ষণে এখানে মিউনিসিপাল স্কুল, ওরিএন্ট্যাল একাডমি ও নদীয়া মহারাজার হাইস্কুল, নামে তিনটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। ইহা ভিন্ন এখানে দুইটী মধ্য ইংরাজী, ষোলটী নিম্ন প্রাথমিক ও চারিটী নৈশ বিদ্যালয় ও পাঁচটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। বালিকা বিদ্যালয় কয়েকটীর মধ্যে রামনগর মধ্য বাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয়টী প্রধান।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু মতিলাল মৈত্রেয় শান্তিপুরে কাব্য প্রকাশ যন্ত্র নামে একটী মুদ্রা যন্ত্র স্থাপনা করেন। বাবু হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের কোকিলদূত কাব্য সেই যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ সান্যাল মহাশয়ের যত্ন ও উৎসাহে আর একটী মুদ্রা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছু দিনের জন্য ভারত ভূমি নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, মুদ্গর নামে হাস্যরসাত্মক মাসিক পত্র ও বহুরূপী নামক একখানি ব্যঙ্গকাব্য এই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। শ্যামাচরণ বাবুই ঐ তিনখানির লেখক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ হইতে রঙ্গভূমি নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে বিহারীলাল গোস্বামী মহাশয় একাদশখণ্ড সরোজিনী নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৩০৫ সালে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক এবং তাহার সভ্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক কর্ত্তৃক সেবা নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। উহা প্রায় এক বৎসর চলিয়া ছিল শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক বিগত ৯ বৎসর হইতে যুবক নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক উহা সম্পাদিত হয়।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারী শান্তিপুরে মিউনিসিপালটী স্থাপিত হয়। এই মিউনিসিপালিটীর মধ্যে ২০ মাইল পাকারাস্তা ও ৮০ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে ইহার পরিমাণ ফল চারিবর্গ ক্রোশ।

শান্তিপুরে রাঢ়ী বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন।

বৈদিকের সংখ্যা অতি অল্প। ছয় জন আচার্য্য রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আদি পুরুষ; চারি জন রাঢ়ী আচার্য্য হইতে বল্লভী, চৈতল সর্ব্বানন্দী ও নপাড়ীগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দুইজন বারেন্দ্র আচার্য্য হইতে গোস্বামী ও কাশ্যপগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য বারেন্দ্রগণ ইঁহাদের দৌহিত্র।

এখানকার ব্রাহ্মণ সমূহের মধ্যে গোস্বামি বংশ * রায়বংশ, চট্টোপাধ্যায় বংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ, ভট্টাচার্য্য বংশ, বহুদিন হইতে প্রধান। কিছু কাল হইতে মুখোপাধ্যায় মৈত্রেয় বংশও প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামি বংশে কিছুদিন পূর্ব্বে গোরাচাঁদ গোস্বামী, মদন গোপাল গোস্বামী ও নীলমনি গোস্বামী, মধুসূদন গোস্বামী ও অদ্বৈত চরণ গোস্বামী ও স্বনামখ্যাত বিজয় গোপাল গোস্বামী পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামী পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। ইঁহার পিতা ৮শ্রীরাম গোস্বামী তাঁহার সময়ের ভাগবতের প্রধান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বহু পূর্ব্বে রাধামোহন গোস্বামী নামে "গোস্বামী ভট্টাচার্য্য" উপাধি খ্যাত জনৈক মহাপণ্ডিত এই মহাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িয়া গোস্বামী বংশে প্রথম পণ্ডিত মাধব চন্দ্র গোস্বামী, শেষ পণ্ডিত হরিনারায়ণ গোস্বামী ও রামগোপাল গোস্বামী ইঁহারা ষড় দর্শনের পণ্ডিত; ইঁহাদের চতুষ্পাঠী ছিল। রায় বংশে উমেশ চন্দ্র রায় (মতি বাবু), চট্টোপাধ্যায় বংশে বর্ত্তমান সময়ে অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সিবিলিয়ান মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য।

বহু পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য বংশে চন্দ্র শেখর বাচস্পতি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান্ সময়ে রামনাথ তর্করত্ন এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত। আশানন্দ মুখোপাধ্যায় একজন বীরপুরুষ ছিলেন। ইঁহার দেহে অসুর লাঞ্ছিত বল ছিল বলিয়া খ্যাত আছে। ইনি একদা অস্ত্রের অভাবে নিকটস্থ একটী ঢেঁকী লইয়া একদল দস্যুকে পরাস্ত করেন বলিয়া ইঁহার তদবধি ঢেঁকী উপাধি হয়। তন্তুবায়কুলে খাঁ চৌধুরী বংশে রামগোপাল খাঁ চৌধুরী প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ১৭৩৮ শকে প্রসিদ্ধ শ্যামচাঁদের

---

* অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামী এবং উড়িয়া গোস্বামী। ইঁহারা উড়িষ্যা হইতে আনীত; রাঢ়ী শ্রেণী

মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উৎকীর্ণ দেখা যায়—

"শ্রীমতঃ শ্যাম-চন্দ্রস্য মন্দিরং পূর্ণ-ভাসরত।
বসু বেদর্ত্তু শুভ্রাংশু।
সংখ্যায়া গণিতে শকে॥"

এই উপলক্ষে তিনি বিপুল ব্যয়ে দেশ দেশান্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন এবং লক্ষ মুদ্রা নজর দিয়া তদানীন্তন নদীয়াধিপতিকেও সেই স্থাপিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে মাত্র দুইটী বিধবা এই বংশের শেষ চিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। তন্তুবায় কুলে প্রামাণিক বংশও উল্লেখ যোগ্য। তিন কুলে দুইটী প্রামাণিক বংশ ও ভবানীবংশ প্রধান বলিয়া পরিগণিত।

এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানাদির মধ্যে জলেশ্বর মন্দির, শ্যামচাঁদের মন্দির, শ্রীঅদ্বৈতের পাট, রিভার টমসন হল, বন্ধুসভা, কুন্দকারদের দাতব্য চিকিৎসালয়, গড়ের নব প্রতিষ্ঠিত মানিক দাসের দাতব্য চিকিৎসালয়, গোস্বামীদের নাট মন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির, নেঝোরের খাদ্, মিউনিসিপাল আপিষ ও স্কুল গৃহাদি উল্লেখ যোগ্য। উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর মধ্যে, এখানকার জগদ্বিখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র, পিতল কাঁসার সামগ্রী, এবং আহার্য্য দ্রব্যাদির মধ্যে, খৈচুর ও নিখুতি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শান্তিপুরের সন্নিকটবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে ফুলে, বেলগড়ে, গড়, হরিনদী, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, বাগআঁচড়া, মদদই-শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য।

হরিনদী—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এই গ্রাম খানির উল্লেখ আছে; সুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে, প্রাচীন হরিনদী গঙ্গাগর্ভে যাওয়ায় হরিনদীর অধিবাসীগণ হরিনদী ত্যাগ করতঃ হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে উঠিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে যে গ্রামখানি হরিনদী বলিয়া পরিচিত তাহা প্রাচীন হরিনদীর ভাতশালা নামক এক ক্ষুদ্র অংশ। গঙ্গার পার্শ্বের বিস্তৃত চরে যেখানে সাহেবডাঙ্গা, নৃসিংহপুর, বাবলাবন প্রভৃতি গ্রাম বিদ্যমান তাহাই প্রাচীন হরিনদী।

বাগ আঁচড়া—শ্রীশ্রীবাগদেবী-মাতার স্থান বলিয়া বাগআঁচড়ার খ্যাতি ও পরিচয়। রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক সাধক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর

মধ্যভাগে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধক রঘুনন্দন এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া লোকে এই স্থানটীকে সিদ্ধাশ্রম বলিয়া থাকে। কথিত আছে রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধ মহাত্মার অভিশাপে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় সবংশে নির্ব্বংশ হয়েন। এই চাঁদরায়কে কেহ রুদ্রের দেওয়ান কেহবা বারভুঁইয়ার অন্যতম শ্রীপুরের চাঁদরায় মনে করেন, কিন্তু অন্নদামঙ্গলে ইহাকে "প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়"—বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

চাঁদরায় কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি রাজা রুদ্রের নির্দ্দেশ ক্রমে নিজ গ্রামের সন্নিকটে ব্রহ্মশাসন গ্রামখানি স্থাপিত করেন। তিনি যে পুর্ণেন্দু চুম্বি শিখর, অত্যুচ্চ শিবমন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশেষ এই গ্রামে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্ষুদ্র একটী চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের চারিদিকে চারিটী ভগ্নপ্রায় মন্দির। উত্তর দিকের মন্দিরটী অপর তিনটী অপেক্ষা কিছু ভাল অবস্থায় আছে, কিন্তু চূড়া বা আবরণ কিছুই নাই; কেবল চতুর্দ্দিকের ভিত্তি দণ্ডায়মান। সম্মুখের ভিত্তিতে ইষ্টকে খোদিত নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি; মন্দিরের শীর্ষদেশে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। মন্দিরের পুর্ব্বদিকের দ্বারের উপর ইষ্টকে খোদিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে :—

"শ্রীশিবঃ।

শাকে বারমতঙ্গবাণ হরিণাঙ্কে নাক্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশু সুধা সুধাকর কর ক্ষীরোদনীরোপমং।
তস্মৈ সৌধমিদমুদা সুজলদানিলীনলোলধ্বজং
তৎপাদেষ্বিত ধীর ধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ॥"

অর্থাৎ,—অবিরত নিশ্চল বুদ্ধি শ্রীচাঁদরায় ১৫৮৭ শকে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পুর্ণচন্দ্রের কিরণ ও ক্ষীরোদ জলতুল্য এবং নিবিড় মেঘ সংলগ্ন চঞ্চল ধ্বজযুক্ত এই মন্দির সেই শিবপদে অর্পণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মশাসন—নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র একখানি আদর্শ ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান স্থাপন মানসে একশত আটঘর নিষ্ঠাবান ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মনোনীত করিয়া তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী ভূসম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক চাঁদ রায়ের সাহায্যে এই

গ্রামখানি স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণের সুপ্রতিষ্ঠা হেতু গ্রামখানি ব্রহ্মশাসন নামে অভিহিত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্রের সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি নামে একজন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ৺জগদ্ধাত্রী মাতার মূর্ত্তি প্রচার ও তন্ত্র হইতে পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। তৎপরে নদীয়ার রাজবংশের চেষ্টায় এই পূজা সাধারণে প্রচারিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে চন্দ্রচূড়ের বংশে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিবদাস, তারাদাস ও যুগলদাস নামে তিন কৃতবিদ্য প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ ব্রহ্মশাসন, কেহবা কালনায় বাস করিতেছেন। সম্প্রতি ব্রহ্মশাসনে ৺জগদ্ধাত্রী মাতার নামে চন্দ্রচূড়ের স্মৃতি রক্ষার্থ একটী আশ্রমবাটী নির্ম্মাণের কল্পনা হইতেছে।

উলা বা বীরনগর।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত উখড়া পরগনার উলা একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গণ্ড-গ্রাম। এই গ্রাম জেলার সদর ষ্টেসান্ নিজ কৃষ্টনগর হইতে ন্যূনাধিক পাঁচ ক্রোশ দক্ষিনপূর্ব্বে এবং ইহা সব্ডিভিসান রানাঘাট হইতে কিঞ্চিদাধিক দুই ক্রোশ উত্তরে চূর্ণী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। সহর কলিকাতা হইতে এই স্থানের দূরত্ব একান্ন মাইল, পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের মুরসিবাদ লাইনের রানাঘাট ষ্টেসনের অব্যবহিত পরেই বীরনগর বলিয়া যে ষ্টেসন সংস্থাপিত হইয়াছে উহাই উলার নামান্তর মাত্র। প্রবাদ আছে যে উলুবনা-কীর্ণ বিস্তীর্ণ চরের আবাদ হইয়া গ্রামের পত্তন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম উলা হইয়াছিল। কেহ কেহ পারসী "আউল" অর্থাৎ জ্ঞানী শব্দ হইতে ইহার নাম উলা হইয়াছে বলিয়া থাকেন। এই উলা অতীব প্রাচীন স্থান। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতেও উলার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে ভাগিরথী গঙ্গা এই উলার পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান উলার পূর্ব্ব ও দক্ষিন দিগ দিয়া ডাকাতের খাল ও বারোমেসে খাল বলিয়া যে অতি প্রাচীন একগভীর নদীর খাতরূপ নিম্ন জলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে অনুমান করেন উহাই সেই বহুপূর্ব্বে অন্তর্হিত গঙ্গার গর্ভখাত। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি ১৪৬৬ শকে স্বপ্রণীত চণ্ডীগ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে যে সময়ে

শ্রীমন্ত সদাগর পিতৃ উদ্দেশে সিংহল যাইতে ছিলেন তৎকালে তিনি এই উলার নীচে নিজ জাহাজ নঙ্গর করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে প্রসিদ্ধ উলাইচণ্ডী-দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। যথাঃ—"বটমূলে ভগবতী, যথায় করেন স্থিতি, উপনিত সেই উলা ধামে" ইত্যাদি। এই উলাইচণ্ডীদেবী অদ্যাপিও প্রস্তর খণ্ডরূপে উলার দক্ষিন পূর্ব্ব প্রান্তে স্থিত সেই বটমূলে বিরাজিতা রহিয়াছেন। কবিবর দুর্গপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বরচিত গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী নামক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে, গঙ্গায় উর্দ্দার অবস্থান এবং তত্তীরে উলাইচণ্ডী দেবীর অবস্থিতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"অম্বিকা পশ্চিম পারে, শান্তিপুর পূর্ব্বধারে,
রাখিলা দক্ষিনে গুপ্তিপারা।
উল্লাসে উলায় গতি, বট মূলে ভগবতী,
যথায় পাতকী নহে ছাড়া॥
বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক লক্ষ্য হয়,
পূর্ণিমা তিথির পুণ্য চয়।
নৃত্য গীত নানা নাট, দ্বিজকরে চণ্ডিপাঠ,
মানে যে মানসা সিদ্ধি হয়"॥ ইত্যাদি।

যদিও কবিবর বর্ণিত লক্ষ লোকের সমাগম না হউক তথাপি আজ পর্য্যন্ত চণ্ডিমাতার যাত্ত উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে উলাতে যে লোক সমাগম এবং পূজা প্রদানের যে ধুমধাম হইয়া থাকে তাহা দেখিবার অযোগ্য নহে।

উলার অপর নাম বীরনগর; কথিত আছে খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে অত্রস্থ মুখোপাধ্যায় জমীদার বাবুদের বাটীতে সশস্ত্র এক দল দস্যু আসিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলে বাবুদিগের তৎকালীন গ্রাম্য প্রতীবেশীবর্গ সমবেত হইয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ দস্যুদলের অধিকাংশ দুর্বৃত্তদিগকে হত ও আহত-করিয়া ডাকাইতদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া নদীয়া জেলার তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় উলাকে "বীরনগর" এই আখ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন। তদবধি সরকারি যাবতীয় ব্যাপারে এবং মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে উলা, বীরনগর নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ এই কালেই শান্তিপুরেও দস্যুভিতী হইলে তত্রস্থ অধিবাসীগণ উক্ত সাহেবের

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে সাহেব তাঁহাদিগের কাপুরুষোচিত ভয় দেখিয়া শান্তিপুরের গাধানগর নাম প্রদান করেন। ইহার উত্তর দিকে বারাসাত, খিসমা প্রভৃতি গ্রাম পূর্ব্ব ও দক্ষিনে বহু পূর্ব্বে প্রবাহিতা ভাগীরথীর সেই অস্পষ্ট গর্ভখাত এবং পশ্চিম দিক দিয়া এক্ষনে রানাঘাট মুরসিদাবাদ নামক রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। এই গ্রামের পরিমান ফল দুই বর্গ মাইল, লোক সংখ্যায় পূর্ব্বকালে এই গ্রাম নদীয়া জেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল, তৎকালে ইহাতে প্রায় ৫০ হাজার লোকের বসতি ছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহার লোক সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের অধিক নহে। বহুদিন ব্যাপী মেলেরীয়া জ্বরের প্রভাবেই ক্রমশঃ গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এই গ্রাম স্বাস্থ্যকর ছিল, তখন ইহার শোভা সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। গ্রামে ছোট বড় ৪ চারিটি বাজার, ছোটবড় পাঁচটি ইস্কুল, মুনসফী আদালত, পোষ্টাফিস প্রভৃতি সকলি ছিল। ব্যবসা বানিজ্য সম্বন্ধে এস্থান নিতান্ত হীন দশা সম্পন্ন ছিল না, এখানে বহুতর দোকান পসার ছিল। এই গ্রামে হালুইকর, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, সুত্রধর, চিত্রকর, গন্ধবণিক, স্বর্ণবনিক, কাংশবণিক, তিলি, মালি, তাঁতি, মোদক, নাপিত বারজীবী প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়ীক ব্যবসায়ী বা শিল্পী লোকের অপ্রতুল ছিল না।

গ্রামে ৪ ৫টি অতি সুপ্রশস্ত সুগভীর বহুমৎস্য পরিপূর্ণ দীর্ঘিকা এবং শতাধিক পুষ্করণী বিদ্যমান ছিল বর্ত্তমানে ঐ খানে জলাশয়ের অবস্থাও অতি মন্দ হইয়া গিয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, ধোপা, কলু, জেলে, মালো, দুলে, হাড়ি, বাগদী, তেয়র, ডোম, হাড়ি, মুচি, নিকারি, চুনরী, সানাই-দার, বদ্যকর, প্রভৃতি সকল জাতীয় লোকেরই বিস্তর বসতী ছিল। মুসলমান মোগল পাঠান প্রভৃতি বংশীয়ও অনেক বসতি করিতেন, ফলতঃ তৎকালে উলার লোকদিগকে কোন বিষয়ে কোন প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য গ্রামান্তরের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। উচ্চশ্রেনীস্থ হিন্দু সম্প্রদায়, কি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহাতেজস্বী ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি সর্ব্বজন পরিচিত কুলগৌরবান্বিত স্বধর্ম্ম-পরায়ণ উন্নতচেতা উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলীন বংশ কি আয়ুর্ব্বেদাদিবৈদ্যশাস্ত্রবিশারদ নাড়ীতত্বজ্ঞ বিজ্ঞ বহুদর্শী বৈদ্যচিকিৎসক কি সম্ভ্রান্ত কায়স্থমণ্ডলি কি গায়ক ও বাদক সম্প্রদায় ইত্যাদি কোন বিষয়েই উলায় হীনতা ছিল না। প্রত্যুত এখানে

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ৮। ১০ খানি টোল, উচ্চশ্রেণীর ১২। ১৪ ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ, ৩০। ৪০ ঘর বৈদ্যচিকিৎসক, ২০০। ২৭৫ ঘর সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র কায়স্থ বাস করিতেন। ইহাদের কুলশীল, আচারব্যবহার, ধনদৌলত, সুখসমৃদ্ধির বিষয় অধিক আর কি বলিব। যে গ্রামে শতাধিক দেবমন্দির, সহস্রাধিক শিব-সালিগ্রাম প্রতিষ্ঠা; ৩। ৪ শত দুর্গোৎসব, হাজার বারশত শ্যামা পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান, যে স্থানে সাধারণ ভোজনাদি ব্যাপারে এক পুংক্তিতে দুই আড়াই হাজার ব্রাহ্মণ একত্রে ভোজন করিতেন; যে স্থানের বিদ্যালয় সমূহে ৭। ৮ শত ভদ্রবংশীয় ছাত্রের উপস্থিতি দেখা যাইত, যে স্থানের বারয়ারী পূজা ব্যাপারে কম বেশী লক্ষ লোক সমাবেশ, সেস্থল যে কিরূপ উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহা বর্ণনা অপেক্ষা অনুমানেই সমাধিক পরিস্ফুট হওয়া সম্ভবপর তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু কি কুক্ষনেই এ স্থানে প্রথম ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর আবির্ভাব হইল, কি কুলগ্নেই সন ১৮৬২ সালের ভাদ্র মাসে সেই ভীষণ নরঘাতিনী, করালবদনা, মহামারি সংহার মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাণ্ডবতালে নৃত্য করিতে করিতে বিশাল বদন ব্যাদন পূর্ব্বক নরশোনিত পানে প্রবৃত্ত হইল যে সেই হইতে আজ প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ মেলেরিয়ার অবিশ্রান্ত আক্রমনে প্রপীড়িত হইয়া তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিস্তীর্ণ নগরবৎ সেই উলাগ্রাম এক্ষনে এক প্রকার জনশূন্য অরণ্যে পরিনত হইতে বসিয়াছে। কথিত আছে মহামারীর প্রারম্ভ হইতে প্রত্যহ গড়ে ১ শত লোকের মৃত্যু ঘটিয়া কিছু কাল এইরূপ সবেগে চলিয়া এই উলায় কমবেশী চল্লিশ হাজার লোক কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছিল। আজ যাহার সহিত দেখা হইল কাল আর তাহার অস্তিত্ব নাই; বহু পরিবার পূর্ণ সুন্দর গৃহস্থলী এক রাত্রেই শব পরিপূর্ণ সমরস্থলী হইয়া রহিয়াছে। রাত্রে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া পরিবারস্থ সকলে নিদ্রিত হইয়াছে প্রাতে আর দ্বার খুলিবার কেহ অবশিষ্ট নাই গৃহস্থ সকলেই রাত্রি মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম যথারিতি সংকার হইবার পরে শবের আর দাহ হওয়া দুরে থাকুক বাটী হইতে বহির্গত হইবার উপায় রহিত হইল, অনেক শব গৃহাভ্যন্তরে পচিতে লাগিল বাহকের বাহন শক্তি রহিত হইল সেই স্থানেই বাহকের পরিসমাপ্তি হইল। এই কোন ব্যক্তি পিতৃদেহ গঙ্গায় সমার্পন করিয়া আসিল পরক্ষণেই তদীয় দেহও

শবরূপে বাহিত হইয়া গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইল। গ্রামের এইরূপ অনীর্ব্বচনীয় দুর্গতিদর্শনে ভীত হইয়া গ্রামবাসীগণ দলে দলে আপন আপন ভবন বৈভব পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিল। সেই অবধি প্রায় ৫০। ৫৫ বৎসর হইতে চলিল কিন্তু উলার হতশ্রী আর সংশোধন হইল না বরং ক্রমশই হীন হইতে হীনতর হইতেছে।

১৮৬৯ সালে এখানে মিউনিসীপ্যালিটীর প্রথম অধিবেশন হয় তখন ইহাতে প্রায় ১৫ হাজার লোক ও ৫.৬ হাজার টাকা আয় ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে জন সংখ্যার হ্রাস হইবার পর করদাতৃগণের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় উহার আয় কমবেশী ৩ তিন হাজার টাকা মাত্র হইয়া থাকে। ১০।১৫ বৎসর মধ্যে মিউনিসিপালিটীর অস্তিত্ব নষ্ট হইবার অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না।

পূর্ব্বে এই গ্রামে একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় ৪টী বঙ্গ বিদ্যালয় এবং ১০।১২টি পল্লীপাঠশালা ছিল তাহার স্থলে এখন সামান্য একটী ইস্কুল আছে তাহার ৫০। ৬০ জনের অধিক ছাত্র দেখা যায় না।

পূর্ব্বে এই গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শীর্ষস্থানীয় বহু বিদ্বজ্জনের আবাস ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের মত লইয়াই এ প্রদেশের যাবতীয় হিন্দু ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত কিন্তু তিনি উলার পণ্ডিত দিগেরও স্বতন্ত্র ভাবে মত গ্রহন করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন ফলতঃ তৎকালে নবদ্বীপের ন্যায় উলার পণ্ডিত গণের একটী স্বতন্ত্র মত চলিত। এখানে টোল ধারি বহুতর গণ্যমান্য পণ্ডিত ছিলেন তন্মধ্যে চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, কৃষ্টরাম ন্যায় পঞ্চানন, সদাশিব তর্কালঙ্কার এবং শিবশিব তর্করত্ন প্রভৃতি অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ বহুশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গেলে প্রত্যেকের জন্য এক এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। প্রথিত আছে একদা উলার কৃষ্টরাম ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় বাটী হইতে স্থানান্তর গিয়াছিলেন ঐ সময়ে এক ব্যক্তি পণ্ডিত শ্রাদ্ধের ব্যবস্থার জন্য তাঁহার টোলে উপস্থিত হইলে তাঁহার জনৈক ছাত্র তাঁহাকে পরবর্ত্তী একাদশীর দিনে শ্রাদ্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা পত্র দিয়া বিদায় করেন কিন্তু ঐ পরবর্ত্তি একাদশী যে শুক্ল পক্ষে তাহা তাঁহার উবোধ হয় নাই পরন্তু ব্যবস্থা পত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর

করিতে গিয়া ভ্রম বশতঃ "শ্রীকৃষ্ণরাম সর্ম্মা" এইরূপ দন্ত সকারযুক্ত "শর্ম্মা" পদের ব্যবহার করিয়া ফেলেন। ঘটনাক্রমে ব্যবস্থাপত্র খানি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টি গোচর হইলে তিনি নিতান্ত বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উলায়কৃষ্ণ রামের নিকট উহার সংশোধন বা সমর্থনের জন্য পুনরায় পাঠাইয়া দেন এবং ঐরূপ ব্যবস্থা ও লিখন বৈচিত্রের যথোচিত উত্তর প্রদানের নিমিত্ত তাঁহাকে রাজধানীতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। তখন মহাতেজস্বী তার্কিক প্রবর কৃষ্ণরাম স্বীয় ছাত্রকৃত তথাবিধ অসঙ্গত বর্ণাশুদ্ধি ও অদ্ভুত ব্যবস্থার সমর্থনে কৃত সংকল্প হইয়া পত্র খানিতে "পুনঃ কৃষ্ণরাম শর্ম্মা" এইরূপ দ্বিতীয় সাক্ষর করিয়া রাজধানিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বকীয় ব্যাবস্থাদির পরিপোষনার্থ বিচার করিবার দিনস্থির করিয়া দিয়া মহারাজের গোচরার্থ নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। মহারাজও পরম কৌতুকী হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে অন্যান্য বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে রাজধানিতে উপস্থিত হইবার অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন। প্রথিত আছে পণ্ডিত প্রবর কৃষ্ণরাম নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজধানিতে উপস্থিত হইয়া সমাগত সুধী মণ্ডলির সহিত একাদিক্রমে সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিচার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলকে কূট তর্কে পরাস্ত করিয়া তথা কথিত স্বকীয় ব্যবস্থা ও লিখনের সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং মহারাজও তদীয় এই অদ্ভুত বিচার ক্ষমতায় পরিতুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে একটী পতাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ পতাকায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামাঙ্কিত নিম্নলিখিত কবিতাংশ লিখিত ছিল।

যথা,—"উলায়াং কৃষ্ণরামস্য পতাকেয়ং বিরাজতে" ইত্যাদি।

কৃষ্ণরাম স্বীয় বাটীতে অতি উচ্চ স্থানে ঐ পতাকা স্থাপন করিয়া স্বকীয় গৌরব চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভবানি চরণ ন্যায় ভূষণ, মুকুন্দ মোহন ন্যায় রত্ন, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী প্রণেতা কবিবর দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের রাজ সভার হাস্য রসিক সুবিখ্যাত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই উলাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলিতে নিতান্তই আক্ষেপ হয় যে তাদৃশ পণ্ডিত গৌরবে গৌরবান্বিত সেই উলা গ্রাম আজ একেবারেই পণ্ডিত শূন্য হইয়াছে। পুরুষের তো কথাই নাই তখন এখানকার স্ত্রীলোকেরাও বিদুষী ছিলেন সারণ সিদ্ধান্তের দুইটী কন্যা বিশেষরূপে সংস্কৃতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন*

* Vide Calcutta Review Vol. VI.

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে যে কয়েকটী প্রধান সমাজ ছিল এই উলা সমাজ তন্মধ্যে অন্যতম বলিয়া গণ্য। তৎকালে ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের ন্যূনাধিক পঁচিশ শত ঘর রাঢ়ীয় শ্রেণীর অতি সম্ভ্রান্ত কুলীন সন্তান এই উলাতে বাস করিতেন। তাঁহাদের অধিকাংশই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সবিশেষ সম্মানিত এবং সমাদৃত ছিলেন। কথিত আছে মহারাজ প্রায় প্রতি বর্ষেই এই স্থানে সমাগত হইয়া স্বীয় দীর্ঘিকাস্থ জলটুঙ্গিতে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবানকে পদ্ম পুষ্প প্রদান করিতেন এবং তদুপলক্ষে সমাজস্থ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর আহ্বান করিয়া পরম সমাদর প্রদর্শন করিতেন। ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের এত অধিক সংখ্যক স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীন তৎকালে আর কুত্রাপি দেখা যাইত না। ইঁহাদের সকলেই সম্ভ্রান্ত এবং অধিকাংশই সবিশেষ অবস্থাপন্ন তন্মধ্যে গড়ের চট্টোপাধ্যায় বংশ, ফুলিয়ার মুখোপাধ্যায় পাড়ার কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়ের বংশ সমধিক বিখ্যাত ও কৌলিন্য গৌরবে গরীয়ান ছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশের সুখৈশ্বর্য্যের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে উলার ফুলিয়া কুলোদ্ভব সুপ্রসিদ্ধ বামন দাস বাবুর বিষয় সর্ব্বাগ্রে বর্ণনীয়। তদীয় পিতামহ মুখুজ্জ্যে কুলোদ্ভব মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই উলা গ্রামের মাঝের পাড়ায় এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে একদা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ বিড়ম্বনায় একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া একটী মাত্র আধুলি সম্বল লইয়া তিনি বাটী হইতে বহির্গত হয়েন এবং বহু কষ্টে গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে করিতে অনেক দিন পরে পরিশেষে রংপুরে গিয়া উপস্থিত হয়েন। তথায় কোন নীল কুঠিয়াল সাহেব তাঁহার দুরাবস্থার পরিচয়ে কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে আপন কুঠিতে জনৈক কর্ম্মচারি নিযুক্ত করেন ক্রমে মহাদেব স্বীয় অদম্য উৎসাহ অপরিসীম অধ্যবসায় অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্রমে জমিদারী প্রভৃতি খরিদ করিয়া একজন গণ্য মাণ্য জমিদার হইয়া উঠেন। কথিত আছে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পাল চৌধুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি কৃষ্ণপান্তি মহোদয় তাঁহার জমীদারী ক্রয় সম্বন্ধে বিস্তর সহায়তা করিয়া ছিলেন। ক্রমে মহাদেব ফরিদপুর, ঢাকা, মৈমনসিং, রংপুর প্রভৃতি জেলার জমিদারী খরিদ করিয়া একজন প্রসিদ্ধ জমিদার হইয়া উঠেন। এই সময়ে তাঁহার জমিদারীর আয় প্রচুর হইয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং অতি সুধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন সুতরাং ঐরূপ ঐশ্বর্য্যের অধি-

পতি হইয়া দান ধ্যান ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তদনুসারে বাটীতে স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা প্রভৃতি যাবতীয় বার্ষিক ক্রিয়া কলাপের সংস্থাপন করিলেন এবং সর্ব্বোপরি হিন্দুগৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য সদাব্রতের সংস্থাপন করিয়া স্বীয় সহৃদয়তা ও ধর্ম্ম প্রবণতার পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধানাথ মুখোপাধ্যায় নামে মহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপর এক সহোদর ছিলেন কথিত আছে মহাদেব স্বেচ্ছাক্রমে ইঁহাকে স্বোপার্জিত জমিদারীর কিয়দংশ পৃথক করিয়া দিয়া যান; এই রাধানাথই উলার খ্যাতনামা জমীদার শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ। শম্ভুনাথ পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যথারীতি হিন্দু আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের দুর্গাপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদ নামে দুই পুত্র ও ত্রিপুরা সুন্দরী নামে এক কন্যা ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্গাপ্রসাদের বামন দাস, গৌরীপ্রসাদ এবং অন্নদা প্রসাদ নামে তিন পুত্র জন্মে আর কনিষ্ঠ কৃষ্ণ প্রসাদের চন্দ্র ভূষণ নামে এক পুত্র হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত বামন দাস মুখোপাধ্যায়ই উলায় মুখোপাধ্যায় জমীদার বংশের কুল প্রদীপ; তিনিই এই জমীদার বংশের পূর্ণ গৌরব ও চরমোন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলে পিতামহ প্রদত্ত বিষয় বৈভবের বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন এবং বিস্তর অর্থব্যায় পূর্ব্বক তদীয় বৈভবানুরূপ সুদৃশ্য সুপ্রশস্ত দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট বাটী নির্ম্মাণ করিয়া পিতামহ প্রতিষ্ঠিত পৈত্রিক ক্রিয়া কর্ম্ম গুলির সমধিক পুষ্টি সাধন পূর্ব্বক দেশ মধ্যে একজন সুবিখ্যাত গণ্য মান্য ক্রিয়াবান হিন্দু জমিদার বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। তাঁহার সময়ে বাটীতে অন্যান্য ক্রিয়া কলাপ মধ্যে তিনটী ক্রিয়ায় সবিশেষ সমৃদ্ধি হইত, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও জগদ্ধাত্রী পূজা; স্নানযাত্রা উপলক্ষে তিনি আমৈথিল চট্টগ্রাম বঙ্গের যাবতীয় প্রধান পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ করিতেন সুতরাং ঐ ক্রিয়ার সময় মিথিলা, রাঢ়, নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলি, ভট্টপল্লী, কলিকাতা, যশোহর, ঢাকা, মৈমনসিং, বাকলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের প্রথিত নামা পণ্ডিতগণ প্রতি বৎসর তদীয় উলার বাটীতে সশিষ্য সমাগত হইতেন। বামন দাস সন ১২৮১ সালে একাত্তর বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

তদীয় ভ্রাতা গৌরি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্থানীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে স্বীয় সহৃদয়তা ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইনি সঙ্গীত শাস্ত্রের সাতিশয় সমাদর করিতেন।

বামন দাসের কালিদাস, অরুণ দাস, মথুরা নাথ, উমানাথ, তারানাথ এবং শ্রীনাথ নামে ছয় পুত্র জন্মে, ইঁহারা সকলেই চরিত্রবান, কৃতী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, যথাসম্ভব পিতার প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপ অক্ষুন্ন রাখিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় ইহাদের কেহই জীবিত নাই। বামন দাসের পৌত্রগণের মধ্যে শ্রীযুত গিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় কথঞ্চিৎ পৈত্রিক প্রথানুযায়ী হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। গিরীন্দ্র নাথের ভ্রাতা শ্রীযুত হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয় কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া থাকেন।

গৌরী প্রসাদের সারদা প্রসাদ (ঘনুবাবু) প্রভৃতি সাত পুত্র হয় কিন্তু তাঁহারা সকলেই নিঃসন্তানে পরলোক গত হইয়াছেন কেবল সারদা প্রসাদের একটী মাত্র পৌত্র বর্ত্তমান থাকিয়া সেই সুবৃহৎ বংশের চিহ্ন মাত্র রক্ষা করিতেছেন।

অন্নদা প্রসাদের উপেন্দ্র নাথ (দনুবাবু) প্রভৃতি ছয় পুত্র হয় তন্মধ্যে বিজয় গোপাল, আশুতোষ (দাসুবাবু) নগেন্দ্র নাথ, নীলমণি প্রভৃতি চারিজন অদ্যাপী বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং এই উলাতেই বসবাস করিতেছেন। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বা শ্রীমান বাবু বর্ত্তমান কালে এই বংশের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানে প্রায় ৩০।৪০ ঘর বৈদ্যের বাস ছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বজাতীয় চিকিৎসা ব্যাবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া সবিশেষ মান প্রতিপত্তি ও গৌরবের সহিত কাটাইয়া গিয়াছেন।

এখানে বহু কায়স্থের বাস ছিল তাঁহাদের অধিকাংশই ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত কুলীন বংশ সম্ভূত এবং বিদ্যা, বিত্ত, বৈভব সম্পন্ন ভদ্র সন্তান। তাঁহাদের ক্রিয়া কর্ম্ম আচার ব্যবহার মন্দ ছিল না। মিত্র কুলোদ্ভব প্রাচীন প্রসিদ্ধ মুস্তফী মহাশয়েরাই উলার আদি সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমীদার। কথিত আছে এই বংশীয় কোন কৃতী পুরুষ প্রাচীন কালে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরূঢ় হইয়া "মুস্তফী" খেতাব

গ্রহণ পূর্ব্বক বহু ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া চাকরি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাটিতে প্রত্যাগমন করেন ক্রমে স্বদেশে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পরিণামে প্রসিদ্ধ জমীদার রূপে পরিণত হন।

নবশায়ক সম্প্রদায় মধ্যে উলার তিলি বংশোদ্ভব খাঁ বাবুরাই সমধিক প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে এই বংশের আদি পুরুষ মুর্শিদাবাদে মুদির দোকান করিতেন ক্রমে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক নবাব সরকারের মুদি হইয়া উঠেন এবং সুপারির কারবারে প্রবৃত্ত হয়েন এই সুপারির কারবারই ইহাঁদিগের অভ্যুদয়ের হেতু। অদ্যাপীও কলিকাতার বড়বাজার এবং নিম্ন বঙ্গের আরও অনেকানেক স্থানে ইহাদিগের সুপারির আড়ত বিদ্যমান আছে এবং বর্ষে বর্ষে ঐ সকল আড়ত হইতে বিস্তর টাকা লাভ হইয়া থাকে। একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বার্ষিক খাজনার অনাদায় জন্য নবাব সরকারে আবদ্ধ হয়েন সেই সময়ে উক্ত মুদী মহারাজের সবিশেষ সেবা সুশ্রূসা ও সাহার্য্য করায় মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে কিছু দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন কিন্তু তিনি তৎকালে উহা না লইয়া আবশ্যক মতে লইবেন এই আবেদন করিলে মহারাজ তহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন পরে ঐ বংশীয় নীলাম্বর কুণ্ডু আপন মাতৃদায় উপস্থিত হইলে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে মহারাজের নিকট সেই প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারের পালন জন্য প্রার্থনা জানাইল এবং কহিল "মহারাজ আমি এই প্রার্থনা করি যে এখন হইতে আপনকার সমগ্র উলা সমাজ আমার বাটীতে পদার্পন করেন" তদনুসারে মহারাজ উহাদিগকে খাঁ এই উপাধি দান পূর্ব্বক উলা সমাজ পাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত উহারা সেই রাজ প্রদত্ত খাঁ উপাধিতে সম্মানিত ও উলার সমাজের গ্রহনীয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগের অবস্থা খুব ভাল। এই বংশীয় রাজকৃষ্ণ খাঁ ও সর্ব্বচন্দ্র খাঁ বিশেষ ধন প্রতিপত্তির অধিপতি হইয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের বর্ত্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে বাবু জগন্নাথ খাঁ, আশুতোষ খাঁ, সুরেন্দ্র নাথ খাঁ, সুজন খাঁ, যতীন্দ্র নাথ খাঁ প্রভৃতি বাবুদের নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য বংশের মধ্যে মিত্র বংশও উল্লোখযোগ্য এই বংশের বর্ত্তমান কালে ৺চন্দ্রকুমার মিত্রের পুত্র বঙ্গভাষায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক, বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর

কাব্য, নরসিংহ, কলিনা, পার্ব্বতী প্রভৃতি লেখক শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র বি, এল মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গভাষার অন্যতম প্রাচীন লেখক শ্রীচন্দ্রশেখর বসুও উলাবাসী।

উলার লোক সাধারণতঃ হাস্যরসিক, এবং খামখেয়ালী সে কারণে এতদঅঞ্চলে উলানিবাসীগণ "উলুই পাগল নামে খ্যাত, এসম্বন্ধে এ প্রদেশে একটী প্রবচনও প্রচলিত আছে যথা "উলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর ও হালিসহরের তেঁদর" * উলার লোক এক দিকে যেমন হাস্যরসিক ছিলেন তেমনি অপর দিকে ভোজন বিলাসীও খুব ছিলেন; মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, ঈশে পাগলা, মহেশ পাগলা প্রভৃতির নাম যেমন রসিক বলিয়া খ্যাতি তেমনি অনেকের 'খোরাকী" বলিয়া খ্যাতি ছিল, এদলের প্রধান ছিলেন রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় ইনি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে আহার করিতেন এ কারণে তাঁহার খ্যাতি ছিল "মুনকে রোঘো"। তিনি আপনার এই অসাধারণ গুণে বহু রাজা ও জমীদারের প্রিয় ছিলেন, এবং তাঁহাদের দত্ত মাস-হারাতেই তাঁহার সংসার চলিত।

উলার মধ্য দিয়া যে প্রশস্ত রাজবর্ত্মটী কৃষ্ণনগর অভিমুখে গিয়াছে তাহা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে উলার মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের উদ্যোগে সাধারণের অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। †

উলার প্রস্তুত সামগ্রীর মধ্যে উলার বাগনের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধি থাকিলেও এখন তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে উলার মুণ্ডি, মনোহরা, বীরখণ্ডী ও সুয়াতোলা সন্দেশ আজিও প্রসিদ্ধ। আজ যে কোনও দেবী প্রতিমা সাজাইতে দেশ দেশান্তরে যে "ডাকের-সাজের" প্রচলন হইয়াছে তাহার প্রথম আবিষ্কার এই উলা গ্রামেই হইয়াছিল। প্রায় দেড় শত বর্ষপূর্ব্বে উলার সন্নিকটবর্ত্তী পানিত পাড়া নামক স্থানে কানাই লাল আচার্য্য ও নীলমনি আচার্য্য নামে দুই ভ্রাতা বাস

---

* As Guptipara is noted for its monkey, Halishahar for its drunkards, so is Ulla for fools, as one man is said to become a fool every year at the Mela.

Cal Review. Art III Vol VI, 1846.

† In 1834 the Baboos of Ulla raised a large subscription and gave it to the authorities to make a Pukka road through the town.

Cal Review 1846. Vol VI. Page 398—448.

করিতেন, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম এইরূপ সাজের সৃষ্টি করেন; উলার মহামারীতে বিপর্য্যস্ত হইয়া তদীয় বংশধরগণ শান্তিপুরের সন্নিধ্য হরিপুরে উঠিয়া আসেন তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপী এখানে থাকিয়া প্রাচীন রীতানুসারে কাশিমবাজার রাজবাটী প্রভৃতি বহুস্থানে ডাকের সাজ সরবরাহ করিয়া থাকেন।

উলা কিছুকাল চৌকী হাঁসখালির অধীন হইয়া ছিল এবং হাঁসখালীর মুনসুফী আদালত এই উলাতেই হইত, মহামারীর সময়েই উহা উলা হইতে রাণাঘাটে স্থানান্তরিত হয়, কিছু দিন রাণাঘাটে ঐ আদালত থাকিয়া পরে শান্তিপুরে উঠিয়া যায় এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তথা হইতে পুনরায় রাণাঘাটে স্থায়ীভাবে উঠিয়া আসিয়াছে।

উলার নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির মধ্যে পাহাড়পুর, রঘুনাথপুর, খিসমা, মামজোয়ান, আড়বন্দী, বাদকুল্লা প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য। পাহাড়পুরের, মুখোপাধ্যায় বংশ প্রসিদ্ধ। ৺কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এই বংশের উপায়ক্ষম ক্রিয়াবান পুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তৎপুত্র ৺বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় M.A.B.L. এক জন সাহিত্যোৎসাহী বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন তৎপুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার একজন পিতার ন্যায় সদাশয় ও উদ্যোগী পুরুষ।

রঘুনাথপুর,—বৈদ্য প্রধান গ্রাম এতদঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ চন্দ্ররায় ও তৎপুত্র ৺ তারিণী চরণ ও ৺ শ্রীচরণ ধন্বন্তরী কল্প সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ৺তারিণীচরণের পুত্র ৺নীলমাধব রায়ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে কলিকাতায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

খিসমার সিংহবংশ বিখ্যাত, রায় বাহাদুর ৺গোকুলচন্দ্র সিংহ এই বংশের।

মামজোয়ান,—নবাবী আমলে নদীয়ার একটী প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ সরকার এই স্থানে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন।

আড়বন্দী,—গ্রামখানি নদীয়ার এক খানি প্রাচীন গ্রাম। বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের নিবাস এই স্থানে।

বাদকুল্লা,—পূর্ব্বে দস্যুর উপদ্রবের জন্য অখ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

রাণাঘাট।

রাণাঘাট নদীয়া জেলার একটী প্রাচীন গ্রাম না হইলেও, ইহা অনেকের নিকট সুপরিচিত। উত্তরে ভিরানগর, মধ্যে রাণাঘাট ও দক্ষিণে নাসড়া এই তিন খানি গ্রাম লইয়া বর্ত্তমান রাণাঘাট গঠিত। কোন প্রাচীন পুস্তকে বা মানচিত্রে এই স্থানের নাম দৃষ্ট হয় না। জেমস্ রেনলসের ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গালার মানচিত্রে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে এই স্থানের নাম দেওয়া আছে। সম্ভবতঃ ইহারি কিছু কাল পূর্ব্বে, রাণাঘাট গ্রামে পরিণত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্যরূপ সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় মানচিত্রে স্থান প্রাপ্ত হয়। যখন মানচিত্রে, রাণাঘাট এইরূপ ক্ষুদ্রাকারে মুদ্রিত তখন কৃষ্ণনগর, পলাশী, অগ্রদ্বীপ, শিবনিবাস, নদীয়া, শান্তিপুর, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থান সমুহ বৃহৎ অক্ষরে বিশদভাবে মুদ্রিত। এই মানচিত্রে কৃষ্ণনগর ও শিবনিবাস উচ্চ মন্দির দ্বারা, ও পলাশী আম্রকুঞ্জ দ্বারা চিহ্নিত এবং অগ্রদ্বীপ ও নদীয়া, কৃষ্ণনগরের পারে অর্থাৎ গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, দেখান হইয়াছে।

অনেকে বলেন ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা রঘুরামের রাজত্বকালে এই স্থানে রণানামে একজন বিখ্যাত দস্যুর ঘাটী বা আড্ডা ছিল তাই রাণাঘাটী হইতে রাণাঘাট নামের উৎপত্তি হইয়াছে। রাণাঘাটের অবস্থান বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা পূর্ব্বে যে একটী নদী বেষ্টিত, দস্যুবাসোপযোগী স্থান ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হয়, কারণ এই স্থানটী পূর্ব্বে প্রায় চতুর্দ্দিকে নদীবেষ্টিত ছিল। উত্তরে বাচকোর নদী ও দক্ষিণ ও পূর্ব্বের কিয়দংশ হাঙ্গর নামা নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখন এই দুইটী নদী খাদ মাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও পূর্ব্বে ইহারা খরস্রোতা নদী ছিল; পশ্চিমে চূর্ণী আজিও বহতা। শুনা যায়, রণার দস্যু কালী-প্রতিমা অধুনা রাণাঘাটের মধ্যস্থলবর্ত্তিনী সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী গ্রাম্য প্রতিমা।

অনেকের মতে রাণাঘাটের নাম পূর্ব্বে যাহাই থাকুক, ইহা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই তাঁহার কনিষ্ঠা রাণীর নামেই রাণীঘাট নামে অভিহিত হয়। *

"Ranighat so called from the Rani of Kissen Chand" (সম্ভবতঃ এই

রাজা রঘুরামের রাজত্ব কালে রাণাঘাটের উৎপত্তি কল্পনা করিলেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ বয়সে ইহা রাণাঘাট বাসী কৃষ্ণপান্তির জন্য খ্যাতিপন্ন হয়।

পালচৌধুরী বংশ

কৃষ্ণপান্তী ১১৫৬ সালে রাণাঘাটে এক দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সহস্ররাম পান্তী কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র; প্রথম কৃষ্ণ চন্দ্র, দ্বিতীয় শম্ভুচন্দ্র ও তৃতীয় নিধিরাম। কৃষ্ণ ও শম্ভু বাল্যকাল হইতে বিশেষ চতুর ছিলেন ও নিধিরাম মহাব্যাধিগ্রস্ত বিধায় সর্ব্বকার্য্যেই অপটু ছিলেন। কথিত আছে সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে কেবলমাত্র একটী আধুলী সম্বল করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন এবং আপনার অধ্যবসায় বলে, লক্ষ্মীর কৃপায় বহুবিত্ত উপার্জ্জন করতঃ বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ ধনী পদ বাচ্য হয়েন। এই ব্যবসায়ের আয় হইতে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র এই সময়ে জমীদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন এবং সর্ব্বপ্রথমে যশোহরের অন্তর্গত সাঁতোর পরগণা ক্রয় করেন। ইহাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম জমিদারী। এই সময়ে নদীয়া রাজ শিবচন্দ্র, কৃষ্ট পান্তীকে চৌধুরী উপাধী দিয়া সম্মানিত করেন এবং ইহার অব্যবহিত কালপরে যখন মারকুইস হেষ্টিংশ সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনে সফরে বাহির হইয়া রাণাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং কৃষ্ট পান্তীর অগনিত অশ্ববাজী, প্রাসাদোপম সৌধশ্রেণী, বিরাট ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সাদর অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি দিতে অগ্রসর হয়েন, তখন কৃষ্টচন্দ্র পাল চৌধুরী তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা গুণে, বিনয়ের সহিত উহা প্রত্যাক্ষান

রাণী রাজার কনিষ্ঠা রাণী যাঁহার পিত্রালয় ছিল রাণাঘাটের অদূরস্থিত নৌকাড়ী গ্রামে)
"is the abode of many rich Zamindars",

Cal. Review, Vol VI. 1846.

ঐগ্রন্থে আরও দেখা যায় যে রাজা কৃষ্ট চন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দনের নিবাস এই রাণাঘাট গ্রামেই ছিল, কিন্তু ইহা ঠিক নহে, উঁহার নিবাস শিবনিবাসের নিকট দেওয়ানের বেড়ে ছিল, এই পুস্তকে ঐ দেওয়ান সম্বন্ধে রাণাঘাটে প্রচলিত বলিয়া একটী প্রবাদ বাক্য দেওয়া আছে—

"Rajbari ghari baje tantana"
Dwi prahare Atit gele
Mukta mari chatkhana"

করেন এবং নদীয়াধিপতি দত্ত চৌধুরী উপাধী তিনি ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের অনুমোদিত করিয়া লয়েন। মার্কুইস হেষ্টিংস তাঁহার এইরূপ সরল ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত আশাসোটা ব্যবহারে অনুমতি দেন।

কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয় তাঁহার জীবনে যে সমস্ত দানাদি ও সৎকার্য্য করিয়াছেন তাহার মধ্যে মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে লক্ষ মন চাউল দান, উলার (বীরনগর) মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের জমিদারী ক্রয়ে সাহায্য, ৺মহাপ্রভুর পুষ্করণী প্রভৃতি কতিপয় সুবৃহৎ পুষ্করণী খনন, রাণাঘাট হইতে জগপুরে গঙ্গাস্নানে যাইবার সুদীর্ঘ পথ প্রভৃতি কার্য্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার প্ররোচনায়, মৃত্যুর পূর্ব্বে, তাঁহার যাবতীয় বিষয় এইরূপ বণ্টন করিয়া যান;—তিনি ও তাঁহার মধ্যম শম্ভুচন্দ্র সমগ্র বিষয় তুল্যরূপে, এবং মহাব্যাধিগ্রস্ত কার্য্যক্ষম কনিষ্ঠ নিধিরাম, মাত্র দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি, ও নগদ ৪ লক্ষ টাকা। এই অসদৃশ ভাগই, কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর, পালচৌধুরী এষ্টেটের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। নিধিরামের পুত্র বৈদ্যনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রাগুক্ত অসদৃশ বণ্টন আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সুপ্রীম কোর্টে যে সর্ব্বধ্বংশী মকর্দ্দমা উত্থাপিত করেন এবং যাহা ১৮২১ খৃঃ হইতে ১৮৫০খ্রীঃ মধ্যে চারিবার বিপুল অর্থব্যয়ে বিলাতে প্রিভিকাউন্সলে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরীত হয়, তাহাতেই পালচৌধুরী ষ্টেটের অবস্থা হীন হইয়া পড়ে, এবং মকর্দ্দমার খরচ কুলাইতে পালচৌধুরীদিগের সোনার জমীদারী সাঁতোর বিক্রয় হইয়া যায়।

এই দুর্দ্দিনে পালচৌধুরী এষ্টেট রক্ষা করিতে, শম্ভুর বংশে পরম মেধাবী জয়গোপাল জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিষয়ের সুচারুবন্দোবস্ত করিতে না করিতে নিদারুণ কাল তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লয়। একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ১২৫৩ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপযুক্ত সহোদর পালচৌধুরীগণের পরিত্রাতা শ্রীগোপাল তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া, পালচৌধুরীর ষ্টেট পুন সংস্কারে ও পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। শ্রীগোপাল, স্বীয় আলৌকিক রূপে ও গুণে কি দেশীয় কি ইউরোপীয় সকলেরই নিকট বিশেষ সম্মানিত হয়েন। একদিকে তিনি যেমন নিজের বংশের

উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তেমনি আবার সাধারণের হিতকর কার্য্যেও তাঁহার সবিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত। রাণাঘাটের মিউনিসিপালীটি, রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহ নির্ম্মাণে মুক্তহস্তে সাহায্য, তাঁহার উদার ও মহৎ হৃদয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। ১২৭৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশের গৌরব, প্রাতঃস্মরণীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হয়েন এবং আপনার মহৎ হৃদয় ও দেব চরিত্র গুণে জনসাধারণের প্রীতিভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হয়েন। রাণাঘাট মহকুমাবাসী জনসাধারণ ও তাঁহার মর্য্যাদাপন্ন বন্ধু বান্ধব তাঁহার সন ১৩০২ সালে মৃত্যুর পর একটী সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া Surendra Nath Memorial Hall নামে উহা তাঁহার পবিত্র স্মৃতিতে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অপকট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সুরেন্দ্রনাথের সাধের জমিদারী পঞ্চায়ৎ গৃহে কলিকাতায় এবং রাণাঘাট স্কুলে যথাক্রমে তাঁহার তৈলচিত্র ও মর্ম্মর স্মারকলিপি স্থাপিত হইয়াছে।

উপরোক্ত মহানুভব ব্যক্তিগণ ব্যতীত পালচৌধুরী বংশে যে সকল মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শম্ভুর পৌত্র বাবু জয়চাঁদ পালচৌধুরী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নীল কমিসনে ইঁহারি সাক্ষ্যের প্রজা হিতৈষী বঙ্গেশ্বর গ্রাণ্ট বাহাদুর বিশেষ প্রশংসা করেন। কথিত আছে ইঁহার ন্যায় উন্নতহৃদয় "বাবু" তদানীন্তন কালে সমগ্র বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। ইঁহার সুনামের সহিত পরম অত্যাচারী জমিদার বলিয়াও খুব অখ্যাতি ছিল।* তখন এতদঞ্চলে লোকে অপরকে গালি দিতে হইলে, "তোকে জয়চাঁদে পাক" বলিয়া গালি দিত।

এই বংশে কৃষ্ণ চন্দ্রের পুত্র বাবু ঈশ্বর চন্দ্রের নামও উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ পালচৌধুরী মামলায় ইনিই প্রধান উদ্যোগী। নিধিরামের পুত্র বৈদ্য

---

* ইঁহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে একজন সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"Some of the Zemindars here have been very oppressive and were in the habit of rnbbiug a hot iron over a man's body and making him then sign stamped papers.

Vide Calcutta Review Vol VI No. XI and XII

Page 412 &13.

নাথকে দিয়া ইনিই সর্ব্বধ্বংশী মকর্দ্দামার সূত্রপাত করিয়া যান ইহাই রাণাঘাটে "বৈদ্যনাথী হাঙ্গামা" বলিয়া খ্যাত। ইঁহার কীর্ত্তির মধ্যে কয়েক বৎসর ধরিয়া লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বাৎসরিক রথযাত্রা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে এই উপলক্ষে ৺ পুরুষোত্তমের রথের লোক সমাগম হ্রাস হইয়া এই স্থানের রথে সেই মত লোক সমাবেশ হইয়াছিল,

কৃষ্ণ চন্দ্রের পৌত্র ৺বিশ্বেশ্বর পাল চৌধুরীর নামও উল্লেখযোগ্য, তিনি এক জন তান্ত্রিকশক্তি সাধক বলিয়া বিখ্যাত।

এ বংশের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে কৃষ্ণের বংশে বাবু ব্রজনাথ ও গোপেশ্বর পাল চৌধুরী এবং শম্ভুর বংশে বাবু নগেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র চন্দ্র, সতীশ চন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র নাথ ও হরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

নগেন্দ্র নাথ তাঁহার বংশের ও রাণাঘাটের বর্ত্তমান পরিচয় স্থল। তিনি এক দিকে যেমন রাণাঘাটবাসীগণের নিকট মান্য তেমনি গবর্মেণ্টেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অসাধারণ সম্প্রতি ইনি রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন।

যোগেশ চন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে নিত্য শত শত রোগীকে ঔষধ দিয়া রাণাঘাট সবডিভিসনবাসী ব্যক্তিগণের নিকট পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারই কনিষ্ঠ সহোদর সতীশচন্দ্র মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এটর্নী দেশের যাবতীয় সাধারণ কার্য্যে তাঁহার সংশ্রব দেখা যায়। হরেন্দ্রনাথ রাণাঘাটের একজন প্রিয় জমীদার।

এই সুপ্রসিদ্ধ পাল চৌধুরীগণের আশ্রয়ে থাকিয়া কত যে গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিপালিত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে উদাহরণের স্থলে কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চতুষ্পাঠীধারীগণের মধ্যে জয়রাম পঞ্চানন, দেব চূড়ামণি, রামকমল শিরোমণি, মধুসূদন ন্যায়রত্ন, পরাণচন্দ্র তর্ক সিদ্ধান্ত, ঈশান চন্দ্র তর্ক রত্ন, তিলক তর্কালঙ্কার, প্রভৃতি; বৈদ্যগণের মধ্যে হরচন্দ্র সেন, দয়াল চন্দ্র সেন, ঈশ্বর চন্দ্র রায়, তারিণী চরণ রায়, গিরীশ চন্দ্র রায়, যোগীন্দ্র চন্দ্র সেন; গায়ক ও বাদক শ্রেণীর মধ্যে লালা কুন্দন, যদুনাথ ভট্ট, ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ খাঁ, গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেতারী বামাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি; হাস্যরসিক ও কবি ছাতু রায়, শত্রুঘ্ন কুণ্ডু ওরফে সুতাঘটে, কবি জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ও কবি কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে কাশী মাষ্টার (যিনি বাবু জয়গোপাল পালচৌধুরী লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে যে



রাণাঘাটের জমীদার ৺শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী।



রাণাঘাটের জমীদার ৺রামলাল দে চৌধুরী।

যাত্রাদল গঠন করিয়াছিলেন তাহার জন্য "মালতী মাধব" নামে সুন্দর পালা রচনা করিয়াছিলেন) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

একদিকে পালচৌধুরী বংশ লইয়াই যেমন রানাঘাট অপরদিকে তেমনি দে চৌধুরী বংশের নামোল্লেখ না করিলে রাণাঘাটের ইতিহাস অসমাপ্ত রহিয়া যায়, কেন না পাল চৌধুরী ও দে চৌধুরী লইয়াই রাণাঘাটের ইতিহাস গঠিত। যে সময়ে কৃষ্ণপান্তী ব্যবসা দ্বারা উন্নতি লাভ করেন, তাহারই সমকালে দে-চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ রামসুখ দে-চৌধুরী মহাশয়ও ব্যবসায় দ্বারা নিজের আর্থিক উন্নতিসাধন করেন। বর্ত্তমান কালে রাণাঘাটের বড় বাজারে যেখানে ৺মদনমোহন বিগ্রহের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত কথিত আছে সেই স্থানেই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম দোকান স্থাপিত ছিল, পরে ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত মালদহ, হাটখোলা প্রভৃতি অঞ্চলে গদী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বিস্তীর্ণভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই মালদহের গদী হইতেই তাঁহাদের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং ক্রমে সেই আয় হইতে জমিদারী ক্রয় করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব বসত বাটী নদীকূলে স্থাপিত ছিল, পরে নদীর ভাঙ্গনে বাটী ভগ্ন হইলে এবং আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইলে তাঁহারা ১১৯৮ সালে তাঁহাদের বর্ত্তমান আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন।

দে চৌধুরী বংশ।

এই বংশের স্থাপয়িতা রামসুখ যে কেবল মেধাবান শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তাহা নহে; তিনি সাতিশয় ধর্ম্মশীলও ছিলেন। ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণতুল্য ছিল। তিনি যে "বার মাসে তের পার্ব্বণ" ও অতিথি সেবা রূপ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি তাহা সাধ্যমত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। বৎসরে অন্যূন ৬০০০ হাজার লোক আজিও তাঁহাদের দ্বারে অন্নের জন্য উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদের ভক্তি শ্রদ্ধাদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া প্রীত হয়।

এই অতিথিসেবী বংশে রামসুখ ও যে সকল উপযুক্ত ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া বংশের গৌরব উজ্জ্বলতর করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দাতারাম, লক্ষ্মীকান্ত, বৈকুণ্ঠনাথ প্রমুখ রামসুখের ছয় পুত্র ব্যতীত শ্রীনাথ, রাধাময়, রামলাল দেচৌধুরী মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীনাথ, সত্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক ছিলেন; রাধাময়, ক্রিয়াশীল ও পণ্ডিতানুরাগী ছিলেন; তাঁহার প্রণীত মুদ্রিত "নবোপাখ্যান" নামক সামাজিক নকসা তাঁহার নাম জাগরূক রাখিয়াছে।

বাবু রামলাল ক্রিয়াবান ও সাতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তৎকালে "বাবু" বলিলে রাণাঘাটে তাঁহাকেই বুঝাইত। তিনি ১২৭৪ সালে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে একমাত্র দুহিতা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

বর্ত্তমান কালে এই বংশের উল্লেখযোগ্য বংশধর বাবু পূর্ণ চন্দ্র দে চৌধুরী ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা শরচ্চন্দ্র, চারু চন্দ্র ও নির্ম্মল চন্দ্র আপনাদের বিমল চরিত্র গুণে সকলের প্রিয়, বাবু পূর্ণচন্দ্র রাণাঘাটের যাবতীয় সাধারণ লোক হিতকর কার্য্যের একজন প্রধান উদ্যোগী। ইনি এক দিকে যেমন বিনয়ী, নম্র স্বভাব এবং বিজ্ঞ তেমনি অপর দিকে সাহিত্যানুরাগী, সজ্জনসেবী সুধী বলিয়াও খ্যাত।

মল্লিক বংশ।

এই বংশধর গণের আদি নিবাস মাটিয়ারী—যথায় নদীয়া রাজবংশের সংস্থাপক ভবানন্দ মজুমদার, বাদসাহ আকবর প্রদত্ত ফারমানে নদীয়া রাজত্ব খেলায়েৎ প্রাপ্ত হইয়া, বাগোয়ান হইতে আসিয়া, আপনার রাজধানী স্থাপনা করেন। সর্ব্বধ্বংশী কালের প্রভাবে এই মাটিয়ারী এখন বনাকীর্ণ। ভবানন্দ মজুমদার কর্ত্তৃক এই মাটিয়ারীতে রাজধানী স্থাপনের পূর্ব্বেও মল্লিকগণ এখানে বেশ মান সম্ভ্রমের সহিত বাস করিয়া আসিতেছিলেন এবং অর্থবল অপেক্ষা বিদ্যাবলে তাঁহারা জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। "মল্লিক", এই বংশের বর্ত্তমান উপাধি হইলেও, "পাল" ইঁহাদের আদি খ্যাতি। অদ্যাপি বিবাহাদি বৈদিক কার্য্য কালে নামের শেষে "পাল দাসস্ত" খ্যাতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই বংশের গৌরবশালী বংশধর শ্রীনারায়ণ, আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে মহামান্য দিল্লী দরবার হইতে মল্লিক এই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তদবধি এই বংশীয়েরা বাদশাহ দত্ত এই সম্মানকে গৌরবাত্মক মনে করিয়া আপনাদের উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ভবানন্দ মজুমদারের তিন পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। এই তিন জনের মধ্যে মধ্যম গোপাল নিতান্ত পিতৃ অনুগত, বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ-বিধায় ভবানন্দ অপর পুত্রদ্বয়ের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া গোপালকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়া যান। একারণে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ পিতার সহিত বিবাদ করিয়া এক বিশ্বস্ত, কার্য্যদক্ষ, বহু ভাষাবিৎ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে দিল্লী গমন করেন ও তথায় আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে ও উক্ত কর্ম্মচারীর লিপি কুশলতায় বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া পরগণা উখুড়া প্রভৃতির উপর চিরস্থায়ী

দপ্তরের ফারমান লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত রাজকর্ম্মচারীর লিপি কুশলতার পুরস্কার স্বরূপ বাদসাহ তাঁহাকে "মল্লিক" বা "সুলেখক" আখ্যা প্রদান করেন। বাদসাহ দত্ত সম্মান ও ভূম্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি কনিষ্ঠ গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাঘব পিতৃ রাজ্যের অধিকারী হইয়া মাটীয়ারী হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন; এই রেউই বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হইলেও কার্য্যদক্ষ বিধায় রাজা গোপাল নারায়ণকে রাজকার্য্য হইতে অবসর দেন নাই, এই সময় হইতেই নদীয়া রাজ বংশের সহিত মল্লিক বংশের একটী যেন স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী কালে মাটীয়ারী হইতে কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে রাজাগণের সহিত মল্লিকগণও তাঁহাদের বাসস্থান উঠাইয়া রেউইতে আসিয়া নূতন বসতবাটী নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে মল্লিকগণের আত্মীয় স্বজন ও অনুগত জন এত অধিক ছিল যে রেউইয়ের যে পল্লীতে আসিয়া তাঁহারা শত শত রম্য সৌধ শ্রেণী নির্ম্মাণে বসবাস করিতে লাগিলেন তাহা "মল্লিক পল্লী" বলিয়াই খ্যাত হইয়া উঠিল। রেউই কৃষ্ণনগর নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রাচীন কৃষ্ণনগরের বহু কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক বংশীওগণও কালের ক্রোড়ায় কতক ধ্বংশ কতক স্থানান্তরিত হইয়া কত দূর দেশে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় আদি পুরুষগণের স্থাপিত মল্লিক পল্লী, তাঁহাদের পরিত্যক্ত সুবিস্তীর্ণ মল্লিক পুষ্করণী প্রভৃতি কৃষ্ণনগরে আজিও তাঁহাদের স্মৃতি সম্যক জাগরুক রাখিয়াছে। মল্লিকগণ কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলে নদীয়াধিপতি রাজা রাঘব, মল্লিকবংশের প্রতি তাঁহার বংশের স্বভাবগত ভালবাসা ও করুণা প্রদর্শন করিবার জন্ম বংশানুক্রমীক এই বংশীয়গণকে তাঁহার প্রধান করদাতৃরূপে অঙ্গীকার করিয়া লয়েন এবং প্রতি বৎসর শুভ পুণ্যাহর দিনে এই বংশীয়গণের নিকটেই রাজ্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম কর গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। এই বংশীয়গণ বংশপরম্পরায় তাঁহাদের ভূস্বামী দত্ত এই সম্মান বহুদিন যাবত ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম সাধিত হইয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত রাজ সংসারের সহিত এই বংশীয়গণের বিশিষ্ট সদ্ভাবের

পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে কাহাকেও পরিচিত হইতে হইলে এই বংশীয়গণের শুভ দৃষ্টি ব্যতীত সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিত না। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার সহিত মল্লিকবংশের নাম বিজড়িত দেখা যায়। সেটী মল্লিকদিগের বারোইয়ারী পূজা। কথিত আছে এরূপ সমারোহে বারোইয়ারী পূজা বঙ্গদেশে আর কখনও হয় নাই। স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই কার্য্যের অধ্যক্ষ হইতেন। এই বারোইয়ারী মণ্ডপে মাতা দশভূজার সম্মুখে প্রতি বৎসর লক্ষ বলি প্রদান করা হইত।

এই সময়েই এই বংশীয় কতিপয় উদ্যমশীল যুবক ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ স্থান হইতে বহু মুদ্রার সূক্ষ্ম মসলিন সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ব্যবসায়ে উন্নতি হইলে, তাঁহারা ঢাকা, এনাতগঞ্জ, কলিকাতা ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি কাপড়ের আড়ত খুলিয়া দেন এবং রাণাঘাটে একটী নীলকুঠী স্থাপনা করেন। এই সময়ে বস্ত্র ব্যবসায়ে তাঁহাদের এতই উন্নতি হইয়াছিল যে কথিত আছে তাঁহাদের বাটীর সামান্য দাসদাসী পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ঢাকাই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিত। এই সকল আড়তের মধ্যে শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগরের সন্নিধ্য বলিয়া রাণাঘাটের আড়তেই তাঁহারা অধিক ভরাভর করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের লোকান্তর হইলে এই বংশীয় পরম ভাগবত হরেকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় কৃষ্ণনগরের বাস পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে রাণাঘাটে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। রাণাঘাটের সিদ্ধেশ্বরী তলায় সুবৃহৎ বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা যেরূপ সমৃদ্ধির সহিত বারোমাসে তের পার্ব্বণের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন তাহা রাণাঘাটে আজিও প্রবাদের ন্যায় হইয়া আছে। রাণাঘাটে পালচৌধুরীগণের প্রাদুর্ভাবও এই সময়ে। কৃষ্ণপান্তী. আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়, সরল হৃদয় ও উন্নত চরিত্র বলে যে কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় বংশের কেহ কেহ বিষয়মদে মত্ত হইয়া উহার অপব্যবহার আরম্ভ করেন। এবং ধনমদে মত্ত হইয়া দারুণ পরশ্রীকাতর হইয়া উঠেন এবং মল্লিকদের সহিত সর্ব্বদা নানামতে কলহের সূত্রানুসন্ধান করিতে থাকেন। একে তখন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতির সূত্রপাত হওয়ায় মল্লিকবংশীয়গণ ব্যবসায় লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তাহাতে পালচৌধুরীদিগের এই অমানুষিক বিদ্বেষে উত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়া

১২৫০ সালে তাঁহাদের বিপদাপদের সহায় শ্রীধরকে লইয়া তাঁহারা রাণাঘাট ত্যাগ করেন।

রাণাঘাট হইতে পতিত পাবন মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার ৭ ভাই সপরিবারে কলিকাতায় তাঁহাদের প্রিয় সুহৃৎ নবীন কৃষ্ণ সিংহের বাটীতে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার সাহায্যে বংশবাটীতে নীলের কুঠী চালাইয়া লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেন। তাঁহার সমস্ত জীবন উদ্যোগী পুরুষোচিত গুণাবলীতে সমুজ্জ্বল। ১২৫৩ সালে নীলের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তিনি কলিকাতায় মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতায় ও রাণাঘাটের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও তিলি সমাজ আহ্বান করিয়া তিনি তাঁহাদের যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এই উপলক্ষে তাঁহারই ভবনে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার কায়স্থ বাবুদের দুই প্রধান সমাজের (সিংহদের ও শোভাবাজার রাজাবাবুদের) সমন্বয় হয়।* ১২৫৪ সালে তাঁহাদের নব সৌভাগ্যের উদয় হইলে, রাণাঘাটের পালচৌধুরীবাবুগণ আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক বহু যত্নে তাঁহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া পুনরায় রাণাঘাটে আনয়ন করেন, তদবধি ইঁহারা রাণাঘাটে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই বংশের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে সুপ্রবীন বাবু রাখাল দাস মল্লিক ও বাবু কালী কুমার মল্লিক মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য

বাবু কালীকুমার রাণাঘাটের যাবতীয় সাধারণ হিতকরী কার্য্যের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। একমাত্র ইনিই রাণাঘাটে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়া যত দিন "Self Government" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তত দিন হইতে একাদিক্রমে অদ্যাবধি অত্রস্থ অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক মিউনিসিপ্যাল কমিসানার নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন, ইহাই তাঁহার প্রতি সাধারণের প্রীতি নিদর্শনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মনে হয়। ইঁহার দুই পুত্র, শ্রীকুমুদনাথ ও শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মল্লিক। কুমুদনাথের শ্রীশচীন্দ্রনাথ ও নৃপেন্দ্রের শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নামে দুইটী নবকুমার জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কালীকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র ভুজেন্দ্রনাথ ও তৎপুত্র রমেন্দ্র নাথ।

তিলি কুলে অন্যান্য প্রাচীন বংশের মধ্যে ৺জগন্নাথ প্রামাণিকের বংশাবলী

---

* এই সময়ের "প্রভাকর" ও ভাস্কর ফাল্গুন সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

উল্লেখযোগ্য। এই বংশের বর্ত্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীমতিলাল প্রামাণিক ও ও তদীয় উপযুক্ত গুণী পুত্র বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্র ও সতীশচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কায়স্থগণের মধ্যে রাণাঘাট নাসড়ার আদিম অধিবাসী ঘোষবংশ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান কালের মধ্যে দত্ত বংশের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। কায়স্থ কুলের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্রাজিলের সৈনাধ্যক্ষ স্বনামে প্রসিদ্ধ কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাণাঘাটে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নিবাস নদীয়া কৃষ্ণগঞ্জের অনতিদূরে নাথপুর। সুরেশচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য তিনি এই সময় পিতৃ পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত অর্থ কষ্টে পতিত হয়েন, পরে ১৭ বৎসর বয়সে জাহাজের খালাসীরূপে বিলাতে গমন করেন। সেখানে যাইয়া তিনি নানারূপ কষ্টসাধ্যকার্য্যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়া একদল ভ্রমণকারী সার্কাস দলের সহিত নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া ব্রাজিলে উপনীত হয়েন। তথায় কোন এক ভীষক দুহিতা তাঁহার প্রেমে পতিত হইয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করিলে তিনি তদবধি ব্রাজিলেই রহিয়া যান, এবং স্বীয় পত্নীর ইচ্ছানুযায়ী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নিজের কৃতিত্বে ও অসীমসাহসীকতায় সৈনিক বিভাগের নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লেফন্যাণ্ট পদে উন্নীত হয়েন। পরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাজিলের রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় সুরেশচন্দ্র সাধারণ তন্ত্র দলে যোগদান করিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। এই সময়ে দেশে পুণর্বিপ্লব উপস্থিত হইলে যে সকল সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতেই অনন্য সাধারণ সাহসীকতা ও বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিয়া কর্ণেল পদে উন্নীত হয়েন এবং এইরূপে তিনি জগতের ইতিহাসে আপনার নাম চিরবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর ৪৫ বৎসর বয়সে পুত্র কলত্রাদি রাখিয়া তিনি ব্রাজিলে পরলোক গমন করেন।*

রাণাঘাটের আধুনিক কৃত্যাবলী ও সভাসমিতির মধ্যে ৺সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা ৺নিস্তারিণী দেবীর মন্দির, পালচৌধুরী বাবুদিগের বৃহৎ প্রাসাদ, রেলওয়ে ষ্টেসন,

* এই উদ্যমশীল মহাপুরুষের সম্যক জীবনী জানিতে হইলে এইচ দত্ত কৃত "জীবনী" ও অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মেমোরিয়াল হল ও পাবলিক লাইব্রেরী *, মিত্রসভা, দেচৌধুরী বাবুদের অতিথিসেবালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পিতলের ছবিযুক্ত বৈঠকাদি, এবং এখানকার কুম্ভকারগণের নির্ম্মিত মাটীর সামগ্রী ও খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পানতুয়া ও সন্দেশ, কুশাসন, পাটী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চাকদহ।

চাকদহ বর্ত্তমান ই, বি, এস রেলের একটী ষ্টেসান। কলিকাতা হইতে ৩১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানটী বহু কালের প্রাচীন। প্রবাদ, ভগীরথ যখন স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন তখন এখানে তাঁহার রথের চক্র প্রোথিত হইয়া যায় তাই এখানকার নাম হয় চক্রদহ, অপভ্রংশে এক্ষণে চাকদহ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম মনসাপোতাকেও পৌরাণিক যুগের সময় উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে চাকদহ, মনসাপোতা, জশোড়া প্রভৃতি স্থানগুলির সম্বলিত নাম প্রদ্যুম্ন নগর। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, নিম্নবঙ্গের তদানীন্তন অধিপতি সম্বরাসুরকে বধ পূর্ব্বক এখানে পাতিত করেন এবং নিজ নামে এই স্থানের নাম প্রদ্যুম্ন নগর রক্ষা করেন। তৎপূর্ব্বে ইহার নাম ছিল ঋক্ষবন্ত নগর। এই প্রবাদের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য থাকুক আর নাই থাকুক এখনও এখানে একটী দীর্ঘিকা প্রদ্যুম্ন হ্রদ নামে খ্যাত এবং জমিদারগণের প্রাচীন কাগজাদিতেও উহার প্রদ্যুম্ননগর নামের পরিচয় পাওয়া যায়। চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও স্মার্ত্ত প্রধান রঘুনন্দন তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে "মুক্ত বেণী" প্রয়াগের স্থান নির্দ্দেশ কালেও ইহাকে প্রদ্যুম্ননগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"প্রদ্যুম্ন নগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যা স্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা॥"

---

* এই লাইব্রেরীটী ইং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৺সুশীল চন্দ্র বোস ও কতিপয় উদ্যমশীল যুবক কর্ত্তৃক ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী নামে স্থাপিত হয় পরে ইংরাজী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহা [illegible] মল্লিক বংশের অন্যতম বংশধর বাবু কালীকুমারের মধ্যম ভ্রাতা ৺মহেন্দ্রকুমার মল্লিকের পু[illegible] স্মৃতিতে ইং ১৮[illegible] সালের Act XXI আইন অনুসারে গবর্মেন্টে রেজেষ্টারী হইয়া পাবলিক লাইব্রেরী না[illegible] খ্যাত হয়, এবং "সুরেন্দ্র স্মৃতি গৃহে" স্থায়ীরূপে স্থাপিত হয়।

এই বচন অনুসারে সরস্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ এবং তাহারও উত্তরে প্রদ্যুম্ননগরএর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলেই "চাকদহ মণ্ডল"ই প্রদ্যুম্ননগর বলিয়া খ্যাত ছিল অনুমিত হয়।

রঘুনন্দন যখন ইহাকে প্রদ্যুম্ননগর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন সেই সময়ে বিভিন্ন ঘটকগণের কারিকায় এই স্থানের "আচাম্বিতা" নামও দেখা যায়। "আচম্বিতা" দেবীবর ঘটকের ৩৬ মেলের এক মেল। জমিদারি কাগজাদিতেও ইহার আচম্বিতা নাম পাওয়া যায়। এই প্রদ্যুম্ননগর পূর্ব্বে বহু দেব মন্দির ও মঠাদি দ্বারা সুশোভিত ছিল জানা যায়। এখনও দুই একটী প্রাচীন দেবতাহীন মন্দির এখানে বিদ্যমান আছে।*

বহু পূর্ব্বের সঠিক বিবরণ জানা না যাইলেও দেড়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহার যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে এই স্থানটী তদানীন্তন কালের সমৃদ্ধ স্থানের অন্যতম শ্রীসম্পন্ন গ্রাম ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও ইহা মহারাজের চারি সমাজের এক সমাজ বলিয়া পরিচিত ছিল। এখানে ও ইহার নিকটবর্ত্তী পালপাড়া, মনসাপোতা, জশোড়া প্রভৃতি স্থান সকলে বহু টোলধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। "কুব্লার্ণব" প্রণেতা ন্যায় ও তন্ত্রের

---

* There is an old temple at Chagdaha which at present lies in a neglected and dilapidated state. The owners Babu Kalikumar Chaudhuri and others of Palpara having taken no care about its preservation. The owners are willing to give up their right to the temple if it is kept in repair by Government, and if they are allowed to use it as a place of worship in the customary way. There has been no idol in the temple nor it is used as a place of regular worship now.

The temple is of ordinary size and has ornamental cut brick-work. Its age may, as it appears and as has been reported by persons who hadthe inscription read, be 500 years. There is no idol there now. People say there was a lingam in it. Mr. J. S. M. Beglar, when Archæological Surveyor of Bengal took measurement of it and also a photograph. There were two inscriptions on stone, which were taken off by Roy Ramsankar Sen, Subdivisional Officer of Ranaghat, and although afterwards returned, are not forthcoming.

Vide the List of Ancient Monuments in the Presidency Division, Published by the Government.

পরম পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার কালে এ স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। পালপাড়ায় তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ডবিশপ্ হেবার সাহেব তাঁহার রোজ নামচায় এই পণ্ডিতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মিশিনারি মিঃ কেরি এই সময়ে এই সকল স্থানে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর এক জন সাহেব ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দেও এখানে ব্যাঘ্রের উপদ্রবের বর্ণনা করিয়াছেন। এখানকার নিবিড় জঙ্গলে ব্যাঘ্রাদির ন্যায় বহু নরাকায় পশুও আশ্রয় লইয়া চুরি ডাকাতি প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে হানিফ নামে এক বিখ্যাত দস্যু ও তদীয় ৮ জন সহচরের এই স্থানের বাজারে নৃশংস ভাবে খুন ও ডাকাতি করা অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।*

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একটী ব্রাহ্ম সভা ও স্কুল স্থাপিত হয় এবং এই বৎসরে এক জন নীলকর সাহেব কর্ত্তৃক আর একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪০ জন। এখানে তখন ২টী স্মৃতির টোল ছিল। তাহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২ জন। ইহা তখন রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বাবুদিগের জমিদারী ভুক্ত ছিল, এবং গঙ্গাতীরে তাঁহাদের গদী বাটীও ছিল। তখন চাকদহের বাজার খুব সমৃদ্ধ ছিল, অন্যূন দুইশত বৃহৎ আড়ত ছিল। গঙ্গাবক্ষ যাত্রীবাহী ও ভারবাহী নৌকায় সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন থাকিত। এক্ষণে গঙ্গা চাকদহ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ায় ও রেল পথের বিস্তার হওয়ায় বাজার, গঞ্জ সমস্তই লোপ পাইয়াছে, এবং গঙ্গাতীরস্থ পুরাতন চাকদহের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া রেলওয়ে ষ্টেসন চাপিয়া নূতন চাকদহ গ্রাম গঠিত হইয়াছে। এই স্থান পূর্ব্বে হিন্দুগণের অন্তিম তীরস্থ করিবার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার শ্মশান মহা শ্মশান বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও শব লইয়া সর্ব্বদা এখানে লোক আসিত। কালী প্রসাদ পোদ্দার নামে যশোহরের এক জন সদাশয় ধনী সুবর্ণবণিক যশোহর হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত, যশোহর বাসীর গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য এক প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা এখনও বিদ্যমান থাকিয়া তাহার স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে।

---

* Calcutta Review Vol. VI. Page 411.

পূর্ব্বে প্রতি বৎসর বারুণীর সময়ে এখানে গঙ্গাস্নানার্থ বহু জন সমাগম হইত। এখানকার বাৎসরিক বারোয়ারি পূজা পূর্ব্বে খুবই জাঁক জমকে হইত। এখনও প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় উহা সমাহিত হইয়া থাকে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। ইং ১৯০৯ সালে এখানে একটী এনট্রান্স স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা প্রায় দুই শত।

চাকদহ মণ্ডলের অধিবাসীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত বংশ ও ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

চাকদহ কাজীপাড়ার কাজী বংশ, চাকদহের দত্তবংশ, এই বংশীয় শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্ত মহাশয় চাকদহের বর্ত্তমান স্কুলের প্রাণ স্বরূপ। জশোড়ার গোস্বামী বংশ; মিত্রবংশ, এই বংশের বর্ত্তমান বংশীয়দের মধ্যে শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র ও শ্রীবসন্ত কুমার মিত্র উল্লেখযোগ্য; মজুমদার (গুহ) বংশ, ঘটক বংশ; গোড়পাড়ার মিত্র বংশ, বসু বংশ, সিংহ বংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ; পালপাড়ার বারেন্দ্রগণের মধ্যে সান্ন্যাল চৌধুরী বংশ, ঢোল বংশ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চট্টোপাধ্যায় বংশ, চৌধুরী বংশ; মনসাপোতার বন্দোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় বংশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সকল বংশাবলীর মধ্যে আবার কাজীপাড়ার কাজীগণই সবিশেষ প্রাচীন বংশ। এই কাজীপাড়ার প্রাচীন নাম পাজনোর, এখনও এতদঞ্চল পরগণা পাজনোরের অধীন। পূর্ব্বে এই কাজীপাড়া কাজী মহল্যা, মুনসী মহল্যা, মুফতী মহল্যা প্রভৃতি বহু পল্লীতে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন কাজীপাড়ার স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে এক্ষণে যাহা কাজীপাড়া নামে খ্যাত উহা পূর্ব্বে আচম্বিতা সহরের অন্তর্গত ছিল। কাজীদিগের বর্ত্তমান আবাস বাটী যে স্থানে উহাও ঐ স্থানে ছিল না। কথিত আছে এই কাজীগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ পাণ্ডুয়ার যুদ্ধ কালে এ দেশে আগমন করেন। এই বংশে বহু বিদ্বান ক্রিয়াবান দানশীল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে হজরত আবদস্ শুকুর মরহুম নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার নিম্নতম ৭ম পুরুষে মুনসী এতে হামদ্দীন মহম্মদ মরহুম ওরফে বেলাত মুনসী জন্মলাভ করেন, তিনি মহা বিদ্বান ছিলেন, দিল্লী তখতের শেষ বাদসাহ সাহ আলমের সময় তিনি বাদসাহের

প্রয়োজনে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ বিলাত গমন করেন, এই কালে তিনি লর্ড ক্লাইবের মীর মুনসী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কাজী পাড়ার মুন্সী বংশেও বহু মহাত্মা জন্মলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুনসী ছলিমুল মরছুম এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁহার প্রতি কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া সেকেঞ্জা নামক যন্ত্রে তাঁহার প্রাণবধের আজ্ঞা দেন, কিন্তু কাজীবংশীয় প্রাগুক্ত বেলাত মুনসী লর্ড ক্লাইবের দ্বারা নবাবকে অনুরোধ করিয়া সে যাত্রা তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কাঁচড়াপাড়া।

কাঞ্চনপল্লী বা বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়া নদীয়ার একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। বহু পূর্ব্বকালে ইহার নাম ছিল নবহট্টগ্রাম। এখান হইতেই বৈদ্যদিগের নব হট্টীয় সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপরে এই স্থানে কুমারহট্টের* অন্তর্গত ছিল এবং পরস্পর সংযুক্ত ছিল। অধুনা বাগের খাল নামে যে খালটি কাঞ্চন পল্লী ও কুমারহট্টের মধ্যে বিদ্যমান আছে সেটী মল্লিক সাহেব নামক কোনও এক ধনী কর্ত্তৃক খাত হয়। এখনও কাঞ্চনপল্লী হাবলী সহর পরগণার অধীন ও

---

* কুমারহট্ট বা হাবলী সহর বা বর্ত্তমান হালিসহর পূর্ব্বে নদীয়ার মধ্যে একটী পণ্ডিত প্রধান বিশিষ্ট গ্রাম ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানের মৃত্তিকা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি বলিয়া দুর্লভ জ্ঞানে, মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও এ স্থানে বিদ্যার চর্চ্চা বিশিষ্টরূপ ছিল। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন এই মহাতীর্থে বসিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এখনও তাঁহার পঞ্চমুণ্ডির আসন বিদ্যমান রহিয়াছে। গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র প্রসাদের অমৃতাধিক সুমধুর কাব্যে ও গীতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন। রাম প্রসাদের সময়ে এখানে আজু গোস্বামী নামে একজন মেধাবী কবি প্রসাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এখানকার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব স্যানিটারী কমিশনর সার্জ্জেন কর্নেল কে, পি, গুপ্ত মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়, শিবমন্দির ইত্যাদি তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

কুমারহট্ট সমাজভুক্ত। বর্ত্তমান কাঞ্চনপল্লী গ্রামটী গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থানের চরভূমির উপর স্থাপিত। পূর্ব্ব খ্যাত কাঞ্চনপল্লী কালের কুটীল গতিতে এখন গঙ্গাবক্ষে বিরাজ করিতেছে। বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ পাঠমালা গ্রন্থে দেখা যায় যে কাঞ্চনপল্লী গ্রামটী সেন শিবানন্দের পাঠ বলিয়া উক্ত আছে। শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই শিবানন্দের বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন ও এখান হইতে শান্তিপুর অদ্বৈত মন্দিরে, পরে তথা হইতে নবদ্বীপে জননী দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেন শিবানন্দ নিজ গুরু শ্রীনাথ আচার্য্যের নামে যে কৃষ্ণ রায় বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন, ঐ বিগ্রহ প্রথমে শ্রীনাথ আচার্য্যের দৌহিত্র শ্রীমহেশের নিজ বাটীতে থাকিতেন; ঐ বিগ্রহের পদ্মাসনে এই শ্লোকটী খোদিত আছে—

"স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায়ঃ প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহায় দ্বিজঃ কিঞ্চিৎ শ্রীয়ঃ শ্রীনাথ সজ্ঞকঃ॥"

কথিত আছে বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পুত্র যশোহরজীৎ কচুরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দিল্লীদরবারে যাইবার কালীন কাঞ্চনপল্লী হইয়া গমন করেন; তখনও কাঞ্চনপল্লী, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান যশোহর রাজ সংসার ভুক্ত ছিল। তিনি যাত্রাকালে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইরূপ মানসিক করেন "যদি এ যাত্রায় আমি দরবারে ফতে হই, তাহা হইলে ঠাকুরের একটী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিব।" সেবার তিনি দরবারে সফল মনোরথ হওয়ায়, প্রত্যাগমন কালে পুনরায় কৃষ্ণরায়কে দর্শন করিতে আসেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির, দোলমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেন; এবং ঠাকুরের নিত্য সেবা নির্ব্বাহার্থ কৃষ্ণবাটী নামে একখানি নিষ্কর তালুক জায়গীর দেন। এখনও উক্ত তালুক তাঁহার সেবার্থ নিয়োজিত আছে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ দশশালা বন্দোবস্তর সময় ইহার বার্ষিক ২৮৸৶০ কর ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন কাঞ্চনপল্লী যখন গঙ্গার ভাঙ্গনে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তখন যশোহরজিতের নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। বর্ত্তমান শ্রীমন্দির যাহা ভারতীয় শিল্প চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে তাহা ১৭০৭ শকে কলিকাতার প্রসিদ্ধ নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয় দ্বয়ের ব্যয়ে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ সুন্দর গঠন, সুঠাম মন্দির সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। শিবানন্দ সেনের পুত্র চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পুরী গোস্বামী



রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্থাপিত উলার দিঘী।



বাগের মসজীদের ভগ্নাবশেষ।

—যিনি মহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ লেহন মাত্রেই, শৈশবে শাস্ত্র পাঠ ব্যতিরেকে অসাধারণ কবি হইয়া কবিকর্ণপুর নামে খ্যাত হয়েন, সেই ভক্তিময় পুরুষটী এই কাঞ্চনপল্লীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গবিখ্যাত শ্রুতিধর নিমচাঁদ শিরোমণি, যিনি ন্যায়শাস্ত্রে প্রথিতনামা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের তুল্যানুতুল্য বলিয়া খ্যাত, তাঁহারও জন্মভূমি এই কাঞ্চনপল্লী। এতদ্ব্যতীত বঙ্গভাষাবিৎ বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত, অদ্ভুত রামায়ণ ও তুলসীদাসী রামায়ণের অনুবাদক হরিমোহন সেন গুপ্ত, জ্ঞানার্ণব গ্রন্থ প্রণেতা প্রেমচাঁদ কবিরত্ন প্রভৃতি অনেক যশস্বী পণ্ডিত এই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়া নানারূপ অমূল্য গ্রন্থাবলী রচনা দ্বারা ইহার যশশ্রী সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

কাঁচড়াপাড়া বলিলে সাধারণে কাঁচড়াপাড়া রেলষ্টেসান যেস্থানে স্থাপিত সেই স্থানটীকে মনে করেন, কিন্তু কাঁচড়াপাড়া ষ্টেসানটি অধুনা নদীয়ার সীমা বহির্ভূত। এই কাঁচড়াপাড়া বিজপুরে ই, বি, রেলের গাড়ী প্রস্তুতের কলকারখানা স্থাপিত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে মাননীয় ডিউক অব্ কনট্ ও বহু সম্মানস্পদ প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্, প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর মহোদয় পক্ষী শীকার উদ্দেশে এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

বাগের গ্রাম।

পাঠানগণ যখন পশ্চিম ভারতে আসিয়া প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করেন তখন, তাঁহারা নিম্ন বঙ্গকে, বাদা ও সুন্দরবনের অস্বাস্থকর জল বায়ুর নিমিত্ত "দোজাক্" বা নরক বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল এই দেশে বাস করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য ; এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা কোনও আমীর বা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে চূড়ান্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইলে, তাঁহার বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে, দণ্ডিত ব্যক্তির শিরঃচ্ছেদ না করিয়া, মৃত্যু নিশ্চয় জ্ঞানে এই প্রদেশে নির্ব্বাসিত করিতেন। মালেক কাসিম নামে ঐরূপ এক আমীর হুগলীর অব্যবহিত পশ্চিমে আসিয়া বাস করেন। এখনও তথায় তাঁহার নামে একটী হাট চলিয়া আসিতেছে। মালেক মীর আমেদ বেগ নামে ঐরূপ আর এক

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া বংশব টীর অপর পারে সুবৃহৎ বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন ও বিস্তার্ণ সৌধশ্রেণী বাজার প্রভৃতি স্থাপনা করেন এবং গঙ্গা হইতে যমুনা পর্য্যন্ত একটী খাল কাটিয়া দেন; উহাই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বেগের খাল অপভ্রংশে বাগের খাল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গঙ্গার উপরে হুগলীর বিপরীত তটেও মীর বেগের আর একটী গড় বেষ্টিত বসতবাটী ছিল, উহা এখনও মীর বেগের গড় নামে খ্যাত। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মুরসিদাবাদ নিজামৎ বংশের মালেক বারখোদাদার নামক জনৈক আমীর কোন দুষ্কার্য্যের শাস্তিস্বরূপে এখানে নির্ব্বাসিত হয়েন, তাহারই বাগ বাগিচা হইতে এই স্থানটী মল্লিক-বাগ নামে ও খালটী বাগের খাল নামে খ্যাত হয়।

এই গ্রামটী যাঁহারই স্থাপিত হউক উহা যে এককালে শোভা সমৃদ্ধি পূর্ণ স্থান ছিল তাহা ইহার ধ্বংশাবশিষ্ট বালাখানা, রংমহল পিলখানা, গোরস্থান প্রভৃতি দর্শনে বিশেষরূপ উপলব্ধি হয়। একটী সুবৃহৎ অর্দ্ধভগ্ন মসজীদ এখনও এই স্থানের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; এরূপ সুবৃহৎ মসজীদ নিকটবর্ত্তী কোনও জেলায় নাই। ইহা বর্ত্তমান কালে মুন্সী বারী আবদুল আলি ও মুন্সী মহম্মদ জুল ফকর হায়দার সাহেব দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে আছে। এই স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা বনাকীর্ণ জনহীন ও অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও গ্রামটী সমৃদ্ধিশালী ছিল। তখন এখানে সপ্তাহে ২ দিন দেশী সুতা ও দোক্তা তামাকের হাট হইত। প্রতি হাটে প্রায় ৭০০০।৮০০০ হাজার লোক সমাগম হইত; এই হাট এক্ষণে হরিৎঘাটা (সুবর্ণপুরে) উঠিয়া গিয়াছে।

* "The island opposite Tribeny has a conspicuous place on De Barro's Map of Bengal and on that by Blaev (Vide Pt. IV). The maps also agree with Abul Fazel's statement in the Ain, that at Tribeny there are 3 branches, one of the Saraswati on which Satgaon lies, the other the Ganga now called the Hugli and the third the Jan or Jabuna (Jamuna). De Barro's and Blaev's map show the three branches of almost equal thickness, the Saraswati passing Satgaon and Chowna (Chaumnha in Hugli District north) and the Jabuna flowing westward to Borhan in the 24 Perganas.

Vide Journal of the Asiatic Society Bengal, Vol XLII, 1873. Pp. 214.

বাগের খালটী এক্ষণে পূর্ব্বকার যমুনা নদীর ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র জাগরূক রাখিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টলেমীর বর্ণনায় ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ডি, ব্যারো ও ব্ল্যাভের ম্যাপে ত্রিবেণী দ্বীপের যে মানচিত্র আছে তাহাতে কাঞ্চনপল্লী, বাগের গ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি দ্বীপ আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডের দক্ষিণে বাগেরখাল, পশ্চিমে গঙ্গা এখনও বহতা। উত্তরদিকে সুপ্রশস্ত যমুনা বহতা ছিল উহার চিহ্ন এখনও কাঁচড়াপাড়া ও মদনপুরের মধ্যবর্ত্তী ঘোষপাড়া গ্রামের উত্তর পার্শ্বে এবং মদনপুর ষ্টেসানের প্ল্যাটফরম হইতে ৫০।৬০হাত দক্ষিণে আসিয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে। ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল লাইনের উচ্চ মৃত্তিকায় ইহার গতিরোধ হইয়া মূল স্রোতবেগ ব্যহত হওয়ায় দিনে দিনে ইহা ক্ষীণ কায়া হইয়া মূল খাত ত্যাগ করিয়া ক্ষীণ রজত রেখার ন্যায় এক্ষনে কুলীয়া গ্রামের নিকট হইতে বাগের খালের সহিত যুক্ত হইয়া বাগের খাল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ডি, ব্যারো ও ব্ল্যাভের ম্যাপে ত্রিবেণীতে গঙ্গা যমুনা ও স্বরস্বতী এই তিন নদীই একরূপ প্রশস্ত দেখান হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন গঙ্গা, যমুনা ও স্বরস্বতী এই ত্রিধারাকেই মুক্ত ত্রিবেণী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং এই স্থানকেই দক্ষিণ প্রয়াগ নির্দ্দেশে ইহার উচ্চ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।* ১৮১০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট সার্ভেতে এই যমুনা ও বাগের খাল, সুন্দর বনের উত্তর সীমা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া ইচ্ছামতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্ব কালের অধিবাসীগণ, স্রোতের বেগে গঙ্গাগর্ভে পতিত হইবে জ্ঞানে, এই যমুনাতে মৃতদেহ ভাসাইয়া দিত। এক্ষণে এই বাগের খাল নদীয়া জেলার দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে।

---

* "দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্ত গ্রামাখ্যা
দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ ! ॥"

এই দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্ত বেণী দক্ষিণ দেশে সপ্ত গ্রামের নিকট ত্রিবেণী বলিয়া খ্যাত। প্রয়াগে যমুনা ও সরস্বতী আসিয়া জাহ্নবীর পূত সলিলে মিলিত হওয়ায় উহার নাম যুক্তবেণী, এই স্থান হইতে এই সম্মিলিত স্রোত জাহ্নবী খাতে প্রবাহিত হইয়া ত্রিবেণীতে মুক্ত অর্থাৎ পুনর্ব্বার বহির্গমন পূর্ব্বক পৃথক ভাবে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়া এই স্থানের নাম মুক্তবেণী হইয়াছে।

সুখ সাগর।

এই গ্রাম খানির বর্ত্তমান অস্তিত্ব না থাকিলেও, ইংরাজ আমলের প্রথমে এই স্থানটী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কালচক্রের আবর্ত্তনে বর্ত্তমান সময়ে সুখ সাগরের পুর্ব্ব চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান নাই। পুতঃতোয়া ভাগিরথীর বিষম তরঙ্গাঘাতে সুখসাগরের সুখস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও অশীতিপর বৃদ্ধগণ সুখসাগরের পুর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। তৎকালে সুখসাগর প্রকৃতই "সুখ সাগর" ছিল। রেনেলের মানচিত্রে সুখ সাগর গঙ্গা হইতে কিছু দূরে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কালে গঙ্গা, ক্রমে সরিয়া আসিয়া, ইংরাজের মুরসীদাবাদ হইতে অপসৃত রেভিনিউ বোর্ডের প্রাসাদোপম অট্টালিকাদি, যাহা দেড়লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তদানীন্তন সুবিখ্যাত ধনী, নীল কুঠিয়াল ব্যারেটো সাহেবের সৌধ শ্রেণী ও তাঁহার ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, ৯,০০০ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জাঘর প্রভৃতি গ্রাস করতঃ ধরণী বক্ষ হইতে সুখ সাগরের চিহ্ন মাত্রও মুছিয়া লইয়াছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে খালসা দপ্তর এখানে উঠিয়া আসিবার কিছু পরেই এই স্থানটী ইংরাজদিগের আমোদ আহ্লাদের উপযোগী মনে হওয়ায়, ইংরাজগবর্ণমেণ্টের পল্লী আবাস এখানেই নির্ম্মিত হয়, পরে উহা উঠিয়া বারাক-পুরে যায়। সপরিষদ মারকুইস কর্ণওয়ালীশ সাহেব গ্রীষ্মকালে প্রায়শঃ এখানেই আগমন করিতেন। ফরাসী চন্দনদগর, হুগলী, চুঁচড়া প্রভৃতি হইতে সাহেবরাও এখানে সর্ব্বদা আমোদ করিবার জন্য আগমন করিতেন।

সুখ সাগরের সমৃদ্ধির কারণ কুঠিয়াল ব্যারেটো সাহেব। তিনি এখানে বহু বর্ত্ম নির্ম্মাণ ও তাহার উভয় পার্শ্বে নিম্ব বৃক্ষ শ্রেণী রোপণ করিয়াছিলেন। এগুলির দুই চারিটী অদ্যাপি স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি এখানে একটী মদের ভাঁটী স্থাপনা করেন। এই কালে লোকে এই স্থানকে "ছোট কলিকাতা" বলিত। ব্যারেটো এই স্থানে মদ ও নীলের কুঁঠী চালাইয়া এতই ধনী হইয়াছিলেন যে তিনি বলিতেন, "সুখ সাগরের গঙ্গা আমি টাকা দিয়া ভরাট করিতে পারি।" সাধারণ লোকে, তাঁহার এই অসম্ভব ধনাগম দেখিয়া তাঁহাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ও যে কোন ধাতুকে টাকায় পরিণত করিতে শক্তিশালী

মনে করিত। ইঁহার কুঠী বেশ সুরক্ষিত ছিল ও কুঠীর গঙ্গার দিকের অংশে কামান সাজান থাকিত। লর্ড ক্লাইব যখন সুখ সাগরের তলা দিয়া পলাসী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন তখন ব্যারেটো তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কামানধ্বনি করিলে ক্লাইব উহাকে শত্রুর শিবির মনে করিয়া ধ্বংশ করিতে অনুমতি দেন।

পূর্ব্বকালে সুখ সাগরের নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুপুর, শ্রীনগর, ভাগড়া, ও অদূরস্থিত জাগুলী প্রভৃতিতে বড়ই ডাকাতের উপদ্রব ছিল। একবার জাগুলীতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর খাজনা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। সেই সময় হইতে ইহার নাম হয় হুণ্ডীমারা জাগুলি। পূর্ব্বে যখন রেল পথের বিস্তার হয় নাই এবং স্থলপথে সৈন্যাদি যাতায়াত করিত, তখন মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাইতে এই জাগুলিতেই সৈনিকদের পথশ্রান্তি নিবারণ কল্পে ছাউনি পড়িত। সুখসাগরের জমিদারী স্বত্ব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল। তিনি এখানে একটী বাজার স্থাপন করেন এবং এক মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে উগ্রচণ্ডী দেবীর মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। কেহ কেহ দেবীকে সিদ্ধেশ্বরীও বলিয়া থাকেন। কালের ক্রীড়ায় এই মন্দির এখন গঙ্গাগর্ভে, সুতরাং দেবী, কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলী কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়া হরধামে চিন্ময়ী দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে রক্ষিত হইয়াছেন।

সুখসাগরের অবনতির ২টী কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। ১ম কারণ, গঙ্গার ভাঙ্গনে কুঠিয়াল সাহেবদিগের কুঠী ও ইমারতাদি জলমগ্ন হওয়া। ২য়, রাণাঘাটের উদীয়মান পাল-চৌধুরীগণ কর্ত্তৃক জোর স্বত্বে সুখসাগরের বাজার ভাঙ্গিয়া চাকদহের বাজার পত্তন। সুখ সাগরের এইরূপ অধঃপতনের পরেও এখানে বহুদিন ধরিয়া একটী উচ্চ শ্রেণীর দেওয়ানী আদালত ছিল।

বিশপ হেবার তাঁহার পত্রিকায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ লিখিয়া গিয়াছেন। "আমি সুখসাগরের নিকট একটী সুসভ্য নগরীর চিহ্ন সকল দেখিয়াছিলাম। একটী ফাঁসী কাষ্টে ২টী কঙ্কালসার মৃতদেহ শৃঙ্খলিত অবস্থায় লম্বমান দেখিয়াছিলাম। তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে ডাকাতি ও খুন করা অপরাধে ২ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই স্থানটীর নাম ডাকাতাদি নানা কারণে কলঙ্কিত।" ফষ্টার নামে এক সাহেব ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "সুখ সাগরের ক্রাষ্ট ও ল্যাকনকস সাহেবের

কুঠী ও চাষ আবাদাদি, বিশিষ্ট মুল্যবান ও উন্নতিশীল। ইহাদের এই স্থানে স্থাপিত সাদা সূক্ষ্ম মসলীনের কুঠীতে কোম্পানী বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা দাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা এখানে রেশমের গুটীর চাষও আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ক্রমে প্রসার ও উন্নতি দেখিয়া স্থাপয়িতাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের বিলক্ষণ পুরস্কারের আশা করা যায়।" ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে গভমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী পাঠশালা স্থাপিত হয়। একজন জমিদার পুর্ব্বে ব্যারেটো সাহেবের নির্ম্মিত একখানি "চৌরীঘর" পাঠশালার জন্য দান করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এক মুনসেফ কর্ত্তৃক এখানে একটী কেরাণী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় ১৫০ জন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ভদ্র সন্তান পরীক্ষা প্রদান করেন।"

বর্ত্তমান কালে সুখসাগরের নাম ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। গঙ্গা বক্ষ হইতে লোকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গঙ্গার ভাঙ্গন ও দুই চারিটী প্রাচীন বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া দেখাইয়া থাকে—"ঐ খানে সুখসাগর ছিল"।

চুয়াডাঙ্গা।

চুয়াডাঙ্গা মহকুমার পরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২৫৪৫৮৯। ইহা বর্ত্তুলাকারে উত্তর দক্ষিণ লম্বা। পূর্ব্ব বঙ্গ রেল পথ ইহার মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। আলমডাঙ্গা, মুনসীগঞ্জ, নীলমণিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, জয়রামপুর ও দর্শনা ষ্টেসন এই মহকুমার সীমার মধ্যে পড়ে। মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ (যশোহর) মহকুমায় যাইতে হইলে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে নামিতে হয়। মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে, ঝিনাইদহ ২২ মাইল পূর্ব্বে; দুইটী পাকা রাস্তা দ্বারা মিলিত। মাথাভাঙ্গা বা হাউলিয়া নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে চুয়াডাঙ্গার মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। সুবলপুর নামক স্থানে মেহেরপুর হইতে ভৈরব আসিয়া হাউলিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। চুয়াডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী হাজরাহাটী নামক গ্রামে নবগঙ্গা নামক আর একটী নদী হাউলিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে; কিন্তু এই নদীর প্রথম ৩৪ মাইল এখন শুষ্ক। এই নদী ঝিনাইদহ অভিমুখে চলিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গ রেল রাস্তার জন্য ইহার মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কয়টী বড় নদী ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কয়েকটী মরা নদী

আছে; কিন্তু সেগুলিতে প্রায়ই জল থাকে না স্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট বড় বিল আছে তাহার মধ্যে রায়সা, দলকা প্রধান।

চুয়াডাঙ্গার চারিটী থানা,—চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা, দামুরহুদা ও জীবননগর। এই চারি থানার গ্রামগুলি ৫৩টী চৌকীদারি ইউনিয়ানে বিভক্ত। কুড়ুলগাছী কাপাসডাঙ্গা, দামুরহুদা, জয়রামপুর, দৌলতগঞ্জ (জীবননগর), ডুমুরদিয়া আলোকদিয়া, কুমরী. বেলগাছী, নাটুদহ এই কয়টী গ্রাম খুব বড়। আলমডাঙ্গা, বেহালা (মুনসীগঞ্জ), হাটবোয়ালিয়া, দামুরহুদা, রামনগর (দর্শনা) এই কয়টী প্রধান বাণিজ্য স্থান। রামনগরে একটী সব রেজষ্টরি আফিসও আছে। এই মহকুমা হইতে পাট, ছোলা, তিসি, লঙ্কা, মুগ. কলাই, অড়হর, গম প্রধানতঃ রপ্তানি হয়। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ধান ও চাউল প্রধান। পূর্ব্বে অনেকগুলি গুড়ের কারখানায় চিনি প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হইত। কিন্তু দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় চিনীর মুল্য কম হওয়ায় সেই সকল চিনির কারখানা লোকসান পড়িয়া প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। কুমারি, বেলগাছী, মমিনপুর প্রভৃতি গ্রামের জোলা ও তাঁতিগণ কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু তাহার পরিমাণ খুব কম।

চুড়াডাঙ্গা মহকুমা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে দৌলতগঞ্জ (জীবননগর) একটী মুনসেফী চৌকী ছিল, আর দামুরহুদায় ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কয়েকজন ডেপুটী কলেক্টরের কাছারি স্থাপিত হইয়াছিল। নীলকরদিগের ও প্রজাদিগের মোকর্দ্দমার বিচারের জন্য দামুরহুদায় এই সকল কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ রেল পথ খুলিলে সেই মুনসেফী কাছারি ও দামুরহুদার কাছারি উঠিয়া আসিয়া বর্ত্তমান চুড়াডাঙ্গা মহকুমা স্থাপিত হয়। পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস ইলিয়ট লাট সাহেবের আমলে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা উঠিয়া গিয়া মেহেরপুরের সামিল হয়; চুয়াডাঙ্গাতে তখন মাত্র একটী মুনসেফের কাছারি থাকে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায়, গবর্ণমেণ্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করা হয়। পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আবার চুয়াডাঙ্গা মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে। মহকুমা উঠিয়া যাইবার সময় কালুপোলে থানা উঠিয়া

গিয়াছিল, আর জীবননগর থানা সদরের এলাকা ভুক্ত হইয়াছিল। মহকুমা পুনঃ স্থাপিত হইলে, জীবননগর আবার চুয়াডাঙ্গায় ফিরিয়া আসিল, কিন্তু কালুপোলে আর আসিল না।

এই মহকুমার মধ্যে কোন প্রাচীন কীর্ত্তি নাই। চুয়াডাঙ্গা হইতে ২ মাইল পশ্চিমে উজিরপুর নামক গ্রামে একটী পুরাতন দীঘি আছে, ও পাকা কোঠার ভগ্নাবশেষ আছে। শুনা যায় নবাবী আমলে উজিরপুর একটী কাছারি ছিল।

এক সময়ে চুয়াডাঙ্গার অধিকাংশ স্থান নাটোরের জমিদার প্রাতঃস্মরণীয়া ৺রাণীভবানীর এলাকাভুক্ত ছিল। এখন মাত্র ৭৮ খানা গ্রাম সেই ষ্টেটের মধ্যে আছে। পরে নীলকর সাহেবগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত এই মহকুমার মধ্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন তাঁহারা এই মহকুমাকে ছয়টী কুঠির এলাকায় বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন যথা—নিশ্চিন্দীপুর, কাঁচিকাটা, লোকনাথপুর, সিন্দুরিয়া, খাড়াগোদা, পোড়াদহ। ইহার মধ্যে নিশ্চিন্দীপুর ও কাঁচিকাটা লোকনাথপুর ও সিন্দুরিয়া কুঠির সাহেবগণ খুব প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। দাঙ্গাহাঙ্গামাকালে জয়রামপুর ও আলোকদিয়া দুইটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৮৬০ অব্দের পর হইতে নীলের চাষ ক্রমশঃ কম হইতে লাগিল। আট বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই মহকুমায় অল্প পরিমাণে নীলের চাষ হইতেছিল। পরে জর্ম্মাণির কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় নীলের চাষ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মাত্র নিশ্চিন্দীপুর কন্‌সার্ণের মিঃ বার্কার ও মিঃ হ্যামিলটন্ সাহেবদিগের জমিদারী আছে। কানাই নগরে তাঁহাদের সবে একটী কুঠি আছে। সিন্দুরিয়া কন্‌সার্ণের মালিক মিঃ সেরিফ্ সাহেব কয়েক বৎসর মারা গিয়াছেন। এই কুঠি এখন ঝিনাইদহের অন্তর্গত পোড়াদহ কুঠির অন্তর্গত হইয়া মিঃ ম্যাক্‌ডোলেন সাহেবের অধীনে আছে। এই সকল সাহেবগণ এখন কেবল জমিদারী করিতেছেন; নীলের সহিত ইঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে নিশ্চিন্দীপুর কন্‌সার্ণের জমিদারীই সর্ব্বাপেক্ষা বড়; তাঁহাদের আয় বার্ষিক প্রায় ১॥ লক্ষ টাকা। ইহার পরে শ্রীযুক্ত বাবু নফর চন্দ্র পাল

চৌধুরী। এই মহকুমায় তাঁহায় জমিদারীর আয় প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা তাহার পরে আমেলা সদরপুরের সাহা বাবুদের জমিদারী; তাহার আয় এই মহকুমায় পনর হাজার টাকা। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ছোট ছোট জমিদার ও তালুকদার আছেন।

এই মহকুমার শতকরা প্রায় ৭৫ জন প্রজা কৃষিজীবি; ১২ জন মজুর; ৮ জন ব্যবসায়ী ও কর্ম্মচারী; ৫ জন শিল্পী। কৃষিজীবি প্রজার মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ জন মুসলমান।

কৃষকদিগের অবস্থা প্রায়ই শোচনীয়। জমির উর্ব্বরতা শক্তি বড় কম। পুর্ব্ববঙ্গের ন্যায় এ জেলায় বন্যার জল দ্বারা মাঠে পলিমাটী পড়ে না; আবার পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় জমিতে সার দেওয়ার রীতিও নাই। পূর্ব্বে জমির উর্ব্বরতা-শক্তির বৃদ্ধির জন্য একই জমি বছরে বছরে চাষ করা হইত না, ফেলিয়া রাখা হইত। এখন লোকসংখ্যা বেশী, জমির পরিমাণ কম; সেই জন্য জমি প্রায়ই ফেলিয়া রাখা হয় না। এই সব কারণে জমির উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ১ বিঘা মধ্যম রকমের জমিতে ৩।৷০ মণ আউস ধান, ২।৷০ মণ ছোলা, ১।০ তিসি, ৩ মণ পাট জন্মে। এই মহকুমার অধিকাংশ জমিতে বৎসরে দুইটী ফসল জন্মে—আউস ধান বা পাট, পরে সারসা, বা মটর, বা কলাই; বা মুগ বা ছোলা বা তিসি, বা গম বা যব। আবাদী জমির প্রায় দশ আনিতে আউশ ধান হয়, প্রায় অর্দ্ধেকে রবি ফশল হয়, প্রায় $\frac{1}{১৬}$ অংশে আমন ধান হয়, প্রায় $\frac{1}{৮}$ অংশে পাট হয়। পাটের আবাদ ক্রমেই বাড়িতেছে। আলমডাঙ্গা থানার মধ্যে ইক্ষুর চাষও ক্রমে বাড়িতেছে। রেলের রাস্তার পূর্ব্ব দিকে খেজুর গাছের আবাদ খুব বেশী।

জমির উর্ব্বরতা শক্তি কম বলিয়া জমির মূল্য খুব কম। এক বিঘা রায়তি জমির মূল্য ৫।৭ টাকার বেশী নহে; কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে ইহার মূল্য ২৫।৩০ টাকা হইবে। জমির খাজানা বিঘা প্রতি ৷৵০ আনা হইতে ১।০ পর্য্যন্ত দেখা যায়। ওঠবন্দী জমির পরিমাণই বেশী; রায়তী জমাই জমি অপেক্ষাকৃত কম।

কৃষকদিগের মধ্যে প্রায় দশ আনি লোক মহাজনগণের নিকট ধান্য ও টাকার ঋণে আবদ্ধ। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছোট বড় মহাজনদিগের অনেক গোলা দেখিতে পাওয়া যায়। একবার যে কৃষক মহাজনের কাছে ঋণে আবদ্ধ হয়,

তাহার আর সহজে নিষ্কৃতি নাই। তবে দুর্ভিক্ষের সময়ে মহাজনগণ ধান ও টাকা কর্জ্জ দিয়া প্রজাদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে। ঋণীকে "আসামী" বলে। প্রত্যেক মহাজনই যে কোন উপায়ে হউক ধান কিম্বা টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার আসামীর জীবন রক্ষা করিতে বাধ্য। সুখের বিষয় পাটের চাষ দ্বারা কৃষকগণ ক্রমশঃ মহাজনদিগের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে।*

ধান্য চাউল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের খোরাকী খরচও ক্রমে বাড়িতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কৃষক শ্রেণীর একটী লোকের গড়ে মাসিক ৪৷৴০ র কম খোরাকী নির্ব্বাহ হয় না। তাহার হিসাব দেওয়া যাইতেছে—

খোরাকী খরচ।	মাসিক।	
চাউল মাসে ২৫সের, ৫৲ মণ দরে	৩৶০ †	
ডাইল তরকারী মাছ গড়ে রোজ ৴৫ হিসাবে	॥০	
হলুদ লঙ্কা ইত্যাদি মশলা	॥০	
লবণ	৵০	
তেল	।০০	
(কাঠ প্রায়ই কেহ কেনে না)		
	৪৷৴০	
এক বৎসরে		৫৪৸০
বস্ত্র।		
ধুতি ১ বৎসরে ৪ খানা	৩৲	
গামছা ২ খানা	॥০	
শীতের চাদর ১টা	১৲	
		৪॥০
জ্বালানি তেল, ঘরমেরামত ও অন্যান্য খরচ ...		৫৲
		৬৪।০

* জমা, জমি, চাষ, আবাদ, প্রজার অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে এখানে যাহা লিখিত হইল তাহা নদীয়ার সকল মহকুমা সম্বন্ধেই প্রযুজ্য।

† চাউলের মূল্য কম বেশী হইলে সেই অনুপাতে খরচেরও কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

গড়ে একটী পরিবারের লোক সংখ্যা ৫টী; সুতরাং একটী কৃষক পরিবারের বার্ষিক ব্যয় ৩২০৲ টাকা অর্থাৎ মোটের উপর ৩০০৲ টাকার কম নহে।

এইরূপ এক জন কৃষকের দুই খানা লাঙ্গল; ৪টী গরু ও ৩২ বিঘা জমি থাকা দরকার। তাহাতে কি আয় দেখা যাউক।

৩২ বিঘা জমির মধ্যে ধরা যাক ২৪ বিঘায় ধান ও রবিখন্দ জন্মে আর ৮ বিঘায় পাট চাষ করা হয়।

২৪ বিঘা জমিতে গড়ে ৭৮ মণ ধান জন্মে, মূল্য ...	২০০৲
৮ বিঘা জমিতে গড়ে ২৭ মণ পাট, তাহার মূল্য ...	২০০৲
রবিখন্দের মূল্য	১০০৲
মোট উৎপন্ন ফসলের মূল্য	৫০০৲
বাদ আবাদের খরচ।	
বিঘা প্রতি ৭৲ টাকা হিসাবে চাষের ব্যয় ও খাজনা ৸০	
৭৸০ × ৩২ বিঘা = ২৪৮৲	
অর্থাৎ মোটামুটী বাদ	২৫০৲
সুতরাং কৃষকের লাভ	২৫০৲

যদি কেহ নিজে ক্ষেতের কাজ না করিয়া মজুর নিযুক্ত করিয়া চাষ আবাদ করে, তাহার এইরূপই লাভ দাঁড়াইবে; কিন্তু কৃষকগণ নিজেরাই ক্ষেতের কাজ করে ও গাঁতা দ্বারা পরস্পরের সাহায্য করে। সেজন্য আবাদের বিঘা প্রতি ৭৲ টাকা না পড়িয়া ৩৷৷০ পড়িবে। এই জন্যই তাহারা কোন ক্রমে বাঁচিয়া থাকে।

কিন্তু ৩২ বিঘা জমি চাষ করে, এরূপ কৃষকের সংখ্যা বেশী নহে; আবার জমি থাকিলেও সব বছর ভাল ফলে না। খোরাকী খরচ বাদে বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কাজের জন্য ও গরু কিনিবার জন্য এক সময়ে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। এই সব কারণে তাহাদিগকে মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। পাটের চাষ বৃদ্ধি হইলে ও পাটের দাম ক্রমে বাড়িলে কৃষকগণের সুবিধা হওয়ার সম্ভব। কোন কোন কৃষক জমি চাষের সঙ্গে অন্যের মজুরি করে। ইহা একটী শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। মজুরি খাটা সম্বন্ধে অনেক চাষীরই অন্যায় কুসংস্কার

আছে; তাহাদের ধারণা মজুরি খাটিলে তাহাদের মান যায়। কেহ কেহ দেশে মজুরি খাটিতে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু বিদেশে গিয়া মজুরী খাটা অপমানের কাজ মনে করে না। এইরূপে অনেক চাষী দক্ষিণ ও পূর্ব্ব জেলায় ধান কাটিতে ও মাটী কাটিতে যায় এবং বেশ দশ টাকা রোজগার করিয়া আনে। এই কুসংস্কার দূর হইলে কৃষকদিগের উন্নতি হওয়া সম্ভব।

মজুরদিগের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে। ধান্যের কর বৃদ্ধি হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। কিন্ত যে পরিমাণে খাদ্য জিনিষের মুল্য বাড়িয়াছে, মজুরির আয় সে পরিমাণে বাড়ে নাই। সাধারণ মজুরের পূর্ব্বে দৈনিক আয় ছিল ✓০ হইতে ✓১০; এখন হইয়াছে ।০ হইতে ।১০; তবে ধান ও পাট কাটার সময়ে মজুরগণ খুব বেশী উপার্জ্জন করে। ধান কাটার মজুরি দৈনিক ।✓০ ও দুই বেলার খোরাকী। পাটকাটার মজুরির কোন নির্দ্দিষ্ট হার নাই; ফুরাণ চুক্তি করিয়া প্রায় কাজ করা হয়। ইহাতে কোন কোন মজুর দৈনিক ২৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকাও রোজগার করিতে পারে। এই জন্য অনেক মজুরের অবস্থা চাষী অপেক্ষা ভাল।

জিনিষ দুর্ম্মূল্য হওয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা মধ্যবৃত্তি শ্রেণীর লোকেরই বেশী কষ্ট হইয়াছে। যে গরিব ভদ্রলোকের পরিবারে পাঁচটী লোক ও মাসিক আয় ২৫৲ টাকা কিম্বা ৩০৲ টাকা তাহার বর্ত্তমান সময়ে ৬৲ টাকা দরে চাউল কিনিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা বড়ই কঠিন। এই জন্য মধ্যবৃত্তি ভদ্রলোক স্বচ্ছল অবস্থায় থাকিতে গেলে তাঁহার মাসে গড়ে ৮৲ টাকার কম কিছুতেই কুলায় না। কারণ কৃষক অপেক্ষা তাঁহার মাছ, ডাইল, দুধ, জ্বালানি কাঠ, কাপড়, ঘরমেরামত, ধোপা, নাপিত, ছেলেদের লেখাপড়া শিখান ইত্যাদি অনেক বেশী খরচ পড়ে। একটী পরিবারের পাঁচটী লোক থাকিলে ৫ × ৮ = ৪০ টাকার কম মাসে নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। অর্থাৎ বৎসরে খরচ ৪৮০৲ টাকার আবশ্যক। তবে একান্নবর্ত্তি পরিবার বলিয়া অনেকের তিন চারিশত টাকার মধ্যেই চলিয়া যায়। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপস্থিত হইলে ঋণ করিতে হয়।

সৌভাগ্যের বিষয় এ মহকুমায় তেমন ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ১৮৬৫—৬৬ সালে। শুনা যায় তখন কোন গৃহস্থ ঘরের বাহিরে বসিয়া ভাত খাইতে পারিত না; পেটের জ্বালায় অন্য লোকে আসিয়া তাহা

কাড়িয়া খাইত। সে বৎসর উড়িষ্যায়ও খুব ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সুতরাং তাহা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ। তাহার পর ১৮৮৯, ১৮৯৭ ও ১৯০৬ সালে অল্পপরিমাণে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। অল্প পরিমাণে সাহায্য বিতরণেই লোকের কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল।

১২৭৮ সনে ইং ১৮৭১-৭২ সনে খুব ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল। তাহাতে রেলের রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইহার পরে আর তেমন বড় বন্যা হয় নাই। তবে ১৮৭৯, ১৮৮৯, ১৮৯২, ১৮৯৭ সনে ও নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্লাবিত হইয়াছিল।

মেহেরপুর।

নদীয়ার অন্যান্য প্রচীন স্থানগুলির মধ্যে মেহেরপুর অন্যতম প্রাচীন গ্রাম। কেহ কেহ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের কালে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এই স্থানটীকে মিহির-খানার বাসস্থান বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন এবং মিহিরের নাম হইতে মিহির পুর, অপভ্রংশে মেহেরপুর নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন।

গ্রামখানি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫ মাইল লম্বা। গ্রামের পশ্চিম দিকে ভৈরব নদ প্রবাহিত। পূর্ব্বে এই ভৈরব প্রকৃতই ভৈরব নদ ছিল, এক্ষণে ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রামখানি মুখোপাধ্যায় পল্লী, মল্লিক পল্লী প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি পল্লীতে বিভক্ত। অধুনা এখানে আনন্দবাজার, কালীবাজার, বড়বাজার ও বৌ বাজার নামে চারিটী বাজার বিদ্যমান।

বহু পূর্ব্বে মেহেরপুরে গোয়ালাচৌধুরী উপাধী-ভুষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ বাস করিতেন; ইঁহাদের প্রধান ছিলেন রাজা রাঘবেন্দ্র। এই রাঘবেন্দ্র রায় সাক্ষরিত সনন্দ, কোবালা, দানপত্র প্রভৃতি দলিলাদি অনেক গৃহস্থের ঘরে আছে। কথিত আছে বর্গীর হাঙ্গামা কালে মহারাষ্ট্রগণের অন্যতম নেতা রঘুজী ভোঁসলার সহিত যুদ্ধে এই বংশীয়েরা সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েন। চৌধুরীদিগের নিধ-নের পর বহুদিন তাঁহাদের অধিকৃত মেহের পুরের অন্তর্গত প্রাসাদোপম অট্টালি-

কাদি ক্রোশৈকদূরস্থ সুবিস্তীর্ণ গড়ভূমি, দীর্ঘিকা ইত্যাদি বনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এবং প্রয়োজন হইলেও কেহ কখন ইহার ইষ্টকাদি ব্যবহার করিত না। সাধারণের মনে ইহাই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, চৌধুরী বংশের ইষ্টকাদি লইলে কাহারও শুভ হয় না; কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালটী স্থাপিত হইলে এই আবাসভূমির মধ্যেই মিউনিসিপাল আপিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিষ, জমিদারী কাছারি এবং দুই এক ঘর গৃহস্থেরও বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। দীর্ঘিকাটী মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক পুনঃসংস্কৃত হইয়া পানায় জলের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ত্তমান কালে এই আবাস বাটীর অনতিদূরে একটী সুগঠিত প্রাচীন শিবমন্দির এবং গোয়ালা চৌধুরীদিগের একটী কালীমন্দির আজিও বিদ্যমান আছে।

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী যখন রাজপুর পরগণের অধিকারিণী হয়েন, তখন মেহেরপুরেরও তিনি অধিশ্বর হয়েন। সেই কালে তাঁহার দত্ত ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, দেবোত্তর প্রভৃতি বহু সনন্দ আজিও লোকের গৃহে থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

রাণী ভবানীর হস্ত হইতে মেহেরপুর কাশিম বাজারাধিপতি হরিনাথ কুমারের হস্তে আসে। পরে হরিনাথের পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ এই ডিহি মেহেরপুর James Hill নামে এক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নীলকুঠিয়ালকে পত্তনী দেন। James Hill থাকবিলি করিয়া লইয়া প্রজা পীড়ন করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার সহিত অত্রস্থ জমিদার মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের বিবাদ বাধিয়া উঠে।

মুখোপাধ্যায় বংশ।

মুখোপাধ্যায় বাবুদের বংশের গজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় আসিয়া মেহেরপুর বাস করেন। গজেন্দ্র বাবু একজন বিশিষ্ট ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইহার ঘনশ্যাম, গোলক, আনন্দ, গোবিন্দ, অনুপ, ও বীরেশ্বর নামে ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য ও কার্য্যক্ষম ছিলেন। গজেন্দ্র বাবু পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্রগণ একযোগে বিষয় কার্য্যের বহু উন্নতি সাধন করেন। এই সময়ে নদীয়ার নীলের আবাদের বিলক্ষণ প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা ১২০টী নীল কুঠী স্থাপনা করেন। জ্যেষ্ঠ ঘনশ্যামের মৃত্যুর পর ইঁহাদের বিষয়ের আয় ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগের পর গোলকের তিন পুত্র মথুরা

লাল, রামচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ নীলকুঠী চালাইয়া স্ব স্ব বিষয় আরও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মথুরানাথ সাতিশয় বুদ্ধিমান বিধায়, মুখোপাধ্যায়গণের ষোল আনা রকম বিষয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া এতদঞ্চলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার বাবুয়ানা সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। শুনা যায় একবার ইঁহার জনৈক ভৃত্য কলিকাতার বাজারে গিয়া প্রসিদ্ধ ছাতু বাবু লাটু বাবুর ভৃত্যের সহিত বাদাবাদি করিয়া ১০০ শত টাকা দিয়া একটী রোহিত মৎস্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। এই সূত্রে ছাতু লাটু বাবুর সহিত পরে তাঁহার সবিশেষ সম্ভাব হয়। বারয়ারি উপলক্ষে ইনি খুব সমৃদ্ধি সহকারে মহিষমর্দ্দিনী পূজা করিতেন। একবার এতদুপলক্ষে আগত স্বনাম খ্যাত কবি হরু ঠাকুর গাহিয়াছিলেন ঃ—

"সত্য যুগে সুরত রাজা, করেছিল দেবী পূজা
ত্রেতাযুগে রাম।
কলিযুগে মথুর নাথে, সদয় হল ভবাণী,
এমনি পূজার ঘটা মেহেরপুরে মহিষমর্দ্দিনী ॥"

১২৪৮ সালে জেম্‌স হিল মেহেরপুর পত্তনী লইলে মথুর বাবুর সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে মথুরবাবু কতকটা মালের জমি নিজ দখলে আনিবার জন্য এক রাত্রির মধ্যে প্রায় ৪০ চল্লিশ বিঘা জমি রেল দিয়া ঘিরিয়া লইয়া তাহার পশ্চিম পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী খনন ও কামরা ঘর প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ বৃক্ষাদি রোপণ ও বাগিচা প্রস্তুত করেন। অদ্যাপি সে রেল বাগানটী মথুর বাবুর রেল বাগন নামে প্রসিদ্ধ। মথুর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবকৃষ্ণ বাবু গ্রামস্থ রামমোহন মৈত্র, ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বুদ্ধিমান ও বলশালী লোকের সহায়তায় বহু সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ সৈন্য লইয়া দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত জেমস্‌ হিলকে মেহেরপুর বেদখলে রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের পোষ্য পুত্রের মকর্দ্দামা লইয়া মুখোপাধ্যায় বংশের মধ্যে গৃহ বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই কালে মথুর বাবুর মৃত্যু হওয়ায় নবকৃষ্ণ বাবু একাকী জেমস্‌ হিলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কৌশলী হিল, মথুর বাবুর পুত্র চন্দ্রমোহন বাবুকে তোষামদে সন্তুষ্ট করিয়া এবং তাঁহার উপযুক্ত নজরানা দিয়া তাঁহাকে সপক্ষে আনয়ন করিলে নবকৃষ্ণ বাবুর সহিত তাঁহার

মনান্তর হয় এবং নবকৃষ্ণ বাবু স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া বহরমপুর প্রস্থান করেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। এক্ষণে নবকৃষ্ণ বাবুর একটী দৌহিত্র, মথুরা বাবুর একটী প্রপৌত্র, পদ্মবাবুর দুটী প্রপৌত্র ও অপর প্রপৌত্রের চারিজন পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।

নবকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুর পর জেমস্ হিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে এমন লোক মেহেরপুরে না থাকায় ১২৬০ সালে জেমস্ হিল সম্পূর্ণ রূপে মেহের পুর দখল করিয়া লয়েন এবং এখানে তখন রাজকীয় বিচারালয় না থাকায় নিশ্চিন্ত পুরের কুঠীতে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে মেহেরপুরে প্রজাপীড়ন করিতে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ মহেশ মুখোপাধ্যায়, যিনি নীলদর্পণে 'গুপে গুওডা" নামে খ্যাত, জেমস্ হিলের মন্ত্রী ছিলেন।

মল্লিক বংশ।

মুখোপাধ্যায় বংশের যখন দোর্দ্দাণ্ড প্রতাপ, তখন এখানকার অন্যতম জমিদার কৃষ্ণকান্ত মল্লিক আসিয়া মেহেরপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কৃষ্ণকান্ত-পুত্র নন্দ কুমার অনুান লক্ষাধিক টাকা লাভের জমিদারি করিয়া ছিলেন। ইহার ছয় পুত্র। তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্রের অকালে মৃত্যু হইলে, নন্দকুমার শোক সন্তপ্ত হইয়া পুত্রের নামে"নবগৌরাঙ্গ" বিগ্রহ স্থাপনা করেন। অদ্যাবধি তাঁহার সেবা চলিয়া আসিতেছে। নন্দকুমার পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পঞ্চম পুত্র তুল্যাংশ বিষয় বণ্টন করিয়া লয়েন। তিনি অতিথিসেবা এবং "আনন্দ বিহারী" নামে বিগ্রহ স্থাপনা করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যান এবং বাটীতে ধূমধামের সহিত বার মাসে তের পার্ব্বণের ব্যবস্থা করিয়া যান। নবকৃষ্ণের পুত্র পদ্মলোচন কাশিমবাজারের কৃষ্ণনাথ কুমারের এষ্টেটের কিছুদিন ম্যানেজারি করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারাও নানারূপ উচ্চপদস্থ কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া বহু অর্থোপার্জ্জন করেন। পদ্মলোচন এইরূপে কিছুদিন রাজ সরকারে কার্য্য করিয়া পরে নিজ এষ্টেটের কার্য্য পরিদর্শনে মেহেরপুরে চলিয়া আসেন। সাধারণ লোক মাত্রেই তাঁহাকে গ্রামের মণ্ডল বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় দয়াবান ও কীর্ত্তিমান ছিলেন। এই সময়ে মুখোপাধ্যায় ও মল্লিক বংশের আশ্রয়ে উভয় পক্ষের দলভুক্ত আশ্রিত প্রায় ৪০০ ঘর ব্রাহ্মণ, শতাধিক ঘর কায়স্থ, পঞ্চাশৎ ঘর বৈদ্য, অসংখ্য নবশাখ, ও অন্যান্য জাতি মেহেরপুরে বাস

করিতেন। গ্রামে ১০।১২টী সংস্কৃত টোল, ৫০টী পারসী ও আরবী বিদ্যালয়, এবং লাঠী ও সড়কী খেলার অনেক গুলি আখড়া বিদ্যমান ছিল।

মুখোপাধ্যায় বংশের ন্যায় ইঁহাদের বংশেও পদ্মলোচনের ভ্রাতা কেশব বাবুর অপুত্রক মৃত্যু হইলে, পোষ্য পুত্র গ্রহণ উপলক্ষে গৃহ বিবাদ বাধিয়া যায়। এই মকর্দ্দমার সময় পদ্ম বাবুকে জেমস্ হিল নানারূপে সাহায্য করায় পদ্মবাবুর ইচ্ছা থাকিলেও নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষ লইয়া হিলের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারেন নাই।

মুখোপাধ্যায় ও মল্লিকবংশের প্রতিপত্তিকালে মেহেরপুরের যেমন জাঁকজমক ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। ১২৬৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাহার মহামারীতে অসম্ভব লোকক্ষয় হওয়ায় গ্রাম হতশ্রী হইয়া পড়ে; পরে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানে মহকুমা স্থাপিত হইলে বিদেশী লোক লইয়া ইহার জনসংখ্যা কথঞ্চিত বৃদ্ধি পাইলেও পুর্ব্বের সে শ্রী আর ফিরিয়া আসে নাই।

এখানকার অন্যান্য প্রাচীন বংশাবলীর মধ্যে কায়স্থ বংশের ঘোষ ও দত্ত, বৈদ্য বংশের সরকার ও মজুমদার এবং ব্রাহ্মণ বংশের চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা উল্লেখ যোগ্য। এতন্মধ্যে মজুমদার বংশের সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে ধাতু ফলকে খোদিত এক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* আরও কথিত আছে বহু পুরাকালে ইহাদের গৃহে একটী ডাকিনা আসিয়া ছদ্মবেশে কিছুদিন বাস করার পর আত্ম প্রকাশ হইলে ঐ ডাকিনী গৃহস্বামীকে একখানি খড়্গা প্রদান করিয়া ইহাদের গৃহ পরিত্যাগ করে। অদ্যাপি সেই খড়্গা যথোচিত ভক্তি ও সম্মান সহকারে পুজিত হইয়া আসিতেছে। উপস্থিত দুইটী মাত্র বিধবা ব্যতীত এ বংশের আর কেহই পরিচয় দিবার নাই।

এস্থানের উৎপন্ন ও উল্লেখযোগ্য সামগ্রী—খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে রসকদম্ব, ক্ষিরের মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বলরাম হাড়ীর আড্ডা, ভজন সম্প্রদায়ের আখড়া, গোয়ালা চৌধুরীদিগের মন্দিরাদি, ঘোষ বংশের শিবমন্দির,

---

* আমরা অনেক চেষ্টায় উহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে অনেক গুলি প্রাচীন লোকের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ও আদালত গৃহ উল্লেখযোগ্য। এখানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা নাই, তবে ১৯১০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গের প্রজাপ্রিয় ছোটলাট সার এডওয়ার্ড নর্ম্মান বেকার মহোদয় নদীয়া পরিদর্শনে আসিয়া দরবারে বক্তৃতা কালে কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়ে খুলিবার আশা দিয়া গিয়াছেন। উক্ত রেল খুলিলে জন সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

নবদ্বীপ।

নবদ্বীপ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু কথাই ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রামখানি যাহা এক্ষণে নবদ্বীপ নামে পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপ কি না, এবং তাহা না হইলে ঐ প্রাচীন নবদ্বীপের স্থানই বা কোথায়, এবং স্থান সম্বন্ধে কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকিলে, তাহাই বা কবে হইয়াছে, অথবা আদৌ ঐরূপ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে বহু দিন হইতে বহু বাদানুবাদ হইলেও এ সম্বন্ধে যে অভ্রান্ত সত্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে স্থূলতঃ আদি নবদ্বীপের যে বহুবার স্থান পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং কিছু দিন পূর্ব্বেও যে নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান গুলি গঙ্গার পূর্ব্বকূলে স্থাপিত ছিল, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।* এমন কি পাশ্চাত্য জাতীয়গণের অঙ্কিত নানা ভাষায় লিখিত মানচিত্রেও ইহার নিদর্শন

---

* কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ পূর্ব্বেও নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বকূলে স্থাপিত ছিল এবং উহার পূর্ব্ব দিয়া জালাঙ্গী বা খড়ে প্রবাহিত ছিল। গোয়ালাপাড়া গ্রামে তখন নবদ্বীপের পূর্ব্ব সীমা বাহিনী জালাঙ্গী ও পশ্চিম সীমাবাহিনী গঙ্গার সম্মিলন ছিল। কথিত আছে ১২০৬ সালে প্রবল বন্যায় গঙ্গাস্রোতে নবদ্বীপের পশ্চিমতলবাসিনী খাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বতল বাহিনী জাঙ্গালা খাতে প্রবাহিত হয় এবং নবদ্বীপ তদবধি গঙ্গার কূলে গিয়া পড়িয়াছে এবং বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব কোণে গঙ্গা জালাঙ্গীর সঙ্গম দাঁড়াইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন কালে শ্রীচৈতন্য দেবের নবদ্বীপের যে কিছু অবশিষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, তাহা সমস্তই প্রায় ধ্বস্ত অথবা স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্য দেবের সময় কোন্ কোন্ গ্রাম লইয়া নবদ্বীপ গঠিত হইয়াছিল, এবং কোন গ্রাম কোথায় স্থাপিত ছিল ইত্যাদি নরহরি দাসের (চক্রবর্ত্তী) নবদ্বীপ পরিক্রমায় সবিশেষ উল্লিখিত আছে। সম্প্রতি সাহিত্যপরিষদ হইতে ইহার একখানি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, সকলেরই উহা পাঠ করা উচিত।

পাওয়া যায়। এই নবদ্বীপেই মহম্মদ-ই-বখতিয়ার আসিয়া লক্ষণসেন দেবকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত করেন।*

এই নবদ্বীপেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কাণভট্ট শিরোমণি, স্মার্ত্ত-প্রধান রঘুনন্দন, তন্ত্রবিৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শঙ্কর তর্কবাগীশ† আনন্দরাম তর্কবাগীশ (যিনি অর্ঘ্যদানের সুবিধার জন্য কোশার মুখ বিস্তারিত করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য কোশার নাম আনন্দার্ঘ্য হয়) প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার যশ ও খ্যাতি জগৎব্যাপী করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইঁহাদের কে কোথায়, কোন স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বা বাস করিতেন, সে সকলের সঠিক নিদর্শন পাইবার কোনও উপায় নাই, এমনকি ইঁহাদের অধিকাংশের বংশ পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে।‡ সম্প্রতি শ্রীচৈতন্য

---

* একথারও সম্প্রতি স্থানে স্থানে প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, এবং সুখের বিষয় যে এবিষয়ে নানারূপ তথ্যানুসন্ধান হইতেছে। যাঁহারা এই চির প্রচলিত বহুজন মান্য মতের প্রতিবাদী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, মহম্মদ ই-বকৃতিয়ার কর্তৃক নদীয়া বিজয় সত্য নহে, হয়তো বখতিয়ার এই পথে লক্ষণাবতী গমন করিয়াছিলেন। বখ্তিয়ারের বঙ্গবিজয়ের বহু বর্ষ পরে নদীয়া সম্পূর্ণভাবে মুসলমান অধিকারে আইসে। তাঁহারা অন্যান্য যুক্তির মধ্যে Asiatic Society তে সংগৃহিত ও রক্ষিত, বঙ্গের মুসলমান নরপতি মুখাহদিন জুবুবাকের সময়ে তদানীন্তন রাজধানী লক্ষণাবতী সহরে মুদ্রিত একটি মুদ্রায় লিখিত কথাগুলির উল্লেখ করেন, এবং বলেন যে ইহাই নদীয়ার মুসলমান অধিকারের পর প্রথম মুদ্রা; কিন্তু কে বলিবে যে, একদিন ভূগর্ভের অন্ধকারময় গর্ত্ত হইতে ইহার পূর্ব্বকার আর কোনও মুদ্রা সহসা আবিষ্কৃত হইবে কি না? উহাতে লিখিত আছে:—

This was minted at Lakhanabati for (paying) the revenue of Karmandan (Burdankar-Burdangarh-Bardhanksta (skt) and Nudiah in the month of Ramzan in the year 653 Hijri (February 1255 A. D.)

H. Nelson Wright—Catalogue of Coins in the Indian Museum Vol. II Part I Pag 146.

† এই নামের দুইজন মহোপাধ্যায় পণ্ডিত নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক জন নবদ্বীপের আদি পণ্ডিত অপর রাজা গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।

‡ উপস্থিত ঐ সকল প্রাচীন বংশাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বংশ অদ্যাপি নবদ্বীপে বিদ্যমান আছে—

১। গদাধর ভট্টাচার্য্য বংশে—অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।
২। জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশে—দ্বারকানাথ শিরোমণি, রামদাস ন্যায়ালঙ্কার।
৩। রামভদ্র সিদ্ধান্তের বংশে—মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন।

মহাপ্রভুর জন্মভিটা আবিষ্কারের চেষ্টা কেহ কেহ করিতেছেন এবং কেহ কেহ বর্ত্তমান নবদ্বীপের পরপারে মায়াপুর নামক স্থানে তাঁহার জন্মভূমি নির্দ্দেশ করিয়া তথায় তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

নবদ্বীপের তলবাহিনী ভাগিরথী ও জালাঙ্গী বহু প্রাচীন কাল হইতে এত অধিকবার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে যে, নবদ্বীপ-মণ্ডলের চতুঃসীমান্তবর্ত্তী ৮।১০ মাইলের মধ্যে কোথায় গঙ্গা বা জালাঙ্গী বা তাহাদের শাখা ছিল এবং কোথায় না ছিল তাহা বলা সুকঠিন। এই ৮।১০ মাইলের মধ্যে অসংখ্য স্রোত ও জলহীন খাদ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতেই এই স্থানটী হিন্দু বৈষ্ণবগণের নিকট পরম সমাদরের স্থান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের চক্ষে ইহার মহিমা শ্রীবৃন্দাবনের তুল্যানুতুল্য এবং সেই কারণে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে এই স্থানে জীবনের অবশিষ্টকাল বাস করিতে দেখা যায়। হেষ্টিংসের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ জীবনে স্বোপার্জ্জিত অতুল বিত্ত বৈভব, নিজ পুত্র লালাবাবুকে অর্পণ করিয়া দুই তিন শত বৈরাগী সঙ্গে এই নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপ সন্নিহিত রামচন্দ্রপুরে একটী ৬০ ফুট উচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অতিথি অভ্যাগত বৈষ্ণবাদির সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় উহা চিহ্ন-রহিত হইয়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেনসিয়া এখানে একটী মুসলমান কলেজ দেখিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত শ্রীমন্দিরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে দেখা যায়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এইখানেই সর্ব্ব প্রথম কলেরা রোগের সৃষ্টি হইয়া ক্রমে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উহা ভারতব্যাপী এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চীনে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আরব ও পারস্য, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রুসিয়া, প্রসিয়া এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে বিস্তারিত হইয়া পড়ে।*

৪। গোপাল ন্যায়লঙ্কারের বংশে—হরিপদ স্মৃতিতীর্থ, শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ।

৫। স্মার্ত্ত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের বংশে—নিবারণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, নৃসিংহ ও সিতিকণ্ঠ।

৬। মাধব সিদ্ধান্তের বংশে—হরিদাস ন্যায় সিদ্ধান্ত।

৭। আগমবাগীশের বংশে—অজিতনাথ ন্যায়রত্ন।

*In May 1817, the Cholera began in Nadiya, in 1818 it spread through India, then in 1820 to China, 1821 to Arbia and Persia, 1823 to Russia, and in 1832 to London.

Vide Calcutta Review Vol. VI. Pages 421—26.

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব গ্রন্থ সমুদয়ে নবদ্বীপের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে, তদানীন্তন নবদ্বীপকে অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সেই পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সহস্রাংশের এক অংশও অধুনা বিদ্যমান নাই। নদীর গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত নগরের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং কালের ক্রীড়ায় ইহা একরূপ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে একজন সাহেব এখানে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের উপদ্রবের কথা লিখিয়াছেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ডক্টর লেডন, যিনি কয়েক মাস নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সার এস ম্যাকোল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি এখানে সর্ব্বদাই ব্যাঘ্রাদি শীকারে নিযুক্ত রহিতেন।

নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জহ্নু নগরে পূর্ব্বে প্রতি বৎসর তাহ্রোব সংক্রান্তিতে একটী বৃহতী মেলা হইত, এখনও উহা গাছপূজা নামে প্রচলিত এবং প্রতি বৎসর ঐ দিনেই হইয়া থাকে।* কথিত আছে এই স্থানেই জহ্নু মুনি এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। এখানে এক গৃহস্থের বাটীতে কামধেনু ছিল এবং বহু লোকে উহার পূজা করিত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দেও এখানে অন্যূন ৩০টী সুন্দর শ্রীমন্দির ও একশত সংস্কৃত টোল বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে মন্দিরের সংখ্যাও অতি অল্প এবং টোলের সংখ্যা মাত্র পঞ্চদশ। পণ্ডিতের সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। †

In the Bengal Medical Report it is distinctly stated, as an undeniable fact, that the epidemic (Cholera) first appeared in the Nuddeah and Mymunsing Dists. in May 1817 that it raged extensively there in June and in July had reached the distant district of Dacca.

(Vide W. H. Carrey's Good old days of Honble John Company P. 273. Vol. I (1600—1858 A D.)

কেহ কেহ বলেন যে কলেরা সর্ব্ব প্রথম বর্ত্তমান যশোহর জেলার গদখালি গ্রামে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে পৃথিবী ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে এবং গদখালি গ্রাম তখন নদীয়া জেলা অন্তর্বর্ত্তী থাকায় প্রাগুক্ত পুস্তকগুলিতে সর্ব্বপ্রথম নদীয়াতে কলেরার উৎপত্তির বিবর লেখা আছে।

*কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ইহাই ব্রাহ্মণী পূজা বলিয়া উল্লিখিত আছে।

† বর্ত্তমান পণ্ডিত মণ্ডলীর নাম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযদুনাথ সার্ব্বভৌম প্রধান নৈয়ায়িক। স্মার্ত্ত-প্রধান শ্রীহরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন—(যদিও পূর্বস্থলী নিবাসী মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন নদীয়ার প্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া গণনীয়, তথাপি তিনি

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এখানে খৃষ্টান পাদরী সাহেবগণ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। তৎপূর্ব্বে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রেভী, ডিয়ার সাহেব এখানে কোন কোন বালককে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। বর্ত্তমান কালে এখানে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; ছাত্র সংখ্যা অন্যূন দুইশত।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একজন প্রতারক "গোপাল পাইয়াছে এবং ঐ গোপালের আদেশে মৃতব্যক্তিগণ পুনর্জীবিত হইয়া ১৩ আশ্বিন যমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিবে" বলিয়া এক হুজুক তুলিয়াছিল। বহু অশিক্ষিত নরনারী তাহার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই দিনে মৃত আত্মীয়গণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে এখানে বহু কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের এখানকার বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে শ্যাম বাউলের নাম সুপ্রসিদ্ধ। শ্যাম নবদ্বীপাধিপতি গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক। প্রেমিক ভক্ত শ্যামের মধুর কণ্ঠে তদানীন্তন আবাল বৃদ্ধ বনিতা মুগ্ধ ছিল, এখনও প্রাচীনাদের নিকট শুনা যায়,—

"বাজলো শ্যাম বাউলের খোল,
যত মাগী চরকা তোল।"

এখানকার উল্লেখযোগ্য বংশাবলীর মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বরেণ্য খ্যাতনামা পণ্ডিত মণ্ডলীর মহিমান্বিত নামাবলী ও সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয়াদি ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এখানকার গোস্বামী মহোদয়গণ শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈত বংশের শাখা, ভক্তশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় ব্রজানন্দ গোস্বামী প্রভুর বংশ, মণিপুরের

উপস্থিত ৺কাশীধাম-বাসী হওয়ায় উপস্থিত হরিশ্চন্দ্রই নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত বলিয়া গণ্য) শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীতারাপ্রসন্ন চূড়ামণি, শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীআশুতোষ তর্কভূষণ, শ্রীসীতারাম তর্কতীর্থ, শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ, শ্রীনিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ, শ্রীশশীমোহন স্মৃতিরত্ন, শ্রীদুর্গামোহন স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীমথুরানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীউমেশ চন্দ্র তর্করত্ন, শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীসতিকণ্ঠ বাচস্পতি, শ্রীদ্বারকানাথ শিরোমণি, শ্রীকৈলাশচন্দ্র কাব্যরত্ন, শ্রীমাধবচন্দ্র কাব্য রত্ন, শ্রীপ্যারিলাল ভাগবতভূষণ, শ্রীচণ্ডীভূষণ শাস্ত্রী, শ্রীঅহিভূষণ কাব্যতীর্থ, শ্রীহরিপদ কাব্য স্মৃতিতীর্থ, স্বামী শ্রীশিবগোবিন্দ ভারতী, শ্রীদামোদর গোস্বামী সাহিত্য দর্শনাচার্য্য ও শ্রীব্রজরাজ গোস্বামী ব্যাকরণ-রত্ন প্রভৃতি।

রাজবংশ, কাংস্যবণিক কুলোদ্ভব কীর্ত্তিমান গুরুদাস দাস মহাশয়ের বংশ, রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের বংশ, বাবু তারিণীচরণের বংশ, প্রসিদ্ধ যাত্রাকার পণ্ডিত ৺মতিলাল রায় ও তৎপুত্র কৃতি ধর্ম্মদাস রায় প্রভৃতির বংশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য, যথা—অত্রস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিভিন্ন চতুষ্পাঠী সকল, ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন স্থাপিত হরিসভা ও চতুষ্পাঠী, ৺পোড়ামা সিদ্ধেশ্বরী, ৺ভবতারণ ও ভবতারিণীর মন্দির, ৺বুড়োশিব, ৺আগমেশ্বরী মাতা, ৺মহাপ্রভুর মন্দির, শ্রীবাস আঙ্গিন* প্রভৃতি।

বিভিন্ন বৈষ্ণব পাঠাবলী, এবং গঙ্গার পর পারস্থিত মায়াপুর ও তথাকার শ্রীমন্দিরাদি এবং চাঁদ কাজীর কবর। বল্লাল দিঘী ও সুবর্ণ বিহার ও তত্রস্থ প্রাচীন রাজবাটীর লুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষ।

সভাসমিতির মধ্যে "বঙ্গবিবুধ জননী সভা" ও গঙ্গাটীকুরী-বাসী স্বনাম-খ্যাত হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থাপিত "নবদ্বীপ সমাজ" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবিবুধ জননী সভার পূর্ব্ব নাম সংস্কৃত বিদগ্ধ-জননী সভা। ইহা প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, ডি এল কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তখন ইহার সভাপতি ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, সম্পাদক সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম ছিলেন। পরে মহেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর ঐ সভা বঙ্গ বিবুধ-জননী সভা নামে খ্যাত হয় এবং বর্ত্তমান নদীয়াধিপতি মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র ঐ সভার সভাপতি হয়েন। পরে সভ্যগণের সহিত মহারাজের কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিলে ৪।৫ বৎসর ইহা স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে রক্ষিত হয় তৎপরে বঙ্গের সুকৃতি সন্তান সুপণ্ডিত, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম.এ, ডি. এল, এফ. আর. এস, ই, মহোদয় ঐ সভার সভাপতি হইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য, সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার, উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ।

* শ্রীবাস আঙ্গিন পূর্ব্বে পুরাণগঞ্জের দক্ষিণ ভাগে রাধী কলুর গৌতায় ছিল, তথা হইতে গঙ্গার চড়ায় বর্ত্তমান বাজারের পূর্ব্ব উত্তর, তৎপরে এখন বাজারের দক্ষিণ অংশে স্থাপিত আছে।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থাপিত নবদ্বীপ সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দুসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার সাধন ও ব্রাহ্মণেতর জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। ইহার বর্ত্তমান মন্ত্রী শ্রীহরিদাস ন্যায় সিদ্ধান্ত।

নবদ্বীপের উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পিত্তল কাংস্যের সামগ্রী, মাটীর বাসন, তুলসীর মালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নদীয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মধ্যে মায়াপুর, স্বরূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য।

মায়াপুর—ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি, বৈষ্ণবমতে অষ্ট ক্রোশ পরিমিত নবদ্বীপ মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পর, নদীর গতি পরিবর্ত্তনাদি নানা কারণে ইহা কিছু কাল, পরিত্যক্ত পল্লীর ন্যায় লুপ্তভাবে ছিল, কয়েক বৎসর হইতে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ, ও অমৃতবাজারে স্বনামখ্যাত, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ ও নদীয়ার স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ সরকার রায় বাহাদুর ও দেশহিতৈষী বৈষ্ণব জমিদার শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী প্রমুখ গৌরভক্তবৃন্দের যত্নে ও পরিশ্রমে, ও সুধার্ম্মিক সাহিত্যোৎসাহী,বদান্য প্রবর ভগবদ্ভক্ত স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য বাহাদুরের আর্থিক আনুকূল্যে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং শ্রীশ্রীগৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য সেবা এখানে স্থাপিত হইয়াছে। এখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মযাত্রা উপলক্ষে একটী মেলা হইয়া থাকে। এখানে বিখ্যাত চাঁদ কাজির সমাধির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এখানে অদ্যাপীও অসংখ্য তুলসীবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উহা বিনা আয়াসে, আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে।

মহেশগঞ্জ—খড়িয়া (জলঙ্গী) নদীর উপরেই স্থাপিত। উপস্থিত ইহা একটী ক্ষুদ্র পল্লী, জমিদার নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ও ইংলণ্ড প্রত্যাগত কৃতবিদ্য ও স্বদেশহিতৈষী জমিদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের পিতা স্বর্গীয় মহেশ বাবুর নামে স্থাপিত, এখানে বিপ্রদাস বাবু নূতন আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। এবং তিনি এখানে কল কারখানা স্থাপিত করিয়া, পাশ্চত্য বিজ্ঞান-সম্মত প্রথায় বাসনের কারখানা ও নদীয়া টেনারী নামে জুতার কারখানা স্থাপিত করিয়াছেন। মেহেরপুর হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত রেল খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে; এই রেল গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়া রেলের সহিত সংযুক্ত হইবে।

স্বরূপগঞ্জ—জলঙ্গীর উপরে স্থাপিত, ইহা শিবনিবাসের জমিদার স্বর্গীয় স্বরূপ চন্দ্র সরকার চৌধুরীর নামে স্থাপিত। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহোদয় এখানে একটী আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সুরভি-কুঞ্জ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ও তথায় বৎসরেরর অধিকাংশ সময়ে অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

বিল্বপুষ্করিণী—একটী ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও এখানে পূর্ব্বে বহু পণ্ডিতের আবাস-স্থান ছিল, এক্ষণে পণ্ডিতের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। এক্ষণে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তর্ক-রত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভাজন ঘাট—নদীয়া জেলার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান; এখানে পূর্ব্বে বহু বৈদ্যের বাস ছিল, এক্ষণেও বহু বৈদ্য এখানে বাস করিয়া থাকেন। রাই-উন্মাদিনী প্রণেতা প্রেমিক কবি স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর আবাস স্থল। এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মাহাত্মাগণের নাম উল্লেখযোগ্য। সুলেখক ও সুচিকিৎসক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কবিরাজ শ্রীশচন্দ্র রায়, শ্রীচারুচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ রায় এবং স্বনামখ্যাত শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য যাঁহার জন্য নদীয়া গৌরবান্বিত।

কুষ্ঠিয়া।

কুষ্টিয়া জেলা নদীয়ার একটী অতি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম না হইলেও ইহা জন সংখ্যাধিক্যে ও বিস্তৃতিতে নদীয়ার সর্ব্বপ্রধান মহকুমা। এখানকার অধিবাসীগণের ১৫ আনা ভাগ মুসলমান এবং কৃষিকার্য্যই তাহাদের প্রধান অবলম্বন।

নবাব মুরশিদকুলির সময়ে যখন অগ্রদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্ব পারে আসিতেছিল, এবং পাটুলির রাজাগণের এলেকাধীন ছিল এবং যখন এখানকার শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর মেলায় প্রতি বৎসর অন্যূন এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হইত, তখন এখানকার এই অসাধারণ জনতায় পিষ্ট হইয়া কতকগুলি লোক প্রাণত্যাগ করে। এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি এইরূপ অকারণ নরহত্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া যখন ঐ স্থানের জমিদারকে শাস্তি দিবার জন্য, অগ্রদ্বীপ কোন্ জমিদারের

জমিদারী-ভুক্ত, এই বিষয় জমিদারগণের পক্ষের মোক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন, কি জানি প্রভুর কি শাস্তি হইবে মনে করিয়া উক্ত জমিদারের মোক্তার অন্যান্য মোক্তারগণের সহিত একযোগে তাঁহার মনিবের নহে এই কথা বলায় সুচতুর নবদ্বীপাধিপতির মোক্তার এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ, কাতরকণ্ঠে, উহা তাঁহার মনিবের এলেকাধীন স্বীকার করিয়া, যথাবিহিত উত্তর দানে নবাবের ক্রোধ শান্তি করিয়া, চতুরতাবলে অগ্রদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভুকে জ্ঞাপন করেন। তখন রাজা, শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউকে এইরূপ অপ্রত্যাশিতরূপে স্বীয় তত্ত্বাবধানে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করেন এবং তাঁহার সেবার নিমিত্ত বর্ত্তমান কুষ্টিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রাম দেবসেবায় অর্পণ করেন ও ঐ সকল স্থানের নাম রাখেন গোপীনাথবাদ। এই গোপীনাথবাদই বর্ত্তমান কালে কুষ্টিয়া। ইহা বর্ত্তমান নদীয়া জেলার উত্তর সীমায় পদ্মা নদীর উপরে অবস্থিত, এবং জেলা ফরিদপুর* ও যশোরের সহিত সংশ্লিষ্ট ; সেই কারণে এখানকার কোনও কোনও স্থানের অধিবাসীগণের বাগ্‌ভঙ্গী পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসী গণের ন্যায়।

ইহার এলেকাধীনে যে সমস্ত নদী আছে তাহাদের মধ্যে গড়্‌ই ও কালীগঙ্গা প্রধান।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ সর্ব্ব প্রথম এই কুষ্টিয়া পর্য্যন্তই স্থাপিত। এই রেলস্থাপিত হওয়ার পর হইতেই এবং মহকুমা স্থাপিত হইয়া ইহা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। মধ্যে এই কুষ্টিয়াকে সেণ্টার (Centre) করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী জেলা হইতে দুএকটী করিয়া মহকুমা লইয়া, উহাকে কুষ্টিয়া জেলা নামে একটী স্বতন্ত্র জেলা করিবার প্রস্তাব হয় ; কিন্তু পরিশেষে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়।

সমগ্র কুষ্টিয়ায় পাটের চাষের বিলক্ষণ প্রসার। নিজ কুষ্টিয়ার কাপড় ও ছিট এক্ষণে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় বিগত ১৯০৭ সাল হইতে এক লক্ষ টাকা মূলধনে এখানে "মোহিনী মিল" নামে একটী

* বিগত ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাহার কুষ্টিয়া মহকুমা হইতে কতকগুলি গ্রাম বাহির করিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট গেজেট করিয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোহিনী বাবুর তত্ত্বাবধানে ইহা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এই কলের কাপড় অন্যান্য কলের কাপড়ের সহিত যেমন প্রতিযোগীতায় শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তেমনি মূল্যেও অসাধারণ সুলভ হইয়াছে।

এখানকার মধ্যে দ্রষ্টব্য—হাই স্কুল, কেনিস কনুসারণ বা বেঁকীদালান নদীতট ইত্যাদি।

কুষ্টিয়া মহকুমার অধীনে, উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রাম সংখ্যা অতি বিরল, তবে উহারই মধ্যে কুমারখালি, আমলাসদরপুর, ছেঁউরিয়া প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের নাম উল্লেখযোগ্য।

কুমারখালি—এখানে নবাবী আমলে একটী কাছারি ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী ফ্যাকটারি ছিল শুনা যায়। বর্ত্তমান রেল ষ্টেসনের সংলগ্ন যে একটী অযত্ন-রক্ষিত গোরস্থান দৃষ্ট হয়, উহা সেই কোম্পানীর আমলে স্থাপিত। এখানকার জমিদার কলিকাতার ঠাকুর বাবুরা। সুপ্রসিদ্ধ কাঙ্গাল হরিনাথ এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নিবাস এই স্থানে এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক রাজসাহির প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের জন্মস্থান ইহার সন্নিকটবর্ত্তী।

আমলাসদরপুর—ইহা স্থানীয় জমিদার সাহ বাবুদের জন্যই প্রসিদ্ধ।

ছেঁউরিয়া—এই গ্রামখানি ধর্ম্ম-সংস্কারক লালন ফকিরের জন্যই প্রসিদ্ধ হয়। তাঁহার চরিত্র নানা অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ। তাঁহার ধর্ম্মমত অতি সরল উদার ছিল। তিনি জাতিভেদের নিন্দা করিতেন এবং নিজে যদিও জাতিতে কায়স্থ (কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী চাপড়ার ভৌমিকগণের আত্মীয়) ছিলেন, তথাপি কেহ তাঁহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি স্বপ্রণীত এই গানটী শুনাইতেন—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে?
লালন ভাবে জাতির কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।
কেউ মালা কেউ তছ্‌বী গলায়,
তাইতে তো জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কাররে?

যদি সুন্নত দিলে হয় মুশলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান।
বামন চিনি—পৈতা প্রমাণ,
বামনী চিনি—কিসে রে ?
জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথা তথা,
লালন সে জেতের বাতা
ঘুচিয়েছে সাধ বাজারে।

লালন নিরক্ষর ছিলেন। তাঁহার সুললিত পদাবলী তাঁহার হিন্দুত্বের পরিচয় দিত। বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্ম মতের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে কখন কখন অবতার স্বীকার করিতেন। সত্য ভাব, সরল ব্যবহার, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূল-মন্ত্র ছিল। ছেঁউরিয়া গ্রামে তাঁহার প্রধান আখড়া ছিল। প্রতি বৎসর শীতকালে তিনি তথায় একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। ইঁহার শিষ্য সংখ্যা শুনা যায় প্রায় দশ সহস্র—প্রায়ই নিরক্ষর কৃষক। ইং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে ১১৬ বৎসর বয়সে লালনের মৃত্যু হয়।

———:o:———

নদীয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয়।

জেলা নদীয়া, বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, এবং ২৪°,১১″০″ ও ২২°৫২′৩৩″ উত্তর ল্যাটিচিউড্ এবং ৮৯°২৪′৪১″ ও ৮৮°১০′৩″ পশ্চিম লঙ্গিচিউডের মধ্যে অবস্থিত। স্থুলতঃ ইহার উত্তর সীমা জেলা রাজসাহী, পূর্ব্ব সীমা জেলা পাবনা ও যশোহর, দক্ষিণ সীমা ২৪ পরগণা এবং পশ্চিম সীমা জেলা বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর-পশ্চিম সীমা জেলা মুরসিদাবাদ। ইহার বিস্তৃতি ১৮৭১ সালে ৩৪১৪ বর্গ মাইল ছিল, এক্ষণে উহা আরও কমিয়া দাঁড়াইয়া হইয়াছে ২,৭৯৩ বর্গ মাইল। ১৭৯৫-৯৬ এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র জেলায় গ্রাম সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০৪১। ১৮৭০ অব্দে ছিল প্রায় ৩২৫০, ১৮৭২ অব্দে আদমসুমারীতে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬৯১। বিগত ১৯০২ অব্দে সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩,৪২০।*

বিগত অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে দৃষ্টিপাত করিলে, নদীয়ায় যে গ্রাম-সংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে দেখা যায়, উহার কারণ এই যে, বঙ্গদেশে ইংরাজ বিজয়ের পর সর্ব্বপ্রথম নদীয়ায় জেলা স্থাপিত হয়। তখন ইহার আধুনিক চতুঃপার্শ্বস্থ সকল জেলার অনেক অংশ, বিশেষতঃ হুগলী, যশোহর ও মুর্শিদাবাদের অনেক গ্রামই নদীয়ার অন্তর্গত ছিল; পরে সময়ে সময়ে ইহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া লইয়া চতুঃসীমস্থ জেলার সহিত যোগ করিয়া দেওয়ায়, ইহার আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বশিরহাট ও তৎসংলগ্ন বহুস্থান নদীয়া হইতে বাহির করিয়া যশোহরে যুক্ত করা হয়। ঐ বৎসর ঐ তারিখে মৌজে আনারপুর নদীয়া হইতে বাহির করিয়া ২৪ পরগণায় যোগ করা হয়, ঐ বৎসর ২৯শে আগষ্ট স্বরূপপুর ও পরানপুর লইয়া যশোহরে যোগ করা হয়। এইরূপ ৭১১৫ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর নদীয়ার বহুস্থান

* Bengal Mss Record" এর ২৬৪১, ২৭৯০, ২৭৯৬, ৩০৬৮, ৩০৭৪, ৩১৪৭, ৩২২০—৩ এবং ৩৭৮৭, ৩৭৯৭, ৩৮৯৩—৯৪, ৩৯৭৪—৭৫, ৫০৮৩, ৫১০৭, ৫১৮৬, ৫২১৭, ৫৩০২, ৫৪৭৭, ৫৮২৭, ৫৮৭০, ৫৯২০, ৫৯২৭, ৫৯৩৮, ৬১৭৮ প্রভৃতি সংখ্যক পত্রের মূল পত্রগুলি দৃষ্টি করিলে নদীয়ার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি উপলব্ধ হইবে।

বর্দ্ধমান ও হুগলীর অন্তর্গত করা হয়। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ১১শে জানুয়ারী নদীয়ার বহুস্থান মুর্শিদাবাদের সামিল করা হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহা হইতে অনেক গুলি পরগণা বাহির করিয়া লইয়া বারাসত জেলা গঠন করা হয়; ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত বারাসত ঐরূপ অর্দ্ধ জেলা ছিল ও তথায় একজন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন। ১৮৭২ অব্দে আদমসুমারীর রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সবডিভিজন বনগ্রাম তখনও পর্য্যন্ত নদীয়া জেলার অন্তঃর্গত ছিল। পরে ১৮৮২ অব্দের ১লা জুন তারিখে উহাকে জেলা যশোহরের অধীন করা হইয়াছে। উপস্থিত কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাট এই পাঁচটী সবডিভিজন লইয়া নদীয়া জেলা গঠিত। ইহার মধ্যে কৃষ্ণনগর, জেলার রাজধানী ও সদর। কথিত আছে এখানে ১৭৭২ অব্দে প্রথম জজ ও কালেক্টরী আদালত স্থাপিত হয়।

১৭৯৩ অব্দে সমগ্র জেলায় মোট একটী দাওয়ানী আদালত ও একজন মাত্র কভেনেণ্টেড অফিসর ছিলেন; ১৮০০ অব্দে ৩১টী আদালত ও ২টী ইংরাজ কভেনেণ্টেড অফিসর ছিলেন। ১৮৮৩ অব্দে ২৬টী ফৌজদারী আদালত (অনারারী বেঞ্চ লইয়া) এবং ১৮টী দাওয়ানী (রাজস্ব সম্বন্ধীয়) আদালত এবং ৪ জন কভেনেণ্টেড্ অফিসর ছিলেন।

নদীয়ার নদী।

নদীয়া জেলায় অনেক গুলি নদী বর্ত্তমান আছে। ইহাদের সকল গুলিই পদ্মার শাখা। পদ্মা, যে স্থান হইতে জালাঙ্গী নদী বাহির হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পূর্ব্বমুখে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত যাইয়া নদীয়ার উত্তর সীমা গঠন করিয়াছে। জালাঙ্গী বা খড়িয়া পদ্মা হইতে বাহির হইয়া নানারূপ বক্রগতিতে নদীয়া জেলার উত্তর পশ্চিম সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণনগরের তলদেশ দিয়া নবদ্বীপের পাদচুম্বন করিয়া নবদ্বীপ তলদেশবাহিনী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে।* ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ জেলায় সুঁতী থানার অন্তর্গত ছাপঘাটী গ্রামে মূল নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিয়দ্দূর আসিয়া বিধুপাড়ার নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের নিম্নে জালাঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ভাগীরথী জালাঙ্গীর সঙ্গম স্থান

হইতে ইংরাজগণ দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথীর "হুগলী রিভার" নাম দিয়াছেন। পদ্মার যে স্থান হইতে জালাঙ্গী বাহির হইয়াছে, তাহার প্রায় পাঁচ ক্রোশ নিম্ন দিয়া মাথাভাঙ্গা বা হাবুই বহির্গত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে পরে কিয়দ্দূর আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণগঞ্জের তলদেশে আসিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে ও দুই মুখ দুই নামে দুইদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই দুই স্রোতের একের নাম চূর্ণী, অপরের নাম ইছামতী। চূর্ণী কৃষ্ণগঞ্জ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে মামজোয়ান, রাণাঘাট হরধাম প্রভৃতির তলদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া শান্তিপুর ও চাকদহের মধ্যবর্ত্তী হুগলী রিভারে পতিত হইয়াছে। ইছামতী প্রধানতঃ যশোর ও ২৪ পরগণা দিয়া প্রবাহিত। ভৈরব নদের উত্তরাংশ জালাঙ্গী হইতে বাহির হইয়া মেহেরপুর প্রভৃতির তলদেশ দিয়া, কাপাশডাঙ্গার নিকট মাথাভাঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। মাথাভাঙ্গা হইতে চাঁদপুরের নিকট কপতক্ষ (কপোতাক্ষ) ও সমানপুরের নিকট গাঙ্গানী বা কুমার নদী বহির্গত হইয়া জেলা যশোহরের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।

এই সকল নদীর মধ্যে ইংরাজদপ্তরে ভাগীরথী, জালাঙ্গী এবং মাথাভাঙ্গা প্রধানতঃ নদীয়ার নদী নামে খ্যাত। পূর্ব্বকালে এই সকল নদীই দেশদেশান্তরে যাইবার একমাত্র উপায় ছিল এবং দেশের অন্তর ও বহির্ব্বাণিজ্য বিস্তারের এক মাত্র উপায় ছিল। জানিনা ভারতের কি পাপে আজ সেই সকল স্বভাবজাতা স্রোতস্বতীর এই অভাবনীয় দুর্দ্দশা। পূর্ব্বে যে সকল নদী দিয়া সুবৃহৎ জলযান ওঅর্ণবপোত সকল অবাধে গতায়াত করিত, যে শান্তিপুরের কুঠী হইতে সূতা, বস্ত্র এবং বহুল পরিমাণে মদ্য এবং মালদহ, মুকসুদাবাদ প্রভৃতি স্থান সকল হইতে রেশমী সূক্ষ্ম বস্ত্র, চিনি চাউল প্রভৃতি এবং নদীয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শত সহস্র কুঠী হইতে নীল সংগ্রহ করিয়া সুবৃহৎ অর্ণবপোত সকল সর্ব্বদা গমনাগমন করিত, আজ সেই সকল নদী নানা কারণে কোথাও বদ্ধসলিলা, কোথাও ক্ষীণ-কলেবরা, কোথাও সূক্ষ্ম রজত ধারার ন্যায় মৃদু হইতে মৃদুতর গতিতে বহমানা। এমনকি যে দুই একটী নদীতে সমস্ত বৎসর ধরিয়া কিছু জল থাকে, তাহাতেও গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী চালনা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর জালাঙ্গা ও মাথাভাঙ্গা নদীতে খরস্রোত প্রবাহিত করাইবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং করিতেছেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও

ফল হয় নাই বা হইতেছে না। এই ব্যয়িত অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট নদীয়া জেলায় দুই স্থানে "টোল" বা চলিত নৌকার উপর কর ধার্য্য করিয়া উহা সংগ্রহের নিমিত্ত আড্ডা স্থাপনা করিয়াছেন। ১ম নবদ্বীপে গঙ্গা জালাঙ্গী সঙ্গমে; ২য় কৃষ্ণগঞ্জে, যেখানে মাথাভাঙ্গা চূর্ণী ও ইছামতী নামে দুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ১৮৬১ অব্দ হইতে ১৮৭০ অব্দ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে নদীয়ার নদী সকল হইতে মোট ২৪১,৬৩২ টাকা চারি আনা আদায় হয়; উহা হইতে সর্ব্ব কারণে মোট খরচ হয় ১১৫,০৯৪ টাকা চারি আনা এবং বক্রী ১০১,৫৩৮ টাকা খাঁটী রাজস্ব আয় হইয়াছে।

এই সমস্ত নদীর উপর পূর্ব্বে যখন রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই, তখন বহু স্থানে গঞ্জ ও নৌকার আড্ডা বর্ত্তমান ছিল। সেই সুপ্ত প্রায় গঞ্জগুলির মধ্যে সুখ-সাগরের গঞ্জই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে গঙ্গা অতিশয় বিস্তীর্ণ ছিল এবং অনেকগুলি নীলকুঠী ইহার উপর ছিল; তন্মধ্যে প্রধান ছিল (বুবু রাট) সাহেবের কুঠী।* প্রথম যখন মুনসেফী আদালতের সৃষ্টি হয়, তখন এখানে উলায় এবং মামজোয়ানে রাণাঘাট সবডিভিজনের প্রথম মুনসফী আদালত স্থাপিত হয়। সুখ সাগরের আদালতে জজ্ হোসেন সাম সাহেবের নাম পাওয়া যায়। অন্যান্য স্থানের গঞ্জগুলি এখনও অতি হীন অবস্থায় বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গঞ্জ কয়টী অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী। ভাগীরথীর উপর কালীগঞ্জ ও নবদ্বীপ, হুগলী রিভারের উপর শান্তিপুর ও চাকদহ। জালাঙ্গীর উপর করিমপুর, চাপড়া, গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর, স্বরূপগঞ্জ। মাথাভাঙ্গার উপর মুন্সিগঞ্জ, দামুড়হুদা, কৃষ্ণগঞ্জ। চূর্ণীর উপর হাঁসখালী ও রাণাঘাট। গাড়ুলী বা কুমারের উপর আলমডাঙ্গা। পদ্মার উপর কুষ্টিয়া অবস্থিত। অদ্যাপি এই সকল গঞ্জে কিয়ৎপরিমাণে ধান, চাল, সরিষা, গুড় ও পাটের আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

---

* Mr. George Barreto অপভ্রংশে "বুবুরাট" হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই জন্য ব্যারেটোর সুখসাগরে একটী দুর্গ কেল্লা ছিল। Lord Clive যখন পলাশী বিজয়ে এই সুখ সাগরের জলবাসিনী গঙ্গা দিয়া গিয়াছিলেন, তখন ব্যারেটো তাঁহার সম্মানের জন্য কামান দাগিয়াছিল। কিন্তু ফরাসীর কেল্লা ভাবিয়া Clive পলাশীর যুদ্ধের পর প্রত্যাগমন কালে এই দুর্গ কেল্লাটি ধ্বংস করিয়াছিলেন।

এই সকল বহতা নদী ব্যতীত নদীয়ায় আর কতকগুলি নদী আছে, যাহারা পূর্ব্বে বেগবতী স্রোতস্বিনী ছিল, এক্ষণে হয় বদ্ধ-সলীলা, না হয় শুষ্ক অবস্থায় পরিণত। ইহারা বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ বিলের আকার ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১ম কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে স্থিত অঞ্জনা। ইহা পূর্ব্বে জালঙ্গী নিঃসৃত ক্ষুদ্র কলেবরা স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী ছিল। কথিত আছে, নদীয়া রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ, কৃষ্ণনগর স্থাপয়িতা রাজা রুদ্রের সময়ে ১০৮৭ হিজরি বা ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি মুসলমান সৈনিক পুরুষ এই জলপথে অঞ্জনা দিয়া যাইবার সময় রুদ্রের দৌবারিকগণের সহিত বিবাদ করে; তাহাতে উভয় পক্ষের একটী ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয়; এই কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা রুদ্র পরবর্ষেই অঞ্জনার গতি রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ২য়—কাঁচিকাটা নদী ইহারই উত্তরে সুবিখ্যাত কাঁচিকাটা কনসারণ নামীয় নীলকুঠী স্থাপিত ছিল। ৩য়—রাণাঘাটের উত্তর এবং দক্ষিণ পূর্ব্বদিক বেষ্টন করিয়া যে দুইটী জলহীন খাত বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যাহারা বাচকো ও হাজরের খাল বলিয়া খ্যাত,—যাহারা বর্ষাকালে অদ্যাপি নদীর আকার ধারণ করে, তাহা পূর্ব্বে চূর্ণী নিঃসৃত দুইটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ছিল। রাণাঘাটের এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাচকোর উত্তর কূলে স্থিত নৌকাড়ি বলিয়া একখানি বহু পুরাতন ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। গ্রামখানির নাম হইতেই উপলব্ধি হইবে যে, ইহা পূর্ব্বকালে নৌকার আড়ি বা নৌকার আড্ডা ছিল। এই গ্রাম খানি বহু পুরাতন, এমন কি ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বেও যে ইহা বিদ্যমান ছিল তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্য লীলায় প্রধান নায়ক শান্তিপুর-বাসী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু (১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রামে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। এ বৃত্তান্ত অদ্বৈত মঙ্গল লেখক শ্রীমদ্ শ্যামদাস বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে সে কালেও এই বাচকোর খাল বহতা ছিল এবং ইহার উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গ্রাম খানি তখনও নৌকাড়ি বা নৌকার আড্ডা ছিল। এই ক্ষুদ্র খাত যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত যে প্রবাহ ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীতে আমরা দেখাইয়াছি যে তিনি এই গ্রাম দিয়া নৌকাযোগে গমন কালে এই নৌকাড়ি গ্রামের কোন অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে জলক্রীড়া কালীন দর্শন করিয়া তাহার রূপে আকৃষ্ট

হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও অর্থাৎ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দেও এই নদীটী বহতা ছিল।

এই সকল স্রোতোস্বিনী বা স্রোতোহীনা বা খাত মাত্রে পর্য্যবসিতা নদী, গঙ্গা ও অন্যান্য নদীসকল বহু পূর্ব্বকাল হইতে বহুরূপে গতি পরিবর্ত্তন করায় নদীয়ার বহু স্থানে বহু খাত দৃষ্ট হয়। বর্ষাকালে প্রায়শঃ এগুলি এক একটী নদীর আকার ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলায় আয়তনের সহিত তুলনা করিলে এস্থানে যত স্বাভাবিক খাল, বিল ও জলাভূমি দৃষ্ট হয়, নিম্ন বঙ্গের আর কোনও জেলায় এরূপ নহে। এই সকল বিল ও খালের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী সর্ব্বাধিক বিখ্যাত; এই সকল বিলে প্রতি বৎসর অনেক সাহেব ও বাবু পক্ষী শিকার করিয়া থাকেন।

১ম। কৃষ্ণনগর সদর সবডিভিজনের অন্তর্গত—হাড়খালি বিল, হাঁসাডাঙ্গা বিল, উমৎপুর বিল, তালদের বিল, দোগাছীয়ার বিল, নোয়ালদহের বিল, কলিঙ্গ বিল, আইদ বিল, পলদার বিল।

২য়। রাণাঘাট সবডিভিজনের এলেকায়—বাগদেবী খাল, হরিপুর খাল, সিকোর খাল, তারাপুর বিল, আমলার বিল, প্রিয়নগরের বাঁওড়, চামটার বিল, রাকড়ির বিল, পুমুলি বিল, চিনিয়ালী বিল, যমুনার খাল।

৩য়। মেহেরপুর সবডিভিজনে—কলমার বিল, পদ্মার বিল, কাজলা বিল, জিনদণ্ডর খাল, নাটোর বিল, খামদর বিল, মাজিয়া বিল।

৪র্থ। চুয়াডাঙ্গা সবডিভিসনের এলেকায়—রায়সা বিল, দলকা বিল, সোনা-পাড়া বিল, পুরাপাড়া বিল, এলাঙ্গী বিল, কমলদহ বিল, তালবেড়ের বিল, গরত রায়পাড়া বিল।

৫ম। কুষ্টিয়া সবডিভিজনে—আমলার বিল, তালবেড়ের বিল, ঝাঁঝাঁর বিল, বোয়ালিয়ার বাঁওর, মহেশ কুণ্ডুর ডাঙ্গোল, কোচো ডাঙ্গার ডাঙ্গোল, খোলাদর ডাঙ্গোল।

এই সকল নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জলকর হইতে মৎস্য ধরা একটী প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু মৎস্যের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতেছে, অধুনা গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং কিসে মৎস্যের চাষ ভালরূপে করা যাইতে পারে, তাহার বিষয়ে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। নদীয়ার বিল খালে ও

নদীতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত মৎস্যগুলি পাওয়া যায়,—রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস, খয়রা, জিওল, কৈ, ইটে, মাগুর, সোল, চিংড়ী, পাঁকাল, আড়, বোয়াল, গাঁড়চা, পুঁটী, টেঙ্গড়া, চেলা, বেলে, চিতল, চাঁদা, ট্যাপা, শঙ্কর, ল্যাটা, বান্, কাঁকলে, তোড়া, খলসে, মেডিচিঙ্গড়ি, ইলিস প্রভৃতি।

নদীয়ার রাজপথ।

অন্যান্য জেলার আয়তনের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র নদীয়া জেলায় যত নদী, রাজপথ, রেলওয়ে প্রভৃতি যাতায়াতের সুযোগ দৃষ্ট হয়, নিম্নবঙ্গের অন্য কোন জেলায় তদ্রূপ দেখা যায় না। যদিও পূর্ব্বকালে নদীয়ার অন্তর ও বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথেই চলিত, তথাপি বাণিজ্য কার্য্য ও গমনাগমনের সুবিধার জন্য মুসলমানদিগের সময়ে এদেশে বৃহৎ বৃহৎ সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম বিদ্যমান ছিল। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানি মানচিত্রে বঙ্গের কয়টী প্রধান প্রধান রাস্তা লক্ষিত হয় ; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত রাস্তাটী নদীয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। যে স্থানে ভাগীরথী ও পদ্মা পৃথক হইয়াছে, পাটনা, মুঙ্গের ও রাজমহল দিয়া সেই স্থান পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আসিয়া দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটী মুরশিদাবাদ, পলাসী, অগ্রদ্বীপ, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়া কটকাভিমুখে গিয়াছে, অপরটী পদ্মার দক্ষিণ ধার দিয়া কাতরাবাদ (ফরিদপুর) পর্য্যন্ত যাইয়া ঢাকার অভিমুখে গিয়াছে। জেমস্ রেনেল্‌স কৃত ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ডেস্‌ক্রিপ্‌সান অব্ রোড্‌স্ (Description of Roads) নামক গ্রন্থেও আমরা এই রাস্তাটীর উল্লেখ দেখিতে পাই ; তাহাতে মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমান দিয়া নদীয়া পর্য্যন্ত রাস্তাটীর উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে রেনলসের "ম্যাপ অব্ বেঙ্গলে" নদীয়ার মানচিত্রে আমরা নিম্নলিখিত স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য ও বড় অক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাই। ১ম। কৃষ্ণনগর—এখানে নদীয়ার রাজাগণের বাসস্থান বলিয়া একটী মন্দির চূড়াদ্বারা চিহ্নিত করা আছে (২) পলাসী—আম্রকুঞ্জ দ্বারা চিহ্নিত। (৩) অগ্রদ্বীপ—ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। (৪) নবদ্বীপ

(৫) শিবনিবাস—ইহাও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম রাজধানী বিধায় বড় অক্ষরে মুদ্রিত। (৬) শান্তিপুর (৭) শ্রীনগর—তদানীন্তন নদীয়া ও রাজসাহির সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত।

এই সকল প্রধান প্রধান স্থানগুলিকে সম্বন্ধ করিয়া নিম্নলিখিত প্রধান রাজবর্ত্মগুলি অঙ্কিত দেখা যায়।

১। কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর—ইহা নবদ্বীপাধিপতি রাজা রুদ্রের নির্ম্মিত। (২) কৃষ্ণনগর হইতে শিবনিবাস। (৩) কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট, শ্রীনগর, মল্লিকপুকুর, বরানগর হইয়া কলিকাতা। (৪) শিবনিবাস হইতে রাণাঘাট দিয়া বারাসাত। (৫) শিবনিবাস হইতে বনগ্রাম ঝিকড়গাছা এবং (৬) শ্রীনগর হইতে বনগ্রাম।

বর্ত্তমানকালে ১১৬টী সাধারণের অর্থে চালিত রাস্তার মধ্যে নদীয়ার নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর	...	দৈর্ঘ্য	৯	মাইল।
কৃষ্ণনগর হইতে কৃষ্ণগঞ্জ পর্য্যন্ত	...	„	১২½	„
কৃষ্ণনগর হইতে নদীয়া	...	„	৬½	„
কৃষ্ণনগর হইতে মেহেরপুর	...	„	২৫½	„
কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট দিয়া আওলি (পূর্ব্বে এই রাস্তা দিয়া সৈন্য চলিত)	...	„	৩২	„
চাপড়া হইতে তেহাট্টা (ডাকরাস্তা)		„	১৪	„
মেহেরপুর হইতে রামনগর রেলষ্টেসান		„	২১	„
কৃষ্ণনগর হইতে বগুলা	...	„	৯½	„
কৃষ্ণনগর হইতে বহরমপুর	...	„	২৮½	„
চাকদহ হইতে সুখসাগর	...	„	৬	„
রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম	...	„	২০	„
রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর	...	„	৮½	„
চুয়াডাঙ্গা রেল ষ্টেসন হইতে ঝিনেদহ (যশোহর)			২২	„
চুয়াডাঙ্গা রেল ষ্টেসন হইতে মেহেরপুর		„	১৮	„

কুষ্টিয়া হইতে দাদপুর ...	„	৭	„
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে কোট চাঁদপুর ...	„	২০	„
কৃষ্ণনগর হইতে শিবনিবাস ...	„	১৪	„
তেহাটা হইতে দেবগ্রাম দিয়া কাটোয়া	„	২৫½	„
ভেড়ামারা হইতে শিকারপুর ...	„	১৬	„
কুষ্টিয়া হইতে কুমারখালি দিয়া সিমলা	„	১৩	„
দর্শনা হইতে কাপাসডাঙ্গা দিয়া কেদারগঞ্জ	„	১৭	„
পলাশী ষ্টেসন হইতে পলাশী মনুমেণ্ট	„	২½	„
কৃষ্ণনগর হইতে পলাশী ...	„	২৮½	„

আদম সুমারি।

ইংরাজ-রাজ আমাদের দেশে যে সমস্ত কল্যাণকর বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে আদমসুমারী প্রথা অন্যতম। এতদ্বারা আমরা আমাদের দেশের লোক-সংখ্যা কত, গৃহের সংখ্যা কত, কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক কত, উহাদের মধ্যে শিক্ষিত কতজন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অশেষবিধ সংবাদ জানিতে পারিয়াছি এবং প্রতি দশম বৎসরে ঐরূপ গণনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ সময়ের মধ্যে উক্ত সংখ্যাগুলির হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপ হইতেছে, তাহা জানিয়া দেশের অবস্থা বিশেষরূপে অনুধাবন করিতে পারিতেছি। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথম যখন উক্ত নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন জনসাধারণ ইহার উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করে এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ আবার বুঝি কোনও রাজকর ধার্য্য হইবে, তাই এইরূপ মানুষ গণনা হইতেছে মনে করিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে। ফলে সে বৎসর আদমসুমারী ঠিক মনোমত হয় নাই। হাণ্টার সাহেবের "ষ্ট্যাটিষ্টীকাল একাউণ্ট অব্ নদীয়া" পাঠে জানা যায় যে সে বৎসর নদীয়ার জনসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া এই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তখন এখানকার কোনও সুশিক্ষিত সুচতুর জমিদার মহাশয় লোককে নানারূপে উহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করেন

কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে এই বলিয়া সকলকে আশ্বাসিত করেন যে "মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র এ দেশে শুভাগমন করায় মহারাণীর আদেশে বাঙ্গলার সকলকে একদিন সন্দেশ প্রভৃতি নানা উপাদেয় মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইবে, তাই যার ঘরে যে কয়জন লোক আছে, সরকারে লিখাইয়া দিলে তাহাকে সেই মত মিষ্টান্ন দেওয়া যাইবে।" এই মহা লোভনীয় আশ্বাস বাক্যে নাকি দলে দলে আসিয়া বিনা আপত্তিতে আপনাদের যথাযথ সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু অনেকে তথাপি নানা কুসংস্কারের বশে আপনাদের সংখ্যা গোপন করিয়াছিল।

এই আদমসুমারীর রিপোর্টে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি একেবারে যথাযথ না হইলেও, অনেকটা প্রকৃত এবং ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে। বিগত চারি বারের আদমসুমারীর লোক-সংখ্যায় প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ১৮৭২ অব্দ অপেক্ষা ১৮৮১ অব্দে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ১৮৭২ অব্দে প্রথম লোক গণনা হওয়ায় সে বৎসরের গণনা ও তালিকায় স্বতই বহু ত্রুটি ও ভ্রম সংঘটিত হইয়াছিল; সুতরাং ১৮৮১ অব্দের সংখ্যাই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরে ১৮৯১ অব্দের গণনায় দেখা যায় যে, পূর্ব্ব বারের গণনা অপেক্ষা এইবার ১৮,৩৮৭ জন লোক কমিয়া যায়। পরে বিগত ১৯০১ অব্দের গণনায় ১৮৯১ অব্দের সংখ্যা অপেক্ষা ২০০৮৩ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে; অর্থাৎ ১৮৯১ অব্দের যে সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইয়াও মোট ৪৬৯৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অধুনা রেল প্রভৃতি গমনাগমনের সুযোগ হওয়ায় যত সংখ্যক বিদেশী এদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ নদীয়ার অগণিত ইটখোলায়, রেলের বিভিন্ন কার্য্যে পোষ্ট আফিষের সহস্র ব্যাপারে, নানা কল কারখানায়, সাধারণ ভৃত্যের, বেহারার, পাচকের ও দারবানের এবং পুলিশের কার্য্যে, নৌকা-বাহী মাঝীর কার্য্যে, ৯টী মিউনিসিপালিটীর শত শত মেথর ও ধাঙ্গড়ের কার্য্যে কন্ট্রাকটারের ঠিকাদারের কার্য্যে এবং নদীয়ার বাজারের শত শত বিপণীতে এবং কোথায় নহে, যেরূপ উড়িয়া, খোট্টা, বিহারী প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিদেশী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে তাহাতে নদীয়ার আদিম জন সংখ্যা যে কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায় নাই, পরন্ত, দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রার্থনীয়।

নদীয়ার বিস্তৃতি ২,৭৯৩ বর্গ মাইল। ইহাতে ৯টী মিউনিসিপাল সহর এবং ৩,৪১১ গ্রাম বিদ্যমান আছে। মোট অধ্যুসিত বাটীর সংখ্যা ৩৪৮, ৬২৮ তন্মধ্যে সহরে ২৪,৮১১ এবং গ্রামে ৩২৩,৮১৭ বাটী আছে। মোট জনসংখ্যা ১৬৬৭৪৯১ তন্মধ্যে ৯টী সহরে ৯৫,৩৫৫ এবং গ্রামে ১,৫৭২,১৩৬। এই লোক সংখ্যার মধ্যে পুরুষ ৮২৭,৫০৯ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৩৯,৯৮২।

সেনসাস্ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুলনায় সমগ্র জেলায় লোকসংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হইবে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ক্ষেত্রে যোগের (+) ও হ্রাস ক্ষেত্রে বিয়োগের চিহ্ন (−) প্রদর্শিত হইয়াছে।

সমগ্র জেলার লোকসংখ্যার হিসাব।*

খৃষ্টাব্দ।	মোট জন সংখ্যা।	তুলনায়	হ্রাস বা বৃদ্ধি।
১৯০১	১,৬৬৭,৪৯১	১৮৯১ − ১৯০১	২৩৫৮৩+
১৮৯১	১,৬৪৪,১০৮	১৮৮১ − ১৮৯১	১৮,৬৬৭ −
১৮৮১	১,৬৬২,৭৯৫	১৮৭২ − ১৮৮১	১৬২,৩৯৮+
১৮৭২	১,৫০০,৩৯৭		

* Subdivision	Area in sq. Miles	Number of Town	Number of Villages	Popola-tion.	Population per sq. Miles.	Number of persons able to read and write
Krishnagar	701	2	740	361,333	515	29,784
Ranaghat	427	4	548	217,077	508	16,706
Kushtia	596	2	1,011	486,368	816	22,743
Meherpur	632	1	607	548,124	551	13,875
Chuadanga	437	7	485	254,589	583	10,267
Dist Total	2,793	9	3,411	1,667,491	597	93,375

স্থানের নাম	কোন সালে	জনসংখ্যা	তুলনায়	হ্রাস বা বৃদ্ধি
কৃষ্ণনগর—	১৯০১	২৪,৫৪৭	১৮৯১—১৯০১	৯৫৩—
	১৮৯১	২৫,৫০০	১৮৮১—১৮৯১	১,৯৭৭—
	১৮৮১	২৭,৪৭৭	১৮৭২—১৮৮১	৭২৭+
	১৮৭২	২৬৭৫০		

১৯০১ সালে হিন্দু ১৬২২০, ব্রাহ্মণ ৪, মুসলমান ৭৪৪৯ ও খৃষ্টান ৮৬৪।

নদীয়া—	১৯০১	১০,৮৮০	১৮৯১—১৯০১	২,৪৫৪—
	১৮৯১	১৩,৩৩৪	১৮৮১—১৮৯১	৭৭১—
	১৮৮১	১৪,১০৫	১৮৭২—১৮৮১	৫,২৪২+
	১৮৭২	৪,৪৬৩		

১৯০১ সালে হিন্দু, ১০,৪১৬, মুসলমান ৪৫৭ ও খৃষ্টান ৭।

শান্তিপুর—	১৯০১	২৬,৮৯৮	১৮৯১—১৯০১	৩৫৩৯—
	১৮৯১	৩০,৪৩৭	১৮৮১—১৮৯১	৭৫০+
	১৮৮১	২৯,৬৮৭	১৮৭২—১৮৮১	১,০৫২+
	১৮৭২	২৮,৬৩৫		

১৯০১ সালে হিন্দু ১৮,২১৯ মুসলমান ৮,৬৭২ ও খৃষ্টান ৬।

রাণাঘাট—	১৯০১	৮,৭৪৪	১৮৯১—১৯০১	২৩৮+
	১৮৯১	৮,৫০৬	১৮৮১—১৮৯১	১৭৭—
	১৮৮১	৮,৬৮৩	১৮৭২—১৮৮১	১৮৮—
	১৮৭২	৮,৮৭১		

১৯০১ সালে হিন্দু ৭,৪০৫ মুসলমান ১২৩৮ খৃষ্টান ৭১।

কুষ্টিয়া—	১৯০১	৫,৩৩০	১৮৯১—১৯০১	৬৮৬৯—
	১৮৯১	১১,১৯৯	১৮৮১—১৮৯১	১,৪৮২+
	১৮৮১	৯,৭১৭	১৮৭২—১৮৮১	৪৭২+
	১৮৭২	৯,২৪৫		

১৯০১ সালে হিন্দু—৩০৩৬, মুসলমান—২২৩৫, খৃষ্টান—২৯।

স্থানের নাম	কোন সালে	জনসংখ্যা	তুলনায়	হ্রাস বা বৃদ্ধি
কুমারখালি—	১৯০১	৪৫৮৪	১৮৯১ – ১৯০১	১৫৮১ –
	১৮৯১	৬,১৬৫	১৮৮১ – ১৮৯১	১২৪ +
	১৮৮১	৬,০৪১	১৮৭২ – ১৮৮১	৭৯০ +
	১৮৭২	৫,২৫১		

১৯০১ সালে হিন্দু—৩,২৪২, মুসলমান—১০৪২

স্থানের নাম	কোন সালে	জনসংখ্যা	তুলনায়	হ্রাস বা বৃদ্ধি
মেহেরপুর—	১৯০১	৫,৭৬৬	১৮৯১ – ১৯০১	৫৪ –
	১৮৯১	৫,৮২০	১৮৮১ – ১৮৯১	১৮৯ +
	১৮৮১	৫,৭০১	১৮৭২ – ১৮৮১	১৬৯ +
	১৮৭২	৫,৫৬২		

১৯০১ সালে হিন্দু—৩,৯৬৮, মুসলমান—১৭৮৭, খৃষ্টান—১১।

স্থানের নাম	কোন সালে	জনসংখ্যা	তুলনায়	হ্রাস বা বৃদ্ধি
বীরনগর—	১৯০১	৩,১২৪	১৮৯১ – ১৯০১	২৯৭ –
	১৮৯১	৩,৪২১	১৮৮১ – ১৮৯১	৯০০ —
	১৮৮১	৪,৩২১	...	...

১৯০১ সালে হিন্দু—২,৩৮০, মুসলমান—৭০৫, খৃষ্টান—৯।

স্থানের নাম	কোন সালে	জনসংখ্যা	তুলনায়	হ্রাস বা বৃদ্ধি
চাকদহ—	১৯০১	৫,৪৮২	১৮৯১ – ১৯০১	৩,১৩৬ –
	১৮৯১	৮,৬১৮	১৮৮১ – ১৮৯১	৩৭১ –
	১৮৮১	৮,৯৮৯	১৮৭২ – ১৮৮১	৭৭১ +
	১৮৭২	৮,২১৮		

১৯০১ সালে হিন্দু—৪,৩০০, মুসলমান—১,১৮১, খৃষ্টান—১।

নদীয়ার লোক সমষ্টি কত জন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী।

নদীয়ার মোট লোক সমষ্টি ১,৬৬৭,৪৯১ ; তন্মধ্যে পুরুষ ৮২৭,৫০৯ ও স্ত্রীলোক ৮৩৯,৯৮২।

					পুরুষ	স্ত্রীলোক
মোট	হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী	৬৭৬,৩৯১	জন	তন্মধ্যে	৩৩৩,৯৮৭	৩৪২,৪০৪
,,	ব্রাহ্ম ,,	১৬	,,		১০	৬
,,	বৌদ্ধ ,,	১	,,		১	০
,,	পার্শী ,,	১	,,		১	০
,,	মুসলমান ,,	৯৮২,৯৮৭	,,		৪৮৯,৩৮১	৪৯০,৬০৬
,,	খৃষ্টান ,,	৮,০৯১	,,		৪,১২৭	৩,৯৬৪
,,	অ্যানিমিষ্ট ,,	৪	,,		২	২

নদীয়ার কত জন নরনারীর বর্ণ শিক্ষা আছে।*

সমগ্র ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে যাহাদের বর্ণ পরিচয় আছে বা শিক্ষিত এরূপ লোক সংখ্যা মোট ৯৩,৩৭৫ ; তন্মধ্যে পুরুষ ৮৬,১০৭ জন ও স্ত্রীলোক ৭,২৬৮ জন।

একেবারে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা মোট ১,৫৭৪,১১৬ ; তন্মধ্যে পুরুষ ৭৭১,৪০২ ; স্ত্রীলোক ৮০২,৭১৪।

---

* Nadia District in spite itsproximity to Calcutta, is not especially remarkable for the diffusion of the rudiments of learning. In 1901 the proportion of the literate persons was 5-6 per cent. (10-4 males and 0-9 females). The total number of pupils under instruction increased from about 20,000 in 1883 to 29,364 in 1892-3 and 31,102 in 1900-1, while 31,513 boys and 4,442 girls were at School in 1903-4, being respectively 25-4 and 2-7 per cent of the number of School going age. The number of educational institutions, public and private in 1903-4 was 1,026, including an Arts College, 90 secondary, 887 primary, and 48 Special Schools.

Imp Gazetter (New Edition)
Vol XVIII Page 281.

বাঙ্গালা ভাষা জানে এরূপ পুরুষ ৮৩১৮৯ স্ত্রীলোক ৭, ১৫২। হিন্দি ভাষা জানে পুরুষ ১০৬৫ ; স্ত্রীলোক ৩৯। অন্যান্য ভাষা জানে পুরুষ ১৩৫৩ ; স্ত্রীলোক ৮৭। যাহারা ইংরাজি ভাষা জানে, তাহাদের মোটসংখ্যা ১৩,১১৮, তন্মধ্যে পুরুষ ১৩,৮৩৬, স্ত্রীলোক ২৮১। পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার মধ্যে ভাষা-জ্ঞান আছে এরূপ হিন্দুর মোট সংখ্যা ৭১,৮৭১ তন্মধ্যে পুরুষ ৬৬,২৮৮ ও স্ত্রীলোক ৫০৬৩। অশিক্ষিতের মোটসংখ্যা ৬০৪৫২০ ; তন্মধ্যে ২৬৭,৭১৯ পুরুষ,৩৩৬,৮০১ স্ত্রীলোক বাঙ্গালা জানে লোকের সংখ্যা ৯৭১ পুরুষ,১৬ স্ত্রীলেক। অন্যান্য ভাষা জানে ৬৩৬ পুরুষ.স্ত্রীলোক ৩। ইংরাজি জানে তাহার সংখ্যা মোট ১২,৮৭৫ জন তন্মধ্যে ১২,৭৪০ পুরুষ, স্ত্রীলোক, ১৩৫। শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ১৯,৮০৮, তন্মধ্যে ১২০০১ পুরুষ ও স্ত্রীলোক ৮০৭। অশিক্ষিত ব্যক্তির মোটসংখ্যা ৯৬৩,১০৯ তন্মধ্যে ৪৭০,৩৮০ পুরুষ,৪৯১,৭৯৯ স্ত্রীলোক। বাঙ্গালা জানে তাহার সংখ্যা ১৮, ৮৭১ পুরুষ ৭০৯ স্ত্রীলোক। হিন্দি জানে তাহার সংখ্যা ৯১ পুরুষ ২২ স্ত্রীলোক অন্যান্য ভাষা জানে ৪৩৬ পুরুষ ২৬ স্ত্রীলোক। ইংরাজি জানে তাহার সংখ্যা মোট ১১১২ ; তন্মধ্যে ১০৯১ পুরুষ ২১ স্ত্রীলোক।

নদীয়ার কৃষি।

নদীয়ার ভূমিসকল বিশেষ উর্ব্বরা নহে। ইহার অধিকাংশ ভূমিই বালুকা-মিশ্রিত, বা বালুকাময়। হৈমন্তিক ধান্যের উপযোগী জল ইহাতে দাঁড়াইতে পারে না, বালুকায় উহা নিশোষিত হয়। নদীয়ার কেবলমাত্র কালান্তরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ও কুষ্টিয়া মহকুমার স্থানে স্থানে হৈমন্তিক ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানেও অল্পবিস্তর জন্মিয়া থাকে। এখানকার কৃষকেরা তাদৃশ কঠিন পরিশ্রমী নহে ইহারা কেবল দৈব ও পর্জ্জন্য দেবের* অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকে ; জমিতে দিবার জন্য সার সংগ্রহণের প্রতি ইহাদের সেরূপ লক্ষ্য ও যত্ন নাই। বিনা আয়াসে বা স্বল্প পরিশ্রমে যে সার সংগ্রহ হয়, তাহাই

---

* Annual rainfall averages 57 inches of which 6·5 inches fall in May. 9·7 in June, 10·3 in August, 8·1 in September, and 4·1 in October. Im. Gazeteer (New edition) vol XVIII page 273.

ব্যবহার করে। অধিকাংশ জমিতে প্রজার কায়েমী স্বত্ব না থাকায় ইহারা জমির উন্নতিকল্পে পরিশ্রম ও যত্ন করে না। তাহার উপর আবার যে বৎসর পর্জ্জন্যদেবের কৃপা না হয় সে বৎসর জলাভাবে যেমন কৃষির ক্ষতি হয় তেমনি স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়ে। † এ প্রদেশে জমির শুষ্কতা প্রযুক্ত খালখনন (Irrigation) করিয়া ক্ষেত্রে জল লইয়া যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। তজ্জন্য এখানে খাল খনন কার্য্য (Irrigation) হয় না করাও হয় না। ১৯০৩।৪ সালে মোট ৯০১ বর্গ মাইল আবাদ হইয়াছিল, আবাদ-যোগ্য পতিতজমি ৫৪৪ বর্গ মাইল ছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউলই প্রধান। ৭৭৬ বর্গ মাইল ভূমিতে চাউলের আবাদ, তন্মধ্যেই আশু ধান্যই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রায় ৬০৭ বর্গ মাইল জমিতে আশুধান্য উৎপন্ন হয়। এই আশুধান্য বৈশাখ মাসে বুনান হইয়া ভাদ্র মাসে কাটা হয়। আমন ধান্য অর্থাৎ হৈমন্তিক ধান্যের বীজ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিয়া আষাঢ় মাসে ঐ চারা ক্ষেত্রান্তরে রোপণ করিয়া অগ্রহায়ণমাসে কাটা হয়। আশু ধান্য ভাদ্র মাসে কাটিয়া ঐ জমিতে চাষ দিয়া পুনরায় উহাতে রবিশস্য বুনানি করা হয়। রবিশস্যের মধ্যে মুগ, কলাই, মটর, ছোলা অরহর খেঁসারি মসুরি সরিষা ও মসিনা। গম ও যবের চাষ এখানে নাই বলিলেও হয়। বর্ষাকালে কোষ্টা কাটা হয়। পূর্ব্বে কয়েকবৎসর কোষ্টার চাষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল কোষ্টার চাষ অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইক্ষুর আবাদ কিছু কিছু হইয়া থাকে, বেশী নহে। পূর্ব্বে এখানে অধিক পরিমাণে নীলের চাষ ছিল, এক্ষণে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। সমস্ত নীল কুঠীই বন্ধ হইয়াগিয়াছে। খর্জ্জুরের গুড় এ প্রদেশে উত্তমরূপে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। শান্তিপুর গড়ে চিনি প্রস্তুত, ও জেলার দক্ষিণাংশে তামাকের চাষ হইয়া থাকে, এবং উত্তম

---

† সম্প্রতি মহামহিমান্বিত রাজরাজেশ্বর ৭ম এডওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে নদীয়ার বর্ত্তমান জন-প্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট ইজাকাইল সাহাদুরকে মুখপত্র করিয়া নদীয়ার জনসাধারণ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া নদীয়ার জল্লরপ্রয়ীর জলকষ্ট নিবারণের কল্পনা করিয়াছেন। আশা হয় শীঘ্রই এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবে।



মহামহিমান্বিত রাজ-রাজেশ্বর ভারত-সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড।

(এই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি-রক্ষাকল্পে নদীয়াবাসী জনসাধারণ বহু অর্থ চাঁদা তুলিয়া কোন স্থায়ী হিতকরী কীর্ত্তি স্থাপনের সঙ্কল্পনা করিয়াছেন।

হিংলী তামাক জন্মে কিন্তু বেশী নহে। চাকদাহ থানার এলাকায় পানের বরজ আছে। আশু ধানের জমিতে প্রত্যেক বৎসর আবাদ হয় না; জমী উর্ব্বরা নহে বলিয়া, এক বৎসর আবাদের পর উপর্য্যুপরি ২।১ বৎসর তাহকে, উর্ব্বরতা-শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পতিতভাবে রাখিতে হয়। এপ্রদেশে তরিতরকারী উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। গঙ্গার চর ভূমীতে, এবং অন্যান্য নদীর চরে পটল, কুমড়া, কাঁকুড়, তরমুজ, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আলুর চাষ এখানে নাই। জমি বালুকাময় হেতু ও স্যাঁতা নহে বলিয়া, এখানে নারিকেল বৃক্ষ তত অধিক নাই। সুপারি বৃক্ষ নাই বলিলেও চলে। গোচরণ ভূমি এখানে নাই; একারণ গবাদির বিশেষ কষ্ট হয়। মোট কথা, এ প্রদেশে যে পরিমাণ চাউল জন্মে, তাহাতে এই জেলার লোকের পক্ষে কোনরূপ চলিতে পারে। তবে অজন্মা হইলে, ও রপ্তানি হইলে সংকুলান হয় না, কাজেই মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এখানে বৃষ্টি রীতিমত হইয়া থাকে। তবে দৈবপাতে, সময়ে সুবৃষ্টির অভাবে, ও অসময়ে অতি বৃষ্টি-প্রযুক্ত শস্যের বিশেষ হানি হইয়া থাকে।

নদীয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্য।

নদীয়ায় মধ্যে শান্তিপুরে, বাউ গাছিতে পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠি ছিল। শান্তিপুর সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন-প্রধান-স্থান, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, শান্তিপুর হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতি বৎসর ১৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সূক্ষ্ম বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিদেশে চালান দিতেন। এক্ষণে শান্তিপুরে বহুতর তন্তুবায় আছে। কিন্তু সেরূপ পরিমাণে বস্ত্র আর প্রস্তুত হয় না। সুতরাং আজিও তথায় উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইলেও, যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে ঐ বয়ন-শিল্প অতি অল্প কাল মধ্যেই লুপ্ত হইবে। শান্তিপুর সুতরাং গড়ে এখনও অল্প বিস্তর চিনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুনসীগঞ্জ আলমডাঙ্গা অঞ্চলেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নবদ্বীপ, রাণাঘাট, মেহেরপুর প্রদেশে পিত্তলের দ্রব্য উত্তমরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কৃষ্ণনগরে মাটীর পুতুল, মাটীর কৃত্রিম ফল সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কুষ্টিয়ায় ইয়োরোপীয় তত্ত্বাবধানে, ইক্ষুর মাড়ার কারখানা আছে। সম্প্রতি কুষ্টিয়ায় অবসর-প্রাপ্ত

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী স্বয়ং একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাধারণে অর্থ সাহায্য করিলে, উহা বিশেষ সুফল প্রসব করিবে। নদীয়ায় নদীর সুবিধা থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধা কর। বিশেষতঃ ইহার বক্ষ দিয়া প্রায় ১০০ মাইল ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল ও তাহার মুর্শিদাবাদ শাখা ৪০ মাইল ও শান্তিপুর লাইট রেল থাকায় নদীয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের আরও সুবিধা হইয়াছে। ছোলা, সর্ব্ব প্রকার ডাইল, কোষ্টা, মসিনা, সরিসা ও লঙ্কা এখান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখান হইতে পূর্ব্ব বঙ্গে চিনি রপ্তানি হয়। বর্দ্ধমান ও মানভূম প্রদেশ হইতে এ প্রদেশে জ্বালানি কয়লা আমদানী হইয়া থাকে; কলিকাতা হইতে এখানে লবণ, তৈল, বস্ত্র আমদানী হইয়া থাকে, কলিকাতা হইতে কেরোসিন তৈল আমদানী হইয়া যশোহর মুর্শিদাবাদ প্রদেশে আবার রপ্তানি হয়। কালনা হইতে বহু পরিমাণে আলু আমদানী হইয়া স্থানীয় খরচ বাদে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হয়। বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, বগুড়া, যশোহর হইতে এখানে চাউল আমদানী হয়। রেলওয়ের ধারে বাণিজ্য-কেন্দ্র যথা, চুয়াডাঙ্গা, বগুলা, কৃষ্ণগঞ্জ, রাণাঘাট, দামুকদিয়া এবং পোড়াদহ। নদী সমূহের ধারে নৌকা-যোগে দ্রব্য সম্ভার আমদানি-রপ্তানি-কেন্দ্র :—যথা শান্তিপুর, রাণাঘাট, করিমপুর, আঁচুলিয়া কৃষ্ণনগর, স্বরূপগঞ্জ, হাঁসখালী, কৃষ্ণগঞ্জ, বোয়ালিয়া, নোনাগঞ্জ, আলমডাঙ্গা, পাংশা, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোক্সা; এই সকল স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৮টী মেলা হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে অধিকাংশই প্রায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মেলা; এই সব মেলার মধ্যে শান্তিপুরের রাসমেলা, নবদ্বীপে পট পূর্ণিমার মেলা, ফুলিয়া অপরাধ-ভঞ্জনের পাঠ মেলা, এবং ঘোষপাড়া দোলের মেলাই প্রধান ও এই গুলিতে অধিক লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই সকল মেলায় নানা স্থান হইতে (স্থানীয় ও অন্য স্থানীয়) বহুতর দ্রব্যাদি আমদানী ও খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

পরিশিষ্ট।

নদীয়া-কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় নরহরি দাসের "নবদ্বীপ-পরিক্রমা"র কোন বিশুদ্ধ সংস্করণ না থাকায় পরিশিষ্টে উহা দিবার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু, সম্প্রতি নবদ্বীপ পরিক্রমার বহু সুন্দর বিশুদ্ধ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ঐতিহাসিকের চক্ষে নবদ্বীপ পরিক্রমার বিশেষ কোন মূল্য না থাকিলেও, প্রাচীন নবদ্বীপের সংস্থানাদি বুঝিতে হইলে নবদ্বীপ পরিক্রমা ভৌগলিকগণের বিশেষ সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা নবদ্বীপ-পরিক্রমা পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন. তাঁহাদিগকে এই বিশুদ্ধ সংস্করণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

——:•:——

Names of Members of the Indian Civil Service who were connected with the administration of the District and who subsequently held higher positions, with short notices of their career.

1. SIR RIVERS THOMSON, K.C.S.I.—was District and Sessions Judge of Nadia from 1862 to 1865 ; while Lieutenant Governor of Bengal, visited Krishnagar in 1886 and Ranaghat when his visit was commemorated by the establishment of a public library which bore his name.

2. SIR WILLIAM HARSCHEL,—was Magistrate of the District and as such, was very popular. Still remembered as a staunch friend of the Indigo *rayyat*. Rose to be a Member of the Board of Revenue.

3. SIR CHARLES CECIL STEVENS, K.C.S.I.—was the most popular Magistrate and Collector of the District. His amiable manners and unfailing courtesy and kindness won for him the heart of everybody who came in contact with him. His name is still remembered in the remotest corners of the District. Rose to be acting Lieutenant Governor of Bengal.

4. SIR HENRY Cotton, K.C.S.I.,—was connected with the District as Subordinate officer of Chuadanga. Rose to be Chief Commissioner of Assam. His memory is still preserved there in a beautiful avenue bearing his name. A portrait is also preserved in the Local Criminal Court. His name is a household word for his love of India.

5. Sir James Westland, K.C.S.I.,—was associated with the administration of the District as Magistrate and Collector. Rose to be an ordinary Member of the Imperial Council.

6. Sir Stuart Colvin Bayley, K.C.S.I.—known as a very popular Magistrate and Collector for his amiable disposition. Rose to be a Member of the Board of Revenue and subsequently Lieutenant-Governor of Bengal.

7. Sir Alexander Mackenzie, K.C.S.I.,—was connected with the District as Sub-divisional officer of Kushtea. Became ultimately Lieutenant-Governor of Bengal.

8. Lord Ullick Browne,—was for sometime the Magistrate and Collector and was known as a popular officer. Became a Member of the Board of Revenue.

9. Horace A. Cockrale, C.S.I.—was Magistrate and Collector. Rose to be a member of the Board of Revenue and subsequently acting Lieutenant-Governor of Bengal.

10. James Monro, C.B.—a popular Magistrate and Collector. His love of the District and specially its people was subsequently evinced by his settling as a Missionary at Ranaghat. His knowledge of the District is sufficiently wide to enable him to speak with authority.

11. W. B. Oldham, C.S.I.—known as an able administrator. Was for a short time Magistrate and Collector. Rose to be a Member of the Board of Revenue

12. W. C. Macpherson, C.S.I.—For a short time an acting Magistrate and Collector. Known as an able officer. Now a Member of the Board of Revenue.

13. A. Earle, C.S.I.—Magistrate and Collector. Now a Secretary to the Government of India.

14. L. R. Tottenham, C.I.E.—Magistrate and Collector. Became a Judge of the High Court.

15. K. G. Gupta, C.S.I.—was for long the Magistrate and Collector and was very popular. Known as an intelligent and able officer. Now a colleague of the Right Hon'ble the Secretary of State.



মহামহিমান্বিত রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ।

নদীয়া কাহিনী।

16. E. A. GAIT, C.I.E.,—One of the most popular Magistrates. His affability and unfailing courtesy endeared him to the people. His interest in furthering Sanskrit learning in the District, especially in *Navadwip* the seat of ancient Sanskrit literature is still remembered by the Educated Community. Now holds the position of Chief Census Commissioner for India.

EDUCATIONAL.

Of the foremost educationists who held charge of the Krishnagar College, the only College in the District, the following are worthy of notice :—

Captain D. L. Richardson ; Sir Roper Lethbridge, K.C.S.I. Norman Chevirs ; S. Lobb ; F. J. Rowe ; Prof Livingstone ; J. Mann ; and S. C. Hill. Some of them held high positions at present. The last named now holds the position of Director of Public Instruction, Central Provinces.

—o—

নিজ নদীয়াবাসী নদীয়ার জমিদারবর্গ ব্যতীত বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার যে সমস্ত প্রধান প্রধান জমীদার বংশের জমীদারী নদীয়ায় আছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যানুরাগী মহানুভব জমীদার বাবুগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (কাসিমবাজার), রাজা সার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর (কলিকাতা), মহারাজা সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (কলিকাত), সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা) সুকবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা), রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), রাজা প্রমথ ভূষণ দেবরায় (নলডাঙ্গা), রাজা হৃষিকেশ লাহা (কলিকাতা), বাবু অম্বিকাচরণ লাহা (কলিকাতা), বাবু গৌরচরণ লাহা (কলিকাতা), রাজা কৃষ্ণদাস লাহা (কলিকাতা), কুমার শরৎ কুমার রায় (দীঘাপতিয়া), কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ (পাকপাড়া), বাবু উপেন্দ্রনাথ নাথ ঘোষ (কলিকাতা), ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ (কলিকাত)।

—:—

নদীয়ার জমীদারগণের শীর্ষ-স্থানীয় নদীয়া-রাজ-শ্রী ভুবনবিখ্যাত অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী বংশের সুপণ্ডিত মহারাজা ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর,—যাঁহার আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় উৎসাহিত হইয়া আমি নদীয়া-কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি, আমার সেই প্রিয়-সুহৃদ যে এত শীঘ্র, নদীয়া-কাহিনী প্রকাশিত হইতে না হইতে আমাদিগকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া অকালে ইহ ধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহা কে ভাবিয়াছিল, (মৃত্যু ২রা ভাদ্র) তাঁহার হস্তে আমি যে সম্পূর্ণ নদীয়া-কাহিনী তুলিয়া দিতে পারিলাম না, এ দুঃখ আমার যাইবার নহে। নারায়ণ তাঁহার আত্মার সদ্গতি সাধন করুণ ; পিতার উপযুক্ত পুত্র কুমার ক্ষৌণীশচন্দ্র পিতার ন্যায় যশঃ সম্মান লাভ করুন, এই দারুণ শোকে ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

যে রাজার রাজত্বকাল মধ্যে কোনও পুস্তক রচনা সমাপ্ত হয় সেই পুস্তক ঐ রাজার রাজত্ব-কালের যে বৎসরে সমাপ্ত হয়, পুস্তক সমাপ্তির তারিখে সেই বৎসরের উল্লেখ করা সনাতন আর্য্য-প্রথা। নদীয়া কাহিনী লেখা, পুণ্যশ্লোক, শান্তিপ্রিয়, রাজরাজেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজত্বকালের ৮ম বর্ষে আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইচ্ছা ছিল তাঁহারই পুণ্যনাম লইয়া তাঁহারই রাজত্বকাল মধ্যে উহা সমাপ্ত করিব, কিন্তু বিগত ইং ১৯১০ সালের ৬ মে, বঙ্গাব্দ সন ১৩১৭ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে নিদারুণ কাল তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লওয়ায় এ সাধে বাদ পড়িয়াছে। এক্ষণে উপ-যুক্ত পিতার প্রতিচ্ছায়া, যশঃশক্তিধর সম্রাট রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের মহামহিমান্বিত নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে ইং ১৯১০ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে, সন ১৩১৭ সালের ১৪ ভাদ্র এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ভগবান তাঁহার কর্ম্মময় জীবন শান্তিপূর্ণ ও সুদীর্ঘ করুন; তাঁহার শান্তিমাখা কোমল আশ্রয়ে কমনীয় বঙ্গভাষা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক, ভগবচ্চরণে ইহাই প্রার্থনা।

———— :•: ————

শাকে পক্ষ-গুণেভ-চন্দ্র-বিমিতে সিংহস্থিতে ভাস্করে
বেদেন্দু-প্রমিতে কুজে ২ সিত-তিথাবেকাদশীসংজ্ঞকে।
ত্রিংশৈকাব্দকঃ প্রবেশ সময়ে সম্পাদিতা শ্রীমতা
রাণাঘাট নিবাসিনা কুমুদনাথেন প্রবন্ধাদিনঃ।
নদীয়াকাহিনীনাম মল্লিকোপাধিধারিণা।
পুস্তিকা সজ্জনারাধ্যা তয়াপ্রীণাতু মাধবঃ।

সম্পূর্ণ।



